বোম্বাই চিত্র

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদনা

রঞ্জিত সেন

অরুণা প্রকাশন
২, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

অরুণা প্রকাশন : মার্চ, ২০০০

প্রকাশক :
শ্যামল ভট্টাচার্য্য
২, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

লেজার কম্পোজ :
অরুণা প্রিন্টার্স
২, কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রণ :
নিম্বার্ক অফসেট
৪এ, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ :
অরুণা ভট্টাচার্য্য

প্রকাশকের কথা

আশপাশে আমরা যে সমস্ত গ্রন্থ সচরাচর দেখতে পাই তা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'বোম্বাই চিত্র' গ্রন্থটি স্বতন্ত্র। তিনি পশ্চিম ভারতের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সমকালীন অবস্থাকে তাঁর বইতে তুলে ধরেছেন, যা মূলত ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতির দান। বিরাট বোম্বাই প্রেসিডেন্সি নিয়ে তিনি যে চমৎকার আলেখ্য তুলে ধরেছেন তাতে তদানীন্তন বোম্বাই প্রদেশ, বোম্বাই শহর ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল আমাদের চোখের সামনে ছবির মতন প্রতীয়মান হয়। তাছাড়াও তিনি প্রতিবেশী বিদেশকেও আমাদের সামনে সিংহল ভ্রমণ বৃত্তান্তে তুলে ধরেছেন। এর পাশাপাশি সত্যেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ শাসনের ব্যবচ্ছেদ করেছেন পরিশিষ্ট অংশে 'ভারতবর্ষীয় ইংরাজ' অংশে। এককথায় বলা যেতে পারে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস-আখ্যান।

সম্পাদকের আলোচনা ও নব সংস্করণের ভূমিকা

রঞ্জিত সেন

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার পরিবার

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর— সে যুগের সবচেয়ে বড় আন্তেপ্রেনিয়র (Entrepreneur) যিনি কার-ঠাকুর কোম্পানি নামে এক বড় কোম্পানি খুলেছিলেন। দ্বারকানাথ ছিলেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড় জমিদারদের একজন যিনি আরবি-ফার্সি-বাংলা-ইংরাজি ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করে এবং জাহাজের ব্যবসা, কয়লার ব্যবসা, নীলের ব্যবসা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিরাট ব্যবসায়িক সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের থেকে কুড়ি বছরের (মতান্তরে বাইশ বছরের) ছোট হয়েও সমস্ত সমাজ সংস্কারের কাজে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। এমন পরিবারে জন্মেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর জন্ম কলকাতায় ১৮৪২ সালের ১লা জুন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৯২৩ সালের ৯ই জানুয়ারি। রবীন্দ্রনাথ বেঁচেছিলেন ৮০ বছর (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর মেজদাদা বেঁচেছিলেন ৮১ বছর। তিনি পেশায় ছিলেন সিভিল সার্ভেন্ট— সরকারের কভেনান্টেড অফিসার। তার সঙ্গে তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক। তাঁর স্ত্রী ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। তাঁর পুত্রকন্যারা হলেন যথাক্রমে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২-১৯৪০) এবং ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (১৮৭৩-১৯৬০)। তাঁদের দুজনেরই পিতার সঙ্গে শৈশবে ইংল্যাণ্ডে প্রবাসজীবন যাপনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' নামক উপন্যাসটি ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি মহাভারতের মূল অংশের একটি সংক্ষিপ্তসার বাংলা ভাষায় রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর বিবাহ হয়েছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি ছিলেন ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ও ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ। তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম প্রবক্তা। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বাড়িতে। সেখানেই তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষার প্রথম পাঠ লাভ করেন। পরে তিনি হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৮৫৭ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় (Entrance examination) পাশ করেন। ১৮৫৭ সালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়— এর সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজ ও বোম্বাইতেও

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এইভাবেই ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগের (the university age) সূচনা হয়। তখন প্রবেশিকা পরীক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পরীক্ষা ছিল। এই পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এই অর্থে বলা যেতে পারে যে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় যুগের প্রথম প্রজন্মের ছাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন তাই। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় যুগের আদি উপাদান নয়, কলকাতা শহরের রেনেশাঁস যুগের বিশিষ্ট অবদানও বলা যেতে পারে তাঁকে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এইভাবে পনেরো বছর বয়সে কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রকেই প্রাপ্তবয়স্ক ধরে নেওয়া হত। এর দু-বছর পরে— ১৮৫৯ সালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। সেই একই বছর তিনি ও কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষির সঙ্গে শ্রীলঙ্কা (তখনকার দিনে বলা হত Ceylon) ভ্রমণে যান। এইভাবে শুরু হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানের জীবন।

১৮৬২ সালে— কুড়ি বছর বয়সে— সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধু মনোমোহন ঘোষ ইংল্যাণ্ডে যান— উদ্দেশ্য ছিল সেখানে যথাযোগ্য পাঠ গ্রহণ করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া। এটি ছিল একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় আগে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার ছিল না। এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রশাসকদের নিয়োগ করা হত। এই প্রশাসকের পদকে বলা হত কভেনান্টেড পদ (covenanted posts)। এক সময়ে শুধু ইংরাজ যুবকরাই এতে অংশগ্রহণ করতে পারত। ১৮৩২ সালে সর্বপ্রথম মুনসেফ ও সদর আমিনের পদ খোলা হয় এবং তা ভারতীয়দের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এর পরের বছর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ খোলা হয় এবং ভারতীয়দের জন্য তার দ্বার খুলে দেওয়া হল। ১৮৬১ সালে চালু হল আই.সি.এস. অ্যাক্ট (The ICS Act of 1861)। প্রতিষ্ঠিত হল ভারতীয় প্রশাসন কর্ম — The Indian Civil Service। ১৮৫৩ সালের একটি আইন (The Act of 1853) এই প্রথা চালু করেছিল যে অতঃপর সমস্ত বিধিবদ্ধ প্রশাসকদের (covenanted civilians) পরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। তখন বিধিবদ্ধ প্রশাসক হতে হলে ভারতীয় যুবকদের ইংল্যাণ্ডে গিয়ে বিদেশের মাটি-জল-হাওয়ার মধ্যে থেকে সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে সাম্রাজ্যের শাসক ইংরাজ যুবকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রশাসকের চাকুরি লাভ করতে হত। পরীক্ষার মাধ্যমে এই রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৮৬৩ সালে সত্যেন্দ্রনাথ আই.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর অল্প কিছুদিন তাঁর বিধিসম্মত প্রশিক্ষণ শেষ (probationary training) করতে সময় লাগে। ১৮৬৪ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। তাঁর বন্ধু মনোমোহন ঘোষ আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তিনি আইন পাশ করে আদালতে ওকালতি শুরু করেন। মনে রাখতে হবে যে তাঁকে বিলাতে গিয়ে ইংরাজ যুবকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার সাহস জুগিয়েছিলেন মনোমোহন ঘোষ। তাঁর সমর্থন ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ হয়ত প্রবাসে যাওয়ার সঙ্কল্প করতেন না।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে কর্মাবস্থান (posting) লাভ করলেন। তখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি বলতে বোঝাত ভারতবর্ষের সমস্ত পশ্চিম উপকূল— সিন্ধু প্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অঞ্চল। চাকুরির প্রথম চারমাস তিনি বোম্বাই শহরে অবস্থান করেন। তারপর তাঁর কর্মস্থান হয় আহমেদাবাদ। কর্মসূত্রে নানা শহরে ও জেলায় তাঁকে পরিভ্রমণ করতে হয় এবং বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে তাঁকে কার্যনির্বাহ করতে হত। প্রথমদিকে তাঁর মূল ও সক্রিয় দপ্তর (active posting) ছিল আহমেদাবাদ। চাকুরিতে অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দক্ষতা বাড়তে থাকে। তখন কাজের পরিধিও বৃদ্ধি পায়। আই.সি.এস. অফিসারের সংখ্যা তখন কমই ছিল। ফলে যোগ্যতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহর থেকে শহরান্তরের বিভিন্ন স্থানে তাঁর অবস্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এইভাবে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মানুষজন, লোকাচার, জীবনপদ্ধতি, ধর্মবিশ্বাস, শিল্প ও কৃষিকাজ সম্বন্ধে তিনি সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। দীর্ঘকাল প্রবাসজীবনে থাকার ফলে তাঁর ভ্রাতা-ভগিনীদের মধ্যে কেউ কেউ— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্ণকুমারী দেবী— তাঁর কাছে গিয়ে থেকেছেন। তাঁদের মধ্যে দিয়ে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। পশ্চিমভারতে ব্রাহ্মসমাজের প্রসারে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এক সক্রিয় শক্তি। আহমেদাবাদ, হায়দরাবাদ ও সিন্ধুদেশে ব্রাহ্মসমাজের দপ্তর খোলা তাঁর সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হয়েছিল। পশ্চিমভারতে থাকার ফলে তিনি বালগঙ্গাধর তিলকের নবহিন্দুত্বের দর্শন ও তাঁর নানা কার্যকলাপে আকৃষ্ট হন। তিলকের গীতাভাষ্যের তিনি বঙ্গানুবাদ করেন। তুকারামের নানা কবিতারও বঙ্গানুবাদ তিনি করেছিলেন। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল ছিল নানা জাতির, নানা ভাষাভাষী ও ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস। তাদের সঙ্গে কাজ করতে হত বলে সত্যেন্দ্রনাথকে একাধিক ভারতীয় ভাষা শিখতে হয়েছিল। সম্ভবত নিজে ব্রাহ্ম ছিলেন বলে তিনি প্রার্থনাসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখতেন। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলেই তিনি সমকালীন পশ্চিম ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন— মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাঙ্গ, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, নারায়ণ গণেশ চন্দ্রভারকর এবং আরও অনেকে। সত্যেন্দ্রনাথ তিরিশ বছর প্রশাসনের কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৭ সালে সাতারার প্রশাসক-বিচারক রূপে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সমাজচিন্তার নবপ্রবর্তক। নারীর উন্নতি, পরিবার ও সমাজের আড়ষ্টতা থেকে তার মুক্তি, সংস্কারের বন্ধন থেকে বের হয়ে এসে এক অনবরুদ্ধ জীবনে তার উদ্বোধন— এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। রামমোহন রায়ই ছিলেন প্রথম আধুনিক মানুষ যিনি নারীকে জীবনের সজীব অবস্থানের মধ্যে এনেছিলেন— তার অস্তিত্বকে প্রাণিত করেছিলেন তার বাঁচার আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে। তিনি বলতেন যে ভারতীয় নারী বড়ই নিগৃহীত জীব— অক্ষরজ্ঞানহীন— অশিক্ষিত, জীবিকা ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত, রজঃস্বলা হওয়ার আগেই বিবাহ-বন্ধনে বিনষ্ট, পর্দার আড়ালে অবলুপ্ত, বৈধব্যের

নির্যাতিত শিকার রূপে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর মাঝে বিলীন এক চিরমলিন সত্তা। কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে (১৮২৯ সালে) তিনি নারীর প্রতি উদ্দিষ্ট যে সমাজভাবনার সৃষ্টি করেছিলেন তার অনুষঙ্গেই গড়ে উঠেছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনা। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন মুক্ত নারীসমাজকে। তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীও ইংল্যাণ্ডে এসে মুক্ত দুনিয়ার আলোবাতাস গ্রহণ করুক। কিন্তু তাঁর বাবামশায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। পরে ভারতবর্ষে এসে আহমেদাবাদে অবস্থানকালে তিনি তাঁর স্ত্রীকে সমাজে স্বাধীনভাবে মেলামেশার অধিকার দেন, বিশেষ করে ইংরাজ অফিসারদের স্ত্রীদের সঙ্গে সংসর্গ স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেন। তরুণ বয়স থেকে তিনি বিশ্বাস করতেন যে পর্দাব্যবস্থা ভারতবর্ষের প্রাচীন ব্যবস্থা নয়— মুসলমান শাসনের সঙ্গে ইসলামি সভ্যতার অঙ্গরূপে তা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। তাই প্রথম থেকেই তিনি স্ত্রীকে পর্দামুক্ত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। ইংরাজ আই.সি.এস. অফিসারদের স্ত্রীরা যে আদবকায়দায় জীবনধারণ করতেন তিনিও তাঁর স্ত্রীকে অনুরূপভাবে থাকার প্রেরণা দিতেন। এর ফলে জ্ঞানদানন্দিনী বাঙালি-ভারতীয় নারীদের প্রথাগত জীবন-পদ্ধতির অনেকটাই বাইরে চলে গিয়েছিলেন। ছুটিতে তাঁরা যখন কলকাতায় আসতেন তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে চঞ্চলতা দেখা দিত। তিনি প্রকাশ্য সমাজে স্ত্রীকে নিয়ে বের হতেন— এটি সে যুগে সহজ ছিল না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা-অধিবেশনে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রকাশ্য প্রার্থনায় মহিলারা অংশগ্রহণ করবেন এমন ব্যবস্থা করায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আলোড়ন উঠেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ যা করেছিলেন তা এর থেকেও বেশি। তিনি গভর্নরের বাসগৃহে একটি নিমন্ত্রণ-সভায় স্ত্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে অনেক ইংরাজ রমণীদের মধ্যে জ্ঞানদানন্দিনীই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় নারী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের অন্যতম বিশিষ্ট মানুষ প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তিনি পরিবারের কোন কুলবধূর এই সকম প্রকাশ্য উপস্থিতি সহ্য করতে না পেরে সভা ত্যাগ করেন।

এই রকম বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণায় ও প্রযত্নে জ্ঞানদানন্দিনী বিকশিত হয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালে সত্যেন্দ্রনাথ এক ইংরাজ পরিবারের সঙ্গে জ্ঞানদানন্দিনীকে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করেন। এই সৌভাগ্যশালিনী নারী তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন তাঁর তিন সন্তানকে। এ যুগের তুলনায় এ ঘটনা বিরল— সে যুগের পক্ষে তো আরও অ্যাডভেঞ্চারের সামিল ছিল এ ঘটনা। তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর সপরিবারে ইংল্যাণ্ডে বসবাস করছিলেন। তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি ব্যারিস্টার রূপে ইংল্যাণ্ডের বার এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হয়ে সর্বোচ্চ আদালতে প্র্যাকটিস করার অনুমতি পেয়েছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী সন্তানদের নিয়ে তাঁর গৃহেই অবস্থান করেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রথমে লণ্ডনে ছিলেন, পরে ব্রাইটনে (Brighton) চলে যান। সেখানে নিজের আবাসে বসবাস

করতে থাকেন। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী এক দুর্নিবার প্রগতিশীল পৃথিবীর সাক্ষাৎ পান। নানাদিকে তাঁর দৃষ্টি উন্মোচিত হয়। নারীসমাজের পোশাক, আব্রু, শালীনতা এসবের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। শোনা যায় যে মেয়েদের শাড়ি পরার আধুনিক রীতি ও অন্তর্বাস পড়ার প্রথা তিনিই চালু করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী শিশুদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হন। গৃহে শিশুদের জন্মদিন পালন করার প্রথা তাঁর সময় থেকে শুরু হয়েছিল। ছোট ছোট শিশুরা উপহার পেতে ভালবাসে। তাছাড়া তাদের ঘিরে আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হলে গৃহে উৎসবের আমেজ আসে। শিশুদের জন্মদিন পালন পাশ্চাত্য জীবনচর্যার অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। সে বিষয়টি সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী বাঙালি ভারতীয় জীবনের অঙ্গীভূত করেন। ১৮৮৫ সালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' নামে একটি পারিবারিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন যে এটিই বাংলা ভাষায় প্রথম শিশুপত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকায় অনেক কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা এই পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। এক বছর চলার পর এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। তখন তার অস্তিত্ব 'ভারতী' নামে পারিবারিক পত্রিকার সঙ্গে মিশে যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ খুব জাতীয়তাবাদী দেশহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির সকল সদস্যের মধ্যেই তখন দেশপ্রেম একটা বড় প্রবণতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সময়ে দেশের মানুষ খুব পাশ্চাত্য পোশাক পরতে শুরু করে। ইংরাজি ভাষাচর্চার আকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধি পায়। এইরকম সমাজব্যাপী ইংরাজিয়ানার মধ্যে ঠাকুরপরিবারের সদস্যরা দেশীয় পোশাক ও বাংলা ভাষাব চর্চাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এই সময়ে বাংলাদেশে দেশপ্রেমের প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটেছিল হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের একজন বিশিষ্ট সদস্য। ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধিবেশন হয়। সত্যেন্দ্রনাথ তখন পশ্চিম ভারতে ছিলেন। ১৮৬৮ সালে তিনি এর দ্বিতীয় অধিবেশনের সময় কলকাতায় ছিলেন এবং এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বচনা করেছিলেন একটি বিখ্যাত গান 'মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান গাহ গান'। এই গানটি এই অধিবেশনের জন্যেই রচিত হয়েছিল। অনেকের মতে এইটিই ভারতের প্রথম জাতীয় সঙ্গীত। এই গানটি ছাড়া আরও অনেক স্বদেশী গান তিনি রচনা করেছিলেন। স্বদেশের কাজ ও ব্রাহ্মসমাজের প্রচার এই দুটি কাজে সত্যেন্দ্রনাথ সমানভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের মতো ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক ছিলেন না, কিন্তু যখন যেখানে থেকেছেন তখন সেখানেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যখন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজ করা হবে বলে স্থির হল তখন কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সেখানে প্রেরণ করা হয়েছিল। আসলে তরুণ প্রজন্মের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য ব্রাহ্মসমাজ অনেক সময়ে তরুণদের উপর নির্ভর করত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং কেশবচন্দ্রের উপর

অনেকখানি নির্ভর করতেন। অনেক কাজে সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সহকারী ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে থাকার সময়ে তাঁর পড়াশুনা ও কাজের চাপের মধ্যেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের কাজ করেছেন। আহমেদাবাদে চাকুরিরত অবস্থায় তিনি বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং তাঁকে নিয়মিত ব্রাহ্মসমাজের খবর পাঠাতেন। ম্যাক্সমুলারের স্ত্রী তাঁর স্বামীর জীবনী লেখার সময়ে এই কথা স্বীকার করেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে থাকেননি। প্রথমে পার্কস্ট্রিট এবং পরে বালিগঞ্জে বসবাস করতে থাকেন। তখন দক্ষিণ কলকাতা আস্তে আস্তে গড়ে উঠছিল। পার্কস্ট্রিট-এর দক্ষিণে সার্কুলার রোড পর্যন্ত পুরানো কলকাতার চৌহদ্দি স্থির হয়েছিল অনেকদিন ধরেই। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে ভবানীপুর অঞ্চল গড়ে উঠতে থাকে। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরু থেকে বালিগঞ্জ অঞ্চল সার্কুলার রোড ও পার্কস্ট্রিটের দক্ষিণে কলকাতার একটি সংলগ্ন উপনগরী রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। কলকাতার অনেক ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁদের পরিবার নিয়ে দক্ষিণে চলে যান। দক্ষিণ দিকের এই রকম অভিবাসনের সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর পুরানো আবাস ছেড়ে বালিগঞ্জে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর গৃহ হয়ে ওঠে সমাজের নানা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মিলনকেন্দ্র। যাঁরা তাঁর গৃহে নিয়মিত যাতায়াত করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি), কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, তারকনাথ পালিত, বিহারীলাল গুপ্ত, মনোমোহন ঘোষ, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (তিনি লর্ড উপাধি লাভ করেছিলেন) এবং আরও অনেক ব্যক্তি। এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ব্রাহ্মসমাজের খুব বড় সমর্থক ছিলেন। সম্ভবত ঠাকুর পরিবার এবং বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে বাংলাদেশের প্রথম অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। ১৯০৯ সালে তিনি গভর্নর জেনারেলের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হন।

সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তক হল সুশীলা ও বীরসিংহ (নাটক ১৮৬৭), বোম্বাই চিত্র (১৮৮৮), নবরত্নমালা, স্ত্রীস্বাধীনতা, বৌদ্ধধর্ম (১৯০১), আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস (১৯১৫), ভারতবর্ষীয় ইংরেজ (১৯০৮) এবং রাজা রামমোহন রায়।

সন্ত তুকারাম

সন্ত তুকারাম জন্মেছিলেন মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত পুণার নিকটবর্তী ডেহু (Dehu) নামে একটি ছোট জনবসতিতে। ডেহু প্রচলিত অর্থে একটি গ্রাম ছিল না, অথচ তখন তা কোন শহরেরও রূপ নেয়নি। পুণার সন্নিকটে বলে গ্রামীণ পরিবেশে এখানে শহুরে জনবসতির অনেক লক্ষণই প্রকাশ পেয়েছিল। পুণা ও তার চারপাশের অঞ্চল বহু শতাব্দী ধরে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের এক প্রভাবশালী কেন্দ্র ছিল। এরকম একটি অঞ্চলে তুকারামের জন্ম হয়। তাঁর

পরিবারের পদবী ছিল 'মোরে' (Moray)। মহারাষ্ট্রে বসবাসকাবা আম্বিলে বা মৌর্য জাতির এরা একটি অংশ। এদের নামের প্রথমাংশে বোলহোবা (Bolhoba) এবং কানাকাই (Kanakai) শব্দ দুটি যুক্ত থাকত। কিন্তু তুকারাম যেহেতু সাধু ব্যক্তি ছিলেন তাই তাঁর নামের আগে এই শব্দগুলি অপসারিত হয়ে 'সন্ত' শব্দটি যুক্ত হয়। এইটিই ছিল ভারতীয় প্রথা। তুকারামের জন্মের তারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে। পণ্ডিতরা যে বছরগুলিকে তাঁর জন্মসাল বলে চিহ্নিত করেছেন সেগুলি হল— ১৫৭৭, ১৫৯৮, ১৬০৮ এবং ১৬০৯। তুকারাম দেহরক্ষা করেন (হিন্দুধর্ম অনুযায়ী সাধু ব্যক্তিরা মরেন না, তাঁরা দেহ রাখেন) ১৬৫০ সালে। এই তারিখটিই নিশ্চিত নয়। তুকারামের স্ত্রী রাখুমাবাই (Rakhumabai) অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন জিজাবাই (Jijabai) অথবা আওয়ালি (Avali) বলেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তুকারামের ছিল তিন পুত্র মহাদেব (তাকে 'সন্ত' বলে ডাকা হত), বিঠোবা ও নারায়ণ। তিনি ছিলেন প্রভু বিট্টলা (Vittala) বা বিঠোবা— অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসক।

সন্ত তুকারামকে বলা হয়ে থাকে যে তিনি মহারাষ্ট্রের হিন্দু ভক্তিবাদের শীর্ষ প্রতিনিধি। ঐতিহাসিক মহারাষ্ট্রের ভক্তিবাদকে 'ভগবৎ হিন্দু ঐতিহ্য' (Bhagwat Hindu Tradition) বলে বর্ণনা করেছেন। এই ভক্তিবাদের ধারা মহারাষ্ট্রে শুরু করেছিলেন নামদেব। মারাঠিদের ওয়ারকরী (Warakari) শাখার মানুষেরা পাঁচজন বিশিষ্ট সন্ত প্রভুদের আরাধনা করে থাকে। এঁরা হলেন নামদেব, জ্ঞানেশ্বর, জনাবাই, একনাথ ও তুকারাম। নামদেব ছিলেন মহারাষ্ট্রের মারাঠওয়াড়া (Marathwada) অঞ্চলের মানুষ। তাঁর জীবনকাল ১২৭০-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ (বা খ্রিস্টায় শতক— Christian Era, সংক্ষেপে CE)। তিনি ছিলেন একজন ভক্ত কবি— ধর্মাশ্রিত কবিতা, গান লিখে তিনি মহারাষ্ট্রে ভক্তিবাদের সূচনা করেছিলেন। তিনি মারাঠি ভাষার আদিপর্বের একজন পদকর্তা। তিনি বিঠোবা প্রভুর উপাসক ছিলেন।

সন্ত জ্ঞানেশ্বর (তাঁকে দাঁনেশ্বরও বলা হয়) ছিলেন ত্রয়োদশ শতকের মানুষ— সন্ত নামদেবের সমসাময়িক। তাঁর জীবনকাল ১২৭৫ থেকে ১২৯৬ খ্রিস্টায় শতক। তিনি জ্ঞানদেব নামেও পরিচিত। তিনি ছিলেন একজন ভক্ত কবি, দার্শনিক ও নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত যোগী। তিনি 'ভাবার্থ দীপিকা' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এটি ছিল ভগবদ্গীতার ভাষ্য (commentary)। তাঁর অন্য একটি গ্রন্থ 'অমৃতানুভব' মারাঠি সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

সন্ত জনাবাই ছিলেন একজন সাধ্বী কবি। ত্রয়োদশ শতকের সপ্তম বা অষ্টম দশকে তিনি জন্মেছিলেন। জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে বলা হয়ে থাকে যে তিনি ১৩৫০ খ্রিস্টায় শতকে পরলোকগমন করেন। মারাঠিদের ওয়ারকরী শাখার মানুষদের কাছে তিনি ভক্তিমার্গের একজন উপাস্য নারী। তাঁর কবিতায় ভক্তি ও প্রেমের ললিত মিশ্রণ ঘটেছে।

সন্ত একনাথ ছিলেন মহারাষ্ট্রের একজন প্রখ্যাত ভক্ত কবি। তাঁর জীবনকাল ১৫৩৩ থেকে ১৫৯৯ খ্রিস্টীয় শতক। জীবনের অধিকাংশ সময়ে তিনি মহারাষ্ট্রের পৈথান (Paithan) অঞ্চলে বসবাস করতেন। তিনি মারাঠি ভাষা ছাড়া আরও পাঁচটি ভাষা জানতেন— সংস্কৃত, আর্বি, ফার্সি, উর্দু এবং হিন্দি। তখন ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের রমরমা চলছে। সমস্ত হিন্দু ঐতিহ্য আড়ালে চলে যাচ্ছিল। সেই সময়ে হিন্দু ভক্তিবাদের প্রাণিত ধারাকে সন্ত একনাথ জাতির শুষ্ক চেতনার মধ্যে বইয়ে দিয়েছিলেন। সন্ত একনাথের সবচেয়ে বড় কাজ হল অস্পৃশ্যতা দূর করার ব্রত'গ্রহণ করা। এ বিষয়ে তিনি ও বাংলার চৈতন্য মহাপ্রভু একই উদ্বোধনের মহাঋষি। মধ্যযুগের মহারাষ্ট্রে তিনি জাতপাতের দ্বন্দ্বকে মুছে দিতে চেয়েছিলেন। মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব— সবাই পবিত্র, কেউই অবাঞ্ছিত, অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ নয়। গোদাবরী নদীর জলে অস্পৃশ্য এক মারাঠা জাতি মহরদের (Mahar) এক শিশুকে জলে ভেসে যেতে দেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন। নিম্নজাতির মানুষদেব তিনি ঠাঁই দিতেন, আলিঙ্গনে বাঁধতেন এবং শান্ত, নম্র ও প্রেমময় বচনে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে নিজের মনের ভাব বিনিময় করতেন। তাঁর কবিতার সুর হল নম্র, ভাষা হল ললিত, ভাব হল প্রেম, অভিমুখ হল উদার সহনশীলতা। মধ্যযুগের প্রেক্ষিতে এটি ছিল একটি বিপ্লব। তিনি মানুষ, পশু, পাখি নির্বিচারে সমস্ত জীবে প্রেম বিতরণ করতে বলেছেন, কারণ জীব মাত্র ঈশ্বরের সৃষ্টি। ভারতবর্ষের জীবপ্রেমের শাশ্বত বাণীকে গ্রহণ করেই বিবেকানন্দ প্রচার করেছিলেন তাঁর সেই অমর উজ্জীবনের বাণী — জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

সন্ত তুকারাম এই ভারতীয় ভক্তি ধারার অন্যতম প্রধান কবি। সন্ত তুকারামের ধর্মজীবন কীভাবে শুরু হয়েছিল বলা যায় না। তাঁর ধর্মজীবনের সূচনা সম্বন্ধে একটি মত হল যে তিনি গৌড়ীয় সাধক মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের (১৪৯৬—১৫৩৪ খ্রিস্টীয় শতক) কৃষ্ণপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এর অর্থ হল যে তিনি ভক্তিযোগের বৈষ্ণবীয় ধারার (The Vaishnava School of Bhakti Yoga) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর আগমনের পর থেকেই একটি ধারা ভারতবর্ষের সমগ্র পূর্বাঞ্চলকে (বর্তমান বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা এবং কিছুটা আসাম) প্লাবিত করেছিল। এই প্লাবনের উচ্ছ্বাস পশ্চিম ভারতেও পৌঁছেছিল। সন্ত তুকারাম সেই প্লাবনের প্রাণিত ধারায় অবগাহন করেছিলেন। যে গুরুমন্ত্র তিনি লাভ করেছিলেন তা হল কৃষ্ণনাম— কৃষ্ণ, রাম ও রাধা— এই ত্রিশক্তি মন্ত্রোচ্চারণের প্রাণময়তায় মর্মরিত হয়েছিল দুটি শব্দে— 'হর' এবং 'হরে'। বলা হয়ে থাকে— অর্থাৎ জনশ্রুতি এইরকম যে তিনি এই দুই শব্দধবনি লাভ করেছিলেন মহাপ্রভু চৈতন্যের কাছ থেকে— অর্থাৎ স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁর দীক্ষাগুরু। এর অর্থ হল গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ধারায় সিক্ত হয়ে স্বপ্নে তিনি এই দীক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে : "He has received guru mantra containing names of Krishna, Rama and Radha (referred by 'Hara' or 'Hari' in vocative) This was at the hands or by the media of a dream of Chaitanya

Mahaprabhu and Gaudiya Vaishnavas document that he was initiated and was a disciple Chaitanya." [Wikipedia, the free Encyclopedia থেকে গৃহীত]। পাঠক-পাঠিকারা অনুগ্রহ করে উপরে referred শব্দের পর একটি 'to' শব্দ যোগ করবেন। তাতে বাক্যটি ব্যাকরণগত ভাবে শুদ্ধ হবে। পঠিতব্য গ্রন্থ Durga Chaitanya Bharati *Sri Gouranga : The Man* (1933) ; Ramchandra D. Ranade, *Tukaram*, New York ; State University of New York Press, 1994 এবং James Rodney Hastings, *Encyclopedia of Religion and Ethics* (2nd Edn. 1925-1940, reprint 1955,

সন্ত তুকারাম সম্বন্ধে একটি আদি তথ্য-গ্রন্থ হল মহীপতি রচিত 'ভক্তি-বিজয়' এবং 'ভক্তি-লীলামৃত'। মহীপতি তুকারামের মৃত্যুর ৬৫ বছর পরে জন্মেছিলেন। স্মরণীয় যে তুকারাম জন্মেছিলেন সন্ত একনাথের ৫০ বছর, সন্ত নামদেবের মৃত্যুর ৩০০ বছর এবং সন্ত জ্ঞানেশ্বরের মৃত্যুর ৩৫৩ বছর পর। এর অর্থ হল পশ্চিম ভারতে ভক্তি আন্দোলনের ধারা পরম্পরাগতভাবে ৪০০ বছরের অধিক সময় ধরে প্রাণময় এক সমাজ উদ্বোধনের ধারা রূপে কাজ করেছে। মহীপতি যখন তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন তখন পশ্চিম ভারতীয় ভক্তিযোগের সার্বিক ধারাকে মাথায় রেখেই তিনি তুকারামের জীবনের অমৃত-কথা রচনা করেছেন। তাঁর তথ্য বেশির ভাগই জনশ্রুতি থেকে আহরণ করা। তাঁর লেখায় আমরা যতখানি ইতিহাসকে পাই তার থেকে বেশি পাই সমকালের ভক্তিবোধের উদ্বোধন।

সন্ত তুকারাম জনগণের মধ্যে ধর্মচেতনার যে প্রভাব এনেছিলেন তা মূলত কবিতা এবং গানের মধ্য দিয়ে। বহু কবিতা তাঁর নিজের লেখা, বহু কবিতা পরম্পরা থেকে পাওয়া। তাঁর গানও তাই— গান ছিল তাঁর কীর্তন (মারাঠি ভাষায় 'কীর্তনে')। তিনি সংগীতে, কবিতায়, পাঠ ও আলোচনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের নিবিড় প্রেমবন্ধনের কথা বলতেন। নম্রতা, দীনতা, অনসূয়ার ভাব নিয়ে, ক্রোধ, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা বর্জন করে মানুষ মানুষকে গ্রহণ করবে, এইটিই হল ধর্মের মূল কথা। আচার-অনুষ্ঠান নয়, যাগ-যজ্ঞ নয়, পণ্ডিত-পুরোহিত-তোষণ নয়, দৈনিক আচার-আচরণের পবিত্রতাই মানুষকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। তিনি বলেছিলেন যে বেদ নিয়ে, ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আতিশয্য অর্থহীন— অর্থবহ শুধু সে জীবন যা সহজ, সরল, সৎ— প্রাত্যহিকের সকল কর্মে যা ভালোবাসায় সিক্ত। তিনি সমবেত কীর্তন, সকলের সম্মিলিত সঙ্গীত, একত্রে সকলের ভজন-উপাসনা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর কবিতা এবং সংগীতে কথায় ও বাণীতে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনার নানা ইঙ্গিত দেখতে পাই। তিনি যৌথ দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে, পাঠ্য-ভাষ্য-কথকতার মধ্য দিয়ে সমাজের প্রবুদ্ধতাকে (enlightenment) বৃদ্ধি করতে চাইতেন। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে সন্ত তুকারাম সাধারণ মিষ্টিক (mystic) ভক্তিবাদী সাধক ছিলেন না তাঁর ভক্তিবাদে এক গভীর সমাজসচেতন প্রাজ্ঞতা বিরাজ করত। মহারাষ্ট্রে ও পশ্চিম ভারতে ধর্মচর্চা ও ভজন আরাধনার পরম্পরার মধ্যে সমাজসেবার নিরন্তরতা (tradition) পালিত হত। একে বলা

হত 'ওয়ারাকারি' বা 'ওয়ারকারি' ধারা (warakari বা varkai tradition)। এই ধারার একটি বড় লক্ষ্য ছিল সমাজসেবা।

এখানে মহারাষ্ট্রের ওয়ারকারি ধারা সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা দরকার। না হলে সন্ত তুকারাম বা তাঁর পূর্ববর্তী ভক্তিধারার কিছুই বোঝা যাবে না।

বোম্বাই চিত্র ঃ রায়তের অবস্থা

'বোম্বাই চিত্র' শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অনবদ্য রচনা। একে ইতিহাস, সমাজচিত্র, ভ্রমণবৃত্তান্ত, পদস্থ রাজকর্মচারীর অভিজ্ঞতা-বিবরণ, জ্ঞানচর্চার ইস্তাহার, স্বদেশকথা ইত্যাদি নানাভাবে বর্ণনা করা যায়। বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের কাছে পশ্চিমভারতকে তার ঐতিহ্য আর ঐশ্বর্যকে নিয়ে এমন অপরূপভাবে তিনি তুলে ধরেছেন যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বড় বেশি দেখা যায় না। এই গ্রন্থে যে সকল প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে তা 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভারতী' পত্রিকার জীবনকাল পঞ্চাশ বছরের—১২৮৪-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ (১৮৭৭-১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)। 'ভারতী'র মতো 'বালক'ও ছিল ঠাকুর-পরিবারের এক নিজস্ব পারিবারিক পত্রিকা। ১৮৮৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী শিশুপত্রিকা রূপে তা প্রকাশ করেন। তিন বছর চলার পর তা 'ভারতী'র সাথে মিলে যায়। ঠাকুর-পরিবারের বালক-বালিকা ও অন্যান্য সদস্যদের বিদ্যা-বিকাশের উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে তাঁদের সাহিত্য প্রতিভা স্ফুরণের জন্য এই পত্রিকা দুটির প্রচলন হয়েছিল। 'ভারতী' পত্রিকার প্রকাশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বলা হয়েছিল ঃ "ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাহার নামেই স্বপ্রকাশ। ভারতীর অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আরেক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণী স্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। ... স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া, যেখান হইতে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই 'নতমস্তকে' গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহদৃষ্টিতে দেখিব। ... ভারতভূমি বিদ্যার জন্মভূমি, বিদ্যার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি ... ভারতভূমিতে যদি জাগ্রত দেবতা অদ্যাপি কেহ বিরাজমান থাকেন, তবে তিনি ভারতী।" (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা, 'ভারতী', শ্রাবণ ১২৮৪, পৃ. ১)

ঠাকুর-পরিবারের মানুষজন জানতেন যে জ্ঞানই শক্তি। তথ্য থেকে আসে বিদ্যা, বিদ্যা থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞা। তাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখায় অনাবিলভাবে তথ্য পরিবেশন করেছেন। পশ্চিমভারতকে চিনিয়ে দিয়েছেন পূর্বভারতের মানুষদের কাছে— বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের জীবনবৃত্তান্ত। তখন মহারাষ্ট্র ছিল বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত— তাই পশ্চিমভারতের মানুষের কথাকে তিনি 'বোম্বাই চিত্র' বলে বর্ণনা করেছেন। উনিশ ও বিশ শতকে পশ্চিমভারতের এক বিস্তীর্ণ

অঞ্চল— সিন্ধুপ্রদেশ থেকে মহীশূর পর্যন্ত এলাকা এবং সমস্ত দাক্ষিণাত্য এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুজরাট, কোঙ্কন, খানদেশ, কর্নাটকের উত্তর পশ্চিমাংশ— সবই ছিল বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত। অতএব সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বোম্বাই চিত্র' বলতে শুধু মহারাষ্ট্র বা বোম্বাই শহরকেই বোঝাননি। সমস্ত দাক্ষিণাত্যই ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন আই.সি.এস. অফিসার— জেলাশাসক, রাজস্বশাসকও বটে। 'বোম্বাই রায়ত' প্রবন্ধমালায় তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রায়তওয়াড়ি ভূমিবন্দোবস্তের স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। রায়তওয়াড়ি ব্যবস্থা উনিশ শতকের ঘটনা। ১৭৯৩ সালে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় জমিদারদের সঙ্গে ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত হয়েছিল। পশ্চিমভারতে ও দক্ষিণভারতে বন্দোবস্ত হয়েছিল রায়ত বা কৃষকদের সঙ্গে। উত্তরভারতে হয়েছিল এক একটি মহল্লার অন্তর্ভুক্ত সামগ্রিকভাবে গ্রাম সমাজের সঙ্গে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ব্যবস্থা হল জমিদারি ব্যবস্থা— মধস্বত্বভোগীদের সঙ্গে ব্যবস্থা। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে হল রায়তওয়াড়ি ব্যবস্থা। উত্তরভারতে হল মহলওয়াড়ি ব্যবস্থা। অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের পর জমিদারি ব্যবস্থা আর কোথাও হয়নি— অযোধ্যা ছাড়া, সেখানে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর তালুকদারি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। সে ব্যবস্থা ছিল ভূস্বামীদের সঙ্গে ব্যবস্থা— কিন্তু বাংলাদেশে জমিদারি ব্যবস্থা থেকে কিছুটা ভিন্ন।

সত্যেন্দ্রনাথ যখন তাঁর প্রবন্ধাবলী লেখেন তখন মোটামুটিভাবে চারটি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা বহাল ছিল— ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণের রায়তওয়াড়ি ব্যবস্থা, পূর্বের জমিদারি ব্যবস্থা, উত্তরের মহলওয়াড়ি ব্যবস্থা এবং অযোধ্যার তালুকদারি ব্যবস্থা। সত্যেন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন জমিদারের পুত্র, তাঁর পিতামহ ছিলেন ডাকসাইটে জমিদার— দ্বারকানাথ ঠাকুর। অতএব জমিদারি ব্যবস্থার ভালোমন্দ তাঁর অজানা ছিল না। তাঁর লেখা পড়লেই বোঝা যাবে যে জমিদারি ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রায়তি ব্যবস্থাকে তিনি জানতে এবং বুঝতে পেরেছিলেন চাকুরির সুবাদে। এই সময়ে— উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়েই— ভারতবর্ষের জনগণের দারিদ্র্য নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ শাসন শেষ পর্যন্ত গোটা দেশে এনে দিয়েছে দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা। দাদাভাই নৌরজী এই দারিদ্র্য বা poverty-কে একটি 'Un-British Rule'-এর পরিণতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস দুখণ্ডে লিখে দেখালেন যে দেশ থেকে ধন-নিষ্কাশন (Drain of wealth) দেশে দারিদ্র্যের সূচনা করেছে। মাধব গোবিন্দ রানাডেও তাঁর সমস্ত বক্তৃতায় এই দারিদ্র্য ও ধন-নিষ্কাশনের কথাই বলেছেন।

(পঠিতব্য গ্রন্থ : (1) Dadabhai Naoroji, *Poverty and Un-British rule in India*; (2) Romesh Ch. Dutt, *Economic History of India* etc. in 2 volumes (3) Romesh Ch. Dutt, *The Peasantry of Bengal*)

উৎসর্গপত্র।

স্নেহাস্পদ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাই রবি,

তুমি এই গ্রন্থ-প্রকাশ বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিয়াছ—তোমার প্ররোচনায় ইহার জন্মলাভ, ইহার স্থানে স্থানে তোমার হস্তচিহ্ন বিদ্যমান। এই গ্রন্থখানি তোমার হস্তে সাদরে সমর্পণ করিতেছি, তুমি আমার এই স্নেহের উপহার গ্রহণ কর।

বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থের সকল প্রবন্ধ (একটী ছাড়া) 'ভারতী' ও 'বালকে' সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, এইক্ষণে গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হইল। "সিংহলে ভ্রমণবৃত্তান্ত" আমার বাল্যকালের রচনা; তদ্ভিন্ন আর যতগুলি লেখা সে সকলি আমার বোম্বাই-প্রবাস-সঙ্গিনী লেখনী হইতে অবসর মতে প্রসূত। এই যোগসূত্রে "ভারতবর্ষীয় ইংরাজ" অত্র প্রবন্ধমালায় গ্রথিত হইল। "সিংহলে ভ্রমণ" ও "ভারতবর্ষীয় ইংরাজ" ছাড়িয়া দিলে অবশিষ্ট সমস্তই বোম্বাইকাহিনীতে পূর্ণ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচীপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠাঙ্ক

বোম্বাই চিত্র

তুকারাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

তুকারাম মহারাষ্ট্র দেশের একজন সাধুপুরুষ ও প্রখ্যাত কবি। তিনি ১৫১০ শকাব্দে (খ্রিস্টাব্দ ১৫৮৮) পুণা নগরীর অনতিদূরে দেহু নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তুকারাম সেই সময়কার লোক, যে সময়ে মহারাষ্ট্রের জনপদ অনেককাল মুসলমানদের আধিপত্যে অবসন্ন থাকিয়া স্বাধীনতা প্রত্যাহরণের জন্য সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠে ও যবন-অধিকারের ভিতরে এরূপ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে যাহাতে শতাব্দীর মধ্যে মোগল সিংহাসন সমূলে কম্পমান হইয়া ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়। তুকারাম মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীর সমকালবর্তী লোক— যে দুইশত বৎসর মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বাধীন রাজ্য উপভোগ করিয়াছিল, তাহার প্রারম্ভকালের ধর্ম ও নীতির ভাব তুকারাম ও শিবাজীর গুরু রামদাস এই দুই কবির জীবনে প্রতিফলিত দেখা যায়।

তুকারাম জাতিতে শূদ্র ও ব্যবসায়ে বণিক ছিলেন। তাঁহার পিতা-মাতা বংশানুক্রমে পণ্ডরপ্‌রের দেব বিঠোবা বা বিঠ্‌ঠলের পরমভক্ত ছিলেন ও তথায় তাঁহারা সর্বদাই তীর্থ করিতে যাইতেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে, বিশ্বম্ভর নামে তাঁহার কোন এক পূর্বপুরুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে চিরন্তন প্রথানুসাবে পণ্ডরপুরে তীর্থযাত্রা করিবার উপদেশ দেন। সেই উপদেশক্রমে বিশ্বম্ভর মাসের মধ্যে দুইবার তথায় যাত্রা করিতে ব্রতী হইলেন। এইরূপে ১৬ বার তীর্থ দর্শন করিবার পর একদা রাত্রিতে তাঁহার স্বপ্ন হয় যে, বিঠোবা দেব ও রুক্সাই দেবীর স্বয়ম্ভু মূর্তি দেহু গ্রামের এক আম্রবনে নিহিত আছে— তুমি গিয়া তাহা উদ্ধার কর — আর তোমার পণ্ডরপুরে তীর্থ পর্যটনে যাইতে হইবে না। পরে বিশ্বম্ভর তাহা উদ্ধার করিয়া দেহু গ্রামে ইন্দ্রায়নী নদীতীরে এক ক্ষুদ্র মন্দির প্রস্তুত করিয়া যথাবিধি সেই মূর্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অবধি বিঠোবা-দেব বিশ্বম্ভরের কুল-দেবতা হইলেন।

তুকারাম, বহেলাজীর তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র। তাঁহার মাতার নাম কনকাই। বহেলাজীর বৃদ্ধাবস্থায় তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাওজীকে সংসারের ভার অর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু সাওজী একজন ভগবদ্ভক্ত পুরুষ, সংসারে বীতরাগ, কাজেই তুকারামের উপরেই কর্মকাণ্ডের সমস্ত ভার ন্যস্ত হইল। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর — কতককাল পর্যন্ত তিনি সাংসারিক ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া পিতামাতার সন্তোষ সাধন করিলেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিল— রখুমাই ও জীজাই। কনিষ্ঠ পত্নীর স্বভাব কিছু কর্কশ ছিল ও তিনি তাঁহার স্বামীর বৈরাগ্য ভাবের উপর কিছু বিরক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে এক দিন তুকারাম

কতকগুলি ইক্ষুদণ্ড উপহার পাইয়াছিলেন। আখের গোছা ঘরে আনিতে আনিতে পথিমধ্যে কতকগুলি বালক তাহার প্রার্থী হইল। তিনি একে একে বিতরণ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে তাঁহার হস্তে একটি দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট রহিল। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে গৃহিণী কোথা হইতে সকল কথার সন্ধান পাইয়াছেন। স্বামীর এইরূপ আচরণে জীজাই রাগান্ধ হইয়া সেই ইক্ষু-গাছটি কাড়িয়া লইয়া পতির পৃষ্ঠোপরি এমন সজোরে প্রহার করিলেন যে তাহা দুই খণ্ড হইয়া গেল। তুকারাম ঐ দুই খণ্ড ইক্ষু হস্তে লইয়া শান্তভাবে কহিলেন—"প্রিয়ে, তুমি আমাকে এত ভালবাস যে এই আখ-গাছটি একলা খাইতে ভাল লাগিবে না বলিয়া তাহা দুই খণ্ডে ভাঙিয়া ফেলিলে!"

তুকারামের বিংশতি বৎসর বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পত্নী রঘুমাইর মৃত্যু হয়। ঐ বৎসর সন্তু নামক তাঁহার একটি পুত্রও মরিয়া যায়। তৎপূর্বে তাঁহার পিতামাতা ও ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হন— তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তাঁহাকে ছাড়িয়া তীর্থযাত্রায় চলিয়া গিয়া তাঁহার শোককে দ্বিগুণিত করেন। ইহার উপর দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট, এই সকল কারণে তিনি সংসারের উপর বিরক্ত ও সর্বত্যাগী হইয়া ঈশ্বরাধনায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে তাঁহার জীবনের পূর্বার্ধ অতিবাহিত হইল।

তুকারাম কবিতাবলী "তুকারামের অভঙ্গ" বলিয়া পরিচিত। তাহা মহারাষ্ট্রীয় প্রাচীন সাহিত্যের এক প্রধান অঙ্গ। ইহা হইতে কবির নিজ জীবনচরিত অনেকটা সংগৃহীত হইতে পারে। একজন সন্ন্যাসী তুকারামকে তাঁহার বৈরাগ্য অবলম্বনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যে সকল অভঙ্গে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

১৩৩৩

শূদ্র জাতি, সংসার চালাই ব্যবসায়ে
বিঠ্ঠল গৃহদেবতা, নমি তাঁর পায়ে।
এ সকল কথা কহা ভাল বড় নয়,
শুধাইছ, সেই হেতু কহিবারে হয়।
মা বাপের মৃত্যু হ'লে পড়িয়া সংসারে,
সহিনু কতই কষ্ট কহিব কাহারে?
ধনমান সঁপিলাম দুর্ভিক্ষের গ্রাসে,
অন্নাভাবে গৃহিণী মরিলা উপবাসে।
লজ্জায় শরমে শেষে হ'য়ে মর' মর',
দুঃখে শোকে একেবারে হয়ে জরজর,
ব্যবসায়ে দেখিয়া দারুণ লোক্‌সান,
দেবতা মন্দিরে গিয়া কৈনু বাসস্থান।

এগারই দিনে আরম্ভিনু সঙ্কীর্তন,
কিন্তু অধ্যয়নে তত নাহি ছিল মন;
সাধুদের গুটিকত পবিত্র বচন
মুখস্থ করিয়া লৈনু করিয়া যতন।
অন্য কেহ যদি কভু গাইতেন গান,
আমিও ভক্তির সাথে মিলাতেম তান।
লজ্জা দূর করি দিয়া, শুদ্ধ করি প্রাণ,
সাধুর চরণামৃত করিতাম পান।
পর-উপকার সদা করিবার তরে
শরীরের প্রতি মায়া দিনু দূর ক'রে।
বন্ধুদের অনুরোধে দিলাম না কান,
সংসারের প্রতি আর রহিল না টান।
অপরের পরামর্শ না আনি শ্রবণে
সত্য অসত্যের সাক্ষী করিলাম মনে।
স্বপ্নে মোর গুরু-মন্ত্র করিয়া শ্রবণ
ঈশ্বরে অচলা ভক্তি করিনু স্থাপন।
কবিত্ব প্রতিভা শেষে স্ফূর্তি পেল মনে,
অর্পণ করিনু হৃদি বিঠোবা চরণে
নিষেধ* হইল শেষে কবিতা লিখায়,
বড়ই আঘাত তাহে পাইনু হিয়ায়।
গ্রন্থ মোর ফেলি জলে, গেলাম মন্দিরে,
দেবতা প্রসন্ন মোরে হইলা অচিরে।
সব কথা বিস্তারিয়া কহিবারে পাছে
সময় বহিয়া যায়, এত কথা আছে।
এখন যে ভাব মোর দেখিছ সকল,
ভবিষ্যতে কি হইবে জানেন বিঠ্‌ঠল।
ভকতে না উপেক্ষা করেন নারায়ণ,
করুণা-সাগর তিনি জানিনু এখন।
পাণ্ডুরঙ্গে বলালেন যে কথা সকল,
তাই একমাত্র মোর রহিল সম্বল!

তুকারাম শূদ্র বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক তিনি কবিতা লিখনে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ পবে প্রকাশিত হইবে।

১৩৩৪

আমি অতি হীন পাপী শুন সাধু সবে,
এত ভালবাস মোরে কেন বল তবে?
মনে জানিয়াছি গতি নাহিক আমার,
এক ভেবে কাজ করি, লোকে ভাবে আর।
কিছুতেই পুরিল না অভাব যখন,
বর্তমান দশা তবে করিনু গ্রহণ।

অবশেষে ফুরাইয়া গেল মোর ধন,
অবশিষ্ট যাহা কিছু কৈনু বিতরণ।
দারা সুত ভাইদের করিয়া বর্জন,
হইলাম হতবুদ্ধি বিষাদে মগন!
লোক মাঝে মুখ আর দেখাব না মনে,
কাটাই জীবন মম বিজনে কাননে।
পেটের জ্বালায় মন হইল কঠিন,
পেটের জ্বালায় হৈনু দয়া-মায়া হীন।
যে যা বলে বসে থাকি আপনার মনে,
না শুনে 'হাঁ' দিয়া যাই সবারি বচনে।
পূর্বপুরুষেরা মোর ছিল ভক্ত অতি,
তাই আমি বিঠোবার করিগো আরতি।
তুকা বলে, "কারো কথা নাহি শুনি আর,
ভক্তদের এই গতি জানিয়াছি সার।"

১৩৩৫

হে দেব যা কিছু মোর আছিল বিভব
আমার ভালরি তরে নিয়াছ যে সব।
দুর্ভিক্ষের কালে যত পড়িয়াছি ক্লেশে,
আমার ভালরি তরে হইয়াছে শেষে।
শোক পেয়ে তব প্রতি ভক্তি গেল দড়,
সংসারের উপরে বিরাগ হল বড়।
ভালই যে পত্নী মম হইলা কর্কশা,
ভাগ্য মোর লোক মাঝে এত যে দুর্দশা।

ভালই যে জগতে পাইনু উপহাস,
গোমেষাদি ধনধান্য সব হল নাশ।
লোক-লাজ না রাখিনু হইল মঙ্গল,
তোমারে করিনু হরি জীবন-সম্বল।
তোমার মন্দিরে আজি সঁপিলাম কায়া,
তেয়াগিয়ে পুত্র জায়া সংসারের মায়া।
"ভাগ্য মোর" তুকা বলে "করিনু ধারণ,
একাদশী ব্রত উপবাস জাগরণ।"

উপবে তুকাবাম তাঁহার স্ত্রীকে কর্কশা বলিয়া উল্লেখ করিযাছেন — নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় শ্লোকে তাঁহাব সেই স্ত্রীব প্রতিমূর্ত্তি পাঠকেরা অবিকল চিত্রিত দেখিতে পাইবেন।

৫৬৬

আমারি বেলায উনি যোগী
নিজের তো বাকী নাই সুখ,
সব সুখ ঘরে আসে, শুধু
আমারি তো ঘুচিল না দুখ।
ঘরে মোর অন্ন নেই বলে
বল দেখি যাই কাব দ্বার?
এই পোড়া সংসারের তরে
আপদ সহিব কত আর?
অন্ন অন্ন কোরে রাত দিন
ছেলেগুলো খেলে যে আমায়!
মরণ তাদের হয় যদি
সকল বালাই ঘুচে যায়।
সকলি ঝেঁটিয়ে নিয়ে যান,
তিলমাত্র ঘরে থাকা ভার।
ঘবে যে গোবর দিতে হবে,
একটিও গরু নাই তার।
তুকা বলে, "দূর পোড়ামুখী,
আপনি মাথায় নিলি ভার।
এখন তাহার তরে, মিছে
কাঁদিলে কি হবে বল্ আর।"

৫৬৭

বোধ হয় এ পাষণ্ড,
পূর্ব জন্মে ছিল মোর অরি।
এ জনমে স্বামী হোয়ে
বৈর সাধিতেছে এত করি!
কত দুঃখ স'ব আর,
কত ভিক্ষা মাগি পর দ্বারে।
বিঠোবার মুখে ছাই —
কি ভাল কোল্লেন এ সংসারে?
তুকা বলে, "স্ত্রী আমার
রাগিয়া কতই কটু ভাষে।
কভু বা কাঁদিয়া মরে,
কভু বা আপন মনে হাসে।"

৫৬৮

ঘরে দুটা অন্ন না এলে
ছেলেদের দেব কোথা খেতে।
হতভাগা তা দেবে না,
সকলি পরেরে যা'ন দিতে!
তুকা বলে, "অতিথিরে
যখনি গো দিতে যাই ভাত,
রাক্ষসীর মত এসে
হতভাগী ধরে মোর হাত।
না জানি যে পূর্বজন্মে
কতই করিয়াছিলি পাপ।"
তুকা বলে, "এ জনমে,
তাই এত পেতেছিস্ তাপ।"

৫৬৯

খাবার কোথায় পাবি বাছা,
বাপ তোর থাকেন মন্দিরে —
মাথায় জড়ান্ তিনি মালা,
ঘরে আর আসেন না ফিরে।

নিজের হলেই হল খাওয়া
আমাদের দেখেন না চেয়ে।
খর্ত্তাল বাজিয়ে তিনি শুধু
মন্দিরে বেড়ান্ গেযে গেয়ে।
কি করিব বল্ দেখি বাছা,
কিছুই তো ভেবে নাহি পাই।
ঘরে না বসেন এক রতি,
চলে যান অরণ্যে সদাই,
তুকা বলে, "ধৈর্য ধর মনে
এখনো সকল ফুরায় নাই।"

৫৭০

গেছে যে আপদ গেছে,
ঘরেতে থাকিবে তবু রুটি।
যা হোক্ তা হোক্ কোবে
পেট ভরে খেতে পাব দুটি।
বোকে বোকে দিনু এল্যে,
জ্বালাতন হনু হাড়ে মাসে,
তুকা বলে, "যদিও সে
দিবা নিশি কত কটু ভাষে,
তুকারে তুকার স্ত্রী যে
মনে মনে তবু ভালবাসে।"

৫৭১

ঘরে আর আসে না যে,
কোনো পরিশ্রম নাহি করে
নিজে না কি খেতে পায
রোজ রোজ সুখে পেট ভরে।
না উঠিতে শয্যা হতে
মিলি দল-বল-গুলা সাথে
করতাল বাজাইতে
আরম্ভ করেন অতি প্রাতে।

খেয়েছে লজ্জার মাথা
জ্যান্তে তারা মড়ার মতন।
ঘরে আছে ছেলেপিলে,
তাদের তো না করে যতন।
স্ত্রী তাদের পড়ে আছে —
হতভাগী লাজ-দুঃখ-ভরে
অভিশাপ দিতে দিতে —
মাথায় পাথব ভেঙে মরে।
"ভাগ্যে যাহা আছে তাহা,"
তুকা বলে "থাক সহ্য করে!"

৫৭২

হেথা কেন আসে লোকগুলা,
তাদের কি কাজ নাই হাতে?
তুকা কহে, "ঈশ্বরের তরে,
ব্রহ্মাণ্ড মিলিছে মোর সাথে।
"ভাল মুখে দু চারিটা কথা,
না জানি তাহে কি ক্ষতি আছে!
"কোথাও যায় না যারা কভু,
ভালবেসে আসে মোর কাছে।
"এও সে বাসে না ভাল হায়,
ভাগ্য কি বা আছে এর বাড়া,
"সকল লোকের প্যাছে পাছে
কুকুরের মত করে তাড়া।"

তুকাবাম সংসারাশ্রম হইতে অবসৃত হইয়া ভজন-পূজন-কীর্তনে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রত্যুষে স্নান করিয়া বিঠোবার মন্দিরে গমন ও দেবপূজাদি সমাপন করিয়া অরণ্যে প্রস্থান — এই তাঁর নিত্যনিয়মিত কর্ম। দেহুর তিন ক্রোশ পশ্চিমে "ভাণ্ডারী" নামক পাহাড় তাঁহার প্রিয় আবাসস্থান ছিল। তথায় সমস্ত দিবস ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকিয়া সন্ধ্যার সময় দেহুতে ফিরিয়া আসিয়া বিঠোবার মন্দিরে ভজনাদি করিতেন, কিন্তু তিনি যে একেবারে গৃহকর্ম ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। একবার তিনি ক্ষেত্ররক্ষণ কার্যের ভার লইয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার বিবরণ এই —

একদিন তিনি ইন্দ্রায়নী-তীরে বসিয়া উপাসনা করিতেছেন এমন সময় তাঁহার নিকটে

একজন কৃষক আসিয়া উপস্থিত। সে তুকারামকে বলিল, "তুকারাম শেঠ, মিছিমিছি নিষ্কর্মার ন্যায় ঘরে বসিয়া আছ, যদি আমার ক্ষেত রক্ষণ কর তো তুমি আধমণ করিয়া দানা পাইবে, তাহাতে তোমার পরিবারের ভরণপোষণে সাহায্য হইবে — আর যদি কোথাও হরিনাম করিতে ইচ্ছা হয় তাহাও করিতে পারিবে।" তুকারাম তাহাতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাকে ক্ষেতরক্ষণ কার্যে নিযুক্ত কবিয়া ক্ষেতকারী গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। তুকারাম ক্ষেতরক্ষণ কালে দেখিলেন যে, দানার লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীদল আসিয়া শস্যক্ষেত্রে উপদ্রব আরম্ভ করিল। কিন্তু ক্ষুধার্ত প্রাণীকে তাড়াইয়া দেওয়া দোষের কার্য জানিয়া তিনি তাহাদের তাড়াইয়া দিতে বিরত হইলেন। তিনি ক্ষেত্রমধ্যে কাষ্ঠমঞ্চের উপর বসিয়া ধ্যানে মগ্ন, এদিকে পক্ষীরা অকুতোভয়ে শস্য খাইয়া যায়। এইরূপে একমাস চলিয়া গেলে ক্ষেতকারী প্রত্যাগত হইয়া দেখে যে তাহার ক্ষেত্র বিহঙ্গকুলের বাসস্থান হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সে ক্রোধভরে তুকারামকে তাঁহার অনবধানতার জন্য বিস্তর তিরস্কার কবিতে লাগিল, পরে গ্রামের পাঁচজনকে একত্র কবিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিল। তাঁহারা ক্ষেত্রকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাব ক্ষেত্রে কত মণ শস্য উৎপন্ন হয়?" সে কহিল, "দুই খণ্ডী"। তাঁহারা তদনুসারে দুই খণ্ডীব মূল্য ক্ষেতকাবীকে দণ্ডস্বরূপ লিখিয়া দিতে তুকারামেব প্রতি আদেশ করিলেন। তৎপরে পর্বত্তায়তেব মধ্যস্থগণ নিজ চক্ষে ক্ষেত্র তদারক কবিতে গিযা যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে অবাক। দেখেন যে ক্ষেত্রটি শস্যে শস্যে ছাইয়া গিয়াছে। সেই শস্য সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে ১৭ খণ্ডী দানা উৎপন্ন হইল। গ্রামবাসীরা বিচারে ধার্য করিলেন যে দুই খণ্ডী মাত্র ক্ষেতকারীর কথা মত তাহার প্রাপ্য — অবশিষ্ট ভাগ তুকারামকে দিতে হইবে। কিন্তু তুকারাম তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। এক ব্রাহ্মণের নিকট উদ্বৃত্ত দানা গচ্ছিত রহিল। অবশেষে দেহুর মন্দির ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল তাহার সংস্করণ কার্যে তাহা ব্যয়িত হইল।

এইরূপে তাঁহার দিন যায়। এখনো পর্যন্ত তাঁহার জীবনের গতি নিরূপিত ও বিশ্বাসের স্থিরতা সম্পাদিত হয় নাই। মাঘ মাসের দশমী শুক্লপক্ষের রাত্রিতে তাঁহার এক স্বপ্ন হয় তাহাতেই তাঁহার জীবন-স্রোত নিয়মিত হইল। সেই স্বপ্নে বাবাজি নামক এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন ও চৈতন্যের শিষ্য বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া তুকারামকে "রাম, কৃষ্ণ, হবি" এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সেই সময় অবধি তুকারামের হৃদয়-গ্রন্থি খুলিয়া গেল — সকল সংশয় ভঞ্জন হইল। তিনি যে অগাধ শান্তি ও আনন্দ লাভ করিলেন তাহা নিজেই কতিপয় শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন।

৩৭১

শুন দেব, মনে যাহা করেছি নিশ্চয়
জীবন সঁপিনু পদে হইয়ে নির্ভয়।
সকলি করেছি ত্যাগ, তোমারেই চাই,
সংশয় আশঙ্কা ভয় আর কিছু নাই।

হে অনন্ত দেব, মোর আছিল সম্বন্ধ ভোর
তব সাথে বহু পূর্বে যাহা।
মিলি যত সাধুগণ আমাদের সে বাঁধন
দৃঢ়তর করিলেন আহা।
আর কিছু নাই, শুধু ভক্তি ও জীবন,
যা আছে তোমারি পদে করেছি অর্পণ।
সাধুগণ সঁপিয়াছে আমারে তোমারি কাছে,
আমি কভু ছাড়িব না ও তব চরণ।
তুমিই কর গো মোর লজ্জা নিবারণ।

এইক্ষণে তুকারামের জীবনের সেই ভাগে অবতীর্ণ হওয়া যাইতেছে যখন তিনি অভঙ্গ রচনা আরম্ভ করিলেন। যে ঘটনায় তিনি ভারতী-বন্দনে জীবন উৎসর্গ করিলেন তাহা ১৩২০-২১ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

১৩২০

নামদেব পাণ্ডুরঙ্গে লয়ে সঙ্গে করে
একদা দিলেন দেখা স্বপ্নে তিনি মোরে।
আদেশ করিলা মোরে কবিতা রচনে,
মিছা দিন না যাপিয়া প্রলাপ বচনে।
ছন্দ কহি দিলা মোরে — গম্ভীর সে বাণী,
বিঠ্‌ঠলজী নিজ হস্তে ধরেন লেখনী।
কহিলেন 'পিঠ মোর চাপড়িয়া হাতে,
একশত কোটি শ্লোক হইবে পুরাতে।'

১৩২১

যদি মোরে স্থান দেও তব পদছায়,
দিবানিশি সাধুসঙ্গে রহিব সেথায়।
যাহা ভালবাসিতাম ছেড়েছি সকল,
তুমি মোকে ছাড়িও না শুনগো বিঠ্‌ঠল।
চরণের একপাশে দেহ যদি স্থান,
শান্তি সুখে কাটাইব এ মম পরান।
নামদেবে তুকা কাছে পাঠালে স্বপনে,
তোমার প্রসাদ এই গাঁথা র'ল মনে।

তুকারাম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তুকারাম তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভারতী-প্রসাদ কিরূপে উপলব্ধি করিলেন তাহা পাঠকগণ তাঁহার নিজমুখ হইতেই শ্রবণ করিয়াছেন। লোকের বিশ্বাস এই যে, তুকারাম কবি নামদেবের অবতার বিশেষ। মুকুন্দরাজ, জ্ঞানদেব, নামদেব, মহারাষ্ট্র দেশের আদি কবির মধ্যে পরিগণিত। নামদেবের মৃত্যুকাল শকাব্দ ১২৫৬ (খ্রিস্টাব্দ ১৩২৮)। নামদেব ও তুকারামের সম্বন্ধে মহীপতি তাঁহার 'ভক্তলীলামৃত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে নামদেব শত কোটি অভঙ্গ রচনায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া ৯৪ কোটি ৪৯ লক্ষ অভঙ্গ রচিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনিই নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে তুকারাম হইয়া পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে তদনুসারে তুকারাম ৫ কোটি ১ লক্ষ ৪৪ হাজার শ্লোক রচনা করেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তুকারাম-কৃত ৪,৬০০-র অধিক সংখ্যক অভঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তুকারাম এই সকল অভঙ্গ অধিকাংশ বিঠোবা-মন্দিরে রচনা করিতেন। কবিতা রচনার উপযোগী আরও একটি বিজন স্থান তাঁহার মনোনীত ছিল— সে স্থানটি এখনো কোনো ভ্রমণকারী দেহু দর্শনে গেলে তাঁহাকে 'তুকার আশ্রম' বলিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়।

এই সময় "ভজন ও কথকতা" এই দুই দ্বার দিয়া তুকারামের কবিত্বশক্তি বিশেষ স্ফূর্তি পায়। ছন্দোময় বাক্যে ঈশ্বরের ভজনার নাম "ভজন"। এই সকল স্থলে ভজন-কর্তা স্বরচিত কবিতা অথবা সঙ্গীতাবলী গান করেন ও পরে শ্রোতৃবর্গ সমস্বরে সেই গানে যোগ দেন। এই সকল কবিতা ও গীতের অর্থ বুঝাইয়া ব্যাখ্যা করিবার রীতি নাই। এইরূপ ভজনের সময় তুকারাম হয়তো অগণ্য অগণ্য অভঙ্গ সদ্যসদ্য রচনা করিয়া গান করিতেন তাহা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়া থাকিবে। এই সকল অভঙ্গ লিপিবদ্ধ হইলে ইহাদের সংখ্যা প্রবাদ অনুযায়ী কোটি না-হউক, নিদানপক্ষে লক্ষেও পৌঁছিতে পারিত। তুকারামের অভঙ্গ জনসমাজে সমাদৃত ও প্রখ্যাত হইবার অপর এক উপায় "কথকতা"। মহারাষ্ট্র দেশে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও ব্যাখ্যানের এক প্রধান সাধন কথকতা। ইহাতে কথক দেব-বন্দনাদি পাঠ করিবার পরে কোন একটি কবিতা কিম্বা বচন অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন। নানা গ্রন্থ হইতে উপদেশ প্রদান ও মধ্যে মধ্যে গল্প ইতিহাস ও কথাচ্ছলে শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করতঃ কবিতাটির মর্ম তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া কথকতার উদ্দেশ্য। সঙ্গীত কথকতার এক প্রধান অঙ্গ। কথক, কাব্য অথবা পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে যে সকল কবিতা ও বচন পাঠ করেন তাহা শ্রোতৃগণ তাঁহার পশ্চাতে আবৃত্তি করেন। মহারাষ্ট্রে কথকেরা বহুমানাস্পদ ও তাঁহাদের উপদেশ সাধারণ জনসমাজে ধর্ম-প্রচারের বিশেষ উপযোগী। এইরূপ বক্তৃতা যতদূর ফলোপধায়ী হইতে পারে তুকারামের মুখে তাহার চতুর্গুণ ফল প্রসব করিত সন্দেহ নাই। কেন না তুকারামের বক্তৃতা কেবল মুখের নয় — তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে তাহা নিঃসৃত হইত। তাঁহার

পবিত্র, অকৃত্রিম ঈশ্বর-ভক্তি ও বিনামূল্যে উপদেশ প্রদান — এই সকল কারণে তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইত।

তুকারামের কীর্তি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট লোকের বিষদৃষ্টিও তাঁহার উপর নিপতিত হইল। কিন্তু তিনি যে সমূহ কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি মুহ্যমান হইবার নহেন, প্রত্যুত অগ্নিপরীক্ষিত কাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার স্বাভাবিক সাধুতা, সরলতা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, নিস্পৃহতা আরো অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। শূদ্র হইয়া তিনি বেদাধ্যয়ন করেন —গুরুর ন্যায় ধর্মোপদেশ দেন — লোকেরা ভক্তিভরে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে — ইহা ব্রাহ্মণদের চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। লোকের দোষ কি, তাহারা ব্রাহ্মণ শব্দের যথার্থ অর্থ অনুসারে শূদ্র তুকারামকেও ব্রাহ্মণদের ন্যায় সেবা করিতে লাগিল;এমনকি তুকারামের জীবনের শেষভাগে এক উচ্চকুলের ব্রাহ্মণ-পরিবার, যাঁহারা গণেশের অবতার-বিশেষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাঁহারা, তুকারামের সহিত একাসনে আহার করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। এই সকল কারণে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে কাহারো কাহারো দ্বেষ ও ঈর্ষা জ্বলিয়া উঠিল ও তাঁহারা তুকারামের প্রতি বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। দেহুগ্রামে মম্বাজী নামে একজন গোঁসাই বাস করিতেন — তাঁহার হস্ত হইতে তুকারামের উপর অত্যাচারের প্রথম সূত্রপাত হয়। বিঠোবা মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে মম্বাজীর একটি বাগান ছিল। তাহা তিনি কাঁটাগাছের বেষ্টন দিয়া ঘিরিয়া লইলেন, একাদশীর দিন দেহুর এক উৎসবের দিন — সে দিন বিঠোবা মন্দির লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। তুকারাম দেখেন যে এই সকল কাঁটাগাছে লোকদিগের প্রদক্ষিণস্থান পর্যন্ত অধিকৃত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি স্বহস্তে তাহা উৎপাটিত করিয়া স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহাতে মম্বাজী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই সকল কণ্টক-যষ্টি দিয়া তুকারামকে উত্তমমধ্যম বিলক্ষণ প্রহার করিলেন। তুকারাম ঐ প্রহারকের প্রতি বিন্দুমাত্র কোপ প্রকাশ না করিয়া তাঁহার নিত্যনিয়মিত কর্মে ব্যাপৃত রহিলেন, যেন কিছুই হয় নাই। অবশেষে তিনি তাঁহার শত্রুর উপর জয়ী হইলেন। "অসাধুং সাধুনা জয়েৎ" এই উপদেশ মত কার্য করিয়া তিনি জয়লাভ করিলেন। তুকারাম নিম্নলিখিত শ্লোকাবলীতে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

৩৫৫

ছাড়িব না ছাড়িব না, ছাড়িব না হে বিঠোবা
তোমারি চরণ।
যতই যন্ত্রণা আসে, আসুক কি করিবে সে,
না হয় হইবে মরণ।
শস্ত্রধারী আসি কেহ, খণ্ড যদি করে দেহ,
তবু নাহি ডরি।
তুকা বলে, "সাবধান, হোয়ে আছি আগুয়ান,
চিতে মোর শমগুণ ধরি।"

৩৫৬

বেশ বেশ বড় ভাল, বিঠোবা হে কল্লে ভাল,
শাপে বর দান
ক্ষমাগুণ শেখাবারে, হানিলে এ দেহোপরে
কণ্টকের বাণ।
কটুকাটব্য গালি, মোর পৃষ্ঠে দিলা ঢালি,
তাহে পাই প্রাণ —
তুকা বলে, "কৃপা করি সংহারিয়া ক্রোধ অরি
দিলে পরিত্রাণ।"

৩৫৭

তরিনু তরিনু দেব তরালে আমায়,
অদৃষ্টে যা ছিল ভাল, তাই মোর তাই হল,
কি বলিব হায়!
যতনে সরল চিতে, কাঁটা তুলি নিজ হাতে,
পথের আটক।
"কত সহি" তুকা বলে, "নাশি কিন্তু রিপুদলে,
হৈনু নিষ্কণ্টক।"

এরূপ সহিষ্ণুতার ফল অচিরেই ফলিল। মম্বাজীর ক্রোধানল আপনা-আপনি নিবিয়া গেল ও তিনি তুকারামের প্রতি বিরক্তিভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুরক্ত ভক্তের মধ্যে গণ্য হইলেন।

পুণার নিকটবর্তী বাঘোলী গ্রামস্থ রামেশ্বর ভট্ট নামক আর একজন ব্রাহ্মণ তুকারামের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তিনি তুকারামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অমূলক অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাঁহার প্রতি গ্রামাধিকারীদিগের বিদ্বেষ জন্মাইয়াছিলেন ও দেহুর প্যাটেলের নিকট হইতে তাঁহার গ্রাম বহিষ্করণের এক অনুজ্ঞাপত্র বাহির করিলেন। তুকারাম মহাবিপদে পড়িয়া এইরূপে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

কি করিব কোথা যাব,
গ্রামে লই কাহার শরণ
গাঁয়ের মণ্ডল, করে গণ্ডগোল,
কার কাছে দুটি ভিক্ষা মাগি গো এখন।
নিয়মভঙ্গ দোষে, দোষী করে রোষে,
আদালতে নিয়ে চাল, বলিয়া শাসায়,

মিলে লোকগুল, বুঝাইল ভুল,
লাভে হতে ভিখারীর অন্ন মারা যায়।
এহেন অসৎ সঙ্গে রহিব না আর —
তুকা বলে, "চল যাই, পাণ্ডুরঙ্গ দ্বার।"

রামেশ্বর ভট্ট তুকারামকে তাঁহার হীন জাতির প্রতি লক্ষ করিয়া বহুবিধ তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া কবিতা রচনা করিতে একেবারে নিষেধ করিলেন। তুকারাম বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমি অল্পস্বল্প যাহা কিছু রচনা করিয়াছি সকলই পাণ্ডুরঙ্গের আদেশে, কিন্তু দেখিতেছি ব্রাহ্মণের আদেশও আমার শিরোধার্য, অতএব আপনাব আজ্ঞানুসারে এখন হইতে আমি কবিতা রচনায় বিরত হইলাম — যে সকল কবিতা আজ পর্যন্ত বিরচিত হইয়াছে তাহাব কি করা যাইবে মহাশয় অনুমতি করুন।" রামেশ্বর ভট্ট তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী জলমগ্ন কবিবাব আদেশ করিলেন। তুকারাম অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া দেহুতে বিঠোবা দেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৎপরে তাঁহার গ্রন্থ দুই প্রস্তর ফলকের মধ্যে রাখিয়া কাপড়ে যত্নে বাঁধিয়া নিজহস্তে ইন্দ্রায়নী নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। পরে লোকেরা আসিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল — "সন্ন্যাসীজি—আগে একবার তুমি খাতাপত্র নদীতে ডুবাইয়া সংসার ডুবাইযা দিলে — এখন আবার তোমার কবিতাগুলি নদীতে ডুবাইয়া পরমার্থও ডুবাইলে— তোমার একূল ওকূল দু-কূল গেল। এই সকল কথা তুকারামের বক্ষে বজ্রপাততুল্য আঘাত করিল। তিনি অন্নপান পরিত্যাগ করিয়া বিঠোবা মন্দিরের প্রাঙ্গণে পড়িয়া রহিলেন ও যে পর্যন্ত তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ না হয় সে পর্যন্ত উঠিবেন না নিশ্চয় করিলেন। এইরূপে ত্রয়োদশ দিবস অতিবাহিত হইল।

তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত — শত্রুদের উল্লাসের আর সীমা রহিল না। তাহারা মনে মনে কত দর্প করিতে লাগিল—এবার আর এই শূদ্রটার মুখ হইতে বেদবাণী শুনিতে হইবে না। কিন্তু স্বয়ং বিঠোবা তুকারামের সহায়—তাঁহার অভঙ্গ সহজে বিলুপ্ত হইবার নয়। ত্রয়োদশ দিবসে তাঁহার গ্রন্থ নদীর উপর ভাসিয়া উঠিল ও লোকেরা তাহা তুকারামের নিকট উপস্থিত করিল। এই উপলক্ষ্যে তিনি যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

২২৪২

অন্যায় করিনু ঘোর —
মরমে বিঁধিছে অনিবারে,
লোকের গঞ্জনা শুনে,
কত কষ্ট দিলেম তোমারে।
মোর দুখভাগী তুমি, মূঢ়মতি দীন আমি,

অনাহারে অনিদ্রায় তের দিন রহি
মম দুখে দুঃখী ক'রি তোমারে, শরমে মরি —
তাই গো দ্বিগুণ জ্বালা সহি।
আমার মরণ দায় ফেলি তব শিরে,
কাজেই বাঁচাতে তাই হলো মুমূর্ষুরে।
জলমধ্যে গ্রন্থখানি করে সংরক্ষণ,
তুকা বলে নিজ ভক্তে করিলে রক্ষণ।

২২৪৩

কৃপাময়ী মা আমার অনাথ শরণ,
বালকের বেশে মোরে দিলে দরশন।
প্রকাশি সগুণ মূর্তি শান্ত কর চিতে,
আলিঙ্গন দিয়ে পরে তারিলে ভকতে।
বন্ধুর সহায় দিয়ে, সাধুসঙ্গে মিলাইয়ে,
উদ্ধার করিলে মোরে সব দুঃখ হতে।
তুকা বলে, "অশরণে, ক্ষমা কর গো জননী —
যাচি করপুটে।
মরিলেও তোমারে মা, আর কভু ফেলিব না
এ হেন সঙ্কটে।"

২২৪৪

সহিব অবাধে আমি সহস্র পীড়ন,
ফেলুক বিপদে ঘোর যতই দুর্জন।
তোমায় আমার লাগি ফেলিব না দায়ে,
আমায় রেখ গো মাতা তব পদচ্ছায়ে।
এবার করেছি দোষ আমি যে চণ্ডাল,
জলে আগুলিয়ে গ্রন্থে রাখিলে কৃপাল।
মন্দমতি সে সময়ে না কৈনু বিচার,
তোমারে ডাকিতে মোর কিবা অধিকার।
জানি না আমি হে দেব কেমনে মহতে
আমার এ ক্ষুদ্র ভার কহি গো বহিতে।
হবার যা হয়ে গেছে বৃথা এ শোচনা,
তুকা বলে, "জানিলাম ভবিষ্য-যোজনা"।

২২৪৫

কি জানিবে পাণ্ডুরঙ্গ, তব অন্ত এ পামর,
কি না তুমি কর দেব, যদি ধৈর্য ধরে নর।
আমি অতি মূঢ়মতি উতলা হইনু,
তবু কৃপানিধি তব আশ্রয় লভিনু।
দেবের তুমি হে দেব, জীবের জীবন,
কেন তবে করি মোরা বৃথায় ক্রন্দন।
তুকা কহে সকাতরে—"পতিত এ জন
তব দ্বারে ধরা দিনু—অন্যায় কেমন।"

২২৪৬

কেন এত ডাকিলাম হরি হরি করি,
আঘাত কি করেছিল পিঠে তীব্র ছুরি।
রোযে তুমি দুই ঠাঁই জলে আর স্থলে,
রক্ষণ করিলে গ্রন্থে তুকারে বাঁচালে।
মা-বাপে তাড়ান্ হেরি একটু অন্যায়,
তুমি কত সও কি বলিব হায়।
তুকা কহে, "কৃপাময় কেমনে বাখানি
তোমা হেন হিতকারী—নাহি মোর বাণী।"

২২৪৭

মা হতে মায়ালু তুমি, চাঁদ হতে তুমি হে শীতল।
তোমাতেই, আহা মরি, বাস করে প্রেম সুনির্মল।
তুমি তো পুরুষোত্তম, উপমা কোথায।
তোমার নামের গুণে পাপী ত'রে যায়।
অমৃত সৃজিলে নিজে তা হতে মধুর,
তব সৃষ্টি পঞ্চভূত এই বিশ্বাঙ্কুর।
স্তব্ধ হয়ে নমে প্রভু তুকা তব পায়,
অপরাধ ক্ষমা কর এই ভিক্ষা চায়।

২২৪৮

দুর্গুণ অন্যায়ী আমি কত আর ক'ব
বিঠ্ঠল আশ্রয় দেহ, আর কি চাহিব।

জানি গো যে এ সংসার—দুস্তর ভয়াল,
থাকিতে না পারি ইথে তিষ্ঠে ক্ষণকাল।
বাসনার যে তরঙ্গ করে কত রঙ্গ,
সে কল্লোলে পড়ি যদি শান্তি হয় ভঙ্গ,
তুকা বলে, "পাণ্ডুরঙ্গ, তুমিই ভরসা,
বিরাজি হৃদয়ে মোর ঘুচাও দুর্দশা।"

দেহুতে এই সকল ঘটনা হইতেছে—এদিকে তুকা-বিদ্বেষী রামেশ্বর ভট্টের দুর্দশার পরিসীমা নাই। প্রবাদ এইরূপ যে, পুণার অনখড় নামক ফকিরের একটা পাতকুয়া ছিল, রামেশ্বর ভট্ট একদিন তাহার জলে স্নান করিয়া দেখেন যে শীতল হওয়া দূরে থাকুক—তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতেছে; বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার শরীব অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইতেছে। অনেক দিন এইরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর তাঁহার স্বপ্ন হইল যে, তুকারামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এ রোগের একমাত্র ঔষধ। তুকারামের গ্রন্থোদ্ধারের কথাও ঐ সময় তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। অবশেষে তাঁহার কৃতাপরাধের জন্য বিস্তর অনুতাপ করিয়া তুকারামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তুকারাম তাহার এই উত্তর দেন—

১৭৫১

চিত্তশুদ্ধি হলে পরে শত্রু হয় মিত্র,
বাঘে নাহি খায় সাপে না দংশয, এমনি বিচিত্র,
বিষ সে অমৃত, বিপদ সম্পদ, অনীতি সেও হয় নীত।
দুঃখ অমঙ্গল, প্রসবে শুভফল, অগ্নি জ্বালা হয় প্রশমিত।
প্রাণীতে প্রাণীর টান, ভাবে সবাই সমান,
এই তো গো স্বাভাবিক রীত।
তুকা বলে, "তোমা পরে তুষ্ট নারায়ণ,
অনুভবে তাহা তুমি বুঝিলে এখন।"

এইক্ষণ অবধি রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের একজন পরম ভক্ত শিষ্য হইলেন—বিদ্বেষ অনুতাপে পরিণত হইল। যাঁহাকে শূদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, তাঁহাকে দেবতা রূপে পূজা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার বোধগম্য হইল যে "ভগবন্ত জনের কোন জাতি নাই — যেমন শালগ্রাম প্রস্তর হইয়াও পূজার্হ, সেইরূপে ঈশ্বরানুরাগী পুণ্যাত্মার প্রতি নীচ জাতির দোষ অর্শে না। দশগ্রন্থী বৈদিক পণ্ডিতেরা শাস্ত্র পুরাণ ভগবদগীতা প্রত্যহ পাঠ করেন কিন্তু তাঁহারা সে সকলের সার অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা কর্মকাণ্ডের কুচক্রে ও সত্যাভিমানে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। তুকা সামান্য ব্যবসায়ী বণিক নহেন—তিনি বিঠোবার চরণদাস—তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ভক্ত ও ত্যাগী পুরুষ আমি পৃথিবীতে আর কোথাও

দেখি নাই।"* এইরূপে তুকার প্রতি রামেশ্বর ভট্টের ভাব আশ্চর্যরূপে পরিবর্তিত হইল ও তিনি যে সকল কবিতা জলমগ্ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন তাহা নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নদী হইতে তুকারামের গ্রন্থোদ্ধার ও রামেশ্বর ভট্টের বৈরমোচনের পর তুকারাম এই সমস্ত অত্যাচার হইতে এক প্রকার অব্যাহতি পাইলেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও অকৃত্রিম দেবভক্তির জন্য তাঁহার নাম মহারাষ্ট্রময় প্রচারিত হইল। তাঁহার সুখ্যাতি মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজির শ্রুতিগোচর হওয়াতে তিনি তাঁহাকে স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়া মহাসমারোহে রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। এই স্থলে বলা উচিত যে শিবাজির ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল ও তিনি রামদাসের শিষ্য বলিয়া প্রকাশ্যরূপে পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি স্বকীয় রাজ্য রামদাসের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহা পুনর্বার তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করতঃ রামদাসের প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য আরম্ভ করেন— সেই হেতু সন্ন্যাসীরা যে গেরুয়া বসন পরিধান করে মহারাষ্ট্রীয় জয়পতাকা সেই বর্ণের কাপড়ে প্রস্তুত হইত। তুকারামকে রাজভবনে আনাইবার জন্য তাঁহার নিকট লোকজন অশ্বরথ, রাজছত্র প্রভৃতি অনেক সরঞ্জাম প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু তুকারাম মহারাজের আমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন না— তিনি সেই সকল সরঞ্জাম ফিরাইয়া দিয়া শিবাজি ও তাঁহার মন্ত্রীগণকে এক উপদেশপূর্ণ ছন্দোময় পত্র লেখেন তাহা নিম্নে অনুবাদিত হইল।

১৮৮৪

ভাল নাহি বাসি ছত্র ঘোটক মশাল
ইথে কেন জড়াইছ আমারে ভূপাল।
ধনমান আড়ম্বর বড় ঘৃণা করি—
এ বিপদ হোতে মোরে রক্ষা কর হরি।

১৮৮৫

ভাল যা না বাসি তাই চাও সঁপিবারে,
এ সঙ্কটে কেন সদা ফেলিছ আমারে?
সঙ্গী ও সংসার হতে অতি দূরে থাকি,
কথা নাহি ক'ব আর, রহিব একাকী।
মানদম্ভ লোকাচার ঘৃণা করি অতি,
এসব তোমারি থাক্ হে পাণ্ডুরি-পতি।

* রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের স্তুতিবিষয়ক যে কয়েকটি অভঙ্গ রচনা করিয়াছেন তাহাতে এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

১৮৮৬

ব্রহ্মা এ ব্রহ্মাণ্ড রাজ্য করিয়া প্রকাশ,
বিচিত্র শক্তির তাঁর করিলা আবাস।
পত্র পড়ে মনে হয় ভক্তি তব দড় —
সুচতুর, বুদ্ধি মান গুরুভক্ত বড়।
লোকের ভাগ্যের সূত্র আছে তব হাতে,
"শিব" এই পুণ্য নাম সেজেছে তোমাতে।
করি ধ্যান আরাধনা যাগযজ্ঞ আর,
স্ববশে এনেছ তুমি হৃদয় তোমার।
সাক্ষাৎ করিতে তুমি চেয়েছ রাজন,
উত্তরে মিনতি মম করহ শ্রবণ।
হীনশ্রী, অরণ্যবাসী, আসক্তি-বিহীন,
বস্ত্রাভাবে মলিন-কায়, অন্নাভাবে ক্ষীণ,
জীর্ণ হস্ত পদ অতি দেখিতে কুৎসিত।
আমারে দেখিয়া তুমি না হইবে প্রীত।
তুকা বলে, "এই মম মনের কামনা,—
মোরে দেখিবার কথা বোলো না বোলো না।"

১৮৮৭

আমি যে তোমারে করি এতেক মিনতি,
জানিহ হরির কৃপা আছে তোমা প্রতি।
পাণ্ডুরঙ্গ পদে যার মন আছে লীন,
নহে সে কৃপার পাত্র নহে দীন হীন।
পাণ্ডুরঙ্গ রক্ষাকর্তা সহায় আমার,
ছাড়ি তাঁরে অন্য কারে নাহি মানি আর
তোমারে দেখিয়া তবে কি হইবে ফল,
সংসার বাসনা যবে ছেড়েছি সকল।
বিসর্জন করি দিয়া সব বাসনায়
পেয়েছি নিবৃত্তি-গ্রাম অল্প খাজানায়।
পতিব্রতা যেই প্রেম রাখে পতি পরে
মন মোর সেই মত বিঠোবার তরে।
বিঠ্ঠলি সমস্ত বিশ্ব আর কিছু নাই,
তোমার মধ্যেও তাঁরে দেখিবারে পাই।

তোমারে বিঠ্‌ঠল আমি করিতাম জ্ঞান,
অন্তরায় হল তায় তব পত্রখান।
রামদাস রয়েছেন সদ্‌গুরু অতি,
মনস্থির একমাত্র কর তাঁর প্রতি।
মন যদি ধায় তব ভিন্ন ভিন্ন দিশে,
তাঁর পরে ভক্তি তবে স্থির রবে কিসে।
তুকা কহে, "শুন ওগো বুদ্ধির আগার!
ভক্তি একমাত্র হয় ভক্তের উদ্ধার।"

১৮৮৮

যাইয়া তোমার কাছে কি হবে আমার,
মিছামিছি কষ্ট শুধু হইবেক সার।
খাবার অভাব হয় খাব ভিক্ষা কোরে,
বস্ত্র চাই ছিন্ন বস্ত্র আছে পথে পড়ে,
শয্যা মোর পড়ে আছে পথের পাষাণ,
আকাশেরে বস্ত্র করি, করি পরিধান।
বল তবে আর করি কিসের প্রত্যাশ,
বাসনা সে জীবনেরে করে শুধু হ্রাস।
বাজার প্রাসাদে যায় মানের আশায়,
কহ দেখি মোরে, সেথা শান্তি পাওয়া যায়?
মহতেরে তরে শুধু রাজার আলয়,
ক্ষুদ্র যে তাহার সেথা মান্য নাহি হয়।
বসন ভূষণ আদি আভরণ যত।
দেখা সে আমার পক্ষে মরণের মত।
এই কথা শুনি তব রোষ যদি হয়,
তবু হরি মোর পরে র'বেন সদয়।
হীনত্ব না ঘুচে করি যজ্ঞ উপবাস,
যতদিন মন রহে বাসনার দাস।
তুকা কহে "লোক মাঝে তোমাদের মান —
আমরা যে হরিভক্ত — দৈব-ভাগ্যবান।"

১৮৮৯

এই একমাত্র যোগ করিও সাধন,
যাহা ভাল তাহা ঘৃণা কোরো না কখন।

যে কাজ করিলে হয় দোষ সংঘটন,
এমন কাজেতে মন দিও না কখন।
দুর্জন নিন্দুকে যদি করে যুক্তি দান,
তাদের কথায় কভু দিয়ো নাক' কান।
রাজ্যের রক্ষক কেবা করিও নির্দ্ধার,
পরীক্ষা তাদের করি বিচার অবিচার।
কি জানাব রাজা তুমি জানিছ সকল,
শরণ লভয়ে যেন অনাথ দুর্বল।
এই যে মিনতি মোর রাখ যদি মনে,
সন্তুষ্ট হইব তাহে কি ফল দর্শনে।
কি সন্তোষ হবে বল সাক্ষাৎ হইলে,
দিন দিন আয়ু ক্ষীণ, কবে যাব চ'লে।
দুই এক কাজ মাত্র সার বলে জানি,
আপনার ভূমে আমি রহিব আপনি।
এই এক সার কথা জানহ কল্যাণ,
একই আত্মা সর্বভূতে রহেন সমান।
আত্মারাম নিরঞ্জনে রাখ সদা মন,
পূজ্য গুরু রামদাসে দেখহ আপন।
তুকা কহে, "ধন্য ধন্য তমিহে ভূপতি —
ত্রিলোক ব্যাপিয়া রহে তব কীর্তি ভাতি।"

১৮৯০

চতুর মান রক্ষক তুমি প্রতিনিধি*
সত্ত্বগুণ নিধি তোমা করিছেন বিধি।

* সমস্ত রাজকার্য নির্বাহ করিবার জন্য শিবাজি আটজন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।
পেশোয়া অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী মোরেশ্বর ত্রিম্বল পিংলে (ডাকনাম মোরেপন্থ) শিবাজির পেশোয়া ছিলেন।
মজুমদাব — ইনি রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী—ইহাকে সমস্ত হিসাবপত্র তদারক কবিতে হইত, সুতরাং ইহার কার্যভার অতিশয় গুরুতর ছিল। কল্যাণী প্রদেশের সুবেদার আবাগী সোনদেও শিবাজীর মজুমদার ছিলেন।
সুর্নীস—ইনি দফ্তর ও পত্রব্যবহার (correspondence) বিভাগের কর্তা। ইহাকে সমস্ত চিঠিপত্র দেখিতে শুনিতে হইত। সমস্ত দলিল দস্তাবেজ ইহার খাতায় লেখা থাকিত। ইনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া দিলে তবে সেসমস্ত মঞ্জুর হইত। আনাজি দত্ত শিবাজির সুর্নীস ছিলেন।
বাক্বানীস্—এই কর্মচারীকে শিবাজির নিজের দৈনিক বিবরণ ও চিঠিপত্র রাখিতে হইত। শিবাজির গৃহরক্ষক সৈন্যদল ও গার্হস্থ্য সমস্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান ভার ইহার উপর। এই কাজে দত্তোজি পন্থ নিযুক্ত ছিলেন।
সর্ণোবৎ — অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ ও ইয়েসজি কঙ্ক পদাতিক দলের অধ্যক্ষ ছিলেন।

শুন হে মজুমদার লেখনী নিপুণ
জানিবে পত্রের তুমি যত গুণাগুণ।
পেশোয়া সুর্নিস, আর চিট্ নিস্, ডবীর,
রাজাজ্ঞা সুমন্ত আর সেনাপতি বীর।
তুমি হে পণ্ডিত রায়ভূষণ সভার,
বৈদ্যরাজ আদি সবে জান নমস্কার।
তোমরা পত্রের অর্থ জানিয়ে অন্তরে,
বিচার করিয়া তাহা বল নৃপতিরে।
সাত্ত্বিক প্রণয়ভরা দৃষ্টান্তের কথা,
যা কহিনু যেন তার না হয় অন্যথা।
মহারাজে যথাস্থিত দিও এ সন্দেশ,
বাক্যের স্বরূপ অর্থ ক'রো সবিশেষ।
ভয়ে ভয়ে বুঝাও হে যদি বিপরীত,
তাহা হলে তোমাদেরি হইবে অহিত।
তুকা কহে, "নমস্কার অধিকারিগণ —
জানাইবে মহারাজে, এই নিবেদন।"

ডবীর — বৈদেশিক বাজকর্মচাবী। বিদেশীয় দূতগণেব অভ্যর্থনা ও বিদেশীয অপবাপব রাজকার্যেব ইনি তদারক করিতেন। সোমনাথ পন্থ শিবাজিব ডবীর ছিলেন।
ন্যায়াধীশ অর্থাৎ বিচারপতি। নীবাজি রাওজি এবং গোমাজি নায়ক ন্যাযাধীশ ছিলেন।
ন্যায়শাস্ত্রী — স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্রেব ব্যাখ্যাকর্তা। ধর্ম, দণ্ড, বিজ্ঞান ও বাজ্যসম্বন্ধীয জ্যোতিষী গণনাব ভাব ইহার উপব ছিল। প্রথমে শম্ভু উপাধ্যায় পরে বঘুনাথ পন্থ শিবাজির ন্যায়শাস্ত্রী হন।
ন্যায়াধীশ এবং ন্যায়শাস্ত্রী ব্যতীত উক্ত প্রত্যেক কর্মচারীকেই সেনা-নাযকতা কবিতে হইত, এইজন্য সর্বদা তাঁহারা নিজ কর্তব্যকাজে মনোযোগ দিতে পাবিতেন না। এই হেতু তাহাদের প্রত্যেকেব এক একজন কাববারী অর্থাৎ সহকারী ছিল। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্মচাবীর অধীন আটজন কনিষ্ঠ কর্মচাবী নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের নাম —
১. দেওয়ান অথবা কাববারী।
২. মজুমদার — হিসাবপত্র পর্যবেক্ষক।
৩. ফর্ণবীস্ — ডেপুটি হিসাব-তদারক-কর্তা।
৪. সব্‌নিস্ — দফ্‌তরদার।
৫ কর্কনিস্ (commissary)
৬. চিটনিস্ — পত্র-ব্যবহার সম্পাদক।
৭. জমিদার — নগদ টাকা ভিন্ন আর সকল মূল্যবান্ সামগ্রী ইহার হস্তে থাকিত।
৮. পোটনিস্ — খাতাঞ্চি ।

তুকারামের পত্রপাঠে শিবাজি বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন — এমনকি, তিনি নিজে সেই সাধুর আলয়ে গিয়া তাঁহার দর্শনেচ্ছু হইলেন। তখন তুকারাম দেহুর নিকটবর্তী লোহ গ্রামে বাস করিতেছিলেন — মহারাজ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া বহুমূল্য মণিমাণিক্য রত্নাদি আনিয়া তাঁহাকে উপহার দেন কিন্তু তুকারাম সে সমুদয় তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিলেন — বলিলেন, "মহারাজ, রজত কাঞ্চন আমার চক্ষে মৃত্তিকা সমান— এ সকল বস্তুতে আমার লোভ হয় না। আমার মোহ ও আশার অন্ত হইয়াছে — আমি হরির দাস, হরিই আমার আশ। মহারাজ, তুমি ভগবদ্ভক্ত হইয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত থাক, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।"

শিবাজি তুকারামের নিস্পৃহতা ও দেবভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। মহীপতি বলেন যে, মহারাজা তুকারামের সাধুদৃষ্টান্ত ও সংসর্গগুণে সংসারের প্রতি এরূপ বীতরাগ হইয়াছিলেন যে তিনি রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। শিবাজির মাতাঠাকুরাণী জিজাবাঈ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ব্যাকুল অন্তরে তুকারামের নিকট গমন করিয়া আপনার একটিমাত্র পুত্রকে সদুপদেশ দ্বারা সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিস্তর মিনতি করিলেন। তুকারাম কহিলেন, "ভয় নাই, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" রাত্রিকালে সংকীর্তনের সময় শিবাজি রাজা সমাগত হইলে অবসর বুঝিয়া তুকারাম তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, যাহার যে ধর্ম তাহা পালন করা তাহার কর্তব্য—তদ্ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। তিনি বলিলেন, ক্ষত্রিয়ের ধর্মই প্রজাপালন, তাহা ছাড়িয়া মহারাজের সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করা কখনই উচিত নহে। এই উপদেশ পাইয়া শিবাজির বিষয়-বৈরাগ্য দূর হইল এবং তিনি তাঁহার মাতার সঙ্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর শিবাজি তুকারামের সহিত একবার পুণায় গিয়া সাক্ষাৎ করেন। তথায় একদিন তিনি তুকারামের কথকতা শ্রবণ করিতেছেন এমন সময় চাকন-দুর্গ-রক্ষক একজন মুসলমান সর্দার তাহার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য একদল পাঠান সৈন্য প্রেরণ করেন। মুসলমান ইতিহাসে এইরূপ কথিত আছে যে পাঠানেরা আসিয়া একত্রিত লোকের মধ্যে কে শিবাজি তাহা চিনিতে পারে নাই। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কোন একজন লোককে পলায়নোদ্যত দেখিয়া শিবাজি অনুমানে শত্রুদল তাহার পশ্চাতে ধাবমান হয়, এই অবসরে শিবাজি তথা হইতে অপসরণপূর্বক তাঁহার সিংহগড় দুর্গে গিয়া উপস্থিত হন। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে, তুকারামের পুণ্য প্রার্থনাবলে শিবাজি শত্রুর চক্রান্ত হইতে রক্ষা পান।

তুকারাম

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তুকারামের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার এক সুবিধা এই যে, তাঁহার জীবনের অনেকগুলি ঘটনা তাঁহার স্বরচিত কবিতাবলীর মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি স্বকীয় জীবনচরিত নিজ হস্তেই একপ্রকার লিখিয়া রাখিয়াছেন, কেবল উপযুক্ত বিষয়সকল বাছিয়া লইলেই হইল। তুকারাম শত্রুর সহিত মিত্রবৎ আচরণ করিয়া কিরূপে ক্রোধ জয় করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখাইয়াছি। শিবাজির নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি আপনাকে নির্লোভ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, — সুদুর্জয় কামরিপু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করে নাই কিন্তু সে সংগ্রামেও তিনি জয়ী হইয়াছিলেন, তাঁহার অভঙ্গেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। একটি তরুণবয়স্কা রূপবতী রমণী তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল। একদিন বিরলে সে আপনার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে তুকারাম যে উত্তর দেন তাহা এই দুই অভঙ্গে দৃষ্ট হইবে —

স্ত্রীসঙ্গ চাহিনা দেব শুষ্ক তরু এ যে —
এ পাষাণ দেহ, তাহে স্ত্রীসঙ্গ কি সাজে?
ভজন সাধন তাহে সব ঘুরে যায়।
লালসা মজালে পরে রক্ষা পাওয়া যায়।
তাকানো সে মুখপানে মৃত্যুর সমান।
কামিনী-লাবণ্য যেন দুঃখের নিদান।
তুকা কহে, "সাধু হয় যদিও আগুন —
কাছে গেলে দহিবে সে, এই তার গুণ।"

৫২৪

পরস্ত্রীকে দেবপত্নী রুক্মিণী সমান —
এ দড় বিশ্বাস মোর, ইথে নহে আন।
যাও মা কি দিব তোরে কিবা মোর আছে,
বিষ্ণুদাস আমরা গো কেন কষ্ট মিছে?
এ তব দুর্দশা হেরি হৃদি দহে দুখে,
ছি ছি ছি ওকথা আর আনিও না মুখে।
তুকা কহে, "হে সুন্দরী, পতি যদি চাও,
প্রণয়ী কতই পাবে, কেন তবে আমারে মজাও।"

তুকারামের চৌদ্দজন শিষ্য ছিল — তাহাদের মধ্যে অনেকেই রামেশ্বর ভট্টের ন্যায় প্রথমে তাঁহার বিদ্বেষী, অবশেষে তাঁহারে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার পদানত হইয়াছিল।

এই শিষ্যবর্গের মধ্যে শিবাজি নামে লোহ-গ্রামবাসী একজন কাংস্যকার ছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, সে অত্যন্ত কৃপণ ও তুকারামের একজন দ্বেষ্টা ছিল, কিন্তু কালক্রমে সে এরূপ তুকাভক্ত হইল যে সকল কাজকর্ম ছাড়িয়া সেই সাধুর সহবাসে দিনপাত করাই তাহার একমাত্র ব্যবসায় হইল। কাংস্যকারের স্ত্রী স্বীয় পতির এইরূপ ভাব পরিবর্তনে রুষ্ট হইয়া তুকারামকে এই অনিষ্টের প্রতিশোধ দিতে কৃতনিশ্চয় হইল। সে একদিন তুকারামকে নিমন্ত্রণপূর্বক আপনার গৃহে আনাইয়া স্নানের সময় এমন উষ্ণজল তাঁহার গাত্রে ঢালিয়া দিল যে, তাহাতে তাঁহার সর্ব শরীর দগ্ধ হইয়া গেল, এবং তিনি জ্বালা নিবারণের জন্য কাতরস্বরে বিঠোবার স্তুতি আরম্ভ করিলেন। এই অগ্নিপরীক্ষাকালে তুকারামের অসামান্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া কাংস্যকার পত্নীর কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল, এবং সেও তাহার পতির অনুবর্তনী হইয়া তুকারামের সেবায় নিযুক্ত হইল। তুকারামের প্রতি সময়ে সময়ে যে এইরূপ কত অত্যাচার আচরিত হইত, তাহার অসংখ্য উদাহরণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রায়ই অত্যাচারকারী দুষ্টদিগের অভীষ্ট সিদ্ধিতে কোন-না-কোন ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। একদিন তুকারামের সঙ্কীর্তন শুনিতে দুইজন পণ্ডিতাভিমানী সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন। তুকারামের হরিনাম তাঁহাদের রুচিকর হয় নাই — তাঁহারা রোষপরবশ হইয়া মহারাজ শিবাজির শিক্ষক* পুণার দাদোজি কোণ্ডদেবের নিকট তুকার বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, দেখুন তুকারাম শূদ্র হইয়া বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে — অজ্ঞ ভাবুক জনেরা তাহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া ধর্মভ্রষ্ট হইতেছে, ব্রাহ্মণেরাও শূদ্রের পদে প্রণিপাত করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে না, একি অন্যায় কথা — এখনি তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন। দাদোজি বিজ্ঞ ও চতুর ছিলেন; তিনি এই দুই সন্ন্যাসীকে বলিলেন আপনারা তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া যদি বাদানুবাদে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার উচিত শাস্তি হইবে। এই বলিয়া তুকারামকে পুণায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একত্রিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিল। দাদোজি সন্ন্যাসীদের কথা না মানিয়া তুকারামের সহিত সাক্ষাৎকরতঃ তাঁহাকে আদরের সহিত নগরে

* দাদোজি কোণ্ডদেব মরারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজির পিতা সাহজির একজন বিশ্বাসী ভৃত্য ও সুদক্ষ রেবেনিউ কর্মচারী ছিলেন। শিবাজি লিখন পঠনে কখনই নিপুণতা লাভ করেন নাই, এমনকি, তিনি নামস্বাক্ষর পর্যন্ত করিতেও অক্ষম ছিলেন। কিন্তু ধনুর্বিদ্যা, বল্লম চালানো, তলবার খেলা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি ব্যায়াম কার্যে তিনি বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিনি রাজকার্য ও শাস্ত্রোক্ত আচার ব্যবহারে কুশলতা লাভ করিয়াছিলেন। রামাযণ মহাভারত ও পৌরাণিক ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ জন্মিত এবং তিনি কথকতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, এমনকি, তাঁহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার অনেক পরে একবার তুকারামের কথা শুনিতে গিয়া তিনি যে সমূহ বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহা পূর্বভাগে বর্ণিত হইয়াছে। দাদোজির মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি শিবাজিকে ডাকাইয়া তাঁহার রাজ্যের স্বাধীনতা সংস্থাপন— গোব্রাহ্মণাদি রক্ষণ, প্রজাপালন ইত্যাদি বিষয়েব উপদেশ দেন — শিবাজির জীবন ও চরিত্রে যে সে উপদেশের ফল ফলিয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

লইয়া আসিলেন। তথায় সংকীর্তন আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসীরা কীর্তনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তুকার ভাব ও ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং দাদোজি তাঁহাদিগকে তীব্র তিরস্কাররূপ দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

ধর্মোপদেষ্টাদিগের একটি রোগ এই যে প্রথম প্রথম তাঁহারা একভাবে ধর্মোপদেশ আরম্ভ করেন। কালসহকারে তাঁহাদের স্বর্গীয় ভাবের সহিত পৃথিবীর ধূলি মিশ্রিত হইয়া তাঁহাদের ভাব পরিবর্তন লক্ষিত হয়। পৃথিবীর নামাঙ্কিত ধর্মনেতাদের জীবনবৃত্ত পাঠে যতদূর জানা যায় তাহাতে এই দৃষ্ট হয় যে, প্রথমে তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ করিয়া ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন, ক্রমে যেমন তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তার হয় ও শিষ্যসংখ্যা বর্ধিত হয়, তেমনি তাঁহারা তাঁহাদের উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া লোকদিগকেও বিপথগামী করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের দৃষ্টি আপনার প্রতি নিপতিত হয় — তাঁহাদের অনুরাগপূর্ণ সরল চিত্তে অল্পে অল্পে ধূর্ততা ও ভণ্ডামি প্রবেশ করে — ঈশ্বরের সিংহাসন তাঁহারা নিজে অধিকার করিতে উদ্যত হন — ঈশ্বর হইতে লোকের হৃদয়-মন কাড়িয়া লইয়া আপনার দিকে তাহা আকৃষ্ট করিতে সচেষ্টিত হন। ধর্ম ও ঈশ্বরের নাম করিয়া আত্মগৌরব বর্ধন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তে নানাপ্রকার প্রকৃতি-বহির্ভূত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার প্রদর্শন দ্বারা লোকসকলকে চমকিত করা তাঁহাদের এক প্রধান কার্য হইয়া উঠে। মূককে বাচাল করা — অন্ধকে চক্ষুদান — ব্যাধিগ্রস্তকে আরোগ্য প্রদান — মৃত শরীরে প্রাণদান ইত্যাদি অদ্ভুত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানচ্ছলে আপনাদিগকে ঈশ্বরের দূত অথবা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। পরে ইঁহাদের দেহত্যাগানন্তর মৃত্যুর ছায়াতে ইঁহাদের জীবনের ক্ষুদ্র ভাব, ক্ষুদ্র লক্ষ্য, ক্ষুদ্র কার্যও এরূপ দীর্ঘাকার ধারণ করে যে, শিষ্যবর্গ মিলিয়া মোহাবেশে অনায়াসে ইঁহাদিগকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লন। এইরূপ পৃথিবীতে কত অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা পবিত্রচরিত্র প্রকৃত সাধুপুরুষ, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া এইরূপ ভণ্ডামি করিতে প্রবৃত্ত হবেন এমন সম্ভবে না, কিন্তু যিনি যাহা বলুন — মানুষ দুর্বল-হৃদয় অপূর্ণ জীব, তিনি প্রকৃত সাধু হইলেও লোকের শ্রদ্ধা অনুরাগ ও পূজা পাইলে মোহবশতঃ তাঁহার মস্তকও অনেক সময় ঘূর্ণিত হবে তাহাতে বিচিত্র কি? এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, তুকারাম আপনাকে এইরূপ ঐশীশক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিতেন কিনা? তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতার অবতারবিশেষ জ্ঞান করিতেন, মহীপতি রচিত তুকার জীবনবৃত্তে তাহার বহুতর নিদর্শন পাওয়া যায়। তুকারামের নিজের লেখায় তাঁহার দেব-শক্তির কথার তাদৃশ উল্লেখ নাই — কিন্তু একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। তুকারাম যে তাঁহার নিজের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না তাহা বোধ হয় না — তৎকালে ওরূপ বিশ্বাস না হওয়াই আশ্চর্য। বিঠোবার উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল ও তিনি তাঁহার জীবনের সামান্য ঘটনাতেও ঈশ্বরের আদেশ দেখিতে পাইতেন — ইহার দৃষ্টান্ত তাঁহার অভঙ্গে অনেক পাওয়া যায়।

স্বপ্নে তাঁহার ধর্মদীক্ষা ও স্বপ্ন হইতে তাঁহার সরস্বতীর প্রসাদ উপলব্ধি হয়। নদী হইতে তাঁহার গ্রন্থোদ্ধার প্রভৃতি কয়েকটা ঘটনা কতকটা অলৌকিক বলিলেও বলা যাইতে পারে। তুকারাম" যে ঘটনাবিশেষে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেন তাহার স্পষ্টতর প্রমাণ তাঁহার অভঙ্গের আরো দুই-এক স্থলে দৃষ্ট হয়। একটি অভঙ্গে একটি মৃত শিশুকে জীবনদানের কথা উল্লেখ আছে। মহীপতি এ ঘটনাটি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

লোহগ্রামে সঙ্কীর্তন হইতেছিল, এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক আপনার শিশুর মৃতদেহ আনিয়া তুকারামের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, তুমি যদি বাপু যথার্থই বিষ্ণুভক্ত হও তবে আমার এই ছেলেটিকে বাঁচাইতে পারিবে। তুকারাম তৎক্ষণাৎ একটি অভঙ্গ রচনা করিয়া নারায়ণের স্তব করিলেন, সকলে দেখিয়া অবাক্ — শিশুটি সজীব হইয়া উঠিল — সে অভঙ্গ এই —

২৩১৫

অচিন্ত্য তোমার শক্তি ওহে নারায়ণ,
নির্জীবে করিতে পার তুমি সচেতন
তোমার অদ্ভুত লীলা আগে শুনা গেছে,
প্রত্যক্ষ কেননা হবে আমাদের কাছে,
কি সৌভাগ্য আমাদের তুমি প্রভু যবে,
আমরা তোমার দাস কি অভাব তবে?
কৃপাময় তুকার হে রাখ এ মিনতি
প্রকাশো এখনি তব অদ্ভুত শকতি।

আর একটি ঘটনা এই। চিন্তামণিদেব নামক এক পূজারী ব্রাহ্মণ দেহুর অনতিদূরে চিঞ্চবাদ গ্রামে বাস করিতেন। তুকা তাঁহার নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। চিন্তামণিদেব তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সহিত ভোজন করিতে বসেন। ভোজনের সময় তুকার আসন এক স্বতন্ত্র পংক্তিতে স্থাপিত হয়। ইহাতে তুকারাম ক্ষুব্ধ না হইয়া প্রস্তাব করেন, এই ভোজে গণেশ ঠাকুরের জন্য এক আসন পাতিয়া তাঁহাকে আহ্বান করো। চিন্তামণি উত্তর করিলেন দেবতাকে কিরূপে এই ভোজে আনয়ন করিবেন, এ তো আমার সাধ্য নয়। তুকারাম দুইটি আসন ও দুই পাত্র রাখিতে বলিয়া গণেশ ও বিঠোবাকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে দেবতারা আসিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মহীপতি বলেন, তুকা আর চিন্তামণি ভিন্ন অপর কেহ দেবতাদের দর্শন পায় নাই — তাঁহারা কেবল দেখিতে পাইলেন যে ভোজ্যপূর্ণ পাত্র ক্রমে আপনাআপনি শূন্য হইয়া আসিতেছে।

এই বিষয়ক অভঙ্গ —

২৮৮২

ওহে চিন্তামণিদেব করি নিবেদন,
গণেশ ঠাকুরে কর ভোজে নিমন্ত্রণ।
দেব কহে, "ওহে তুকা কি সাধ্য আমার,
গ্রাসিয়াছে দেখ মোরে ঘোর অহঙ্কার।
প্রস্তুত হয়েছে অন্ন জুড়াইয়া যায় —
ব্রাহ্মণেরা সমাগত জ্বলিছে ক্ষুধায়।"
তুকা কহে, "তব পুণ্যে আনিব গণেশে,
স্থির হও ধৈর্য ধর, দেখহ নিমেষে।"

১৫৭১ শকে তুকারামের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে প্রবাদ এই যে তিনি বিষ্ণুর পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মহীপতি বলেন যে তুকারামের অন্তর্ধানের কিছুকাল পূর্ব হইতে তিনি কথায় কথায় বৈকুণ্ঠ যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার শিষ্যদের প্রতি তাঁহার শেষ উপদেশ এই —

২৪৬০

শুন শুন যারা হরি ভকত,
রয়েছ এখানে ভাবুক যত,
তার্কিক সঙ্গ ছাড়িয়া দেহ
বিঠোবা চরণ ধরিয়া রও।
মতের চক্রে ভ্রমিও না আর,
ডুবিবে নরকে কহিনু সার।
কলির মাঝে তুকারাম দাস,
বিদায় লইয়া যান নিজ বাস।

উপদেশ সমাপ্ত হইলে তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম তুমি আমার সঙ্গে আসিতে চাও তো এসো।" তাঁহার স্ত্রী ও কথায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়া উত্তর করিলেন, "আমার পাঁচমাস গর্ভ, ছোটো ছোটো ছেলে, ঘরে গরু বাছুর, সংসারধর্ম ছেড়ে এখন তোমার সঙ্গে কেমন করে যাই বল দেখি।" তুকারাম মন্দির হইতে বাহির হইয়া চতুর্দশ শিষ্যের সহিত ইন্দ্রায়নীর তীরে আসিয়া সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্তন শেষ হইলে তুকার জন্য আকাশ হইতে পুষ্পক বিমান অবতীর্ণ হইল — তুকারাম দেবতাদের সঙ্গে রথারূঢ় হইয়া অদৃশ্য হইলেন। চতুর্দিক হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। মহীপতির গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে ও ইহার আভাস তুকারামের কয়েকটি অভঙ্গে লক্ষিত হয়। কিন্তু তুকারামের অভঙ্গ

যে সকল পুস্তকরূপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে গদ্যে এইরূপ লিখিত আছে যে "১৫৭১ শকে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া প্রাতঃকালে তুকারাম অদৃশ্য হন।" দেহুতে নদী হইতে উদ্ধৃত যে গ্রন্থখানি তুকার বংশজ মধ্যে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে তাহাতে তুকারামের মৃত্যু বিষয়ে এইমাত্র লিখিত আছে যে "১৫৭১ শকে বিরোধীনাম সংবৎসরে সীমগা (ফাল্গুন) বদ্য (কৃষ্ণপক্ষে) দ্বিতীয়া, বার সোমবার তে দিবসী প্রাতঃকালী তুকোবাণা তীর্থাস প্রয়াণং কেলে— শুভং ভবতু মঙ্গলং" অর্থাৎ "১৫৭১ শকে বিরোধীনাম সম্বৎসরে ফাল্গুন কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া সোমবার প্রাতঃকালে তুকারাম তীর্থ প্রয়াণ করিলেন— শুভমস্তু।"

তুকাবামেব এইরূপ অন্তর্ধান আর আমাদের কবি রামপ্রসাদ সেনের মৃত্যুর মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

তুকারামের আসন্ন কালে তাঁহাকে সর্বদাই ধ্যানমগ্ন দেখা যাইত। এই কালের একটি প্রবাদ আছে যে তিনি আলন্দীর মন্দিরে গিয়া দেখিলেন যে মন্দিরের প্রাঙ্গণে এক বৃক্ষতলে একপাল পক্ষী চরিতেছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাহারা উড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া তিনি বিষাদে মগ্ন হইলেন। তাঁহার মনে হইল যে এখনো আমার মনের মালিন্য অপনীত হয় নাই — এখনো জীবজন্তু আমাকে দেখিয়া শঙ্কিত হয় — যে অবস্থায় প্রাণীমাত্রে আমাকে দেখিয়া ভয় পাইবে না আমি এখনো সেই নিষ্কাম শান্তির অবস্থায় উপনীত হইতে পারি নাই। এই ভাবিয়া তিনি সেই বৃক্ষতলে শবের ন্যায় এরূপ নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন যে বিহঙ্গদল তাঁহাকে অচেতন পদার্থ জ্ঞানে তাঁহার গায়ে আসিয়া উড়িয়া বসিল। তুকারামের এই সময়কাব রচনাতে — সংসাব মায়াময় — জীবব্রহ্মে অভেদ — এই বৈদান্তিক ভাব প্রকটিত দেখা যায়, এবং তিনি ঈশ্বরে লীন হইয়া সংসার হইতে অপসৃত হইবার ভাব ব্যক্ত করেন।

১৫৯০

সংসারের গায়ে মাখা যতেক ব্যসন,
বিশুদ্ধ হয়েছি চিত্তে করিয়ে কীর্তন।
নিষ্কলঙ্ক দেখি এবে এই ত্রিভুবন —
ভেদাভেদ জ্ঞান ধুয়ে পেয়েছি চেতন।
করিব অখণ্ড এবে ব্রহ্ম পুরে বাস,
যেই স্থানে হয় সব পাপতাপ নাশ।
তুকা কহে "ভুলে সবে একান্ত নিরত —
ব্রহ্মাতেই ব্রহ্মারস ভুঞ্জিব সতত।"

তুকারামের অন্তর্ধানের চতুর্থ দিবসে তাঁহার বিয়োগক্লিষ্ট শিষ্যগণের নিকট তিনি আপনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একজোড়া মন্দিরা যাহা সর্বদাই তাঁহার হাতে থাকিত — একখানি বস্ত্র ও কতকগুলি অভঙ্গ প্রেরণ করেন। সেইদিনে দেহুবাসিগণ হরিসঙ্কীর্তনে ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি

উৎসবের কার্য মহা উল্লাসের সহিত অনুষ্ঠান করেন। দেহুতে এইরূপ প্রতিবর্ষে ফাল্গুনের পঞ্চমীর ষষ্ঠীতে তুকারামের স্মরণার্থ উৎসবক্রিয়া মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

তুকারাম তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যেসকল শ্লোকে আপনার অনুগতমণ্ডলী হইতে বিদায় লইয়াছিলেন তাহার কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে —

১

দাও গো বিদায় এবে যাই নিজ ধামে,
এতকাল আছিলাম তোমাদের গ্রামে
আর কি কহিব বল মনে রেখো মোবে,
আর না ভ্রমিতে হবে সংসারের ঘোবে।
বল সবে রামকৃষ্ণ বিঠ্‌ঠলের নাম,
বৈকুণ্ঠে পৃথিবী ছাড়ি যায় তুকারাম।

২

নিজ গ্রামে নিজ ধামে চলিনু এখন,
বিদায় দিয়েছ মোরে মিলে সাধুগণ।
মোর সুখ-দুখ-মর্ম করেছ গ্রহণ,
কৃপাদৃষ্টি আমা পরে আছে বিলক্ষণ।
সাজায়ে মিষ্টান্ন কত এসেছে লইতে,
বহুদিন পরে সুতে প্রবাস হইতে।
সেই পথে তাকাইয়া আছি নিশিদিন,
সেই দিকে চিত্ত মোর শঙ্কা ভয়হীন।
তুকা কহে, "আনিতে এসেছে লোকজন,
ডাকিছেন বাপ মায়ে দিতে আলিঙ্গন।"
শিহরে অঙ্গ পুলক ভরে,
শুভ চিহ্ন সব আমার তরে।
স্মরেছেন মোরে মা বাপে আহা —
দেখা যাক্ ভাগ্যে আছে কি তাহা।
উৎকণ্ঠিত অতি হয়েছে হিয়া,
সুলক্ষণ তাহে দিতেছে কহিয়া।
তুকা কহে এবে কাজ হল শেষ
আর কি থাকা যায় এখন বিদেশ।

৩

বাহিরে ও ঘরে মোর আছ যারা যারা —
এই আশীর্বাদ—সুখে থাকগো তোমরা।
গুরুপূজ্য লোক মোর রয়েছেন যত,
প্রণতি তাঁদের মোর জানাইবে শত।
মধু অন্বেষণ তরে অলি যায় উড়ে —
বস্ত্র ছিন্ন হলে পরে আর কি সে যুড়ে?
নদী যবে একবার সাগরেতে মিশে —
তার সেই স্রোত আর ফিরাইবে কিসে?
এইসব কথাগুলি মনে কোরো সার —
এই যে চলিল তুকা ফিরিবে না আর।

৪

শঙ্খচক্র ধরি করে আইলেন হরি,
কিবা শোভে কুণ্ডল মুকুটে আহা মরি।
মেঘশ্যামবর্ণ হরি পীতাম্বরধারী,
কহিছেন ভয় নাহ; আর কিবা ডরি।
আমি গেলে সকলে কাঁদিবে উচ্চরবে —
কিন্তু আর ফিরিবে না মনে জেনো সবে।
"যে ছিল গ্রামের রত্ন সে ছাড়িল দেহ,
মোদের সে বার্তা তবু জানালে না কেহ" -
পাছে এই কথা বল ভয় করি ভাই,
পৃথ্বী ছাড়িবার আগে জানাইনু তাই।
লইয়া ধ্বজার বোঝা করি ভেরীরব —
পণ্ডরীপুরেতে যায় হরিভক্ত সব।

৫

তুকার পরীক্ষা হইল শেষ,
বিস্ময়ে পূরিল সকল দেশ।
প্রত্যহ দেবতা ভজন গান,
এইমাত্র তার অনুষ্ঠান।
বসিল তুকা বিমানে চড়ি,
সাধুগণ দেখে নয়ন ভরি।

ভক্তিতরে দেব ক্ষুধিত প্রাণ —
তুকারে বৈকুণ্ঠে লইয়া যান।

এই শেষ চরণের মূল অভঙ্গ পাঠকদিগের কৌতূহল উদ্রেকের জন্য দেওয়া যাইতেছে —

তুকা উতরলা তুকী।	নরল ঝালেঁ তিহীঁ লোকীঁ।।	১
নিত্য করিতো কীর্ত্তন।	হেঁচি ত্যাচেঁ অনুষ্ঠান।।	২
তুকা বৈসলা বিমানী।	সন্ত পাহাতী লোচনা।।	৩
দেব ভাবতো ভুকেলা।	তুকা বৈকুণ্ঠাসী নেলা।।	৪

বোধ হয় এই শ্লোক হইতেই তুকারামের স্বর্গারোহণ কল্পিত হইয়াছে।

তুকারামের জীবনবৃত্তে যে সকল ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ — বিষয-ত্যাগ ধৈর্য ক্ষমা শান্তি — তাঁহার অচলা দেবভক্তি প্রকাশ পাইতেছে। তুকারাম যে বাস্তবিক একজন ভগবদ্ভক্ত সাধু ছিলেন তাহা তাঁহার জীবন পুস্তকে সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত আছে। তাঁহার বৈরাগ্য কেবল মুখের নয় — বৈরাগ্যের প্রকৃত অর্থ তাঁহার জীবনে ফলিত হইয়াছিল। তিনি স্বেচ্ছাপূর্বক সর্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যকষ্টে প্রথমে তাঁহার সংসার ত্যাগে প্রবৃত্তি জম্মে, কিন্তু পরে যখন তাঁহার যশঃসৌরভ মহারাষ্ট্রমধ্যে বিস্তার পাইল — যখন লক্ষ্মী তাঁহার দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন এবং সুদুর্লভ রাজপ্রাসাদ তাঁহার হস্তগত হইল, তখন তিনি সমুদয় প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া কহিলেন — এ সকলে আমাব কাজ নাই — আমি যে দুই একটা পদার্থ সাব বলিয়া জানি তাহাতেই অনুরক্ত থাকিব। — "আপনার ভূমে আমি রহিব আপনি" এই নিশ্চয় করিলেন। তিনি পার্থিব ধনমানেব প্রার্থী ছিলেন না — রাজ-সম্মান তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হইত — তিনি জানিতেন, "আমরা হরিভক্ত দৈব-ভাগ্যবান্।"

তিনি বলিয়া গিয়াছেন —

১

নম্রতা প্রভুর অমূল দান,
হয় না সহিতে ঈর্ষার বাণ।
মহাপুরে ভাঙে বৃক্ষের কায়,
কোমল লতিকা বাঁচিয়া যায়।
সাগর তরঙ্গ আইসে ধেয়ে,
প্রণত হইলে যায় বহিয়ে।
তুকা কহে দেখ বিনয়ের ফল,
পায়ে পড়িলে তো চলে না বল।

২

দীনতা নম্রতা দেহ গো হরি,
বড়ত্বের মোরা ধার না ধারি।
পিপীলিকা সেই ক্ষুদ্র প্রাণী,
সে পায় মিছরী টুকরোখানি।
মহারত্ন ঐরাবতে
জ্বলে অঙ্কুশ আঘাতে।
মহৎ যে জন হয়,
কঠিন যাতনা সয়,
তুকারাম কহে শুন হে সার,
মৃদু যে যত লঘু ভার তার।

তুকারামের শ্লোকাবলী মহারাষ্ট্রীয় বৈষ্ণবদিগের বেদ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু শুধু বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেন মহারাষ্ট্র দেশের সাধারণ জনপদের মধ্যে তাঁহার অভঙ্গ প্রখ্যাত ও আদরণীয়। তুকারাম যেরূপ ধর্মোপদেষ্টা, যাঁহার জীবনে জীবন্ত ধর্ম প্রতিভাত ছিল — তিনি যেরূপ কবি, যাঁহার লেখায় নীতি ও ভক্তি-সুধাপূর্ণ জ্বলন্ত বাক্যসকল আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী, তাঁহার প্রতি অনুরাগ যে কোন সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ তাহা নহে — তিনি মহারাষ্ট্রদেশের জাতীয় কবি। তাঁহার অভঙ্গ ব্রাহ্মণ শূদ্র কথক শ্রাবক সকলেরই মুখে। শিন্দে, হোলকার প্রভৃতি রাজপুরুষগণ তুকার অনুযাত্রী বলিয়া পরিচিত ও মাসের মধ্যে নিয়মিত দিবসে সবান্ধব তাঁহার শ্লোক কীর্তন করা তাঁহাদের কর্তব্যকর্মের মধ্যে পরিগণিত। নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে তীর্থকরীগণ মহা উল্লাসের সহিত তুকার অভঙ্গ গান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প নয় — প্রতি বর্ষে আষাঢ় ও কার্তিক মাসে প্রায় লক্ষ লোক বিঠোবা দর্শনে পণ্ডরীপুর যাত্রা করেন।

ঈশ্বরে ধ্রুব বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসানুযায়ী আচরণ, তুকার উপদেশের দুই প্রধান অঙ্গ। ভক্তিমার্গকেই তিনি মোক্ষলাভের প্রকৃত মার্গ জ্ঞান করিতেন। মুখে ধর্মভানকারী অন্তরে ঘোরবিষয়ী যে সকল লোক কতকগুলি বাহ্যাড়ম্বরকেই ধর্মসাধন মানিয়া চলেন, তাহাদিগকে তিনি দেখিতে পারিতেন না। তিনি বলিয়াছেন —

কথা অতি মিষ্ট আর মন ভাল যার,
নেই বা রহিল গলে ফুলমালা তার।
আত্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভ করেছে যে জন
নেই বা সে শিরে জটা করিল ধারণ।

আসক্তি নাহিক যায় পরস্ত্রীব প্রতি,
ভস্ম যদি না মাখে সে কি তাহাতে ক্ষতি।
নিন্দায় সে মূক আর অন্ধ পরধনে,
তুকা কহে সন্ন্যাসী কহিও সেই জনে।

পুনশ্চ —

কি ফল পূজিতে বল পিত্তল পাষাণ,
ভাবহীন হয়ে যদি রহিলে অজ্ঞান।
ভক্তিই সুখকারণ ভক্তিই তারণ,
ভক্তিই শাস্ত্রেতে কহে মোক্ষের সাধন।
জপমালা কণ্ঠমালা কি করিবে বল —
বিষয়ের জপে যদি মগন কেবল।
অক্ষরের অভিমানী হইয়ে পণ্ডিত —
কি হবে যদি না তুমি সাধো জীবহিত।
খোল করতাল ধরি গাও নিশিদিন,
কি ফল তাহাতে যদি অন্তরে মলিন।
তুকা কহে, "ভক্তি বিনা দেবসেবা করি,
বৃথা পণ্ডশ্রম খালি — পাইবে কি হরি?"

এই ক্ষণকার ধর্মপ্রচারকেরা তুকারামকে তাঁহাদের জীবনের আদর্শ করিয়া চলিলে অনেক শুভ ফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ত্যাগী শ্রদ্ধাবান শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল — ঈশ্বর-ভক্তিই তুকারামের সর্বস্ব ছিল — তাহাই তাঁহার জীবনের অন্ন পান — তাহাই তাঁহার উপদেশের সার — তাহারই গুণে মহারাষ্ট্রের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই নিকট তাঁহার অভঙ্গের এত আদর — এত গৌরব — তাহার গুণে ঐ প্রদেশে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তুকারামের অভঙ্গ হইতে ঈশ্বরভক্তিসূচক শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

সন্তানে মায়ের হাতে কেবা দেয় আনি,
আপনি জননী তাকে লন কোলে টানি।
কাজ যাঁর তিনিই তা করিবেন, তবে
আমি কেন মিছামিছি মরি ভেবে ভেবে।
সন্তান না যদি চায় তবুও জননী,
রাখেন তাহার তরে মিষ্টান্ন আপনি।
সন্তান যখন রহে খেলায় ভুলিয়া,
কাছে গিয়ে লন তারে বুকেতে তুলিয়া।

পীড়া তার হলে তিনি ব্যস্ত হন কত —
তুকা তাই কহে, "শুন বন্ধুগণ যত —
এত যত্ন কেন তবে শরীরের প্রতি,
মা থাকিতে আঘাত না পাবে এক রতি।"

এই শ্লোকটিতে ঈশ্বরের মাতৃভাব সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। নিম্নের কয়েকটি শ্লোকে কবির ঈশ্বরনিষ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে।

নিজ হতে বাক্য কভু নাহি কহে নর,
প্রিয় ভগবন্ত যিনি তাঁরি সেই স্বর।
কোকিল যে করে সদা সুমধুর গান,
অন্যজন তারে সেই শিখাইল তান।
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি যাহা আমি —
এ ক্ষমতা দিলা মোরে জগতের স্বামী।
তুকা কহে কে জানিবে তাঁহার শকতি,
পঙ্গুখঞ্জ জনেরেও দেন তিনি গতি।
লইনু সর্বতোভাবে তোমার শরণ,
কায়মনোবাক্যে তব করিনু বন্দন।
হে দেব, অপর কিছু নাহি অভিলাষ,
তব পদে থাকে যেন বাঁধা তব দাস।
আমার হৃদয়পরে সেই গুরুভার —
তোমা বিনা ওহে নাথ কে করে উদ্ধার,
আমি হে তোমার দাস প্রভু তুমি আর —
বহুদূর হইতে এসেছি তব দ্বার।
তুকা কহে ধন্না দিয়ে বসিনু এখন,
হিসাব দেখিতে হবে দিয়ে দরশন।

ওহে পতিত পাবন,
দীননাথ নারায়ণ,
তব রূপ হৃদি মাঝে,
সদাই যেন বিরাজে,
ওহে ব্রহ্মাণ্ড নায়ক
ভক্ত-জন-প্রতিপালক।

জীবের জীবন তুমি প্রাণাধার,
দেব দেব তুমি তুকা কহে সার।

এই বরদান মাগি গো প্রভু,
যেন তোমা-হারা না হই কভু।
তবে গুণগানে সঁপিয়া প্রাণ —
ভবের বিভব চাহি না আন।
ধনমান যশ না চাহি কৃপাল,
সাধু সঙ্গে যেন কেটে যায় কাল।
ছাড়ি যায় যবে তুকা ভববাস —
হয় যেন সুখী এ তব দাস।

পতিত যে পাপী আমি লয়েছি শরণ,
পাণ্ডুরঙ্গ করো মোর লজ্জা নিবারণ।
ভকত বৎসল তব অন্ত কেবা জানে,
তোমা বিনা কেবা তরে অভাগা এ জনে।
কত কষ্ট পায় আহা দ্রোপদী ভগিনী,
আপনার মত তারে রাখিলে আপনি।
প্রহ্লাদে বাঁচালে স্তম্ভে হয়ে অবতার,
আমারে ভুলিলে তবে একি অবিচার।
দারিদ্র্য ঘেরিল আসি সুদাম ব্রাহ্মণে,
তুমি তারে পাণ্ডুরঙ্গ উদ্ধারো যতনে।
তুকা কহে কায়মনে ধরিনু আধার,
পাপ নাশি তব দাসে দেও হে নিস্তার।
এই দেব তব পদে করি হে মিনতি,
কৃপাগুণে হোক্ মোর দেহের বিস্মৃতি।
তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবারে চাই,
জীবনের সুখ শান্তি নাহি অন্য ঠাঁই।
তোমার চরণ পানে বাঁধি নিজ ধাম,
সন্তোষ পাইব চিতে লভিব বিশ্রাম।
লজ্জা কিম্বা ভয় আর কাম ক্রোধ অরি —
বিনাশো জঞ্জাল সবে প্রভু কৃপা করি।

তব পদে প্রভু তুকা এই ভিক্ষা চায় —
সাধু সঙ্গে মিলাইয়ে তরাও তুকায়।

পৌত্তলিকতা বিষয়ে তুকারামের উক্তি —

স্থানেতে আবদ্ধ ক'রে পুজি গো তোমায়,
চৌদ্দ ভুবন কিন্তু অন্তরে লুকায়।
নাচায় ফিরায় তোমা লোকে দ্বার দ্বার
রূপরেখাহীন কিন্তু তুমি নিরাকার।
তোমা লাগি আমরা গো গাই কত গীত—
তুমি কিন্তু ওহে দেব শব্দের অতীত।
তোমা তরে আমরা গো পরি জপমালা—
তুমি কিন্তু সৃষ্টি হতে রয়েছ নিরালা।
তুকা কহে, "এবে তুমি হয়ে পরিমিত—
প্রসন্ন হইয়ে মোর সাধো কিছু হিত।"

বৈদান্তিক মতের উপর তুকার উক্তি —

খন্ডোবার ভিক্ষুক সে আছিল প্রথমে—
ভাগ্যগুণে সেনাপতি হল ক্রমে ক্রমে—
তবুও ভিক্ষার ঝুলি ঘুচিল না তার,
পুরানো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।
প্রথমে গণক ছিল, এমনি কপাল,
ক্রমে ক্রমে রাজ্যের সে হইল ভূপাল—
পাঁজি পড়া তবুও তো ঘুচিল না তার—
পুরানো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।
প্রথমে ছিল যে দাসী, কে জানিত কবে
সেই দাসী ভাগ্যগুণে পাটরাণী হবে—
তবুও তো হীন কর্ম ঘুচিল না তার—
পুরানো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।
প্রথমে পাইল তুকা সাধুদের সঙ্গ,
ক্রমে পাণ্ডুরঙ্গ সাথে হল এক অঙ্গ।
তবু তার গুণগান ঘুচিল না তার,
পুরানো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।

ভক্তের লক্ষণ —

সেই জন ভক্ত, যেই দেহেতে উদাস—
সংসারে বিরাগ যার ছিন্ন আশপাশ,
বিষয় তাঁহার নাই বিনা নারায়ণ,
মাতাপিতা নাহি চান নাহি ধন জন।
গোবিন্দ সহায় তাঁর হন পদে পদে,
আগুলে রাখেন তাঁরে সম্পদে বিপদে।
তুকা কহে এই জেনো ভক্তের লক্ষণ,
সত্য কাজে সদা তিনি থাকেন মগন।

সংসারের অনিত্যতা —

কোন জন দেখ জল বোয়ে মরে,
সুখে শোয় কেহ খাটের উপরে।
কালের চক্র যেমন ঘুরে,
লোকের কপাল তেমনি ফিরে।
কভু শুষ্ক রুটি বহুকষ্টে মেলে,
কভু চর্ব্য চোষ্য পাই অবহেলে।
কেহ পদব্রজে ঘুরিয়ে মরে,
কেহ রথে বসে সুখে বিহরে।
কেহ রাজবেশে ভূষিত শরীর,
কারো পুরাতন ধূলি মাখা চীর।
কভু বা দারিদ্র্য কভু ধনরাশ,
কভু হীন সঙ্গ কভু সাধু সহবাস।
তুকা বলে এই কথা মনে জেনো ঠিক,
পৃথিবীর সুখদুঃখ সকলি অলীক।

ধর্মনীতি ও ঈশ্বরবিষয়ক আর কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা যাক।

সেই পাপ মনে যদি রহিল সংশয়,
পাপ পুণ্য দুই সে মনের ধর্ম হয়।
ভাল চিন্তা পুণ্য অতি জানিও গো সবে,
বীজ যদি ভাল হয় ফল ভাল হবে।

তুকা কহে, মনেরে রাখিও শুদ্ধ সত্ত্ব,
সেই অতি ভাল কাজ, সেই সার তত্ত্ব।
ধন্য ধন্য সেই প্রাণী ক্ষমা যার অঙ্গে,
ধৈর্যবল ধরে যেই সকল প্রসঙ্গে।
পর-গুণদোষ-চর্চা নাহি যাঁর ঠাঁই —
অহঙ্কার গর্বশূন্য যে জন সদাই।
অন্তর বাহির যার সমান নির্মল,
পুণ্যতোয়া গঙ্গাসম হৃদয় কোমল।
তুকা কহে হেন জন দোসর আমার —
প্রণমি তাহার পদে শত শত বার।

সন্তপ্ত পীড়িত জনে যে দেখে আপন,
দীন হীনে কবে যেই হৃদয় ধারণ
নিজ দাসদাসী 'পরে
পুত্রের বাৎসল্য ধরে,
সেই সাধু, সেই তীর্থ দেবের বসতি,
তার গুণ বাখানিব হেন কি শকতি।
তুকা কহে, "সাক্ষাৎ সে ভগবন্ত মুরতি।"

সদুপায়ে ধনরাশি করি উপার্জন
ভাল কোরে বুঝেসুঝে কোরো বিতরণ।
কটু বাক্য না কহে যে পরহিতে রত,
পরস্ত্রীরে দেখে যেই জননীর মত —
জীবজন্তু সবা 'পরে অতি দয়াবান,
মরুভূমে তৃষাতুরে করে জল দান।
সদা শান্ত, নাহি করে পর অপবাদ,
গুরুজন সাথে কভু না করে বিবাদ।
সে লভে উত্তম গতি নাহি পায় দুখ,
পরম সৌভাগ্য তার ভুঞ্জে সদা সুখ।
তুকা কহে আশ্রমের রত্ন তারে মানি,
এ হতে তপস্যা আর কি আছে না জানি।

সংসারের ধারি না ধার,
হরির জন যে সখা আমার।
ব্রহ্মানন্দে কাল যায়
বিষয়ে কি মন তৃপ্তি পায়।
না আসে চিন্তা স্বপনেও কভু,
নিশি দিন যায় সুখেতে প্রভু।
তুকারাম কহে, এ যে ব্রহ্মরস,
কি বলিব আহা কেমন সরস।
কৃপাময় যিনি তাঁরে না কর স্মরণ।
একাকী জগৎ যিনি করেন পোষণ।
উত্তাপে শুকালে তরু, দিয়ে বারিধার
কে করে তাহাতে বল জীবন সঞ্চার।
কে বল মায়ের স্তনে যতনে ঢালিয়া,
পান হেতু দুগ্ধ দেন আগেতে ভাবিয়া।
তুকা কহে জান তাঁর নাম বিশ্বম্ভর,
ভক্তি ভরে তাঁর ধ্যান কর নিরন্তর।

সবাই বলে গো দেব আমি তব দাস,
তুমিই রাখিবে মোরে এই মম আশ।
অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন,
এই নাম জপি আমি কাটাব জীবন।
ভজন পূজন মোর মুখেই কেবল,
অন্তরের কথা প্রভু জানিছ সকল।
তুকা কহে তুমি ওহে করুণার সিন্ধু,
ভবপাশ নাশো মোর ওহে দীনবন্ধু।

প্রবাস পত্র

সিন্ধু কাহিনী

প্রথম পত্র

ভাই, —

তুমি আমাকে আমার বোম্বাই প্রবাসের বিবরণ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছ কিন্তু কি লিখি কোথায় আরম্ভ করি তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। প্রথমে কোন এক নূতন দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে অনেক নূতন ছবি চোখে পড়ে — নূতন ভাব মনে উদয় হয়, লোকদের চালচলন রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে এদেশের নূতনত্ব নাই — আমি এখানকার একজন প্রাচীন বাসেন্দার মধ্যে গণ্য হইতে পারি। বিশ বৎসর ধরিয়া আমি এ প্রেসিডেন্সিতে কাজ করিতেছি, ইহার এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করিয়াছি। জন্মভূমিই যে আপনার দেশ তাহা নহে, যে প্রদেশে জীবনের অধিকাংশ ও সারভাগ কাটাইয়াছি যে লোকেদের মধ্যে এত কাল বাস করিয়াছি ও যাহাদের কার্যে আমার শরীর ও মনের সমুদয় শক্তি ব্যয় করিয়া কর্মক্ষেত্রের প্রান্তভাগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি — সেই দেশ ও লোকদিগকে আপনার বলিয়া বরণ করাই স্বাভাবিক। আমি তো বোম্বাইকেই নিজের দেশ মনে করি— এ দেশ আমার হাড়েমাসে জড়িত— তাই মনে হয় যেন নূতন কিছুই লিখিবার নাই, সকলি পুরানো কথা। তবে এখানে দেখিয়া শুনিয়া আমার যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহা আগড়ম বাগড়ম বকিয়া যাইতে পারি— তা যদি তোমার ভাল লাগে।

ভাষা অনুসারে এ প্রেসিডেন্সি সামান্যতঃ চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও সিন্ধুদেশ। শেষ থেকে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুদেশের কথা পাড়া যাক্। সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ রাজ-পরিবারের নবোঢ়া বধূ — ইহা ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হইবার পর এখনো অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত হয় নাই। ম্যাপে দেখিলে এ প্রদেশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মনে হয় না — পঞ্জাবের অঙ্গ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। মধ্যে মধ্যে সিন্ধুদেশকে পঞ্জাবের সহিত যোগ করিবার প্রস্তাবও শুনা যায়, কিন্তু বোধ করি সিন্ধিদের তাহা ইচ্ছা নহে — তাহারা বোম্বাই গবর্নমেন্টের অধীনে সুখে আছে। এদেশের ভাষা সিন্ধি, মারাটী গুজরাতীর সঙ্গে তাহার সৌসাদৃশ্য দেখা যায় — সংস্কৃতই এ সকল ভাষার আদ্য-জননী। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ইহার লিখনপদ্ধতি উর্দু — সংস্কৃতমূলক নহে। অক্ষর অনায়াসে দেবনাগরী হইতে পারিত — সিন্ধি ভাষায় যত শব্দ আছে নাগরীতে তাহা সহজে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। কতকগুলি অতি কঠোর শব্দ আছে তাহার মধ্যে কেবল কোন রূপরেখা কিম্বা বিন্দুর প্রয়োজন। আমরা যেমন 'ড' ও 'ড়' মধ্যে বিন্দু দিয়া প্রভেদ নির্দেশ করি, কতকগুলি সিন্ধি-অক্ষর সম্বন্ধে সেইরূপ কোন সঙ্কেত ব্যবহার করিলেই হইল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, দেবনাগবার

পরিবর্তে উর্দু অক্ষর কেন চলিত হইল? ইহার উত্তর, সবকারের হুকুম। যখন ইংরাজেরা সিন্ধুদেশ অধিকার করে তখন সেখানে লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। বণিকদের হিসাবপত্রে এক প্রকার নাগরীর অপভ্রংশ ব্যবহৃত হইত কিন্তু তাছাড়া বর্ণাক্ষরের প্রচার ছিল না। যখন ব্রিটিশ আদালতসকল স্থাপিত হইল তখন কোর্টের একটা ভাষা ঠিক করা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যক হইল। এই সময়ে কোন্ এক মহাপুরুষের মনে হইল যে উর্দুই উপযুক্ত অক্ষর — ক্রমে তাহাই প্রচলিত হইল। আমি যখন সিন্ধি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি তখন ভাষা শিখিতে যত না কষ্ট হউক্ তাহার লেখা অক্ষর লইয়া তাহার সহস্রগুণ গোলযোগ উপস্থিত হইত। উর্দু হাতের লেখা পড়িয়া উঠা সহজ নয় — দেবনাগরী হইলে কেমন সহজে লিখিতে পড়িতে শিখিতাম। সিন্ধি শিখিবার সময় এই অক্ষর প্রণেতার উপর কতবার আমার মনের ঝাল ঝাড়িয়াছি তাহার ঠিক নেই — মনে করিয়াছি — আঃ, এই আনাড়ীর হাতে না গিয়া যদি শর্মার হাতে সিন্ধি অক্ষর চালাইবার ভার থাকিত!

এখানে যত দেশ দেখিয়াছি তাহার মধ্যে সিন্ধুদেশ আমার চক্ষে বিশেষ নতুন ঠেকিয়াছিল। অন্যান্য স্থান হইতে উহার ভাবগতিক অনেক ভিন্ন। প্রথমতঃ বর্ষার অভাব। নদী, নালা, খালের জল হইতেই প্রায় সমস্ত কৃষিকার্য নির্বাহ হয়। ইন্দ্র বর্ষণ করেন না — পৃথিবীই স্বীয় নীর দিয়া তাহার অভাব পূরণ করেন। বৃষ্টি হয় না বলিয়া পাকা ঘরবাড়ি নির্মাণ করিবার আবশ্যক হয় না, যেমনতেমন খড় মাটির ঘর বাসযোগ্য করিয়া নিতে পারিলেই হইল। কালেভদ্রে যদি কখনও ইন্দ্রদেবের প্রসাদে বর্ষার আধিক্য হয় অমনি শুনা যায় শহরের অর্ধেক বাড়ি ভূমিসাৎ হইয়াছে। সিন্ধুদেশের আবহাওয়ায়, বিশেষতঃ উত্তর অঞ্চলে, শীতোষ্ণের আতিশয্য, যেমন ঠান্ডা তেমনি গরম। গ্রীষ্মকালে ছাতের উপর কিম্বা বাহিরে খোলা জায়গায় শয়ন করিলেও পাখার আবশ্যক হয় ও জলসিঞ্চন করিয়া বিছানায় প্রবেশ করিতে হয়। শীতকালে তেমনি বিপরীত — ঠান্ডা, ঘরের ভিতরে অগ্নিসেবন ব্যতীত চলে না। সিন্ধুদেশে প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য বিরল। ভাগ্যি সিন্ধুনদী আছে তাই রক্ষা, নতুবা ওদেশ মানুষের বাসযোগ্য হইত কিনা সন্দেহ। আমরা যখন হাইদ্রাবাদে ছিলাম তখন সিন্ধুনদী আমাদের একমাত্র বেড়াইবার স্থান ছিল। সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারে গিয়া বায়ুসেবন করা আমাদের নিত্য নিয়মিত কার্য ছিল। মরুভূমির মধ্যে যেন সেই একমাত্র আরামের স্থান বোধ হইত আর মধ্যে মধ্যে নদীর উপর নৌকা করিয়া বেড়ান যাইত। সিন্ধু নদীর ভাব অনেকটা গঙ্গার মত — গঙ্গানদীর ন্যায় প্রশস্ত। ইহা দেখিলে আমার দেশ মনে পড়িত, মনে হইত যেন গঙ্গার বুকের উপরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছি। সিন্ধু নদীতে পল্লা বলিয়া একরকম মাছ পাওয়া যায়, তাহা আমাদের ইলিস। জেলেরা কলসী ভাসাইয়া মজার রকমে এই মাছ ধরে। এ মৎস্য অতীব সুখাদ্য বলিয়া প্রখ্যাত। আমার একজন সিন্ধি চাকর ছিল তাহার কাছে এক গৎ শুনিতাম মনে আছে —

পল্লা মচ্ছী খানা
সিন্দ্ মুলুক ছোড়কে নহি যানা।

নদী ও খালের তটপ্রদেশ ভিন্ন অন্যত্রে গাছপালা প্রায় দেখা যায় না। চতুর্দিকে বালুময় ক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে। এই সকল স্থানে উটের উপর দিয়াই গতিবিধি ও এদেশে উট অনেক কাজে লাগে। জলের কল — তেলের ঘানি উট দিয়াই চালিত হয়। উটই মরুসাগরের জাহাজ। সমুদ্রের উপর যেমন জাহাজের দোলা খাইয়া আনাড়ী নাবিকযাত্রীর ওষ্ঠাগতপ্রাণ হয় তেমনি যাহার অনভ্যাস উষ্ট্র-বাহকের ঝাঁকানিতে তাহার রক্ত-দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। শিক্ষিত উট, ভাল মাহুত, অভ্যস্ত আরোহী এই তিন একত্র হইলে উটে চড়ায় আরাম আছে সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। এক বিষয়ে মরুভূমির উপযোগিতা তোমার সহজে মনে হইবে না। তাহা বলি শুন। বালির উপর সহজে পায়ের দাগ বসে — ইহা চোর ধরিবার এক উৎকৃষ্ট উপায়। আমি যখন শীকারপুরে কাজ করিতাম তখন গরুচুরি মকদ্দমা রাশি রাশি আমার কাছে আসিত। পশুহরণ সিন্ধিদের এক রোগ। এমন দিন নাই যে ঘোড়া, গরু, উট, মেষ, মহিষ প্রভৃতি লুঠের মকদ্দমা উপস্থিত না হইত। কিন্তু তাও বলি 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।' গ্রামে গ্রামে যে সব চৌকিদার আছে তাহাদের নাম 'পগী'। পদচিহ্ন দেখিয়া চোরামাল গ্রেপ্তার করা তাহাদের কাজ। মনে কর, কোন এক গ্রাম হইতে একটা উট চুরি গিয়াছে। অমনি সেই গ্রামের পগী অপহৃত উটের পদচিহ্ন ধরিয়া চোরের সন্ধানে বাহির হইল। সেই পদচিহ্ন যদি সে তাহার সমীপবর্তী গ্রামে দেখাইয়া দিতে পারে তাহা হইলেই তাহার দায়িত্ব হইতে সে খালাস। তারপর শেষোক্ত গ্রামের উপর জবাবদিহি পড়িল। এই গ্রামের লোকেরা পগী সঙ্গে করিয়া সেই চিহ্ন ধরিয়া বাহির হয় — এইরূপে চোরের আড্ডায় গিয়া চোরামাল ধরিতে পারিলে তাহাদের পরিশ্রম সার্থক। আশ্চর্য এই যে অনেক স্থলে এই উপায়ে চোরামাল ধরা পড়ে — পগীরা এ কাজে এমনি নিপুণ যে প্রায় তাহারা শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসে না। তাহাদের দক্ষতার প্রমাণ চোরামাল হস্তগত হওয়া — মাল ধরা না পড়িলে তাহাদের কথায় বিশ্বাস করা যায় না। অনেক সময় পদচিহ্ন দেখাইয়া তাহারা অন্য গ্রামের লোকেদের উপর অপরাধ চাপাইয়া আপনার দোষমুক্ত হইতে প্রয়াস পায়, কিন্তু বিজ্ঞ বিচারকের কাছে ওরূপ প্রযত্ন সফল হয় না।

শীকারপুরের নামে মনে পড়িল যে সিন্ধুদেশ শিকারের এক প্রশস্ত স্থান। স্থানে-স্থানে যে বনজঙ্গল আছে সেখানে হরিণ, বরাহ, নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি বনজন্তু পাওয়া যায়। কোন কোন জলাভূমিতে নানা পক্ষী পাখালীও দৃষ্টিগোচর হয়। আমি মাঝে মাঝে শিকারে বাহির হইতাম কিন্তু বড় বাঘ কখনও দেখি নাই — একবার আমার সামনে একটা হায়েনা আসিয়াছিল। সিন্ধিরা সকল রকম বাঘকেই 'সিংহ' বলে। কিন্তু আসল পশুরাজ সিংহ এ সকল বনে দৃষ্ট হয় না। আমাদের দেশের কেঁদো বাঘ Royal Tiger এখানে আছে কিনা সন্দেহ। এই সকল শিকার করিতে গেলে অনেক কুলি সংগ্রহ করিতে হয়। শিকারীগণ বন্দুক-

হস্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া বসেন, কুলিরা একচক্র বাঁধিয়া হাঁকাহাকি ডাকাডাকি আরম্ভ করে। সেই চীৎকার ধ্বনিতে যত জীবজন্তু শস্ত্রধারী শিকারীদের দিকে ধাবিত হয় — এই অবসরে যার যেমন সুবিধা বন্দুক ছুড়িয়া শীকার আদায় করিতে হয়। যে বনে ব্যাঘ্র সঞ্চরণ করে, সেখানে হয় কোন বৃক্ষের উপর কিম্বা উচ্চ মঞ্চের উপর বসিয়া বাঘমামাকে প্রতীক্ষা করিতে হয়। সিন্ধিরা অত্যন্ত শিকারপ্রিয়, শীকারপুরে থাকিতে মধ্যেমধ্যে প্রায়ই আমার শিকারের সঙ্গী জুটিত। একবার আমরা দলবলে মঞ্চর নামে একটা বৃহৎ সরোবরে শিকার করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে বুনো হাঁস প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী পাওয়া যাইত। আমরা এক একবার বোটের উপর হইতে শিকার করিতাম। মঞ্চরে একজন বৃদ্ধ সিন্ধী আমাদের যথোচিত আতিথ্য করিয়াছিল — আমরা বেশ আমোদে ছিলাম। একবার মনে আছে আমরা একটা জায়গায় চখাচখীর ঝাঁকের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। সংস্কৃত কাব্যে চখাচখীর কথা পড়িয়া তাহাদের সঙ্গে এমন সখ্যবন্ধন হইয়া গিয়াছে যে গুলি ছুড়িতে হাত উঠিল না। সে বেচারীদের মধ্যে গুলি চালাইতে গিয়া 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং' আকাশবাণী আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া আমার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিল। সে যাহা হউক, আমার ভারী দেখিতে ইচ্ছা করে চখা-চখীর বিচ্ছেদ বর্ণনা কতদূর সত্য। তাহা বাস্তবিক ঘটনা অথবা আমাদের সংস্কৃত কবিদের কল্পনা মাত্র। সত্যই কি বিধাতার এমনই কঠোর নির্বন্ধ যে সন্ধ্যা হইলেই চখা-চখী বিযুক্ত হইবে — চখা যদি এপারে থাকে চখী ওপারে গিয়া বসিবে। চখা বলে— 'চখী মই আঁউ', চখী উত্তর দেয় 'নহী নহী চখা'। আবার চখী বলে 'চখা মই আঁউ', চখা উত্তর দেয়, 'নহী নহী চখী'। এই রূপে কি সমস্ত রাত্রি গত হয়?

আমি কি করিতেছি— শিকার হইতে কবিতায় গিয়া পড়িলাম। আবার পক্ষ সংযত করিয়া নিম্নদেশে অবতরণ করা যাক। ইংরাজেরা সিন্ধুদেশ অধিকার করিবার পূর্বে তাহা আমীরদের রাজ্য ছিল। আমীরেরা বড়ই শিকারভক্ত ছিল। তাহাদের হাতে রাজ্য থাকিলে এতদিন সিন্ধুর সমস্ত প্রদেশ 'শিকার গাঁয়ে' পরিণত হইত। কথিত আছে তাহাদের এমন কঠোর শাসন ছিল যে রক্ষিত বনের কেহ একটা বরাহ বধ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। এখন আর সেকাল নাই। এই আমীরদের রাজ্যের খয়েরপুর এখন অবশিষ্ট আছে — আলি মোরাদ তাহার রাজা। তদ্ব্যতীত আমীরদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এক্ষণে কেহ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টে কাজ করিতেছেন কেহ বা পেন্সন ভোগ করিতেছেন। একজন মীর সাহেব আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কখনও কখনও শিকারে যাইতাম। তিনি শিকারে বিলক্ষণ মজবুত — উড়ন্ত পক্ষী তাঁহার গুলি খাইয়া পড়িত। এই মীর একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। একটা খুনী মকদ্দমাতে তিনি একবার এক কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিলেন। মকদ্দমা সেশনে কমিট হইলে যেসকল জিনিস প্রমাণস্বরূপ নথির সঙ্গে পাঠাইতে হয় — যাহাদের এদেশের চলিত ভাষায় 'মুদ্দামাল' বলে, তাহার মধ্যে বুদ্ধিমান ম্যাজিস্ট্রেট মৃত ব্যক্তির মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া সেশন কোর্টে কাটা-মুণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া সেশন-জজ ক্রোধান্ধ হইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের

বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন। এই অতি বুদ্ধির কাজ করিযা বেচারী মীরসাহেব ভারি বিপদে পড়িয়াছিলেন।

সিন্ধুবাসী অধিকাংশ মুসলমান। এসব দেশে যেমন হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান ওদেশে তেমনি মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু। হিন্দুদের আচার ব্যবহার অনেকটা মুসলমানী ধরনে গঠিত। তাহারা আমিষ-ভক্ষণ ও সুরাপানে পরাঙ্মুখ নহে। 'আমিল' নামে হিন্দুদের প্রধান জাতি কায়স্থ — তাহাদের বেশভূষা ও শ্মশ্রুজাল মুখশ্রীতে মুসলমানদের সঙ্গে প্রভেদ বুঝা দুষ্কর। প্রথমে যখন সিন্ধু-হাইদ্রাবাদে আমার কর্ম হয় তখন হিন্দুদের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি আমাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। আমরা একসঙ্গে এক মেঝেয় বসিয়া পানভোজন করি — তাহাতে আমার কিন্তু আশ্চর্য বোধ হইল। কেন না হিন্দুদের ওরূপ জাতেজাতে মেলা-মেশা সচরাচর দেখা যায় না। শেষে উহার কারণ বুঝিতে পারিলাম। হাইদ্রাবাদে এক ব্রাহ্ম-সমাজ আছে। ন-রায় একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম ও সমাজের এক প্রধান নেতা। তাঁহার যত্নে কতকজন সাহসী যুবা দলবদ্ধ হইয়া হিন্দু সমাজের বিপক্ষে খড়গ-হস্ত হইয়াছেন। মাঝে মাঝে দুই দলে গোলযোগ উপস্থিত হয়। যাঁহারা সাহস করিয়া আমার সঙ্গে একাসনে আহার করিয়াছিলেন তাঁহারা যে সামাজিক শাসন হইতে একেবারে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন তাহা নহে। শুনিলাম তাহার জন্য তাঁহাদের নাকি শেষে অনেক জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

মুসলমানদের রাজত্ব যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানেই অবরোধ প্রথার কড়াক্কড় নিয়ম দৃষ্ট হয়। সিন্ধুদেশে তাহাই দেখিলাম। স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরেই রুদ্ধ — সূর্য চন্দ্রও তাহাদের রূপ দেখিতে পায় না। চন্দ্রের কথা ঠিক হইল কিনা জানি না কিন্তু ইহা সত্য যে অন্তঃপুরে সূর্যদেবের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমি কতমাস ওদেশে ছিলাম, কোন ভদ্র সিন্ধি মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই। ন-রায় মহাশয় ঘন ঘন আমাদের কাছে আসিতেন — আমার সঙ্গে একত্রে বসিয়া আহারাদি করিতেন কিন্তু তাঁহার পরিবারের মধ্যে কখনও আমাদিগকে আমন্ত্রণ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে হইল। মহাত্মা মিস কার্পেন্টার যখন দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন আমরা সিন্ধুদেশেই ছিলাম। তিনি হাইদ্রাবাদে আমাদের বাটীতে কতকদিন বাস করিয়াছিলেন। সিন্ধিরা তাঁহার আতিথ্য সৎকারের জন্য অনেক করিয়াছিল। স্কুলের ছাত্রেরা মিলিয়া এক নাটক অভিনয় করিল, তাহাতে এক কবিতা পঠিত হয় — তার ধুয়া মিস মেরি কার্পেন্টার — তাহা যেন এখনো আমার কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে। মিস কার্পেন্টারের উপর সিন্ধিদের এমন ভক্তি, এত আদর, এত যত্ন যে ন-রায় মহাশয় তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনার স্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। ইহাতে তাঁহার সদ্ভাবের বিলক্ষণ পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। যে অন্তঃপুর এমন আটেঘাটে বদ্ধ যে আমার স্ত্রীও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাহার মধ্যে একজন ইংরাজ মহিলাকে ডাকিয়া অভ্যর্থনা করা সামান্য সাহসের কর্ম নহে। আজ তবে এইখানে শেষ করি, আর এক সময় শহরের বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সামাজিক

দ্বিতীয় পত্র

সিন্ধুদেশ আর বাঙ্গলাদেশ কি তফাত। বাঙ্গলার হাস্যময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে বাস করা যাহাদের অভ্যাস তাহাদের কাছে সিন্ধু কি নীরস কি শুষ্ক — যে দিকে চাও বালুময় ক্ষেত্র, চক্ষের আরাম আদবে নাই। কিন্তু মরুভূমির মধ্যেও সুভদ্র হরিতক্ষেত্র নেত্রগোচর হয়। সিন্ধুদেশেও স্থানে স্থানে ভূমি উর্বরা ও শস্যশালিনী। শীকারপুরের জমি রাসালো মন্দ নয়। এই মরুভূমিতে যে এত বড় বড় গাছ — ফলের গাছ, ছায়াতরু জন্মিতে পারে তা সহজে বিশ্বাস হয় না। এ সকল বৃক্ষের বয়স অধিক নয়, কুড়ি বৎসরের মধ্যে কর্তৃপুরুষদের যত্নে এই ষ্টেশন গাছে গাছে ভরিয়া গিয়াছে। আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম তার কমপৌণ্ডের বাগানে আম খেজুর ও অন্যান্য ফল ফুলের গাছ ছিল। আঙ্গুর পর্য্যন্ত জন্মিত। দ্রাক্ষালতার জন্য চাল বাঁধিয়া দিতে হয়, আমরা তাহার নীচে চলিয়া বেড়াইতাম। দুঃখের বিষয় যে তাহার ফল ভক্ষণ করিতে পারিলাম না, আঙ্গুর পাকিবার আগেই আমার অন্যত্রে বদলি হইল। অনেক সময় এইরূপ হয়, এক জায়গায় জিনিসপত্র কিনিয়া ঘরকন্না গুছাইয়া বসিয়া নিয়াছি এমন সময় বদলির হুকুম; অমনি তল্পিতল্পা বাঁধিয়া দূরে যাইতে হইল। সার্বিসের প্রারম্ভে এইরূপ অস্থির পঞ্চমে অনেক ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কলেক্টর কি জিলাজজ কি এরূপ একজন swell হইয়া দাঁড়াইলে আর কোন ভয় নাই, তখন একস্থানে স্থির হইয়া বসা যায়। কোন কোন জজ কিম্বা কলেক্টর এইরকম একটা জায়গা দখল করিয়া ঘরবাড়ী ফাঁদিয়া বসেন আর সেখান হইতে নড়িতে চান না। তাই বলিয়া, সিন্ধুদেশ ছাড়িতে আমার যে বড় কষ্ট হইয়াছিল তা নয়। ঐ সৃষ্টিছাড়া বিজন গহনে বাস করা নির্বাসন বলিলেই হইল, সিন্ধু হইতে গুজরাটে গিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমরা যখন প্রথমে সিন্ধুদেশে যাই তখন বোম্বাই হইতে পথে ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া স্টীমারে করিয়া করাচী-বন্দরে উপস্থিত হই, সিন্ধু ছাড়িয়া যাইবার সময় রেলগাড়ী করিয়া উত্তর-পূর্ব মুখে চলিলাম। মুলতান লাহোর হইয়া আম্বালা ষ্টেশন পর্য্যন্ত গেলাম, তথা হইতে কতক ডাকের গাড়ী, কতক ঝাঁপানে করিয়া সিমলার পাহাড়ে চড়া গেল। সিমলা কি চমৎকার জায়গা, তার আবহাওয়া কি চমৎকার! কিন্তু যাহা দেখিবার আশা ছিল তাহা হইল না। কাল্পনিক সিমলা ও বাস্তবিক সিমলার অনেক তফাত। সিমলা হইতে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত পর্বত শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই দেবতাত্মা হিমালয়—

পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ

কল্পনায় যাহা মুদ্রিত আছে তাহার অনুরূপ ঠিক দেখিলাম না। বাড়ী ঘরদুয়ার, — মানুষের কারিগরিতে তাহার দেবত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে। সিমলায় ৩/৪ দিনের অধিক থাকিতে পারি নাই

— আর বেশী সময় ছিল না। মনে কর আমি যেখানে সপরিবারে গিয়াছি — পরিবার রাখিয়া নিজস্থানে একাকী গমন করিতে হইবে। হাতে ঐ সময় — উহার মধ্যে বাড়ী ঠিক করা — দুইটি স্কুল ঠিক করা — একটা ছেলেদের স্কুল একটা বালিকা বিদ্যালয় — সব গুছাইয়া দিয়া যাইতে হইবে — ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ পাহাড়ের শোভা দর্শন করিবার আমার কত অল্প অবসর ছিল। তাড়াতাড়ি করিয়া দিল্লীতে দুই একদিন থাকিয়া মোগল সম্রাটদের কীর্তিকলাপ যত পারিলাম দেখিয়া লইলাম, পরে রাজপুতানা লাইন দিয়া আমার গম্যস্থানে উপনীত হইলাম।

সিন্ধী কুলকামিনীদের কথায় মনে করিও না যে বোম্বায়ের সর্বত্রই এই দুর্বিষহ অবরোধ প্রথা প্রচলিত। যে ভাগে মুসলমান আধিপত্য প্রবল অথবা মুসলমান আদর্শে সমাজ গঠিত সেই সকল প্রদেশে এ প্রথা বদ্ধমূল। যেখানে হিন্দুরা আপনার স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিতে পারিয়াছে সেখানে অপেক্ষাকৃত স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ হয়। সে স্বাধীনতার দৌড় যে বড় বেশী তা নয়। ইংরাজ সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যেরূপ মেশামেশি তাহা তত দূর যায় না, আবার আগন্তুক দেখিয়া কুলস্ত্রী ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইবে, — তেমন সঙ্কোচভাবও দৃষ্ট হয না। পরপুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের কথা কওয়া দূষ্য নহে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলেও গৃহিণী অন্ন পরিবেশন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। পারসী স্ত্রীদের স্বাধীনতা ইহা অপেক্ষাও একমাত্রা অধিক — তাহার কারণ তাহারা ইউরোপীয় সমাজের আদর্শ গ্রহণ করিতে সমধিক তৎপর। বিজাতীয় রীতিনীতি গ্রহণ কবিতে তাহাদের বিশেষ কোন বাধা নাই। প্রথমত ভারতবাসীদের নিকট তাহাবা নিজেই বিদেশী। তাহারা কয়েকশত বৎসর মাত্র এ দেশে আসিয়া বাস করিতেছে। এখানকার কোন জাতির সঙ্গে তাহারা বিবাহসূত্রে মিলিত হয় নাই। এদেশের উপর তাহাদের ততটা মমতা প্রত্যাশা করা যায় না। অতীতের বল তাহাদের উপর তত আক্রোশ করে নাই, দেশাচারের অভেদ্য শৃঙ্খল-বন্ধন তাহাদের উপর নাই। আর এক কথা তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নাই সুতরাং ভিন্ন জাতিদের সঙ্গে মেলামেশা তাহাদের পক্ষে সহজ। সাগর পার হইয়া ইংলন্ড যাইতে হইলে জাতি যাইবার ভয়রূপ কোন দৈত্য আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়ায় না। আশ্চর্য এই, পারসীদের এই ক্ষুদ্র দল, ভারতবাসীদের মধ্যে এক বিন্দু বলিলেই হয়, আর জাতিভেদের নিয়ম বহির্ভূত হইয়াও তাহারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে, বিবাহবন্ধনে অন্য কোন জাতির সঙ্গে মিশাইয়া যায় নাই। সে যাহা হউক, হিন্দু সমাজের তুলনায় তাহাদের সমাজ পরিবর্তনও উন্নতিশীল বলিতে হইবে। আচারব্যবহার বিষয়ে ইংরাজ অনুকরণে পারসীরা বিলক্ষণ মজবুত। পারসীরা যখন প্রথমে ভারতবর্ষে আসে তখন তাহারা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির মনোরাগ করিয়া চলিতে বাধ্য হয়। তাহাদের চালচলন দেশীয় অনুকরণে ক্রমে অনেক পরিবর্ত হইল। হিন্দুদের অনুরোধে গোমাংস বর্জন করিতে হইল। মুসলমানদের যাহা 'হারাম' তাহাও তাহাদের বর্জনীয়। তাহাদের পরিচ্ছদেও তেমনি বদল — পুরুষদের পাগড়ী, স্ত্রীদের শাড়া অনেকটা

গুজরাটী ধরনের অনুকরণ। পারসীদের কথা (motto) এই, যখন যেমন তখন তেমন। ইংরাজ রাজ্য হইয়া অবধি তাহাদের সামাজিক নিয়ম ক্রমে ইউরোপীয় ধরনে গঠিত হইতে দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে। প্রথমে বোম্বাই আসিয়া আমার চক্ষে যাহা নতুন ঠেকে তাহা স্ত্রী-স্বাধীনতা। এই বিষয়ে কলিকাতা ও বোম্বাই মধ্যে ভয়ানক প্রভেদ। কলিকাতার ভদ্র স্ত্রীগণ সকলেই অন্তঃপুরে রুদ্ধ, বাহিরে কোথাও একটি কুলস্ত্রীর মুখ দেখিবার যো নাই। বোম্বায়ে পথেঘাটে যেখানে যাও ভদ্রমহিলা চোখের সামনে পড়ে। গবর্নমেন্ট হৌসের অভ্যাগতের মধ্যে — বিদ্যালয়ের ছাত্র-পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে সমবেত জনতাসমূহে দেশীয় স্ত্রীপুরুষ সম্মিলিত দেখিবে। বাগান, বন্দর, ব্যান্ড বাজিবার স্থান প্রভৃতি নগরের প্রকাশ্য স্থানে সন্ধ্যাবায়ু সেবনের জন্য দেশী ও ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ একত্রিত হয়, হিন্দু ও পারসী মহিলারা চিত্রবিচিত্র শাড়ীতে সজ্জিত হইয়া সেই সকল স্থানের শোভা সম্পাদন করে।

বলিতে কি, অন্তঃপুরপ্রথা আমার নিতান্ত অনিষ্টকারী কুপ্রথা বলিয়া মনে হয়, তাহাতে অবলাদের নিজের সুখ-স্বাস্থ্যের হানি, সামাজিক হানি। সমাজের অর্ধাঙ্গ অবরুদ্ধ ও বিকল হইলে অপরার্ধ কিরূপে সুশিক্ষিত, সুস্থ, সবল হইবে বল? সেদিন পুণার বালিকা বিদ্যালয়ের ইট-পত্তন কালে বম্বের গভর্নর স্যর জেম্স — তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এ সম্বন্ধে বেশ দু এক কথা বলিয়াছেন — অনুবাদ না করিয়া নীচে তাহা তুলিয়া দিলাম।* যদি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের অবস্থা উন্নতি করিতে চাও তবে আপাতত বোম্বায়ের আদর্শ গ্রহণ করিতে পার। আমাদের অনেকের ভয় হয় স্ত্রীলোকেরা বাহিরে গেলে তাহাদের কোন বিপদ ঘটিতে পারে। আমাদের দেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে আমার এই বিষয়ে কথা হয়। তিনি বলেন, "আমাদের পুরুষেরাই আপনারা আপনাদের রক্ষা করিতে অপারক, ঘরের মেয়েকে কি করিয়া বাহিরে লইয়া যাইবে, যদি কেহ তাহাকে অপমান করে কিরূপে রক্ষা করিবে।" তাহার উত্তর — এ ভয় কেবল কল্পনা মাত্র, ফলে ওরূপ ঘটনা অতি বিরল। এ মুসলমান রাজ্য নয় যে অত্যাচারভয়ে কুলকামিনীদিগের গৃহরুদ্ধ রাখা আবশ্যক, ইহা ইংরাজরাজ্য, স্ত্রীলোকের সম্মাননা যাহার প্রধান ধর্ম। ওরূপ আশঙ্কা যে অমূলক তাহা আমার নিজের দৃষ্টান্ত হইতেই দেখিতেছি। প্রথমে যখন আমি বোম্বায়ে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া আনি তখন আমাকে কত লোকে কত প্রকার বিভীষিকা দেখাইয়াছিল, কিন্তু কাজে দেখিতেছি সে-সকল কিছুই নয়। আমরা স্বামীস্ত্রীতে প্রকাশ্যভাবে এতদিন বিদেশে ঘুরিলাম, কই আমাদের ভাগ্যে তো কখনও কোন বিপদ ঘটে

But the custom of secluding your women is not sanctioned by antiquity and it is a custom which not only degrades them, but reduces them to object slavery. You cannot degrade your wives and the mothers of your children from their rightful position in this life without degrading your race to a slavery, that is sure to act injuriously on yourselves.

নাই। কেবল আমার উপদেশ এই যে, বাহিরে যাইতে হইলে রীতিমত ভদ্রবেশ পরিয়া যাওয়া আবশ্যক। 'জেনানা' পক্ষপাতীর প্রতি আমার আর একটি কথা বলিবার আছে। যদি বল আমরা আত্মরক্ষায় অক্ষম তবে নিদানপক্ষে আমাদের কি তাহা শিক্ষা করা উচিত নহে। ইহা কি দেখিতেছ না যে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসাদে আমাদের সে শিক্ষা লাভ হইতে পারে? এ জাতীয় কলঙ্ক দূর হইতে পারে? ভারতমহিলা বল, বিদ্যা ও স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিলে তাহার আভা পুরুষসমাজে প্রতিফিলিত হইবে ইহা তো ধরা কথা — ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এ দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। শুদ্ধ তাহা নহে। আর একদিক দিয়া দেখ, স্ত্রী রক্ষণের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমাদের বল ও সাহস দায়ে পড়িয়া বৃদ্ধি হইবে কিনা? আমরা নিজে অনেক সময় অকাতরে অত্যাচার সহ্য করিয়া যাই — কেহ এক গালে চড় মারিলে আর একগাল তাহাকে ফিরাইয়া দিই, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি অপমান সহ্য করে এমন কাপুরুষ অতি অল্প। স্ত্রীকে কোন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইলে যে দুর্বল সেও সবল হয় — ভীরুও অভয় হয়। অবলাকে অন্তঃপুররুদ্ধ নিতান্ত 'অবলা' করিয়া রাখিলে কখনই আমাদের জাতীয় ভীরুতা দূর হইবে না।

এদেশের হিন্দুদের আচারব্যবহার বর্ণনা করিতে গেলে সর্বাগ্রে জাতিভেদ প্রথার উল্লেখ করিতে হয়। আমি যতদূব দেখিতে পাই এখানে জাতিভেদের নিয়ম কিছু কড়াকড়। এই হেতু এদেশে হিন্দুদের মধ্যে ইউরোপ-যাত্রীর দল অতি অল্প, কেহ সাহস করিয়া সাগর পার হইলে শেষে জাত লইয়া তাহাকে মহা বিব্রত হইতে হয়। আমাদের দেশে হিন্দু-সমাজের ওদিকে অত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নাই — ইংলন্ড ফেরতা বাঙ্গালী তাহার জাতির মধ্যে সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু কোন গুজরাটি কি মহারাট্টা-হিন্দু বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলে জাতে উঠিবার জন্য মহা হাঙ্গাম বাধিয়া যায় — একটা প্রকাশ্য প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হয়। সেদিন এইরূপ একটা ঘটনা হইয়া গিয়াছে, পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার নাম অবশ্য শুনিয়াছ। তিনি প্রফেসর মনিয়র উইলিয়ম্‌সের সহিত বিলাত যাত্রা করিয়া অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি সংস্কৃতে একজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু যখন এদেশ হইতে যান তখন লাতিন গ্রীকের ক-অক্ষর জানিতেন না। অথচ অল্পকালর মধ্যে ঐ দুই কঠিন ভাবাব প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যে ইংলন্ডে বিশেব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে যে oriental congress বসিয়াছিল তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরিত হন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি আইন শিক্ষা করেন ও ব্যারিষ্টর হইয়া সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেশে আসিয়াই তিনি রতলমের দেওয়ানের পদ পাইয়াছেন — ইহাতে তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই আহ্লাদিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যাহার জন্য পণ্ডিতবরের কথা পাড়িলাম তাহা এই, তিনি একটা ভীরুতার কার্য করিয়া অনেককে নিরুৎসাহ করিয়াছেন।

তাঁহার জাতির লোকের অনুরোধে তিনি নাসিকে গিয়া শিরোমুণ্ডন ও পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। পবিত্র গোদাবরীতে স্নান করিয়া ইউরোপ প্রবাসের পাপ প্রক্ষালন করিয়াছেন। ইহাতে নানাদিক্ হইতে নানান্ কথা উঠিয়াছে। তিনি যে এতদূর অবনতি স্বীকার করিবেন তাহা আমাদের মনে হয় নাই, দুই বৎসর পূর্বে তিনি ভারত প্রত্যাগত হইয়া আপনার সহধর্মিণীকে বিলাতে লইয়া যান তাহাতে বোধ হইল জাতিভয়ে তিনি বিচলিত হইবার পাত্র নন। এক্ষণে দেখা গেল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। জাতভায়াদের কঠোর শাসনে নতশির হন না এমন সাহসী হিন্দু-যুবা এদেশে কেহ আছে কিনা সন্দেহ। এখানে যখন একজন গুজরাতী ব্রাহ্মণ এদেশ হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জাতিবর্গের মধ্যে মহা হুলুস্থুল বাধিয়া যায়। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও শেষে তিনি পার পাইলেন না। তাঁর জাতি দুই দলে বিভক্ত হইল, একদল তাঁহার পক্ষ, একদল বিপক্ষ। কিন্তু এ অনেক দিনের কথা। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, ২০, ২৫ বৎসরের মধ্যে কি এ সম্বন্ধে কিছুই উন্নতি হয় নাই? এখনো কি জাতির এমন কঠোর শাসন যে তাহার ভয়ে আপনার মত ও বিশ্বাস জলাঞ্জলি দিতে হইবে? কোন হিন্দুর কি এতটুকু সাহস নাই যে আপনি যাহা সত্য বলিয়া জানেন, যাহা কর্তব্য জ্ঞান করেন, তাহা অকুতোভয়ে অবলম্বন করিতে পারেন—আপনার আন্তরিক বিশ্বাস অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারেন? বহুরূপীর মত একবার ইউরোপীয় সভ্যতার সং সাজিয়া নৃত্য করা আবার তাহা পাপ বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া এই কি সত্যনিষ্ঠ সাহসী পুরুষের কার্য।

জাতিভেদের ন্যায় বাল্যবিবাহ আর চিরবৈধব্য প্রথা হিন্দু সমাজের কলঙ্কস্বরূপ নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু চির-বৈধব্য প্রথা যে এখনকার সমস্ত হিন্দু-জাতির মধ্যে প্রচলিত তাহা নহে। এমন অনেক জাতি আছে যাহার মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণদের দৃষ্টান্তে যাহার চলন সেইসকল জাতির মধ্যেই এই প্রথা দৃষ্ট হয়। এই প্রথার আনুষঙ্গিক এক ভয়ানক কুৎসিত নিয়ম আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে — সে কিনা বিধবার মস্তক মুণ্ডন। আমাদের বিধবাদের অনেকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয় — উপবাস, একসন্ধ্যা আহার, অলঙ্কার পরিহার, কিন্তু ভাগ্যক্রমে শিরোমুণ্ডন-প্রথা তাহার উপর নাই। এদেশীয় বিধবাদিগের সেসব তো আছেই তাহার উপর এ অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। ভবিষ্যতে বিধবা-স্ত্রীর যেসকল জ্বালা যন্ত্রণা অদৃষ্টে আছে পতিবিয়োগের পরক্ষণেই নাপিতের হাতে কেশচ্ছেদন তাহার পূর্বাভাস। স্ত্রীলোকের পক্ষে এ যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা তাহা আমরা সহজে কল্পনা করিতে পারি না। আমার বিবেচনায় এ অপেক্ষা সহমরণ অনেকগুণে ভাল ছিল, মুহূর্তের মধ্যে সতীর সকল কষ্টের অবসান হইত। শিরোমুণ্ডন কিম্বা মুণ্ডচ্ছেদন যদি কোন রমণীর এ দুয়ের একটি বাছিয়া লইতে হয় তাহা হইলে বোধ করি সে বেচারী শেষোক্ত দণ্ডই ঘাড় পাতিয়া লয়। স্ত্রীলোকের যা অমূল্য আভরণ — যে 'রূপের নিগড় কি অমরে কিবা নরে না বাঁধে কাহারে' — সেইটি হরণ করিতে পারিলেই নির্ভীক হওয়া গেল — আর

তাহার রূপলাবণ্যের কোন গৌরব রহিল না — তাহার সতীত্বের প্রতি আঘাতে কোন শঙ্কা রহিল না এই উদ্দেশ্যেই এই নিষ্ঠুর নিয়ম সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। আশ্চর্য এই যে, যেসকল জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ চলিয়া আসিতেছে তাহারাও ব্রাহ্মণদের দেখাদেখি ঐ কঠোর রীতি অবলম্বন করিতে প্রস্তুত। কুদৃষ্টান্তের এমনি বল। সে দিন দেখিলাম আমার এক কায়স্থ বন্ধু, রায়বাহাদুর, আপনার পরিবারস্থ এক তরুণবয়স্কা বিধবা কন্যার শিরোমুণ্ডন স্বচ্ছন্দে অনুমোদন করিলেন। স্বচ্ছন্দে বলাটা ঠিক হইল না — জাতির অনুরোধে বলা উচিত, কিন্তু তিনি একজন শিক্ষিত নব্যদলের লোক হইয়া এরূপ স্থলে এ অনুরোধ এড়াইতে না পারিলেন তো আর কি হইল? সমাজ সংস্কার-আশা আর কোথায় রহিল?

বাল্যবিবাহ আর এক বিষম রীতি। শুধু বঙ্গদেশে নয় ভারতের সর্বত্রই ইহার গরলময় ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। কন্যাকে অত ছোট বয়সে পিতামাতা গৃহ হইতে বিদায় করিয়া যে কি স্বর্গ-সুখ লাভ করেন তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা, তাহার স্বাধীন বৃত্তি উপার্জনের উপায় করিয়া দেওয়া — এসকল গুরুতর কর্তব্য ছাড়িয়া দিয়া সর্বাগ্রে তাঁহার বিবাহ দিতেই গুরুজনেরা ব্যস্ত। এদেশে বালকবালিকার বিবাহ পুতুলে পুতুলে বিয়ের মতন। একজন গাইকওয়াড় ছিলেন তিনি পায়রার বিয়ে দিতে বড় ভালবাসিতেন — তাঁহার সভাসজ্জন নিমন্ত্রণ করিয়া খুব ধুমধামে কপোত কপোতীর বিবাহোৎসব অনুষ্ঠান করিতেন — এইসব বালক বালিকার বিবাহ অনেকটা সেইরূপ। এদেশে দশ বারো বৎসরের বালক ও সাত আট বৎসরের বালিকাকে সচরাচর উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে দেখা যায়। এইরূপ বাল্যবিবাহ হইতে হিন্দু সমাজের যে কত অনর্থোৎপত্তি হইতেছে বলা যায় না। আমি বলিতেছি না যে আমাদের দেশে বাল্যবিবাহের উপযোগিতা আদপে নাই — কিন্তু দেখিতে গেলে অনর্থের ভাগই অধিক তাহার কোন সন্দেহ নাই। বালিকা প্রসূতি, স্কুলের ছাঁত্রের উপর বৃহৎ পরিবার পোষণের ভার, নির্বীজ রুগ্ণ সন্তানসন্ততি, শিক্ষার ব্যাঘাত, দারিদ্র্য, অকালজন্ম, অকালমরণ, অকালপক্কতা, অকাল জীর্ণদশা, এই সকল অনিষ্ট কাহারও চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবার আবশ্যক করে না, তাহা আমাদের সমাজে জাজ্বল্যমান প্রকাশিত রহিয়াছে। কেহ বলিতে পারেন যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষের শরীর মনের শক্তিসকল অকালে পরিপক্ক হয় এই জন্য তরুণ বয়সে বিবাহ দেওয়াই আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার তো একটা সীমা প্রকৃতিতে নির্দিষ্ট আছে, দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকারা কখনও বিবাহের উপযুক্ত হইতে পারে না। চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতেছি যে অমুক বয়সের পূর্বে আমাদের শরীরের পূর্ণতা লাভ হয় না সেই পূর্ণ বয়সের পূর্বেই বিবাহ দেওয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অনিষ্টকারী — সে বিবাহের ফল অমঙ্গল এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

এক্ষণে কথা হইতেছে এ রোগের ঔষধি কি? এ সকল অনিষ্ট নিবারণের উপায় কি? মালাবারি নামক প্রসিদ্ধ পারসী লেখক বাল্যবিবাহ ও বলাৎকার বৈধব্য বিষয়ে এক প্যামফ্লেট

লিখিয়াছেন, তাহা লইয়া সংবাদপত্রে অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। এখন প্রশ্ন এই যে বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্য কোন আইন করা বিধেয় কি না? অনেকে ইহার বিপক্ষে মত দিবেন সন্দেহ নাই, তাঁহারা বলিবেন দেশাচার সংশোধনের জন্য গবর্নমেন্টের শরণাপন্ন হওয়া অন্যায়। কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহার পক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে। সমাজের সুখশান্তিরক্ষণ, অনিষ্ট নিবারণ এই উদ্দেশ্যেই আইন প্রবর্তিত হয় — তাহাতে কখনও যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খর্বতা হয় তাহার উপায়ান্তর নাই। এই স্বাধীনতাটুকু হরণ করা সমাজের উপকারের জন্যই অনেক সময় আবশ্যক হয়। আমাদের দেশের অনেক সামাজিক কুরীতির উপর আইনের হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে নহিলে তাহার উচ্ছেদসাধন কঠিন হইত। ভ্রূণহত্যা—নরবলি—সহমরণ প্রভৃতি এদেশের চিরন্তন প্রথাসকল আইন দ্বারা নিবারিত হইয়াছে, তবে এটা হয় না কেন? যেসকল বিষয়ে অপ্রাপ্তবয়স্কদিগের হিতাহিত নির্ভর করে অনেক সময় আইন তাহার উপর হস্তপ্রসারণ করে। যে রীতি অনুসারে বালক বালিকা চিরকালের জন্য অকাট্য বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে, যাহার উপর তাহাদের চিরজীবনের সুখদুঃখ নির্ভর, তাহাতে রাজার নিয়ম হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না এমন কখনই হইতে পারে না। আইন দ্বারা বিবাহের একটা বয়স নির্দিষ্ট হওয়া কি ভাল নয়। পুরুষের ধর ১৮ বৎসর, মেয়েদের ১৫ বৎসরের নীচে বিবাহ নিষেধ এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া কি নিতান্ত অন্যায়? কেহ বলিতে পারেন এরূপ করিতে গেলে ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। কিন্তু আমাদের কোন্ শাস্ত্র বাল্যবিবাহ অনুমোদন করে? পুরাতন আর্যদিগেব যে চতুরাশ্রমের নিয়ম ছিল — ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য — তাহা কি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। অধ্যয়নের বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া কখনও সংসারের ভার গ্রহণ করিবার রীতি ছিল না। মেয়েদের অধিক বয়সে বিবাহ দিবার যে সামাজিক প্রতিবন্ধক আছে পুরুষের সম্বন্ধে তাহা কিছুই নাই। অতএব নিদান পুরুষের বিবাহের একটা বয়স সহজে ঠিক করা যাইতে পারে — মেয়েদের বয়স পরে আপনা হইতেই নিয়মিত হইবে। মালাবারি মহশয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে ইউনিভার্সিটি হইতে অবিবাহিত ছাত্রদের অনুকূলে কোন বিশেষ নিয়ম প্রচারিত হউক। তিনি আরো বলেন, যাঁহাদের হাতে চাকরি বিতরণের ক্ষমতা আছে তাঁহারা অবিবাহিত কর্মপ্রার্থীদিগকে বাছিয়া লইতে উদ্যত হউন্ তাহা হইলে ক্রমে বিবাহ করিবার নেশা ছুটিয়া যাইবে। এ সকল প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। বিদ্যার চাবি, ধনের চাবি অবিবাহিতের হাতে — লক্ষ্মী, সরস্বতীর প্রসাদ আইবড়র প্রতিই মুক্তহস্তে বিতরিত হইবে আর বিদ্যার দ্বার বিবাহিত পুরুষের প্রতি রুদ্ধ হইবে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ভারাক্রান্ত পুরুষ কর্মের অভাবে শুকাইয়া মরিবে এ নিয়ম নিতান্ত অন্যায়। সে যাহা হউক আমাদের সমাজ সংস্কারকেরা চেষ্টা করিলে এ কুরীতি উৎপাটনে কতক পরিমাণে কৃতকার্য হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই, আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা মিলিয়া যদি এক সমাজবন্ধন করিয়া অমুক বয়সের আগে বিবাহ করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন তাহা হইলে আপনা হইতেই ক্রমে বিবাহের নিয়ম পরিশুদ্ধ হইয়া আসিবে। এ বিষয়ে তোমার কি বক্তব্য জানিতে ইচ্ছা করি।

বাল্যবিবাহ, আহার ও পরিচ্ছদ

তৃতীয় পত্র

আমি গতবারের পত্র বাল্যবিবাহে শেষ করিয়াছিলাম এবার তাহা হইতে আরম্ভ করি। আমার লেখা শেষ হইবার পর ফাল্গুন মাসের ভারতীতে বাল্যবিবাহ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। লেখক মহাশয় বাল্যবিবাহের বিপক্ষ দলের প্রতি প্রাণপণে অস্ত্রচালনা করিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হইল তিনি ব্রীফ লইয়া ব্যারিষ্টরের মত একপক্ষে কথা কহিতেছেন — তর্কের জন্য তর্ক করিতেছেন — নিরপেক্ষভাবে ঐ প্রথাটির দোষগুণ বিচার করেন নাই। তাঁহার চক্ষে বাল্যবিবাহের সকলি মধুময়, সুধাময়, সৌন্দর্যময় — তাহাতে দোষের লেশমাত্র নাই। একপক্ষের কথা শুনিয়া কোন বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা করা দুঃসাধ্য তাই আমি আমার পক্ষে দু একটি কথা বলিতে চাই।

আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ সর্বত্র প্রচলিত বলিয়াই তাহার গুণ মানিয়া লইতে হইবে তাহা আমি স্বীকার করি না। নানান কারণে এই রীতিটি হিন্দু সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভ্রান্তমত ও বিশ্বাসের প্রভাবে ইহা ধর্মের মতে একপ্রকার জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। কন্যা-ধর্ম প্রাপ্ত হইবার পূর্বে কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে, নহিলে জাতি কুল মান লইয়া সর্বনাশ উপস্থিত — এই সংস্কার হিন্দু সমাজে যতদিন থাকিবে ততদিন বাল্যবিবাহও রাজত্ব করিবে। গুজরাটে এক জাতীয় চাষা আছে তাহাদের নাম কড়ুয়া কুনবী, তাহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথা এই যে, দ্বাদশ বৎসর অন্তর তাহাদের বিবাহকাল উপস্থিত হয় তখন বালক বালিকার বিবাহ দিবার জন্য মা বাপ আকুল হইয়া পড়েন, কেন না সে সময়টি চলিয়া গেলে বার বৎসরের মধ্যে আর বিবাহের লগ্ন নাই সুতরাং এ জাতির মধ্যে এই নিয়মটি বাল্যবিবাহের প্রবর্তক। ইহাদের মধ্যে অনেক সময় দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকার বিবাহ ঘটনা শ্রুত হওয়া যায়। এইরূপ অনেক কারণে বাল্যবিবাহ হিন্দুসমাজে স্থান পাইয়াছে কিন্তু আমার মতে এ কালসর্পকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের কোনমতে রক্ষা নাই — কালক্রমে আমাদের সমাজ প্রলয়-দশা প্রাপ্ত হইবে।

রসিকবাবু বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আপত্তিসকল যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন কিন্তু তাহাতে যে কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা বোধ হয় না। বাল্যবিবাহে দম্পতির শরীর মন রুগ্‌ণ হইয়া পড়ে এ বিষয়ের দোষটা তিনি দম্পতির অভিভাবকের স্কন্ধে চাপাইতে চান। তাহার অর্থ স্পষ্টাক্ষরে এই বুঝা যায় — বিবাহ ও বিবাহের পরিণতি — এই দুই স্বতন্ত্র রাখা উচিত — তাহা হইলে এ প্রথার দোষের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণের অংশ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এ কেবল কথার কথা, কাজে এরূপ নিয়ম হওয়া অসম্ভব। মহারাষ্ট্র ও অন্য কোন কোন দেশে এই রীতি আছে বটে যে মেয়ে বড় না হইলে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে প্রেরিত হয় না। যে দেশে এই রীতি প্রচলিত সে দেশে বাল্যবিবাহের দোষ অনেকাংশে পরিহার হয় কিন্তু

বাঙ্গালা দেশে এ নিয়ম নাই। যেখানে বিবাহের পরেই বৌমাকে শ্বশুরালয়ে বাস করিতে হয় সেখানে ওরূপ ব্রতরক্ষা সুকঠিন। বালদম্পতি বিবাহপাশে বদ্ধ হইয়াও অবিবাহিতের ন্যায় থাকিবে এরূপ নিয়ম জারি করা সহজ, এ নিয়ম পালন করা সহজ নহে। বর্তমান সমাজে তাহা হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। গৃহকর্তা অন্ধ অথবা দেখিয়াও দেখেন না;আর তাঁহারই বা দোষ কি? দিনের বেলায় তো নবদম্পতির কথা কহিবার অধিকার নাই — রাত্রিকালেও কি তাহারা দুই এক দণ্ড মিলিবার সুযোগ পাইবে না? ফলে দাঁড়ায় এই, নিয়ম পালন অপেক্ষা নিয়ম উল্লঙ্ঘনই অধিক প্রচলিত হয়। More honoured in the breach than in the observance.

অল্পবয়সে বিবাহ করিলে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই যে শিক্ষার ব্যাঘাত হয় তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে রাশিরাশি পড়িয়া আছে। 'বউ ধরেই বই ছাড়ে' অনেক পুরুষের এরূপ দুর্দশা দৃষ্টিগোচর হয়, আর স্ত্রীশিক্ষার তো কথাই নাই। আমাদের বালিকাগণ বড জোর ১১, ১২ বৎসর পর্যন্ত স্কুলে কি গৃহে পাঠাভ্যাস করিতে সক্ষম — বিবাহের পব অধিকাংশ বালিকাই মাষ্টার পণ্ডিতের সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য। ইহাতে আব বিদ্যাশিক্ষা কি হইবে? যে স্ত্রী ভাগ্যবশতঃ শিক্ষিত স্বামীর হস্তে পড়ে — এমন স্বামী যিনি গুরুগিরি পর্যন্ত স্বীকাব করিয়া স্ত্রীকে আপনার যথার্থ সঙ্গিনী, সহধর্মিণী করিতে উৎসুক তাঁহারই শিক্ষালাভ ঘটে নতুবা সংসারে প্রবেশ করিয়া বালিকা পূর্বপাঠ সকলি ভুলিয়া যায় — তাহার পূর্বশিক্ষার ফল সর্বৈব ব্যর্থ হয়। এদেশের স্ত্রী বিদ্যালয়ের সঙ্গে যাঁহার কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে তিনি ইহার প্রমাণ পদে পদে জাজ্বল্যমান দেখিতে পান — বাল্যবিবাহ স্ত্রীশিক্ষার যে ভয়ানক শত্রু তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন।

বালস্ত্রী-প্রসূত সন্তান রুগ্ণ ও ক্ষীণকায় হয় একথা লইয়া যে তর্ক উঠিতে পারে তাহা আমি জানিতাম না। তর্কবলে আমরা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারি কিন্তু সে জাদুকরের ভেল্কির মত চোখে ধাঁধা দেওয়া মাত্র — প্রকৃতির নিয়ম তাঁহার বিপরীতে সাক্ষ্য দেয়। ফল ফুল পাকিবার নির্দিষ্ট সময় আছে। পশুপক্ষীর যৌবনের বয়স নিরূপিত আছে, তাহার সীমা তাহারা উল্লঙ্ঘন করে না, মানবদেহও প্রকৃতির নিয়মাধীন। তাহার পরিপক্কতার বয়স নির্ধারিত আছে। অকালপক্ক ফল যেমন সুস্বাদু হয় না অকালপ্রসূত সন্তানও সেইরূপ ক্ষীণমনঃকায় হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কোন্ বয়সে স্ত্রীপুরুষের বিবাহ দেওয়া উচিত? পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, বিবাহের নূতন আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই বিষয়ে কতকগুলি দেশীয় ও ইউরোপীয় ডাক্তারের মত জিজ্ঞাসা করেন — ডাক্তার নর্মান চেবার্‌স্, ডাক্তার ফেরার, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ প্রভৃতি বিচক্ষণ ডাক্তারেরা বিবাহের বয়স সম্বন্ধে সেই সময় আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এ-দেশের

আবহাওয়া গুণাগুণ, দেশীয়দের শরীর-প্রকৃতি তাঁহারা যেমন ভাল বুঝেন আমরা তেমন বুঝি না। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া তাঁহারা কি বলিয়াছেন? তাঁহারা বলেন যে পুরুষের ২০ বৎসরের নীচে, মেয়ের ১৬ কিম্বা ১৭ বৎসরের আগে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। ১৬ জন ডাক্তারের মত লওয়া হয় তাহার মধ্যে কেবল একজন (ডাক্তার চন্দ্র) এ দেশে স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স ১৪ বৎসর নির্দেশ করিয়া বলেন। এইসকল পণ্ডিতের মত এই যে স্ত্রীলোক স্ত্রীধর্ম প্রাপ্ত হইলেই যে সন্তান ধারণের উপযুক্ত হইল তাহা নহে। আরো দু তিন বৎসর অতীত হইলে তবে তাহাদের প্রসবের উপযোগী অঙ্গপ্রতঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে আমাদের দেশের বিবাহের নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। যেসকল স্থানে দ্বিতীয় বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর একত্র সহবাসের রীতি আছে সেখানেও বাল্যবিবাহের দোষ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হয় না, কেননা এই সময় হইতেই যে স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স তাহা নহে। তাহাদেব শরীরের পূর্ণতা, যৌবনের বিকাশ আরো অধিককাল সাপেক্ষ।

বালক বালিকা অপ্রাপ্তবয়সে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় একত্রে সহবাস করিবে ইহা প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে এত অল্পবয়সে বিবাহ দিতে পিতামাতার এত আগ্রহ কেন? অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যার উপর এইরূপ অধিকাব খাটাইয়া কি তাঁহারা ভাল কাজ — মা বাপের উপযুক্ত কাজ করেন? যে বয়সে সন্তানের স্বাধীন ইচ্ছা পরিস্ফুটিত হয় নাই — নিজের মতামত দিবার ক্ষমতা জন্মে নাই — সে বয়সে চিরজীবনের মত তাহাকে উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কি তাঁহারা সুবিবেচনার কার্য করেন? আমি একথা বলিতেছি না যে পুত্র কন্যার বিবাহে পিতামাতার অধিকার নাই — মতামত দিবার ক্ষমতা নাই — হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যক নাই। আমি বলি নিদান এতটুকু বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত যে বয়সে দম্পতি আপনারা জানিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে পারে — বিবাহে আপনাদের ইচ্ছানিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে। যে বয়সে তাহারা বিবাহের মর্ম বুঝিতে ও নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিতে অসমর্থ সে বয়সে তাহাদের বিবাহ ঘটাইয়া দেওয়া অন্যায়। একথা সত্য বটে যে আমাদের সমাজে বিবাহের স্বাধীন ক্ষেত্র নাই, স্ত্রী পুরুষের স্বয়ম্প্রণয়ের (courtship) সুবিধা নাই — বাপমায়ের ঘটকালি ব্যতীত চলে না, কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে যে বিবাহকালে আসল পাত্রপাত্রীর মুখ বন্ধ থাকিবে। তাহাদের নিজ মতামতের কোনো প্রয়োজন নাই। স্বাধীন ইচ্ছাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। কন্যার উপর পিতামাতার যতই অধিকার থাকুক না কেন তথাপি দেখিতে হইবে যে সে স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট জীব — ঘটিবাটির মত ব্যবহারের জিনিস নহে। তাহার স্বাধীনতাটুকু যাহাতে বজায় রাখা যাইতে পারে তাহা কর্তব্য। যে সামাজিক নিয়ম তাহার প্রতি একেবারেই লক্ষ করে না অথবা যাহাব প্রভাবে তাহা সমূলে বিনষ্ট হয় সে নিয়ম কদাপি হিতাবহ হইতে পারে না।

আমি বলিয়াছি অপ্রাপ্তবয়স্কের উপর রাজবিধির মমতা অধিক। যেখানে অপ্রৌঢ় বালক বালিকার অনিষ্ট আশঙ্কনীয় সেখানে রাজনিয়ম হস্তপ্রসারণ করিতে কুণ্ঠিত নহে। তাহার এক

দৃষ্টান্ত মনে হইতেছে। মনে কর, যদি কোন বারনারী তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে নিজ বৃত্তিতে নিয়োজিত করে তাহা হইলে সে দণ্ডনীয় হয় কিনা? এদেশে 'নায়িকা' নামে একদল বারনারী আছে তাহারা দেবমন্দিরে নৃত্যাদি কার্যে নিযুক্ত ও তাহাদের ঘরে কোন সুন্দরী ছোট মেয়ে থাকিলে তাহারা কখনও কখনও প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে আপনাদের ব্যবসায়ে দীক্ষিত করে, কিন্তু এরূপ করিয়া অনেক সময় তাহারা পীনল কোডের গ্রাসে পতিত হয়। এই প্রকার দীক্ষার বিশেষ বিধান ও অনুষ্ঠান আছে, তাহার নাম 'সেজ' বিধি। সে অনুষ্ঠান বিবাহের ভড়ং মাত্র — বরের ঠিকানায় একটা খড়্গ কি ছুরিকা প্রতিষ্ঠিত হয় — তাহার উপর ফুলের মালা রাখিয়া পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে ও মেয়ে তাহাকে পতিত্বে বরণ করে। সেই অবধি দেবতার কার্যে ও কুলধর্মে তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত হইল। বোম্বাই হাইকোর্টের রিপোর্টে (ষষ্ঠ খণ্ডে, crown cases page 60) এ সম্বন্ধে এক মকদ্দমা দেখিতে পাইবে। আমি কারওয়ারে থাকিতে এইরূপ মকদ্দমা মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিত। আসামীর বক্তব্য এই — এ আমাদের চিরন্তন প্রথা — মেয়েকে আমাদের কুলধর্মে দীক্ষিত করাতে দোষ কি? কিন্তু দেশাচার কুলাচার সত্ত্বেও আইনের অনুশাসন এই যে অপ্রৌঢ়া বালিকার উপর এরূপ অত্যাচার দণ্ডনীয়। আইন যদি এস্থলে দেশাচারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিল তাহা হইলে অজ্ঞান বালিকার হিতসাধন উদ্দেশ্যে কি আরো কতকদূর অগ্রসর হইতে পারে না? আমরা অনেকসময় দেখিতে পাই পিতা আপন অল্পবয়স্কা কন্যাকে পঞ্চ সতীনের ঘরে বিসর্জন দিয়া তাহাকে চিরজীবনের মত অসুখী করিতেছেন, অর্থলোভে আপনার অষ্টম বর্ষীয় দুহিতাকে পলিতকেশ বৃদ্ধ বরের হস্তে অকাতরে সমর্পণ করিতেছেন ইত্যাদি, — এরূপ স্থলে কি রাজদণ্ড হস্ত উত্তোলন করিবে না? বাল্যবিবাহ হইতে যে সকল মহা অনিষ্ট উদ্ভূত হইতেছে তাহা নিবারণের জন্য সমাজ যখন নিশ্চেষ্ট অথবা সমাজ যখন আপনার মস্তক আপনি ছেদন করিতে উদ্যত তখন আমার বিবেচনায় রাজ-নিয়মই তাহার উদ্ধারের একমাত্র উপায়। আমি বিবাহ সম্বন্ধে দুইটি মূলতত্ত্ব স্থির করিয়াছি, আমার মতে তাহা অখণ্ডনীয় ও সর্ববাদীসম্মত বলা যাইতে পারে। প্রথম এই যে, দম্পতি যোগ্য বয়সে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক বিবাহ করিবে।

দ্বিতীয়, স্ত্রীপুত্র ভরণপোষণের সামর্থ্য বুঝিয়া পুরুষ দারপরিগ্রহ করিবে।

আমাদের দেশের বিবাহ প্রণালী এ দুই মূল-সূত্রের উপরেই কুঠারাঘাত করে — তাহার ফল দাম্পত্য অসুখ, — দুঃখ, দারিদ্র্য, হীনবীর্য সন্তানসন্ততি।

বিবাহের বিষয়ে অনেক বলা হইয়াছে এখন আর কোন কথা পাড়া যাক্। সংসারের দুই দিক আছে — এক উজ্জ্বল হাস্যময়, অপর দুঃখশোক সমন্বিত অন্ধকার। একদিকে মহোল্লাস অন্যদিকে হাহাকার। বিবাহের অভিনন্দন হইতে মৃত্যুশোকের ক্রন্দন হঠাৎ মনে উদয় হইল। আমাদের বিবাহ যেমন অনেক সময় পুতুলে পুতুলে বিবাহের ন্যায় — বিবাহের ভান মাত্র,

তেমনি গুজরাটি একটা রীতি আছে তাহা শোকের ভান — পেশাদারী শোকপ্রকাশ। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিতে হইলে একদল স্ত্রী ভাড়া করিয়া আনা হয়, তাহারা বুক চাপড়াইয়া মহা আর্তনাদ আরম্ভ করে। পথেঘাটে এইরূপে শোকভানকারিণী বিলাসিনী দেখিতে পাইবে — দেখিলে মনে হয় যেন কাহার কি সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের তালে তালে বক্ষাঘাত — অশ্রুহীন-বিলাপধ্বনি ও কৃত্রিম ভাবভঙ্গী দেখিয়া শীঘ্রই সে ভ্রম দূর হয়। যেমন কৃত্রিম আমোদ তেমনি কৃত্রিম বিলাপ — সংসার কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ।

এ দেশের আচারব্যবহার বর্ণন উপলক্ষ্যে পান-ভোজনের রীতি জানিতে তোমার কৌতূহল হইতে পারে। আহার বিষয়ে এখানকার ব্রাহ্মণ ও উচ্চজাতিদের মধ্যে মৎস্য মাংস পরিহার্য তবুও মাংসাশী জাতির সংখ্যা কম নয়। কোঙ্কণ ও কানাড়ার সমুদ্র-তটবর্তী ধীবর ও অন্যান্য নীচজাতীয় লোক মৎস্যভোজী। বাঙ্গালীদের মত মাছভাত তাহাদের উপজীবিকা। মহারাষ্ট্রী শূদ্রদের মধ্যেও আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে। সেনবী নামক একজাতীয় ব্রাহ্মণ আছে তাহারা আপনাদিগকে গৌড়ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয় — তাহারা মৎস্যজীবী। কিন্তু অন্য ব্রাহ্মণদের দেখাদেখি তাহাদের অনেকে নিরামিষ ভোজন ধরিয়াছে অথচ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে ব্রাহ্মণের মধ্যেই গণ্য করে না। তাহাদের নাম ও আচারব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় যে আসলে তাহারা গৌড়ব্রাহ্মণ — বঙ্গদেশ হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। গুজরাটবাসীগণ প্রায়ই নিরামিষাশী দেখা যায় তাহার কারণ সেদেশে জৈনদের বাস। যেখানে জৈনধর্মের প্রাদুর্ভাব সেখানে জীবহিংসা নিষেধ, অহিংসা পরমোধর্মঃ। গুজরাটে মুসলমানদের ভারি দুর্দশা, কোন কোন গ্রামে হিন্দুদের দৌরাত্ম্যে কশাই টিকিতে পারে না, দায়ে ঠেকিয়া মুসলমান ভায়াদের মাংস ত্যাগ করিতে হয়, ইংরাজ বাহাদুরেরাও শীকার করিতে গিয়া এক এক সময়ে গ্রাম্য জনপদ কর্তৃক তাড়িত হইয়া বিপদগ্রস্ত হন। সামান্যতঃ বলিতে গেলে বোম্বাইবাসী রুটিখোর, বাঙ্গালীর মত ভাতজীবী নয়। কিন্তু এ নিয়মের অপবাদ আছে। কোঙ্কণ কানাড়া প্রভৃতি যেখানে বর্ষার প্রাচুর্যবশতঃ প্রচুর ধান জন্মে ভাতই সেখানকার লোকদের জীবনের অবলম্বন। তদ্ব্যতীত বাজরী, জওয়ারী, গম প্রভৃতি যেখানে যেরূপ শস্য জন্মে সেখানে তাহা সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত। গুজরাত ও সিন্ধুদেশ বাজরীপ্রধান দেশ — আমি এক্ষণে যে প্রদেশে বাস করিতেছি (সোলাপুর ও বীজাপুর) সেখানে জওয়ারীই শ্রমজীবী জনগণের আহার। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ভাত সকল স্থানেই উপাদেয়, ধনী ও উচ্চ জাতীয় লোকদের ভাত ও বরণ (ডাল) ভিন্ন চলে না। অথচ এই সকল হিন্দুদের আহার-প্রণালী ঠিক আমাদের সঙ্গে মেলে না। আমাদের যেমন তিক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' একটা খাবার নিয়ম, এখানে সেরূপ দেখা যায় না। মিষ্ট ঝাল কি নোন্তা যখন যাতে অভিরুচি, — তাহা গ্রহণের কোন নিয়ম নাই। মনে কর লুচী ক্ষীর হইতে আরম্ভ করিলে, পরে ঝাল তরকারী চাটনির সোপান হইতে ডাল ভাতে গিয়া পড়িলে, আবার হয়ত

স্বাদ বদলাইবার জন্য মিষ্টান্নের পুনঃপ্রবেশ। মিষ্টে অরুচি হইলে টক ঝাল — ঝালে অরুচি হইলে আবার মিষ্ট;ঝালের মুখ মিষ্টি করিয়া আবার নোস্তায় আসিয়া উপস্থিত। কোন মহারাষ্ট্রী কিম্বা গুজরাতী হিন্দুর বাড়ী নিমন্ত্রণ হইলে কখন কোন্‌টা খাইতে হয় — কোথা হইতে আরম্ভ, কোথায় গিয়া শেষ কিছুই ভাবিয়া পাই না — মহাবিপদ! খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে তরকারী অনেক থাকে তাহা ঝালপ্রধান — মসলার মধ্যে হিঙ্গের গন্ধ আর সব ছাড়াইয়া উঠে — মিষ্টান্নে জাফরান। নানারকম চাটনী, বিরাট মসলার তরীতরকারী, অম্বলের জায়গায় 'কড়ি' সে একপ্রকার মসলাওয়ালা টক দধির ঝোল, আর 'শ্রীখণ্ড' যাহা মহারাষ্ট্রীদের পরম উপাদেয় সামগ্রীমধ্যে গণ্য তাহা জাফরান ও মিষ্ট দধি দিয়া প্রস্তুত — এতদ্ব্যতীত পূরণ পুরী, সাখর ভাত প্রভৃতি মিষ্টান্ন — এইসব এদেশীয় হিন্দুদের আহার। মিষ্টান্নের ব্যাপার আর সব আমাদেরই মতন, কেবল দেখিতে পাই এদেশের লোকেরা ছানা তৈয়ার করিতে জানে না, সুতরাং সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি ছানার মিষ্ট নাই। কোন বাঙ্গালী ময়রা এদেশে এইসকল জিনিষের দোকান খুলিলে বোধ করি অনেক লাভ করিতে পারে। আমার তো বিশ্বাস বোম্বাই এ বিষয়ে বাঙ্গালার কাছ হইতে নূতন শিখিতে পারে। আহারের সময় এ দেশে পট্টবস্ত্র পরিবার নিয়ম আছে সে বস্ত্রের নাম সোলা। বলা বাহুল্য যে সোলাধারী হিন্দুর পিঁড়ে আসন, কদলী-পত্র বাসন ও প্রকৃত্তিদত্ত অঙ্গুলীই কাঁটাচামচ — এসকল বিষয়ে আমাদের দেশ হইতে এখানে কিছুই প্রভেদ নাই।

আহার প্রণালীর উপর যাহা বলা হইল তাহা এ দেশীয় হিন্দু-রীতি — পারসীদের সম্বন্ধে ও সব ঠিক খাটে না। অন্যান্য সামাজিক প্রথার ন্যায় আহার পদ্ধতিতেও তাহারা ইউরোপীয় আদর্শ গ্রহণ করিতেছে। ভূ-আসন ও কদলীপত্রের পরিবর্তে ক্রমে তাহারা মেজচৌকী ও চীনের বাসন ব্যবহার করিতে শিখিতেছে। মুসলমানের মত পারসীরাও মাংসপ্রিয় কিন্তু পারসীদের মাংস রান্না অপেক্ষাকৃত সাদাসিদে, ঘি মসলায় ছড়াছড়ি যায় না। হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ স্বতন্ত্র আহার করে — স্বামীর আহার সমাপ্ত হইলে স্ত্রী কখনও কখনও তাহার পাতের প্রসাদ পায়। পারসী পরিবারেও স্বতন্ত্র আহারের নিয়ম, কিন্তু এক্ষণে অনেক কৃতবিদ্য পারসী মহিলাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া আহার করেন — ইহা উন্নতির লক্ষণ বলিতে হইবে। পরিবার মধ্যে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিবার নিয়ম অস্বাভাবিক ও নিন্দনীয় — তাহাদের মধ্যে যতই প্রণয় ও সদ্ভাবে মেলামেশা হয় ততই ভাল।

আহারের পর পরিচ্ছদের বিষয় বলা যাইতে পারে। এদেশীয়দের আমাদের সঙ্গে যে যে বিষয়ে পরিচ্ছদের অমিল তাহা এই। প্রথম মেয়েদের কাপড়। মহারাষ্ট্রী স্ত্রীগণ কোনরূপ শিরোবেষ্টন ব্যবহার করে না — খোলা মাথায় চক্রাকারে খোঁপা তার উপর ফুলের মালা ও স্বর্ণাভরণ। নাকে মুক্তাগুচ্ছ নথ। মহারাষ্ট্রী মেয়েদের শাড়ী পরিবার ধরন একটু আলাদা। শাড়ী তার উপর আবার মালকোচা। সামনের দিকটা দেখিতে মন্দ দেখায় না কিন্তু পিছনে

মালকোচার বাঁধন স্পষ্ট ধরা পড়ে। মেয়েদের উপর এ পুরুষবেশ আমাদের চক্ষে অদ্ভুত ঠেকিতে পারে, কিন্তু কাপড়ের দোষগুণ অনেকটা অভ্যাসের উপর নির্ভর। এককাল ছিল যখন মহারাট্টা বীরাঙ্গনাদের অশ্বারোহণে সৈন্যসহ একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে হইত, তখনকার কালের পক্ষে মালকোচাই উপযুক্ত বেশ। এখানকার স্ত্রীলোকদের অঙ্গাবরণ আমার বেশ পছন্দ হয় — এদেশে তাহাকে 'চোলী' বলে। আমরা তাহাকে কাঁচুলি বলি। কি মহারাট্টা কি গুজরাতী, মেয়েরা সবাই এই চোলী ধারণ করে। কারওয়ারে থাকিতে একজাতীয় পাহাড়ে মেয়ে দেখিয়াছিলাম তাহারা কড়ির মালা ধারণ করে। বিবাহের বয়স হইতে আরম্ভ কবিয়া প্রতি বৎসরে এক একটা মালা যোগ করিয়া দেয়। ইহাতে তাহাদের বয়স গণিবার বেশ সুবিধা হয় কিন্তু অধিক বয়সে সেই মালার ভার দুঃসহ হইয়া পড়ে।

এখানে পুরুষদের মধ্যে শিরোমুণ্ডন ও শিখা ধারণ রীতি। সুতরাং কদর্য নেড়ামাথা ঢাকিবার জন্য উষ্ণীয় ধারণ প্রয়োজন হয়। এই প্রথাটিই এদেশে আসিয়া লঙ্গশির বাঙ্গালীর চক্ষে বিশেষ নূতন ঠেকে। বিদেশীগণ বাঙ্গালা ও ভারতের অন্য স্থানে এই পার্থক্য সহজে লক্ষ করিয়া থাকে। কেহ বলে খোলা মাথা অসভ্যতার লক্ষণ, কিন্তু তাহাদের প্রাচীন রোমকদের দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। তাহাদের টোপা ও মুক্তশির আমাদের বেশ হইতে বড় ভিন্ন নহে। বাঙ্গালীর খোলা মাথায় যেমন কৃত্রিম কোন শিরস্ত্রাণ নাই তেমনি প্রকৃতির শোভন আবরণ বিদ্যমান। এদেশে শিরোমুণ্ডনের রীতি সুতরাং পাগড়ী না পড়িলে চলে না। বাহিরে পথেঘাটে সমগ্র পাগড়ীওয়ালা মাথা। পাগড়ীর গঠন ও আকৃতি অনুসারে জাতি ও বর্ণ লক্ষিত হয়। মুসলমানদের জরির বাঁধা মোগলাই পাগড়ী, মহারাট্টীদের শ্বেত কিম্বা লোহিত বর্ণ রথচক্র, গুজরাতীদের লালরঙ্গের গজমুণ্ড, পারসীদের ত্রিকোণবিশিষ্ট লম্বাটুপী, সিন্ধীদের বিপর্যস্ত ইংরাজী হ্যাট। এইরূপ লম্বা, গোল, কোণবিশিষ্ট নানাধরনের পাগড়ী দেখা যায়। এইসকল চিত্রবিচিত্র শিরোভূষণ নগরবাসী পথিকদের মধ্যে বিচিত্রতা সম্পাদন করে। কলিকাতায় ঘরে বাহিরে সর্বত্রই আটপৌরে ভাব — বোম্বাই পোষাকী শহর।

পারসীরা একজাতীয় গুজরাতী বণিকের লম্বা পাগড়ী গ্রহণ করিয়াছে তাহা কতকটা তাহাদের জাতীয় টুপির অনুরূপ। পারসী স্ত্রী পুরুষ সকলেই শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে খোলা মাথায় অহরিমান (শয়তান) সহজে প্রবেশ লাভ করে। পারসী রমণীগণ সচরাচর সুশ্রী, সুরেখ ও গৌরবর্ণ। তাহারা গুজরাতী মেয়েদের ন্যায় রঙিন রেশমী শাড়ী ধারণ করে। কিন্তু মাথায় একটা রুমাল বন্ধনে তাহাদের মুখশ্রী নষ্ট। দেখিতে বিশ্রী কিন্তু রুমালের এক গুণ এই যে মাথার শাড়ী চুলের তেলে ময়লা হয় না। মহারাট্টীদের মাথার রথচক্রের কথা বলিয়াছি তাহার বিস্তৃতির উপর মানমর্যাদা নির্ভর করে — যত বড় লোক তত বড় পাগড়ী। এই ভার মাথার উপর চাপাইয়া কেমন করিয়া যে তাহারা তাহাদের নিত্যনিয়মিত কার্য করিতে সক্ষম হয় তাহা ভাবিয়া উঠা দুষ্কর। যাহাদের অভ্যাস নাই এই

ভার মাথায় রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয় সন্দেহ নাই। যদি আমার মত জিজ্ঞাসা কর — আমি বলি আমাদের খোলা মাথার নিয়ম অনেক গুণে ভাল। কিন্তু খোলামাথা তো আটপৌরে পোষাক, বাহিরে পরিবার বেশ কি? এর উত্তর দেওয়া সহজ নহে। এখন যেমন দেখা যায় কেহ বলিতে পারে যে বাঙ্গালীর কোন জাতীয় পরিচ্ছদ নাই, যাহার যেমন রুচি সে সেইরূপ কাপড় ব্যবহার করে। কোন প্রকাশ্য স্থানে যাও নানাধরনের পাগড়ী ও পরিচ্ছদ দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া বৃথা, কালসহকারে আপনা-আপনি একটা সাম্য দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই। অনতিবিলম্বে দেখিতে পাইবে যে সুগঠন অথচ লঘু 'বাবু' পাগড়ীর ফ্যাশন উঠিয়াছে। অন্যান্য জাতিরা তাহার আদর্শ গ্রহণ করিতে তৎপর।

পারসীদের পরিচ্ছদ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এখনো ইউরোপীয় ধরনে পরিবর্ত হয় নাই। নীচের ভাগ যেমনই হউক পারসী-উষ্ণীয় দেখিলে তাহার বাহককে চিনিবার কোন গোল হয় না। তাছাড়া পারসীর জাতীয় পরিচ্ছদ 'সদরা ও কুস্তি'। সদরা একটা মলমলের জামা ও 'কুস্তি' বাহাত্তর সূত্রের কটিবন্ধ, প্রত্যেক জরতোস্তবাদীর ইহা বরণীয়। জন্দ-অবস্তায় সদরা সুভদ্র মঙ্গল বসন রূপে ব্যাখ্যাত। কুস্তি তিন বেড়ে কটিদেশ প্রদক্ষিণ করিয়া চার গ্রন্থিতে আবদ্ধ। প্রত্যেক গ্রন্থি বাঁধিবার সময় এক এক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, প্রথম মন্ত্র, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় জরতোস্ত ধর্মই সত্য, তৃতীয় জরতোস্ত ঈশ্বরের দূত, চতুর্থ সদাচরণ করিবে ও পাপ পরিহার করিবে। এই চারি মন্ত্র পাঠকরতঃ সদরা ও কুস্তি পরিধান করিয়া পারসী জরতোস্ত ধর্মে দীক্ষিত হয়।

পারসী পরিবার

চতুর্থ পত্র

আমি পূর্বপত্রে পারসীদের রীতিনীতি কতক কতক বর্ণন করিয়াছি, এবার এক পারসী পরিবারকে বঙ্গভূমিতে অবতরণ করা যাক্। বোম্বাই গিয়াই এই পরিবারের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। আমার কর্ম্মস্থলে যাইবার পূর্বে আমি কয়েক মাস সস্ত্রীক ইহাদের বাটীতে বাস করি। বাড়ীটা বড়সড়, দোতালা, ইংরাজি ধরনের সাজান ও কতকগুলি মূল্যবান তৈলরঙের চিত্রফলকে অলঙ্কৃত। বৃদ্ধ মা-জী গৃহকর্তা, তাঁর দুই কন্যা তাঁহার গৃহপ্রদীপ। একজন পারসী ভৃত্য — তাহার নাম জিলা। জিলাকে জরির কাপড় পরাইয়া সাজসজ্জা করাইয়া দিলে চাকর মনিবে বড় তফাত জানা যায় না। মনিব অপেক্ষা চাকর সুশ্রী ও একহাত উচ্চ। মা-জী যেমন আকারে খর্বকায়, স্বভাবেও তাঁর কতকটা তেমনি ছেলেমানুষি জাঁকের ভাব, ঐ ক্ষুদ্র দেহটি আত্মশ্লাঘায় পূর্ণ। কোন কোন লোক আছে সে নিজের চক্ষে নিজে মস্ত লোক — সারাদিন সগর্বে পুচ্ছ ফুলাইয়া বেড়ায়, সময় অসময় নাই অবাধে আপনার গুণগান করিয়া যায়, শ্রোতা তাহা গলাধঃকরণ করিতেছে, কি শুনিয়া মনে মনে হাসিতেছে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; মা-জী ঐ ধরনের লোক;বড় বড় ইংরাজ ও রাজারাজড়ার পরিচিত বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে তাঁর বড় আমোদ, ইউরোপের সমুদয় মুকুটধারীর সহিত তাঁহার গলাগলি ভাব এইভাবে অনেক সময় তিনি তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের গল্প করিতেন। আমাদের দেশে কিছুই নাই, যাহা আছে সমস্তই খারাপ — ইউরোপীয় সভ্যতাই আমাদের আদর্শ ও অনুকরণীয় এই তাঁর উপদেশের ধুয়া। তাঁহার কথায় যদি তোমার প্রতীতি না জন্মে তাহা হইলে কোন্ লর্ড তাহাকে কোন্ পত্র লিখিয়াছিল, তাহার কি উত্তর দিয়াছিলেন, কোন্ কালে তাঁর কোন্ পামফেট ছাপা হইয়াছিল এইসব পাঁজিপুঁথি বার করিয়া তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন — অবশেষে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলিয়া তোমাকে অগত্যা তাঁহার মতে মত দিতে হইবে। মানুষ গুণদোষে জড়িত — দোষ ধরিতে গেলে কাহার না ধরা যায়, মা-জীর অনেক সদ্গুণও আছে — উদার-সাদাসিদে সরল। এদিকে যেমন ইংরাজভক্ত তেমনি আবার ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যখন ছোট আদালতের জজ ছিলেন, তখন গবর্নর স্যর বার্টল ফ্রেয়র কোন এক সংবাদপত্রের রিপোর্ট দৃষ্টে তাঁর কাজের দোষ ধরিয়া তাঁহাকে অপদস্থ করেন। মা-জী শীঘ্র ছাড়িবার পাত্র নন, এদেশে কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা না দেখিয়া এই ব্যাপারটি তিনি পার্লামেন্ট সভা পর্যন্ত লইয়া গিয়া আপনি দোষমুক্ত হইলেন — শুধু তা নয়, ক্ষতিপূরণ হুকুম পকেটে করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজ কোর্টের উচ্চতর আসন অধিকার করিয়া লইলেন। মা-জী একটি পারসী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যুবরাজ-পত্নী আলেকজান্দ্রার নামে তাহার নামকরণ করিয়াছেন। এটি তাঁর বিশেষ যত্নের ধন — তাঁর বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন। লোক দেখাইবার এই একটি

জিনিস পাইয়া মা-জী হাতে এক কাজ পাইয়াছেন, নতুবা পেন্সন লইয়া নিষ্কর্মার ন্যায় জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইতেন। কোথায় ব্রিটিশ রাজপরিবার — কোথায় বড়লাট সাহেব — কোথায় পোর্তুগীস গবর্নর জেনেরল — কোন একজন বড় লোক বোম্বায়ে এলে হয়, অমনি মা-জী তাঁহাকে ধরিয়া আপনার স্কুল পরিদর্শনার্থ লইয়া যাইতে ব্যস্ত। ঈশ্বরের কৃপায় স্কুলটি এখন ভাল চলিতেছে — ছাত্রীসংখ্যা শতাধিক, তাহার প্রায় সকলেই পারসী বালিকা — দুজন মাত্র হিন্দুকন্যা। হিন্দুরা এই বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাইতে চান না তার এক কারণ মনে হয় যে এখানে দেশীয় ভাষা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই, কেবলি ইংরাজী শিক্ষা। পারসীদের মাতৃভাষা যে গুজরাতী, তাহা শেখান হয় না কেন? এ প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। বোধ করি ইহা ইউরোপীয় সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠাতার অপার অনুরাগের ফল।

কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার খাতিরে বৃদ্ধ মা-জী তাঁহার জরতোস্তী প্রার্থনামালা আবৃত্তি করিতে শৈথিল্য করেন না। প্রত্যহ সকালে তিনি দুরূহ জন্দ ভাষায় বিজবিজ করিয়া “মনস্নী গবস্নী কোনস্নী’ কত কি মন্ত্র পাঠ করিতেন — সে ছবি আমার মানসপটে এখনো জ্বলন্ত দেখিতেছি।

মা-জীর দুই কন্যারত্নের গুণের কথা কি কহিব, তাহাদের সহাস্য সুন্দর মূর্তি আমাদের হৃদয়ে চিরমুদ্রিত থাকিবে — তাঁহাদের যত্ন শুশ্রূষা কখনই ভুলিতে পারিব না। আমার স্ত্রীর সেই প্রথম দূর প্রবাস। অন্তঃপুর-কারাগার হইতে সহসা স্বাধীন সমাজের পূর্ণ আলোকে পড়িয়া পিঞ্জরের পাখীকে মুক্ত আকাশে, মুক্ত বাতাসে ছাড়িয়া দিলে যেরূপ হয়, তিনি সেইরূপ কতকটা থতমত খাইয়া গিয়াছেন — এই দুই পারসী ভগিনীর সংসর্গে তিনি অনেক অংশে সেই পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাইতে পারিয়াছিলেন। মেয়ে দুটি বয়স্কা কিন্তু উভয়েই অবিবাহিতা। বড়টির তখন courtship চলিতেছে। আমরা থাকিতে থাকিতে তাঁহার পিতা সাহেবী ভোজ দিয়া ‘উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যরীতি’ অনুসারে মহা ধূমধামে কন্যার বিবাহোৎসব সম্পন্ন করেন। এখন তিনি অনেকগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন, তাঁহার স্বামী কর্সদজী কামা পারসীমণ্ডলীর মধ্যে পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর বলিয়া বিখ্যাত। কনিষ্ঠা সিরিনবাঈ ইংরাজী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন — লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তার সামাজিকতায়, গৃহকার্যে সুদক্ষ। দুঃখের বিষয় তাঁহার শরীর নিতান্ত অপটু কিন্তু ঐ রুগ্‌ণ শরীর লইয়া বৃদ্ধ পিতার সেবাশুশ্রূষা, ভগিনীর গৃহকার্য পর্যবেক্ষণ, বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কর্তব্য সাধনে যথাসাধ্য কালাতিপাত করিতেছেন। তাঁহাদের অশেষ আতিথ্য সৎকার লাভে তাঁহাদের বাটীতে যতটুকু সময় সুখে কাটাইয়াছি, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এই পত্র শেষ করি।

বোম্বায়ের নামকরণ

পঞ্চম পত্র

গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত যে ষোড়শ বৈদিক সংস্কার বিধিবদ্ধ আছে, তাহার মধ্যে নামকরণ পঞ্চম সংস্কার। জাতকর্মের পর নামকরণ— সন্তান জন্মিবার দ্বাদশ দিবস পর্যন্ত সামান্যতা ইহার সময় নির্দিষ্ট। সকল বর্ণের মধ্যে সময়ের একই নিয়ম নাই; ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দ্বাদশ দিবস, ক্ষত্রিয়দের ত্রয়োদশ, বৈশ্যদের ষোড়শ, শূদ্রদের দ্বাবিংশ দিবস নামকরণের নির্ধারিত কাল। আর কার্যগতিকে এই কালের ব্যতিক্রমও ঘটিয়া থাকে।

গুজরাটী ব্রাহ্মণদের মধ্যে জাতকর্ম প্রথা এক্ষণে প্রচলিত নাই, মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, কিন্তু নামকরণ সাধারণ হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত। তাহা যে শাস্ত্রের বিধানানুসারে সম্পন্ন হয়, কেবল তাহা নহে, লৌকিক ব্যবহারে তাহা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের মতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দ্বাদশ দিবসে কিম্বা প্রথম মাসের অন্য কোন দিবসে, অথবা প্রথম সংবৎসরে পিতা পুত্রের নামকরণ করিবেন। পিতা যদি বিদেশে গিয়া থাকেন, তবে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নামকরণ করিবেন। নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া পুত্রের তিনবার মস্তক আঘ্রাণ করিবেন।

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাহসি স জীব শরদাং শতম্।।

ককারাদি বর্গের প্রথম দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ বর্ণ নামের আদিতে ও বিসর্গান্ত হ্রস্ব স্বর অন্তে থাকা বিধেয়, প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি দ্বি-অক্ষর নাম রাখিবেন; ব্রহ্ম-বর্চ্চস-কাম চতুরক্ষরের নাম রাখিবেন; পুরুষের নামে যুক্তাক্ষর মিলিত থাকিলে হানি নাই, কন্যার নামের আদিতে যুক্তাক্ষর না থাকে এইরূপ নাম রাখিবে, যথা সুখদা, সুভদ্রা, বসুদা, যশোদা, সাবিত্রী, সুমঙ্গলা, কলাবতী ইত্যাদি। পারস্কর গৃহ্যসূত্রের মতে পুরুষের নাম তদ্ধিতান্ত হওয়া বিধেয় নয় (দৈবদত্তিঃ ঔপমন্যবঃ ইত্যাদি) স্ত্রীর নাম তদ্ধিতান্ত হইবার বাধা নাই, যথা গান্ধারী, কৈকেয়ী, জানকী ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের উপাধি শর্মন, ক্ষত্রিয়ের বর্মন্, বৈশ্যের গুপ্ত, শূদ্রের দাস।

গোভিলীয় গৃহ্য-সূত্রে নামকরণ-প্রথা এইরূপ লিখিত আছে।

কুমারকে শুদ্ধ বসন পরিধান করাইয়া মাতা বামভাগে উপবিষ্ট পিতার হস্তে তাহাকে দিবেন। তৎপরে পত্নী পৃষ্ঠদেশ হইতে পতিকে পরিক্রমণকরতঃ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন। পতি "যজ্ঞে সুসীমে" "যথা সন্ন প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্র্যা অধীতি" প্রভৃতি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া পত্নীকে কুমার প্রত্যর্পণ করিবেন। পরে 'যদদশচন্দ্রমসীত্যাদি' মন্ত্রে চন্দ্রমার অর্চনা

করিয়া পুত্রকে আশীর্বাদ করিবেন ও যথোক্তপ্রকার হোমাদি অনুষ্ঠান করিয়া পুত্রের নামকরণ করিবেন।

কালক্রমে এই বৈদিক প্রথার অনেক পরিবর্তন ও রূপান্তর হইয়া আসিয়াছে।

সংস্কার পদ্ধতি প্রয়োগে নামকরণ পদ্ধতি নিম্নলিখিত প্রকার।

একাদশ কিম্বা দ্বাদশ দিবসে পিতা সন্তানের দীর্ঘায়ু ও কল্যাণ উদ্দেশ্যে নামকরণ সঙ্কল্প করিবেন। হোম ক্রিয়া ইচ্ছাধীন। নিম্নলিখিত নাম হইতে নাম নির্বাচিত হওয়া উচিত।

১	২	৩	৪	৫	৬
কৃষ্ণ	অনন্ত	অচ্যুত	চক্রী	বৈকুণ্ঠ	জনার্দন
৭	৮	৯	১০	১১	১২
উপেন্দ্র	যজ্ঞপুরুষ	বাসুদেব	হরি	যোগীশ	পুণ্ডরীকাক্ষ

চৈত্র হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত এক এক মাসের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা — চৈত্র-প্রধান কৃষ্ণ, বৈশাখ-প্রধান অনন্ত ইত্যাদি। এই হেতু যে মাসে সন্তান জন্মে সেই মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামে তাহার নাম রাখিতে হইবে। চৈত্রে জন্মিলে তাহাকে কৃষ্ণের নাম দেওয়া বিধেয়।

অপিচ গৃহদেবতা কি কুল-দেবতার নাম হইতেও সন্তানের নাম দেওয়া যায়, যথা — শঙ্কর, মহাদেব, গোবিন্দ, গণেশ, গোপাল, বামন ইত্যাদি।

সংস্কার-পদ্ধতিতে নাম রাখিবার আর এক প্রথা নির্দিষ্ট আছে। একটি কাংস্যপাত্রে স্বর্ণলেখনী দ্বারা চতুর্বিধ নাম লিখিত হইবে। যথা —

১। কুলদেবতার নাম (রাম, কৃষ্ণ, বিঠোবা ইত্যাদি)।
২। মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম (কৃষ্ণ, অনন্ত ইত্যাদি)
৩। রাশির নাম।
৪। কুলাচার অনুযায়ী নাম।

রাশি নাম স্থিরীকৃত হইবার নিয়ম এই— মেষ, বৃষ প্রভৃতি রাশি ২৭ নক্ষত্রে বিভক্ত। প্রত্যেক রাশির জন্য পৃথক পৃথক অক্ষর নির্দিষ্ট আছে — মেষ রাশির অ, ল, ই — বৃষতে র, ব, উ — মিথুনে ক, ছ, গ, ইত্যাদি। মেষ রাশিতে জন্ম হইলে অ, ল অথবা ইকারাদি নাম রাখা যায়, যথা — অনন্ত, ললুভাই, ঈশ্বর।

উল্লিখিত প্রকারে কাংস্যপাত্রে নাম লিখিত হইলে মাতা শিশুকে দক্ষিণ ক্রোড়ে বসাইবেন ও পিতা শিশুর দক্ষিণ কর্ণে নাম উচ্চারণ করিয়া "তদস্ত মিত্রাবরুণ" মন্ত্র পাঠ করিবেন ও পুরোহিত আশীর্বাদ করিয়া কর্ম সমাপন করিবেন।

এই সকল নিয়মে ও বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে। কুলদেবতার নাম ও রাশিনাম রাখিবার প্রথা বৈদিক কালে প্রচলিত ছিল না। অবতারবাদ হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হইবার পর এই সকল নাম প্রচার হইয়াছে, ইহা সহজেই প্রতীতি হয়। কি মহারাষ্ট্র দেশে কি গুজরাটে পুত্র কন্যার নাম প্রায়ই দেবদেবীর নাম হইতে গৃহীত। বৈদিক নাম প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদের অনুকরণে দৌলত রায়, হুকুমত রায়, খুসাল রায়, মহতাব রায়, ন্যামত রায় প্রভৃতি কতকগুলি নাম পারস্য ভাষায় সংরচিত দেখা যায়।

আমি গুজরাট হইতে লিখিতেছি। এ প্রদেশে নামকরণ পদ্ধতিকে 'বারা' বলিয়া অথবা 'বারসা' (বার বাসর) বলে; ইহাতে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর নাই; নামকরণ কার্য স্ত্রীদের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সন্তানের নাম রাখিবার ভার বিশেষরূপে তাহার ফোই অর্থাৎ পিসিমার হস্তে সমর্পিত ও এই উপলক্ষ্যে তিনি তাঁহার ভ্রাতার নিকট হইতে উপহার প্রত্যাশা করেন।

গুজরাটে নামকরণের প্রথা এইরূপ, —

চারিজন বালক যাহাদের উপনয়ন হয় নাই, অথবা চারি স্ত্রী একখণ্ড রেশমের কাপড়ের চারি কোণ ধরিয়া দাঁড়ায়, পরে মাতা সন্তানকে তাহাতে রাখিয়া দেন। বালকেরা অথবা স্ত্রীগণ সেই ঝোলা দুলাইতে দুলাইতে এই শ্লোক আবৃত্তি করে, —

ঝোলী পোলী পীপল পান
ফোইয়ে পাড়্যুঁ (অমুক) নাম
(পিসি রাখে অমুক নাম)

পরে মিষ্টান্ন পরিবেশন হইয়া ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণদের সচরাচর দুই নাম থাকে; এক ডাক নাম, এক রাশি নাম।

মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে কতকগুলি নাম কেবল পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জনসাধারণের মধ্যে তাহারা এক নামে পরিচিত, আপনাদের মধ্যে তাহাদের আর এক নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা —

কৃষ্ণরাও	নানাসাহেব
ভীমরাও	তাত্যাসাহেব
খণ্ডেরাও	ভাউ
গণপতরাও	বালা

এইরূপ অপ্‌পা, অন্না প্রভৃতি আরো কতকগুলি ঘরাও নাম আছে। গুজরাটীদের মধ্যে এইরূপ নানু, মনু, মোটা ভাই বলিয়া কতকগুলি নাম শ্রবণ করা যায়। অনেক সময় পিতাকে পুত্রেরা বাবার পরিবর্তে হয়ত মোটা-ভাই বলিয়া সম্বোধন করে। মাতাকে 'মা' না বলিয়া

'মোটী-বেন' বলিয়া ডাকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জন্য দাদা দিদির অনুরূপ কোন নাম নাই।

মহারাষ্ট্রী গুজরাটী ও বাঙ্গালা ভাষায় সম্বন্ধসূচক নামাবলী পাঠ করিয়া পাঠকগণ এই তিন ভাষার সৌসাদৃশ্য অনেকাংশে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাঙ্গলা	গুজরাতী	মহারাষ্ট্রী
বাপ	বাপ	বাপ
পিতা	পিতা	পিতা
মা	মা	আই
মাতা	মাতা	মাতুশ্রী
ভাই	ভাই	ভাউ
ভগিনী, বোন	বেন	বহিন
খুড়তুতা ভাই	পিত্রাই	চুলত ভাউ
কাকা	কাকা	কাকা
কাকী	কাকী	কাকী
স্বামী	ধনী, বর	নববা-ভ্রতার
স্ত্রী	বায়ড়ী	বায়কো
বড়ঠাকুর	জেঠ	জেঠ
দেওর-ঠাকুরপো	দেব	দীর
ননদ	ননদ	ননদ
শালা	সালা	মেহমনা
ভাজ	ভোজাই	ভাউজাই
	ভাবী	
ভগিনীপতি, বোনাই	বনেবী	বনেবী-দাজী
সতীন	সোখ	সবত
ভাগনে	ভানেজ	ভাচা
ভাগনী	ভানেজ	ভাচা
মামা	মামা	মামা
পিসি	ফোই	ফোই
মাসী	মাউসী	মাউসী
বউ	বহু	সুন
জামাই	জমাই	জাঁবই

বাঙলা	গুজরাতী	মহারাষ্ট্রী
ঠাকুরদাদা	দাদা	আজা
দিদিমা	দাদী	আজী
পৌত্র, নাতী	পৌত্র	নাতু
ভাইপো	ভতৃজ	পুতনা

জ্যেষ্ঠা ও মূল, এই দুই নক্ষত্র অশুভ বলিয়া পরিগণিত। এই দুই নক্ষত্রে পুত্র কি কন্যা জন্মিলে জননী আপনাদের মৃত্যু আশঙ্কা করেন। এই অমঙ্গল নিবারণ হেতু সেই নক্ষত্রের নামে সন্তানের নাম রাখিবার নিয়ম আছে। জ্যেষ্ঠাতে জন্ম হইলে নাম জেঠা কিম্বা জেঠী, মূল নক্ষত্রে জন্ম হইলে নাম মূলজী, মূলশঙ্কর অথবা মূলী রাখা হইয়া থাকে। যদি অনেক সন্তান মৃত হইয়া দৈববশাৎ এক সন্তান বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার নাম জীবা কি জীবী রাখা হয়। যে গৃহে বালকের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের যত্ন নাই, তথা হয়ত ধূলা, কচরা, জুঠা, পুঁজা প্রভৃতি অযত্নসূচক নাম শ্রুতিগোচর হয়।

এদেশে নাম রাখিবার সময় পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যোগ করিয়া দিবার এক রীতি সর্বত্র প্রচলিত। মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, পারসী সকলেরই মধ্যে এই রীতি দৃষ্ট হয়। যথা — পিতার নাম সারাভাই — পুত্রের নাম ভোলানাথ সারাভাই — পৌত্রের নাম ভীমরাও ভোলানাথ। পারসীদের মধ্যেও এইরূপ — পিতার নাম খরসদ্‌জী, পুত্রের নাম মানকজী খরসদজী, পৌত্রের নাম জাহাঙ্গীর মানকজী। অনেক স্থলে এই স্বনাম ও পিতৃনাম ভিন্ন জাতিসূচক নাম কিম্বা মর্যাদাসূচক কোন উপাধি দৃষ্ট হয় না। বঙ্গবাসীদের মধ্যে যেমন বন্দ্য, চট্ট, মিত্র, দাস প্রভৃতি জাতিসূচক নাম ব্যবহৃত হয়, এখানে সেরূপ নিয়ম নাই। তবে মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে অনেকেরই কুলপদবী থাকে;যথা — গোড়বোলে (মিষ্টভাষী), কড়কড়ে, জোসী মুনসি, তখড়্‌কর ইত্যাদি। ইহা অপরিবর্তনশীল বংশগত নাম।

গুজরাটে 'জী' ও 'ভাই' শব্দান্ত নামই অধিক প্রচলিত। কায়স্থ ও বণিকদের মধ্যে দেবতার নামের শেষে দাস শব্দ সংযুক্ত করিবার রীতি আছে, যেমন জগজীবন দাস, লক্ষ্মণ দাস, নরোত্তম দাস ইত্যাদি। এক প্রদেশে রণছোড় নামক এক ভীরুস্বভাব দেবতা আছে, অনেকে সেই নাম ধারণ করেন। একজন নব্য সম্প্রদায়ের গুজরাটী কায়স্থ, ঐ নামের উপর চটিয়া আপনার পুত্রের নাম 'রণজিৎ' রাখিয়াছেন, ইহা উন্নতির লক্ষণ বলিতে হইবে। মহারাষ্ট্র দেশে বিঠোবা নামক দেবতাবিশেষ প্রসিদ্ধ আছে, এই হেতু মহারাষ্ট্রীদের মধ্যে "বিঠোবা" "বিঠ্‌ঠ্‌ল রাও" অনেকের এই নাম শ্রুত হওয়া যায়।

স্ত্রীলোকের নাম দেবী ও অধিকাংশ নদী হইতে গৃহীত হয;যথা — পার্বতী, লক্ষ্মী, উমা, দুর্গা, রেবা, যমুনা। সীতা চিরদুঃখিনী বলিয়া কন্যার ঐ নাম রাখিতে বঙ্গবাসীরা যেরূপ

কুণ্ঠিত, এখানে সেরূপ ভাব দেখা যায় না। সীতা, জানকী প্রভৃতি নাম এখানে অত্যন্ত প্রচলিত। এতভিন্ন পুষ্প কিম্বা স্বর্ণ মাণিক্য হইতে কন্যার নাম প্রদত্ত হয়। মোতি, সোনু, জহর, রত্ন, চম্পক, চমেলী এ সকল নামও প্রচলিত। বিবাহিতা স্ত্রী পতিগৃহে নামান্তর গ্রহণ করেন। বিবাহের দিন কন্যা পতিগৃহে উপস্থিত হইলে গৃহদেবতার সম্মুখে দম্পতি উপবিষ্ট হয়েন। বরের মাতা তাঁহার বধূর যে নাম রাখা স্থির করেন, তাহা এক পাত্রে চাল রাখিয়া তাহার উপরে অঙ্কিত করেন। পরে বর কন্যার কানে কানে সেই নাম বলিয়া দেন। জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর নাম সচরাচর লক্ষ্মী রাখা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, স্বামীর নাম অনুসারে স্ত্রীর নাম রচিত হয়। স্বামীর নাম মহাদেব হইলে স্ত্রীর নাম পার্বতী, শঙ্কর হইলে উমা, কৃষ্ণ হইলে রাধা, বিঠোবা হইলে রুক্মা, রাম হইলে সীতা। কন্যার নাম যদি আবড়ী (আদুরী) থাকে, তবে আত্মারামের সঙ্গে বিবাহ হইলে তাহার নাম রাখা হইতে পারে, কেন না কৃষ্ণের আর এক নাম আত্মারাম। গুজরাটে অনেক সময় অবিবাহিত কন্যার প্রতি 'কুমারী' ও বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি 'বধূ' শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা,

পার্বতী কুমারী — পার্বতী বধূ
রুক্মিণী কুমারী — রুক্মিণী বধূ

বাঈ-শব্দ মর্যাদাসূচক — স্ত্রীদের নামের প্রথমে কি শেষে ইহা যুক্ত হয়; যথা, — সোনু বাঈ, আনা বাঈ, দুর্গা বাঈ, বাঈ রতন, বাঈ মানক ইত্যাদি।

পারসীরা তাহাদের পারস্যদেশীয় পুরাতন বীরপুরুষদের নাম সচরাচর ধারণ করে, যথা — রোস্তম, কাইখসরু (cyrus), জমসদ, জাহাঙ্গীর, খুরসদ, দোয়াব, সোরাব ইত্যাদি। এইসকল নামে গুজরাটের প্রথা অনুসারে জী কিম্বা ভাই যোগ করিয়া দিলে পারসী নাম সম্পূর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি হিন্দু নামও তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে, রতন-জী, পদম-জী, ডোসা ভাই, দাদা-ভাই, আদর-জী, জীবন-জী ইত্যাদি। পারসী স্ত্রীগণ হিন্দু স্ত্রীর নামানুযায়ী নাম ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কতকগুলি পারস্য নামও প্রচলিত আছে; যথা — সিরীন, পরোচিস্তা ইত্যাদি।

পারসীদের মধ্যে কতকগুলি হাস্যকর পদবী ও উপাধি দৃষ্ট হয়, তাহা অনেক স্থলে তাহাদের পূর্বপুরুষদের অবলম্বিত ব্যবসা হইতে কল্পিত বোধ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত — বোতলওয়ালা, দারুখানাওয়ালা, ঘাসওয়ালা। এইসকল নামের মধ্যে দুইটি নাম বোম্বাই মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ — বোতলওয়ালা ও রেডিমনি (নগদ পয়সাওয়ালা)। স্যর্ জমসদজী জি জি ভাই প্রসিদ্ধ নাইটের পদবী বোতলওয়ালা। প্রবাদ আছে যে প্রথম স্যর্ জমসদজী বোতল বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন ও ক্রমে বাণিজ্যকার্যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া তাহার সদ্ব্যয় দ্বারা ব্রিটিশ নাইটের উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। অপর একজন পারসী নাইটের

উপাধি Ready money (নগদ-কড়ি) কিন্তু ইনি ভারত নক্ষত্রের নাইট, ইহার নাম স্যর্ কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, ইনিও উদারতা ও বদান্যতায় নাইট পদবী পাইয়াছেন। এমন কোন হিতকর বিষয় নাই, যাহাতে ইহার দান প্রকাশ না পায়, ইহার দান দেশ-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ নহে। সকল জাতির জন্যই ইহার ধনাগার মুক্ত রহিয়াছে। ইংল্যন্ডবাসীদের দারিদ্র্য-মোচনই বল, স্বদেশের কল্যাণ-সাধনই বল, ইহার নগদ টাকা সর্বত্রই কার্যে আইসে।

বঙ্গদেশ ও বোম্বায়ের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায়, বঙ্গদেশে নাম-রাজ্য অপেক্ষাকৃত সুবিস্তীর্ণ। বঙ্গবাসীর মধ্যে দেব-দেবীর নামেরও অভাব নাই — দ্বারকানাথ, গোপীমোহন, গোকুলকৃষ্ণ, নবগোপাল, শারদা, বরদা, লক্ষ্মী প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। তদ্ভিন্ন প্রকৃতির মনোহর সুন্দর পদার্থ হইতে আমরা অনেক সময়ে নাম গ্রহণ করি। এদেশে প্রায় সেরূপ নাম শুনা যায় না, যেমন — চারুচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, শশীন্দ্র, নীলকমল ইত্যাদি। কতকগুলি নাম গুণবাচক; যথা — সত্য, করুণাধর, প্রতাপ, মনোমোহন; আর কতকগুলি নাম রাজা অথবা বীরসংজ্ঞক; যথা — রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র, শূরেন্দ্র, মহীন্দ্র, নরেন্দ্র। এ সকল নাম এ প্রদেশে প্রচলিত নাই। স্ত্রীলোকের নাম তুলনা করিয়া দেখিলেও বঙ্গাঙ্গনাদের প্রাধান্য দিতে হয়। বঙ্গাঙ্গনাদের নামে বিচিত্রতা ও শ্রুতিমাধুর্যের পরাকাষ্ঠা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, সৃষ্টির সমুদয় মধুর পদার্থ হইতে সেই সকল নাম সংগৃহীত। সৌদামিনী, ঊষা; নলিনী, কুমুদিনী, মালতী প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্প; ঋতুপ্রধান বসন্ত ও শরতের অধিষ্ঠাত্রী কুমারী; সুশীলতা, দয়া, করুণা প্রভৃতি গুণসমূহ; স্বর্ণ, হীরা, মুক্তা, মণি-মাণিক্য এ সকলই বঙ্গাঙ্গনাদিগের নামের কল্পতরুস্বরূপ। নামের সঙ্গে গুণের যোগ থাকা স্বাভাবিক হয়, তবে বঙ্গস্ত্রীদের মত রূপগুণসম্পন্ন নারীরত্ন কোথায় পাওয়া যাইবে?

বোম্বাই শহরের গানবাজনা

ষষ্ঠ পত্র

তুমি আমাকে এদেশের গানবাজনা কিরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছ — আমার যা মনে হয় বলি। বাঙ্গালীরা যেমন গানবাজনাভক্ত আমি যতদূর দেখিয়াছি এ দেশের লোকেরা তেমন নয়। বাঙ্গালী আমোদপ্রিয় শৌখিন জাতি, আমাদের দেশে ভদ্রলোকদের মধ্যে যতটা সঙ্গীতের চর্চা এদেশে সেরূপ দেখা যায় না। আমার একজন মহারাষ্ট্রী বন্ধু বলিতেছেন তিনি কলিকাতায় গিয়া দেখিলেন বাঙ্গালীরা অত্যন্ত তামাক ও সঙ্গীতপ্রিয় — যে বাড়ীতে যাও একটা হুঁকা ও তানপুরা। হুঁকা তাঁর চক্ষে নূতন ঠেকিয়াছিল কেন না এদেশে উচ্চ জাতীয় হিন্দুদের মধ্যে তামাকের বড় আদর নাই। কোন কোন স্থানে আফিম চলিত — কিন্তু ভদ্রসমাজে ধূমপান অতি বিরল। তানপুরা ছড়াছড়ি দেখিয়া প্রতীতি হইল বাঙ্গালীরা সঙ্গীত রসজ্ঞ। তাই বলিয়া এমন মনে করিও না যে এদেশে গীতবাদ্যের চর্চা বা মর্যাদা আদবে নাই, তবে আমার মনে হয় যে সঙ্গীতবিদ্যা প্রায়ই পেশাদারী লোকদের মধ্যে বদ্ধ। ভদ্রলোকের মধ্যে গানবাদ্যে সুনিপুণ অতি অল্পলোকই দেখা যায়।

সামান্যতঃ বলা যাইতে পারে গীতের আদর্শ হিন্দুস্থানী খেয়াল ধ্রুপদ। এই সাধারণ নিয়ম — স্থানে স্থানে রূপান্তর দৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্রীদের মধ্যে সাকী, দিন্তি, অভঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি জাতীয় ছন্দের গান শোনা যায়, আর 'লাওনী' নামক একপ্রকার টপ্‌পা আছে তাহাই খাঁটি দিশি জিনিস। আমাদের দেশের খোলকর্তাল সমেত সঙ্কীর্তনের মত উৎসাহোদ্দীপক সমবেত ধর্মসঙ্গীত শ্রুত হওয়া যায় না। এদেশে ধর্ম প্রচারের অন্যতর উৎকৃষ্ট প্রণালী 'কথা'। একটি ধর্মশিক্ষা নীতিসূত্র — তার ব্যাখ্যা — পরে গান ও উপন্যাসছলে তাহার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া দেখান — এই হচ্ছে কথা। পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে হৃদয়গ্রাহী উপন্যাসাবলী বিবৃত করিয়া বলা বাঙ্গালা দেশের কথকতা — কথা একটু আলাদা ধরনের জিনিস। কথার আদ্যোপান্তে একটি ভাবসূত্র গ্রথিত থাকে — সেইটি বিস্তার করিয়া শ্রাবকদের মনে মুদ্রিত করাই কথার উদ্দেশ্য। এই স্থলে যে সকল কবিতা ব্যবহৃত হয় তাহা তুকারাম প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় প্রাচীন কবিদিগের কাব্যখনি হইতে সংগৃহীত। আমি একবার 'কথা' শুনিয়াছিলাম তাহাতে বিনয়ের মাহাত্ম্য, ঔদ্ধত্যের পরাভব সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছিল। যে বিষয়টি অবলম্বন করিয়া কথা হইয়াছিল তাহা তুকারামের এই অভঙ্গ,

লহানপণ দে গা দেবা
মুগী সাখরেচা রবা।
ঐরাবতী রত্ন থোর
ত্যালা অঙ্কুশাচা মার॥

এই কবিতাটি কি তোমার সুশ্রাব্য বলিয়া বোধ হইল? থোর মার — দেবা রবা — এ কি অদ্ভুত মিল! এই শ্লোকটির অনুবাদ নিম্নে লিখিয়া দিতেছি —

হে দেব দেও নম্রপনা
পিপীলিকা পায় মিষ্টকণা
ঐরাবত বৃহত বারণ
তার শিরে অঙ্কুশ তাড়ন॥

"কথা" প্রসঙ্গে কবিতার মাঝে মাঝে এক একটা গান আসে। গানের ধুয়ায় উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ কথকের সঙ্গে সমস্বরে যোগ দেন — অবশেষে কথক মহাশয়ের বন্দনাদি হইয়া কথা ভঙ্গ হয়।

আমি এইমাত্র বলিলাম গানবাজনা পেশাদারের মধ্যে বদ্ধ কিন্তু এ নিয়মের একটা বিপরীত দৃষ্টান্ত মনে হইতেছে। গুজরাটে গরবা বলিয়া একপ্রকার সঙ্গীত সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। ভদ্রঘরের স্ত্রী পুরুষ ইহাতে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হন না। আশ্বিন মাসে নবরাত্রি উৎসবের আরম্ভ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই গরবা গানের ধুম লাগিয়া যায়। আহমদাবাদ সুরাট বরদা প্রভৃতি গুজরাটের প্রধান প্রধান সহরে কুলস্ত্রীগণ গরবা গান করে। নাগর ব্রাহ্মণ, গুজরাটী ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণিত, সুরাটের নাগর রমণীগণ গরবা গানের জন্য বিখ্যাত। এই গানের প্রধান বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম। বিবাহ প্রভৃতি গার্হস্থ্যের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কখনও কখনও নাগর রমণীগণের গরবা গান হয়। যাঁহারা তাহাদের মধ্যে সুগায়ক, বন্ধুবাটীতে গান গাহিবার জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণ হয়। গরবা একজনেও গাইতে পারে কিন্তু সচরাচর একদল মিলিয়া গায়। গরবা গাইবার রীতি এই — একদল গায়িকা চক্র বাঁধিয়া ঘুরিয়া করতালি দিতে দিতে গান আরম্ভ করে। আরম্ভের সময় প্রধান গায়িকা দুই এক তান ধরে পরে তাহাতে আর সকলে যোগ দেয়। প্রতি পংক্তি কিম্বা চরণ দুবার করিয়া গীত হয়। এমনও হইতে পারে যে কেবল ধুয়াতে সকলে সমস্বরে যোগ দেয়, অবশিষ্ট অংশ প্রধানা কর্তৃক সঙ্গীত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে বর্ণনা করিয়া ভাল বুঝান যায় না — শ্রবণেই ইহার স্বাদ গ্রহণ। অতএব আমার অনুরোধ এই একবার বোম্বাই আসিয়া এখানকার গীতবাদ্য শ্রবণ কর — দুর্গোৎসবের অবকাশ ইহার প্রশস্ত সময়।

'বাইনাচ' বলিলেই নৃত্যের প্রণালী কি বুঝিতে পারিবে। নাচের মধ্যে অবশ্য গান অন্তর্ভূত এমনকি প্রধান অঙ্গ বলিলেও হয়। এদেশে গানের ভাল ওস্তাদ সচরাচর দেখা যায় না — নর্তকীর মুখেই যা কিছু ভাল গান শুনা যায়। আমার মনে আছে একবার কারওয়ারে একজন কর্ণাটী নর্তকীর মুখে জয়দেবের কবিতা গান শুনিয়াছিলাম, গান অতি চমৎকার আর তেমন শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ বঙ্গদেশের বড় বড় পণ্ডিতের মুখেও শুনা যায় না। সংস্কৃত নাটকে স্ত্রীলোকের মুখে প্রাকৃত দিবার রীতি আছে কিন্তু সংস্কৃতও তাহাদের মুখে কত ভাল শুনায়

তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। এদেশে কেরল * নামে একপ্রকার নৃত্য আছে, আহাতে নটী পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া সুতাকাটা, ঘুড়ি উড়ন, সাপুড়ের ভেঁপু বাজান ইত্যাদি নানা বিষয়ের তালে তালে নকল করিয়া দেখায়। ইহাতে গতির কবিত্ব না থাক — ইহা কৌতুকজনক নৃত্য বটে। কর্ণাটক দেশ নানাবিধ কলাকৌশলের জন্য বিখ্যাত। ওদেশে নর্তকীদলেরও বিশেষ প্রাদুর্ভাব। ইউরোপে সামান্যতঃ নরনারী একত্রে মিলিয়া নাচিবার রীতি আছে তাহা যদিও এদেশে দুর্লভদর্শন কিন্তু কোন কোন স্থলে একদল নর্তকী মিলিয়া নৃত্য করিতে দেখা যায়। কানেড়ায় দেখিতাম একদল নর্তকী প্রতিজনে এক এক যষ্টিখণ্ড হস্তে করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিত — তালে তালে যষ্টির পরস্পর সংঘট্টন — সে এক সুন্দর দৃশ্য — তাহাতে একটু চলাফেরার সৌন্দর্য দেখা যায়।

একবার একস্থানে 'পালকী' নাচ দেখিয়াছিলাম সে অতি চমৎকার। মনে কর একটি বালিকা পালকীর ভিতরে শয়ান — আর পালকীটি তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। স্ত্রীলোকটির যে আসল পা তাহা নীচে পালকীর কাপড়ে অদৃশ্য হইয়া রহিয়াছে। আর যে পা দেখা যায় তাহা নকল পা — ঠিক বোধ হয় একটি বালিকা পালকীর মধ্যে ঠ্যাসান দিয়া বসিয়া আছে আর তার বাহন কি এক মন্ত্রবলে নাচিয়া বেড়াইতেছে।

কালের বিচিত্র গতি। রুচির পরিবর্তন হইতেছে। পুরাতনের রাজ্য গিয়া নূতনের অধিকার প্রসৃত হইতেছে। এক্ষণে বাইনাচ, যাত্রা, কথা কাহারও ভাল লাগে না এখন নাটকের পালা পড়িয়াছে। সেখানে যাও পারসী নাটক হিন্দু নাটকের ডঙ্কাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে। সে দিন এক পারসী নাটকের দলপতি আসিয়া আমাকে মুরব্বি ধরিয়াছিল — আমি অগত্যা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। অনেকগুলি নাটকের ছাপা কাগজ আমার নিকট পাঠান হইল তাহার মধ্য হইতে আমার যাহা ইচ্ছা বাছিয়া লইলে সেই নাটক অভিনীত হইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে শকুন্তলা আমার মনোনীত হইল — তাহার অভিনয় দেখিয়া আমার আপাদমস্তক সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। শকুন্তলা একালের পারসী মেয়ের বেশে আসিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইল — দুষ্মন্ত উনবিংশ শতাব্দীর নবেল-বর্ণিত প্রণয়ী। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ হিন্দুস্থানী ভাষাতে গান করিতে লাগিল। দুষ্মন্তের পুত্র সেও একেলে ধরনের বালক; পিতাকে দেখিয়া তাঁহার উপরে একটা বই ছুঁড়িয়া মারিল। আর সে যে আশ্রম, যে ঋষিবালক যে কণ্বমুনি — কালিদাস স্বকৃত নাটকের এইরূপ অপব্যবহার দেখিলে কি মনে করিতেন বলিতে পারি না।

মহারাষ্ট্রীদের মধ্যেও নাটকের কতকগুলি বিখ্যাত দল আছে তাহারা শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক, নারায়ণরাও পেশওয়ার বধ নাটক উৎকৃষ্ট অভিনয় করিয়া থাকে। এই সকল নাটকে গণেশ সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর নৃত্যগীত হইয়া রীতিমত কর্মারম্ভ হয়। গুজরাতে ভাবইয়া নামে এক ভাঁড়ের দল আছে অনেক বৎসর হইল অহমদাবাদে একবার তাহার যাত্রা শুনিয়াছিলাম।

* দাক্ষিণাত্য মালাবারবাসীগণ সংস্কৃত গ্রন্থে কেরল বলিয়া অভিহিত।

যাত্রা কথাটি ঠিক হইল না। তাহাদের অভিনয়ে যাত্রার মত গানের প্রাচুর্য নাই — সং-এর ভাগটাই অধিক। ভাবইয়ার নকল করিতে বিলক্ষণ মজবুত। আমি যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন বোম্বায়ে "সেয়র-মেনিয়া" রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই "সেয়র" কিনিবার জন্য পাগল। যে দরিদ্র সে এক রাত্রের মধ্যে ধনী হইবে — যার সচ্ছল অবস্থা সে লক্ষপতি — যে লক্ষপতি সে ক্রোড়পতি হইবে — সকলেই সহজ উপায়ে টাকা করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ গুজরাটী মহারাষ্ট্রী সকলেই সেয়র কিনিবার জন্য লালায়িত। যাহার সঙ্গতি আছে সে আপনার যথাসর্বস্ব দিয়া ব্যাকবের এক সেয়র লাভ করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। সেই ঝোঁকে ইংরাজী দেশীয়ের মধ্যে অনেক মেলামেশা হইত — নেটিব তখন নীচ বলিয়া ঘৃণিত হইত না। লক্ষ্মীর অনুগ্রহে ইংরাজ নেটিব দিনকতক সমকক্ষ হইয়া চলিয়াছিল — তাহাদের তখন গলাগলি ভাব দেখে কে। "সেয়র" বাজারের বাজা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ — তিনি তখন ক্রোড়পতি — তাঁহার অঙ্গুলীর এক ইঙ্গিতে সেয়রের বাজার নিয়ন্ত্রিত হইত। ইংরাজেরা তখন তাঁহার দরবারে গিয়া খোশামোদ করিতে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিতেন না। মেমসাহেব পর্যন্ত কখন কখন সেয়র ভিক্ষা করিতে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইতেন। এই বিষয়টি সেই গুজরাতী ভাঁড়েরা সুন্দর নকল করিয়াছিল। সাহেব তাঁহার মেমকে সঙ্গে লইয়া সেয়র আবদারের জন্য বাহির হইয়াছেন — এদিকে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে হাস্যের ফোয়ারা উঠিল। ইহার মধ্যে ওদিকে ও কি গোলযোগ উপস্থিত। চটাপট চপেটাঘাতের শব্দ উঠিল। একজন ইংরাজ তাঁহার জাতির ওরূপ উপহাসজনক নকল সহিতে না পারিয়া বেচারা ভাঁড়দের উপর উত্তমমধ্যম প্রহার আরম্ভ করিলেন — সেই গোলমালে মজলিস ভাঙিয়া গেল। ভাঁড়ের খেল বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইল — আমরা হাসি কি কাঁদি কিছু ঠিক করিতে পারিলাম না।

সমাজসংস্কার

সপ্তম পত্র

এবারকার পত্রে এদেশীয় হিন্দুসমাজ সংস্কার বিষয়ে দুই এক কথা বলিবার ইচ্ছা করি।

সমাজসংস্কার

পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ বর্তমান হিন্দুসমাজ ও ধর্মের সারভূত দুই প্রধান অঙ্গ। হিন্দু সমাজশৃঙ্খলার মূলে জাতিভেদ ও হিন্দুধর্মের শিরে শিরে পৌত্তলিকতা। সংস্কারকর্তাগণ কালবিশেষ ও অবস্থাবিশেষে কেহ জাতিভেদ প্রথা কেহ বা পৌত্তলিকতা এই দুই ভিত্তির উপর সাধ্যানুসারে অস্ত্রাঘাত করিয়া আসিতেছেন। সমাজ সংস্কারের প্রতি যাঁহাদের একান্ত লক্ষ তাঁহারা জাতিভেদ উন্মূলন করিতে ব্যগ্র — ধর্মসংস্কার যাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহারা পৌত্তলিকতাব উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান। পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন মানসে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে সনাতন বেদবেদান্ত প্রতিপন্ন একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের উপাসনা প্রচারে কৃতসংকল্প হন তাহাই এইক্ষণে ব্রাহ্মধর্মে পরিণত হইয়াছে। এ প্রদেশে ব্রাহ্মধর্মের বীজ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহা হইতে আশানুরূপ ফলোৎপত্তি দৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব সাধারণ হিন্দুসমাজে অদ্যাপি প্রবেশ লাভ করে নাই। এদেশে হিন্দুধর্মের দুর্গ আটেঘাটে এমনি দৃঢবদ্ধ যে তাহা ভেদ কবা কঠিন ব্যাপার। জাতিভেদের শৃঙ্খলও তেমনি কঠোর। সময়ে সময়ে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের যেসকল চেষ্টা হইতেছে তাহাতে বিশেষ ফলোদয় উপলক্ষিত হয় না। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বাধা দিবার ক্ষমতা প্রচুর, উন্নতির পথে পদক্ষেপ করিবাব শক্তি নাই। এই সমাজে যাহা কিছু পরিবর্তন — যাহা কিছু উন্নতি প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা বাহিরের সংশ্রবে, সমাজের নৈসর্গিক নিজ বলে তাহা সাধিত হইতেছে না। ইংরাজি শিক্ষার ফলে — পাশ্চাত্য সভ্যতার সংশ্রবে এখন আমাদের নবজীবনের সূত্রপাত। বোম্বায়ে ইংরাজি উচ্চশিক্ষা পত্তন হইবার অনতিকাল পরে একদল শিক্ষিত যুবক সমাজ সংস্কারে কটিবদ্ধ হয়েন, কিন্তু সেই বামন বলপ্রয়োগে রাক্ষস সমাজের কি হইবে? সমাজের এক অঙ্গুলীর তাড়নে উদ্ধত যুবকদল রণে ভঙ্গ দিয়া কে কোথায় ছুটিয়া পালাইলেন তাহার ঠিকানা নাই। শিক্ষিতমণ্ডলী হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট; সমাজ সংস্কারের আবশ্যকতা তাঁহাদের অনেকেরই মনে জাজ্বল্যমান কিন্তু কি উপায়ে তাহা সাধিত হইবে সে বিষয়েই বিষম মতভেদ। কাহারো মত এই যে জোর জবরদস্তি করিয়া জাতিবন্ধন ভাঙিয়া ফেল — সামাজিক কুরীতি কুসংস্কার উৎপাটন কর। তদপেক্ষা শান্ত ও দূরদর্শী লোকেরা বলেন, জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি সাধন করিয়া আস্তে আস্তে সংস্কারের সোপান প্রস্তুত কর — মূলে কুঠারাঘাত কর বৃক্ষ আপনা হইতেই ভূমিসাৎ হইবে। এই প্রয়াসশীল ও রক্ষণশীল দুই দলের মধ্যে প্রথম হইতেই দলাদলি বিবাদ বিচ্ছেদ।

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী* নামে এক উন্নতচেতা মহাপুরুষ বোম্বায়ে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি যেমন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন তেমনি ধর্মনিষ্ঠ সচ্চরিত্র সাধুপুরুষ ও আপামর সাধারণের ভক্তিভাজন ছিলেন। এদিকে শিক্ষা বিভাগে তিনি উচ্চ পদারূঢ় কর্মচারী — ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যেও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির সম্মান, অথচ তাঁহার শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার নম্র স্বভাব ও বিনয়গুণে তিনি সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার চেহারা বেশভূষাতে কে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য — তাঁহার আন্তরিক মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারে? এ বিষয়ের একটা কৌতূহলজনক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এক ব্যক্তি তাঁহার গুণকীর্তনে মোহিত হইয়া পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে বাটীতে তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ডেস্কে ভর দিয়া কি এক দুরূহ প্রবন্ধ লিখিতেছেন এমন সময় সেই ব্যক্তি গিয়া উপস্থিত। লেখকটিই যে বালশাস্ত্রী তাঁহার ভাবসাবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত কখন সাক্ষাৎ হইবে। তিনি কাজে ভয়ানক ব্যস্ত, সময় নষ্টের ভয়ে উত্তর করিলেন আর কতকঘণ্টা বিলম্বে আসিলে অমুক সময়ে সাক্ষাৎ হইতে পারে। আগন্তুকের প্রস্থান ও যথানির্দিষ্ট সময়ে পুনঃপ্রবেশ। বালশাস্ত্রী সেই স্থানেই বসিয়া — কেবল সামনে গ্রন্থ কাগজ কলম নাই। আগন্তুক ব্যক্তি যখন জানিতে পারিলেন যে এই সামান্য বেশধারী খর্বকায় ব্যক্তিই সেই বালশাস্ত্রী তখন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। বালশাস্ত্রীর যত্নে বোম্বাযে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয। মফস্বলের নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থী আহরণ করা — নিজ গৃহের নিকট তাহাদের বাসস্থান ভাড়া করিয়া দেওয়া, তাহাদের যথাযোগ্য শিক্ষাদানও সর্বতোভাবে তত্ত্বাবধান করা এই সকল বিষয়ে তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি ছিল না। এই সকল বিদ্যার্থীদিগকে শিক্ষা দিয়া জ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী করা তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি সমাজসংস্কর্তা বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন না ও সমাজ বিপ্লবকারী সেকালের শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গেও যোগ দিতেন না। বিশুদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়া অল্পে অল্পে সমাজসংস্কার করা তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়। তিনি বলিতেন ধর্মভিত্তির উপর সমাজসংস্কার স্থাপন কর নতুবা স্থায়ী ফলের প্রত্যাশা নাই। এই বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য। তিনি এত সাবধানে কার্য করিয়াও গোঁড়া হিন্দুদের কটাক্ষ এড়াইতে পারেন নাই। জাতিতে পহ্লাড় ব্রাহ্মণ কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী বলিয়া ঘৃণা করিত। তাহার কারণ এই, তাহার জাতির অনুরোধে কর্তব্য পালনে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাহার দৃষ্টান্ত, রেভরেন্ড নারায়ণ শেষাদ্রির ভ্রাতা শ্রীপাদ শেষাদ্রি অকারণে জাতিভ্রষ্ট হন। জাতে উঠিবার আবেদন করিলে একদল গোঁড়া হিন্দু তাঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, এই লইয়া হিন্দুসমাজে মহা হুলুস্থুল বাধিয়া গেল। শাস্ত্রী মহাশয় প্রাণপণে

বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী

* ইন্দুপ্রকাশ সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে ২ মার্চ ১৮৮৫ হইতে কতিপয় সংখ্যায় Political Rishi স্বাক্ষরিত কয়েকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা হইতে বালগঙ্গাধর শাস্ত্রীর জীবনী ও পরমহংস সভাব বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

পতিতোদ্ধারের সাহায্যে তৎপর হইলেন ও নিজে অশেষ অন্যায় উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও শ্রীপাদের বহিষ্কার কলঙ্ক মোচনে কৃতকার্য হয়েন, এদেশে কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার উপর জয়লাভের এই প্রথম দৃষ্টান্ত। দুর্ভাগ্যবশতঃ বালশাস্ত্রী অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন — তিনি ১৭ই মে ১৮০০ অব্দে ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার ধর্মসংস্কারের যে ইচ্ছা — সে মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। আমাদের সন্ধ্যা গায়ত্রীর মধ্যে যে গূঢ়ার্থ যে উচ্চ উপদেশ প্রচ্ছন্ন আছে তাহা বিবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহাও সিদ্ধ হইল না। তাঁহার অকালমৃত্যুতে সমাজ সংস্কারের বিস্তর হানি জন্মে — সে ক্ষতিপূরণ করে আজ পর্যন্ত এমন লোক উদয় হইল না। তাঁহার মৃত্যুর পর শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে আর এক নূতন ভাব প্রবেশ করিল — তাহার কার্যপ্রণালী স্বতন্ত্র, ও ফলে কি দাঁড়াইল তাহার বিবরণ বলি শুন।

কলিকাতায় ডিরোজিও ও ডাক্তার ডফের আমলে নব্যবঙ্গের মধ্যে যে অশান্ততা, যে প্রচণ্ড রুদ্রভাবের আবির্ভাব হয় তাহা শুনিয়া থাকিবে। কতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক জাতিচ্ছেদ ব্রতে ব্রতী হইয়া হিন্দু সমাজের সহিত যে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন বোম্বায়ের ইতিহাস পৃষ্ঠায়ও তাহার অবিকল প্রতিরূপ মুদ্রিত দেখা যায়। মৃত কৃষ্ণমোহন বন্দ্য সেকালের ইঙ্গবঙ্গদের নেতা — তাঁহারা যেসকল কাণ্ড করিয়া গিয়াছেন তাহা বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধই আছে, ডিরোজিওর টেবিলে প্রকাশ্যে খানা খাওয়া তাঁহাদের এক কাজ — তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া একদিন কতকগুলি যুবক তাঁহাদের দলপতির ভবনে সম্মিলিত হন। তথায় যথেচ্ছা পানাহার করিয়া তাঁহারা গোমাংস হস্তে উন্মত্তের ন্যায় রাস্তায় বাহির হইয়া জনৈক ভক্ত বৈষ্ণবের প্রাঙ্গণে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া আসেন। কিন্তু এ উদ্যম অধিককাল টিকিতে পারে নাই। হিন্দু সমাজের শাসনে শীঘ্রই তাহাদের চৈতন্যোদয় হয় ও এই দুঃসাহস ব্রতে জলাঞ্জলি দিয়া নিস্তার পান।

কৃষ্ণ বন্দ্য

ইহার ১৫ বৎসর পরে বোম্বায়ে সমাজসংস্কারের সূত্রপাত হয় ও উভয়ের শেষ দশা একই প্রকার। এই উভয় বীরদলের কার্যপ্রণালী যে একই প্রকার তাহা নহে। মহারাষ্ট্রীরা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা Practical কাজের লোক — তাঁহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মাদের ন্যায় বাহির না হইয়া অতি সন্তর্পণে গুপ্তভাবে কার্যারম্ভ করেন। বাঙ্গলায় যেমন কৃষ্ণ বন্দ্য, বোম্বায়ে তেমনি দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ, প্রসিদ্ধ ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গের ভ্রাতা, এই দলের দলপতি। এই দুই ব্যক্তি একই ধরনের লোক। উভয়েই সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন — উভয়েই খৃষ্টধর্ম তত্ত্ববিশারদ। উভয়েরই ধর্মের ভাব প্রবল — প্রভেদ এই, কৃষ্ণ বন্দ্য খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দুসমাজের সহিত সমুদয় বন্ধন ছেদন করিলেন। দাদোবার ঝোঁক ঐ দিকে কিন্তু খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। ধর্ম বিষয়ে তিনি অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন — কোন্ ধর্ম সত্য, কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, দাদোবার উৎসাহ — তাঁহার বশীকরণ শক্তি —

দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ

সামাজিক অনীতি অত্যাচারের উপর জ্বলন্ত বিদ্বেষ এই সকল বিষয়ে তিনি কৃষ্ণ বন্দ্যের সমতুল্য ছিলেন ও ইনি যেমন কলিকাতায় উনি তেমনি বোম্বায়ে কতিপয় শিক্ষিত যুবকের নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন।

বাল শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ বোম্বাই নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। এই তাঁহার অবসর — সেই স্কুলের ১২ জন ব্রাহ্মণ ছাত্রকে তাঁহার কাজের উপযোগী হাতিয়ার পাইলেন ও নিজ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শীঘ্রই তাহাদিগকে শিষ্য করিয়া লইলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অপরাপর বিদ্যালয়েও অনুপ্রবিষ্ট হইল।

পরমহংস সভা

জাতিভেদ প্রথা ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কুরীতি নিবারণ উদ্দেশ্যে এক সভার সৃষ্টি হইল, তাহার সভ্যগণ ফ্রীমেসনদের ন্যায় গোপনে কার্য সাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। এই সভার নাম পরমহংস। হংস যেমন জলীয় ভাগ ফেলিয়া দিয়া দুগ্ধ বাছিয়া লয় সেইরূপ সকল বস্তুর মন্দ পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুণ গ্রহণ করা এই সভার উদ্দেশ্য। জন্মিয়াই হিন্দু সমাজের প্রতি বাণ বর্ষণ ইহার প্রথম উদ্যম। বাহিরের লোকের দৃষ্টিবহির্ভূত বিজন স্থানে অকুতোভয়ে সম্মিলিত হইয়া কাজ করিতে পারেন তাহার উপযোগী স্থান চাই — অনেক খুঁজিয়া সভ্যেরা একটা বাড়ী সংগ্রহ করিলেন। বাড়ীর কর্তা তাঁহাদের দিতে প্রস্তুত কিন্তু একটি ভাড়াটে ব্রাহ্মণ তাহাতে বাস করিতেন। তিনি আততায়ীদিগের দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া ছাড়িয়া যাইতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। অনেক বাদানুবাদের পর বাসেন্দা এক ফন্দী করিলেন। তিনি তালাচাবি দিয়া ঘর বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়িলেন — ভাবিলেন তাঁহার দেবদেবীর বিগ্রহ সকল ঘরের মধ্যে সুরক্ষিত। পরমহংসগণ তাহাতে নিবারিত হওয়া দূরে থাকুক তাঁহাদের বল ও সাহসের পরিচয় দিবার অবসর পাইলেন। সেই লোকটির অবর্তমানে তালাচাবি ভাঙিয়া প্রতিমা সকল এককোণে সরাইয়া স্বচ্ছন্দে ঘর দখল করিয়া লইলেন। এখানে কিন্তু তাঁহারা অধিক দিন রাজত্ব করেন নাই — গিরগামের এক অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট গৃহে শীঘ্র উঠিয়া যান। প্রতি সপ্তাহে একদিন সভার অধিবেশন হইত। ঈশ্বর প্রার্থনার পর কর্মারম্ভ এই যা ধর্মের সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক। আর সকল বিষয়ে সভার উদ্দেশ্য সামাজিক। কোন ব্যক্তি সভ্যপদে দীক্ষিত হইবার পূর্বে তাঁহার প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে তিনি জাতিভেদ স্বীকার করেন না, পরে পাঁওরুটির টুকরো মুখে করিয়া আপনার অকৃত্রিম বিশ্বাসের পরিচয় দিতে হইত, তদনন্তর সভার রেজিষ্টরে নাম স্বাক্ষর করিয়া সভ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতেন। প্রথম কয়েক বৎসর মুসলমানের হস্ত হইতে জলগ্রহণ করিবারও বিধান ছিল।

দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গ, রাম বালকৃষ্ণ এইরূপ কতকগুলি লোকের যত্ন ও উৎসাহে ক্রমে সভ্যদল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পুনা, আহ্মদনগর, থানাযশ, বেলগাম প্রভৃতি মফস্বলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরমহংস সভার শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হইল। সভ্য সংখ্যা কত ঠিক নির্ণয় করা অসাধ্য তথাপি সভার শ্রীবৃদ্ধিকালে অন্যূন ৫০০শ আন্দাজ করা যায়।

এই সভা প্রায় বিশ বৎসর কাল জীবিত ছিল। যদিও ইহার সাপ্তাহিক অধিবেশনে গোপনে কার্য নির্বাহ হইত তথাপি সময়ে সময়ে সভ্যদের উৎসাহ উথলিয়া উঠিয়া নির্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে দেখা গিয়াছে। একবার তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি যুবক কেল্লার এক রুটিওয়ালার দোকানে পাঁওরুটি কিনিয়া সেই রুটি হস্তে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া তাঁহাদের গৃহদ্বারে উপনীত হন। তাঁহাদের সাপ্তাহিক অধিবেশনে দীক্ষা ও তর্কবিতর্ক ভিন্ন আর বিশেষ কোন অনুষ্ঠান হইত না। কিন্তু বার্ষিক প্রীতিভোজ এই সভার এক প্রধান অনুষ্ঠান ছিল। সেই সময়ে মফঃস্বলের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে পরমহংস দল সমবেত হইয়া জাতি নির্বিশেষে একত্রে পান-ভোজন করিতেন।

কিন্তু এইরূপে অধিক দিন যায় নাই — পরমহংসমণ্ডলীর শীঘ্রই সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে হিন্দু-ধর্ম ও জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন সহজ নহে। এক সামান্য ঘটনা হইতে এই বালির বাঁধ ভাঙিয়া গেল। কোন এক ব্যক্তি (কে তাহা প্রকাশ হয় নাই কিন্তু সভ্যদের মধ্যে নিঃসন্দেহে একজন) সভার খাতাপত্র হরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহাতে সভার যত গুহ্য কথা — সভ্যদিগের নাম, তাহাদের জাতিচ্ছেদের প্রতিজ্ঞা যাহা কিছু নিহিত ছিল সকলি বাহির হইয়া পড়িল। হিন্দুসমাজে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। যতদিন পর্যন্ত সভার গুহ্য কথা প্রকাশ হয় নাই ততদিন হিন্দুসমাজ সন্দেহ করিয়াও তাহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় নাই, গুপ্ত কথাসকল ফাঁস হইয়া গিয়া সকলের চিত্তে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। হিন্দু সমাজের কাছে তাঁহারা বমালসুদ্ধ ধরা পড়িলেন। তাঁহারা ভয়ে একে একে সরিয়া পড়িলেন — পলাতকদের দৃষ্টান্তে যথার্থ বীরের হৃদয়ও দমিয়া গেল। সভা ভগ্ন চূর্ণ হইয়া ধরণীতলে লুণ্ঠিত হইল। তিনি এমন দুর্বল যে অল্প একটুকু আঘাত পাইয়া সমূলে নির্মূল ও অদৃশ্য হইয়া গেল। জনসমাজে গভীর-নিখাত কোন কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে প্রথমে লোকের মন নবমার্গে চলিবার জন্য প্রস্তুত করা আবশ্যক। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুসমাজে এরূপ বদ্ধমূল যে উহার সহিত সম্মুখযুদ্ধে জয়লাভের আশা দুরাশা মাত্র। আক্রমণের অন্যতম কৌশল অবলম্বন করা কর্তব্য। ধর্মোৎকর্ষ সাধন, বিদ্যালোক প্রকাশ, স্ত্রীশিক্ষা দান, গার্হস্থ্যপ্রণালী সংশোধন ইত্যাদি উপায়ে সামাজিক উন্নতি সাধন কর, জনসমাজে সভ্যতার বিস্তার কর, জাতিভেদ বন্ধন আপনাপনি শিথিল হইয়া আসিবে। এখনি দেখ ঐ সকল কারণে হিন্দুসমাজে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেকাল ও একালে একবার তুলনা করিয়া দেখ। তখনকার কালে জাতিভেদের কি কঠোর নিয়ম ছিল, 'রাজনীতিজ্ঞ ঋষি' তাহার এক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। কতকগুলি ইংরাজ বোটে করিয়া গঙ্গা ভ্রমণকালে দেখিলেন গঙ্গার উপর এক মনুষ্যদেহ ভাসিয়া যাইতেছে। বোম্বায়ে জাতিবন্ধন অপেক্ষাকৃত কঠিন তথাপি পূর্বকালের তুলনায় কত শিথিল হইয়া আসিতেছে। জাতির শৃঙ্খল অপেক্ষা ঘটনাস্রোত বলবত্তর। পূর্বে নীচ জাতির স্পর্শে ব্রাহ্মণ আপনারে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন, এইক্ষণে রেলওয়ে গাড়ীতে উচ্চনীচ জাতি একসঙ্গে বসিয়া ভ্রমণ করেন। প্রথমে যখন

বোম্বাই হইতে একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ 'কালা পানি' পার হইয়া ইংলন্ড যাত্রা করেন তাঁহার প্রত্যাগমনকালে হিন্দুসমাজে যে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয় পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ বিষয়ে বিলক্ষণ পরিবর্তন দর্শন করা যায়। এইক্ষণে সমুদ্রপারযাত্রী হিন্দুসন্তান ফিরিয়া আসিয়া পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন না ও নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া তিনি জাতির সমক্ষে সংশোধিত হন। এই পার্লামেন্টে প্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষে বোম্বাই প্রেরিত হিন্দু প্রতিনিধি ইংলন্ড হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইবার পর জাতির খাতিরে তাঁহার সাদর সৎকারের কোন ত্রুটিই হয় নাই। দেখ সেকাল ও একালে এ বিষয়ে কত প্রভেদ।

প্রার্থনাসমাজ

পরমহংসমণ্ডলীর ধ্বংস হইবার পর তাহার ভগ্নাবশেষ হইতে বোম্বায়ে প্রার্থনাসমাজ উত্থিত হইয়াছে। ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ এই সমাজের প্রধান নেতা। তাঁহার ও তৎসদৃশ আর কতকগুলি সজ্জনের যত্ন ও উৎসাহে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এই সমাজ স্থাপিত হয়। জাতিভেদ বাল্যবিবাহ চিরবৈধব্য প্রভৃতি সামাজিক কুরীতি উন্মূলনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমাজ কার্যারম্ভ করেন — পরে সভ্যেরা বিবেচনা করিলেন সামাজিক নিয়মে সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ করাতে কোন ফল নাই — ধর্মোন্নতি সাধন প্রথম কর্তব্য। ধর্ম সংস্কারের সোপান হইতে সমাজ সংস্কার সহজসাধ্য, এই বিবেচনায় পৌত্তলিকতা পরিহারপূর্বক একেশ্বরের উপাসনা প্রচার সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। ইতিপূর্বে কেশবচন্দ্র সেন দুই একবার বোম্বাই আগমন করিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা লোকের মন বিচলিত করিয়া গিয়াছিলেন — ক্ষেত্র প্রস্তুত, উপযুক্ত সময়েই বীজ নিক্ষিপ্ত হইল। ১৮৬৭ অব্দে এই সমাজের প্রথম অধিবেশন ও তদুপলক্ষে আনন্দাশ্রম স্বামী নামক জনৈক বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী হিন্দীভাষায় উপসনাদি কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। ১৮৭২-এ সমাজের স্বতন্ত্র মন্দিরের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর নিহিত হয় ও শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই কার্যে সহায়তা করেন।

সমাজের মূলতত্ত্ব

১। একমাত্র অনন্তস্বরূপ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরই জগতের সৃষ্টিকর্তা।
২। তাঁহার উপাসনাতেই ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল।
৩। তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন তাঁহার উপাসনা।
৪। প্রতিমা পূজা ও অবতার পূজা তাঁহার প্রকৃত উপাসনা নহে।
৫। ঈশ্বরপ্রণীত বিশেষ কোন ধর্মগ্রন্থ নাই।
৬। ঈশ্বরকে পিতা ও সকল মনুষ্যকে পরস্পর ভ্রাতৃস্বরূপ জ্ঞান করা কর্তব্য।

সমাজের এই কয়েকটি মূলতত্ত্ব।

ইহা হইতে প্রতীতি হইবে যে প্রার্থনাসমাজ যদিও ব্রাহ্ম নাম গ্রহণে সঙ্কুচিত তথাপি ইহার মত ও বিশ্বাস অনেকাংশে ব্রাহ্মধর্মের অনুযায়ী। আমার বোধ হয় আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত এই সমাজের বিশেষ সহানুভূতি। অতীতের প্রতি উভয়েরই অটল শ্রদ্ধা — সামাজিক

বিষয়ে উভয়েই রক্ষণশীল। প্রার্থনাসমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনে আদি ব্রাহ্মসমাজের ধরনে ব্রহ্মোপাসনা সঙ্গীতাদি হইয়া থাকে। সঙ্গীত আধুনিক ও তুকারামের অভঙ্গ প্রভৃতি প্রাচীন এই উভয় মিশ্রিত ও এমন সহজ ভাষায় গীত হয় যে তাহাতে উপস্থিত সকলে যোগ দিয়া থাকেন। সমাজের কোন দীক্ষিত উপাচার্য নাই — সভ্যদের মধ্যে যাঁহারা সুবক্তা ও ধর্মোপদেশে সক্ষম তাঁহারাই অবসরক্রমে আচার্য পদ গ্রহণ করিয়া সমাজের সাপ্তাহিক কার্য নির্বাহ করেন।

শ্রমজীবী বিদ্যালয়

যাঁহারা প্রতিজ্ঞাপূর্বক সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা অন্যূন ১০০, তাহার দশমাংশ পৌত্তলিকতা কার্যতঃ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনে সমর্থ হইয়াছেন। অনুষ্ঠান বিষয়ে ইঁহাদের বড় অগ্রসর দেখা যায় না। নূতন আইন অনুসারে রেজিস্ট্রি করিয়া ব্রাহ্মবিবাহ আজ পর্যন্ত দুইটি মাত্র সমাহিত হইয়াছে। এই আইন এখানকার হিন্দুদের হৃদয়গ্রাহী নহে। তাহার প্রধান কারণ এই যে এই আইন অবলম্বন করিবার পূর্বে হিন্দুধর্মভ্রষ্ট বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে হয়। প্রার্থনাসমাজ যে সকল সৎকার্য অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন তাহার মধ্যে প্রধান। সভ্যদের যত্নে এইরূপ চারিটি বিদ্যালয় বোম্বায়ে স্থাপিত হইয়া তথায় প্রায় ৩০০ ছাত্র মহারাট্রী ও ইংরাজি অধ্যয়ন করিতেছে।

প্রার্থনাসমাজ যে শান্ত নিরীহভাবে কার্য করিতেছে তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত হিন্দু সমাজের স্বপ্নগোচর হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তাহার সাপ্তাহিক ভজন পূজনে হিন্দু সমাজের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। হিন্দু সমাজ তাহার ৩৩ কোটি দেবদেবী ও অগণ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত লইয়া সমানভাবে রাজত্ব করিতেছে। পৌত্তলিকতা যেরূপ পরাক্রমশালী তাহা ভাঙিবার বল সে পরিমাণে সমাজে আছে কিনা সন্দেহ। রাবণ বধের জন্য রামের মত বীর চাই— তাহা কোথায়? যে পর্যন্ত না তেজীয়ান্ একনিষ্ঠ ধর্মোপদেষ্টা বোম্বাই সমাজে আবির্ভূত হইবে সে পর্যন্ত প্রার্থনাসমাজের ধর্মবল হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

আর্যসমাজ

পৌত্তলিকতার দ্বিতীয় শত্রু আর্যসমাজ। এই সমাজের অস্ত্র বেদ। মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী জন্মদাতা। ইনি একজন গুজরাতী ব্রাহ্মণ, কাঠেওয়াড় ইঁহার জন্মভূমি। দয়ানন্দের পিতা একজন গোঁড়া শৈব ছিলেন, আপন পুত্রকেও শৈবধর্মে দীক্ষিত করেন কিন্তু এই স্থূল অন্নে পুত্রের আধ্যাত্মিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল না। তাঁহার ধর্মজিজ্ঞাসা প্রবল ছিল। পৌত্তলিকতার অসারতা শীঘ্রই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল, তিনি মনোনিবেশপূর্বক বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এক ভগিনীর সহসা অকালমৃত্যুতে তাঁহার মনে বৈরাগ্য উদয় হইল। পিতার ইচ্ছা তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে গার্হস্থ্যশৃঙ্খলে বদ্ধ করেন — তিনি সেই বন্ধনভয়ে গৃহত্যাগী হইয়া পলায়ন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ ও দয়ানন্দ সরস্বতী নাম ধারণ করিলেন। অশেষ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনের পর

তাঁহার সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইল যে ব্রাহ্মণ উপনিষদ স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এ সমস্ত শাস্ত্র ভ্রান্তিমিশ্রিত — কেবল খাঁটি সত্য বেদ — বেদ ভিত্তির উপরেই হিন্দুধর্মের পত্তন করা বিধেয়। বেদে মূর্তিপূজা নাই — একেশ্বরবাদই বেদমন্ত্র সকলের প্রকৃত মর্ম — অগ্নি ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি সেই এক ব্রহ্মের নামভেদ মাত্র। তিনি নানা যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক স্বমত স্থাপন ও বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া বেড়াইতেন — যেখানে যাইতেন পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ ও বেদমাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিতেন — তাঁহার বুদ্ধি ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইত। তাঁহারি যত্নে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বেদসত্য সমর্থনকারী আর্যসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বায়েও এই সমাজের এক শাখা আছে। বেদবাক্য সত্য বলিয়া সভ্যদের বিশ্বাস। কিন্তু তাঁহারা বলেন ভাষ্যকারেরা যেরূপ বেদার্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা সর্বাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করি না। তাঁহাদের মতে পৌত্তলিকতা বেদবিরুদ্ধ আধুনিক ধর্ম, সুতরাং তাহা পরিহার্য। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন স্বীয় বিশ্বাস অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন? এই আর্যসমাজ এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। ইঁহাদের মতামত এখনো বায়ুমণ্ডলে বাষ্পাকারে অবস্থিত — জমাট বাঁধিয়া ভূতলে অবতীর্ণ বলিয়া বোধ হয় না।

কড়ুয়া কণবী

অষ্টম পত্র

গুজরাটে কৃষিদলের সাধারণ নাম কণবী। কণবীগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত — লেওয়া কণবী ও কড়ুয়া কণবী। কড়ুয়া ও লেওয়া কণবী একত্রে পানভোজন করিতে পারে, কিন্তু উহাদের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান নাই।

কড়ুয়া কণবীদের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর অন্তর বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হয়। এই দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একদিন হরপার্বতী বনের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে একস্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। মহাদেব উমাকে কহিলেন, প্রিয়ে, তুমি এইস্থানে কিছুকাল অবস্থিতি কর, আমি বিরলে তপস্যা করিতে চলিলাম, দ্বাদশ বৎসর পরে আসিব। এই বলিয়া মহাদেব প্রস্থান করিলেন। বিরহবিধুরা উমা কথঞ্চিৎ কাল হরণ করিবার জন্য মৃত্তিকার পুত্তলী গড়াইয়া ক্রীড়া করিতেন। বার বৎসর পরে মহাদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও উমার অনুরোধে সেই সকল পুত্তলীকে জীবন দান করত সচেতন করিলেন। তাহা হইতে কণবী জাতির উৎপত্তি হইল। এই হেতু কণবীজাতি উমার বিশেষ ভক্ত। যে স্থানে মহাদেব বাব বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা গাইকবাড় পরগণার উমা নামক গ্রাম বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। সেখানে একটি দুর্গা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই দেবীর আদেশক্রমে কড়ুয়া কণবীর মধ্যে বিবাহলগ্ন স্থিরীকৃত হয়। প্রতি দশ কিম্বা বার বৎসর অন্তর সিংহরাশির সহিত বৃহস্পতির সমাগম হইলে তাহাদের বিবাহের সময় উপস্থিত হয়। উমা সম্মতি দান করিলে পূজারীগণ বিবাহের লগ্ন প্রকাশ করে ও তাহা গ্রামে গ্রামে সমস্ত কণবী জাতির দূত কর্তৃক ঘোষিত হইয়া থাকে।

এই বিবাহের দিবস উপস্থিত হইলে কণবী জাতির মধ্যে যত অবিবাহিতা কন্যা থাকে তাহাদের উদ্বাহ-ক্রিয়া সেই এক দিবসেই সম্পন্ন হয়। মাসেকের দুগ্ধপোষ্য হইতে যোগ্যা-বয়স্কা কন্যা পর্যন্ত সকলেই এক একটি বরের সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হয়। এই অবসর চলিয়া গেলে আবার বার বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হয়;সুতরাং পারতপক্ষে এ সময় কেহ অবহেলা করে না। যদি কারণবশত কোন কন্যার উপযুক্ত বর না পাওয়া যায় তো পুষ্পরাশির সঙ্গে তাহার নামমাত্র বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। পর দিবস সেইসকল ফুল কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ ক্রিয়া বরের মৃত্যু-সমান পরিগণিত হয়, ও তৎপরে সেই কন্যার 'নাত্রা' অর্থাৎ পুনর্বিবাহ হইবার কোন বাধা থাকে না। ঈদৃশ আর একটি প্রথার নাম 'বাহুবর' বিবাহ অর্থাৎ স্বজাতীয় কোন পুরুষ যদি পূর্ব হইতে এইরূপ অঙ্গীকার করে যে, আমি এত টাকা পাইলে আমার বিবাহে কোন দাবী থাকিবে না এবং এই বলিয়া যদি অর্থ গ্রহণ করে তাহা হইলে সে কন্যার উপর তাহার কোন অধিকার থাকে না। কন্যা-দানের অব্যবহিত পরেই

সেই বিবাহ-বন্ধন হইতে বর ও কন্যা উভয়েই নিষ্কৃতি পায়। যে স্ত্রী এইরূপে অব্যাহতি পায় — তাহার 'নাত্রা' অর্থাৎ পুনর্বিবাহ করিবার বাধা নাই। অবিবাহিতা স্ত্রীর নাত্রা হইবার বিধি নাই, সুতরাং বিবাহের নির্দিষ্ট কাল ভিন্ন তাহার বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু একবার নামমাত্র বিবাহ দিতে পারিলে পুনর্বিবাহ সম্ভবেও এইরূপ বিবাহের কোন নিরূপিত সময় নাই, যখন ইচ্ছা দেওয়া যাইতে পারে। বাহ্যবর বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া পরক্ষণেই বর স্বকীয় আলয়ে গমন করে। কন্যা পিতৃগৃহে আসিয়া চুড়ি ফেলিয়া স্নান করে, যেন তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। পরে সুবিধা হইলে পিতামাতা তাহার নাত্রা দেয়।

মুসলমানদের যেমন নিকা, নীচবর্ণ হিন্দুগণের সেইরূপ 'নাত্রা'। নাত্রাতে বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি কিছুই আবশ্যক হয় না, বিবাহের ন্যায় তাহাতে ব্যয়বাহুল্যও নাই। বয়স্কা বিধবার ত কথাই নাই — অল্প বয়সে পতিগৃহে গমন করিবার পূর্বে যে স্ত্রীর বৈধব্য-দশা উপস্থিত হয়, অথবা পূর্বোল্লিখিত প্রকারে নামমাত্র বিবাহ হইবার পর যে স্ত্রীর পুনর্বিবাহ হয়, তাহার নাত্রা অপেক্ষাকৃত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। বরের ধুতির অঞ্চল ও কন্যার শাড়ীর অঞ্চলে গাঁট দেওয়া হয়, এইরূপ গ্রন্থিবদ্ধ দম্পতি অশ্বারূঢ় হইয়া জনতার মধ্য দিয়া গীতবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে। তথায় পুরোহিত তাহাদিগের গণপতির পূজা করাইয়া বিবাহের কার্য সম্পন্ন করেন। ইহার নাম নাত্রা।

এইরূপ শুনা যায় যে, কণবী জাতির মধ্যে অজাত সন্তানদিগেরও বিবাহের সম্বন্ধ কখন কখন স্থির হইয়া থাকে। দুই প্রতিবেশীর নিজ নিজ স্ত্রী গর্ভবতী হইলে তাহারা এইরূপ চুক্তি করে যে তোমার পুত্র আমার কন্যা, কিম্বা আমার পুত্র তোমার কন্যা হইলে তাহাদের পরস্পর বিবাহ হইবে। এইরূপ ধার্য হইলে সত্য সত্যই যদি এক স্ত্রীর কন্যা ও অপরের পুত্র প্রসূত হয় ত অঙ্গীকার মত তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয়।

সকলের কুল সমান নহে। কোন কুল উচ্চ, কোন কুল নীচ রূপে পরিগণিত। পূর্বপুরুষের কৃতি ও সুখ্যাতিবশত কোন কোন বংশ বিশেষ গৌরবের পাত্র হইয়াছে। এক্ষণে অনেকটা জন্মভূমির উপর বংশমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। অহমদাবাদের আদিমবাসী কণবীগণ কুলশীলে শ্রেষ্ঠরূপে প্রখ্যাত। কুলীনের সঙ্গে কিসে কন্যার বিবাহ হয় ইহারই উপর পিতামাতার বিশেষ লক্ষ্য। নীচকুলের বরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হওয়া মহা অপমানের বিষয়, কুলীন যদি হতশ্রী বা বিগতযৌবন হয় তথাপি সে প্রার্থনীয়। ৫০ বৎসর বয়স্ক কুলীনের সঙ্গে মাতা তাঁহার দশমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন না। উচ্চকুলের বর পাইতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন ও বিবাহের অনুষ্ঠানেও বিস্তর ব্যয়। এই হেতু কুলাভিমানী নির্ধন কণবী এবং রাজপুতদের মধ্যে কন্যাহত্যা এত প্রচলিত ছিল। কন্যা সন্তানের প্রতি বিরাগের আর এক কারণ এই যে, পিতা মনে করেন কন্যার বিবাহ হইলেই অপর ব্যক্তি আমাকে শালা শ্বশুর বলিয়া সম্বোধন করিবে, এ অপমান কিরূপে সহ্য হয়? কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে এক

দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া দিয়া পিতামাতা কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন; এই প্রথার নাম 'দুখ পীতী'। ইহা বলা বাহুল্য যে ইংরাজ রাজ্যে এ নিয়ম এক্ষণে সতীদাহ ও অন্যান্য নিষ্ঠুর প্রথার ন্যায় রাজশাসনে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর নীচ বংশজ হইলে তাহাকে টাকা দিয়া কন্যা ক্রয় করিতে হয়। অর্থের অভাবে আপন পরিবারস্থ কোন কন্যার বিনিময়েও কন্যা পাওয়া যায়। মনে কর, রণছোড়ের এক ভগিনী ও দাজীর একটি কন্যা আছে। রণছোড় দাজীর ভ্রাতার সঙ্গে আপনার ভগিনীর বিবাহ দিয়া দাজীর কন্যাকে বিনিময়ে পাইতে পারেন। এইরূপ তিন ভ্রাতার তিন ভগিনী থাকিলে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন ভগিনীর বিনিময়ে এক এক স্ত্রী পরিগ্রহে সমর্থ হয়। এইরূপ বিবাহকে 'সট্টা' বিবাহ বলে।

কণবীদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। স্বামীকে অর্থ-লালসার বশ করিতে পারিলে স্ত্রী আপনার অভিলষিত নায়কের নিকট গমন করিতে সমর্থ হয়। স্বামীর অভিমতি ভিন্ন পরপুরুষেব সহিত সহবাস করিলে অনেক সময় স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে; কিন্তু আইন অনুসারে স্ত্রী দণ্ডনীয় নহে, তাহাব নায়ককেই দণ্ড ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই সকল মকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্বেই প্রায় পঞ্চায়েত-কর্তৃক নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এই সকল বিবাহসম্বন্ধীয় বিবাদে জাতীয় শাসন বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। জাতির পাঁচজন মিলিয়া যে বিধান করেন তাহা উভয় পক্ষে শিরোধার্য। স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যদি আর একজনের সংসর্গে বাস করে — স্বামী স্বজাতীয় লোকদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের নিকট আপন কাহিনী ব্যক্ত ব রেন। জাতির মত হইলে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই অপরাধী পুরুষকে জাতি হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, ইহাতে গুরুতর দণ্ড আছে কিনা সন্দেহ। জাতির অভিপ্রায়ে যদি স্থির হইল যে, পরস্ত্রী গ্রহণের দণ্ডস্বরূপ ৫০০ টাকা দিয়া স্বামীর সম্মতি ক্রয় করিতে হইবে তো অগত্যা তাহাতেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। জাতির বিচারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলে উপায়াভাবে আদালতের শরণাপন্ন হইতে হয়।

যে সকল কণবীর মধ্যে স্ত্রীজাতির সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অল্প, তাহাদের পুরুষদের বিবাহ লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। এক একটি কন্যারত্ন পাইবার জন্য তাহাদের প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হয়, ও অনেক বৎসর পর্যন্ত কাজে কাজেই অবিবাহিত থাকিতে হয়। এই সকল লোককে মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব অপহরণ করিবার আশয়ে কোন কোন প্রবঞ্চক এক এক কন্যা লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। কন্যা হয়ত অন্য জাতীয়া — অথবা বিবাহিতা ও তাহার স্বামী জীবিত। বর ত কন্যার জন্য বুভুক্ষিত মৎস্যের ন্যায় তাকাইয়া আছেন — টোপ টপ্ করিয়া পড়িল কি অমনি তাহা কণ্ঠস্থ

করিয়া আট্‌কাইয়া পড়িলেন। ভবিষ্যতে কোন গোলযোগ না হয় তজ্জন্য গ্রামের দুই একজন ভদ্রলোক হয়ত জামিন হইল — তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া ছল-বল-কৌশলে তাহাদিগকেও বশ করিতে হয়। বর কন্যাকর্তার হাতে টাকা গনিয়া দিয়া মহা উল্লাসে বিবাহ করিলেন, পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখেন সে কন্যা নাই কন্যাকর্তাও অন্তর্হিত হইয়াছে। খোঁজ খোঁজ খোঁজ — পরে সন্ধান পাইলে হয়ত আদালতে এক মহামকদ্দমা আসিয়া উপস্থিত হয়। ইনি ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পরস্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলেন — এদিকে সে স্ত্রীর যে যথার্থ স্বামী তাঁহার বাটীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। তাহার স্ত্রী কোথায় পলায়ন করিল, এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অন্বেষণ করিয়া প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলে তিনিও বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া কন্যাকর্তার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। সত্য নিরূপণ করিতে বিচারপতির মাথা ঘুরিয়া যায়। স্বামী চান তাঁহার স্ত্রী, উপস্বামী, প্রতারক দল, সকলেরই সমুচিত শাস্তি হয়। স্ত্রী বলিতেছেন — আমার স্বামী আমাকে মা বোন বলিয়া সম্বোধন করত গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন — আমার দোষ কি? উপস্বামী বলিতেছেন — এই স্ত্রীর স্বামী বর্তমান ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর, জানিতে পারিলে কি এত টাকা দিয়া কন্যা ক্রয় করিতাম। প্রতারকদল বলিতেছে, আমরা ইহার কিছুই জানি না, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ কবিযাছে। বর কন্যা আমরা কাহাকেও জানি না — আমরা আমাদের গ্রামে বাস করিতেছিলাম, তথা হইতে পুলিশের লোকে আমাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছে। প্রত্যেক পক্ষ আপন আপন সাক্ষীর সহিত দণ্ডায়মান। পাঠকগণ বিবেচনা করিযা দেখুন, এই মিথ্যা জালের মধ্য হইতে সত্য নির্ণয় করা কি সহজ ব্যাপাব?

এই প্রসঙ্গে আমার এক বালিকাহরণ মকদ্দমার কথা মনে পড়িল — তাহার আসামী ফরিয়াদি নাসিক জিলা নিবাসী মহারাষ্ট্রীয় কুণবী। বালিকার বয়স ১২ বৎসর ও তাহার মাসীর নামে নালিশ। বালিকার পিতা বলিতেছেন — আমি আমার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া বিবাহ সামগ্রী ক্রয় করিতে রেবলার বাজারে যাই। কন্যা আমার সঙ্গে ছিল, তাঁহাকে একটা দোকানে বসাইয়া জিনিসপত্র কিনিতে লাগিলাম। কার্য শেষ হইলে ফিরিয়া আসিয়া দেখি বালিকা সেখানে নাই — শুনিলাম তাহার মাসী তাহারে লইয়া গিয়াছে। ইহাতে কোন মন্দ অভিসন্ধি সন্দেহ না করিয়া আমি বাড়ী ফিরিয়া যাই, গিয়া দেখি কন্যা এখনো ফেরে নাই। পরে অন্য গ্রামে তাহার মাসীর বাড়ী গিয়া শুনিতে পাই যে সেখানে সকালে আসিয়া আবার তাহারা চলিয়া গিয়াছে। আরো এদিক ওদিক অন্বেষণ করিয়া কন্যার কোন খোঁজ-খবর পাই না, অবশেষে জানিতে পারিলাম সে তাহার মাসীর সঙ্গে বোম্বাই প্রস্থান করিয়াছে। আমিও দুই একজন লোক লইয়া বোম্বাই চলিলাম। সেখানে সন্ধান পাই জিরগ্রামে একজন পারসীর বাঙ্গালায় আমার মেয়ের বিবাহের উদ্যোগ চলিতেছে — গিয়া দেখি কন্যার গায়ে হলুদ কুঙ্কুম নূতন চেলী নূতন শাড়ী বিবাহের সমস্ত আয়োজন। কি করি পুলিশে খবর

দিলাম। পুলিশ সাহেবের সাহায্যে শেষে আমার কন্যা ফিরিয়া পাই ও তাহাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসি।

বালিকা নিজে সাক্ষ্য দিতেছে — আমি রেবলার দোকানে বসিয়া আছি এমন সময় আমার মাসী আসিয়া বলিলেন, তোমার দিদিমার ভারি ব্যামো চল দেখিতে যাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম পিতার কি অনুমতি লওয়া হইয়াছে — তিনি বলিলেন হ্যাঁ হইয়াছে তাই আমি যাইতে সম্মত হইলাম। মাসীব বাড়ী গিয়া দেখি দিদিমা যেমন তেমনি আছেন ব্যামোব কথা সকলি মিথ্যা। তারপর আমাকে একটা বিযে দেখাইবার ছলে অপব গ্রামে লইয়া যান পরে যে কোথায় গেলাম কি হইল বলিতে পারি না — আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। যখন চৈতন্য হইল তখন দেখি আমি বোম্বায়ে আমাব গায়ে হলুদ — বিয়ের ধুম। কতকক্ষণ পরে আমার পিতা লোকজন সঙ্গে আসিয়া আমাকে উদ্ধার কবিলেন।

আসামীর বক্তব্য— এই বোম্বাইবাসী সখারামের ভাই পরশরামেব সঙ্গে কন্যাব বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। স্থির হইবার পব তাব পিতা তাহাকে আমার সঙ্গে বোম্বাই পাঠান। আমি তাঁহার অনুমতি ক্রমেই রাধাকে বোম্বাই লইয়া যাই। কথা ছিল তিনি নিজে দুই একদিনেব মধ্যে বোম্বাই গিযা আমাদের সঙ্গে মিলিবেন। কথা মত তিনিও উপস্থিত হইলেন। শেষে যে কি গোল উঠিল তাহাতে বিবাহের সমস্ত উৎসব ভাঙিযা গেল।

আসামীর তরফ অনেকগুলি সাক্ষী ছিল তন্মধ্যে সখারামই প্রধান। তাঁহার সাক্ষ্যে বিপরীত পক্ষের সমুদায় গাঁথুনি চুরমার হইযা গেল। সখারাম বলিলেন — আমি বোম্বায়ে বাস করি — ডাক্তারি আমার উপজীবিকা। আমার ভ্রাতার বিবাহোদ্দেশে আমি এই অঞ্চলে আসিয়া ফরিয়াদি কাশীবাব সঙ্গে এই সম্বন্ধ স্থির করিয়া যাই। অনেক বাদানুবাদের পর মেয়েব মূল্য ৫০ টাকা ধার্য হয়। আমি তাহার অর্ধেক কাশীবাদের হস্তে দিই — অপরার্ধ পরে দিবার কথা। তিনি বলিলেন, আমার এখনি তোমার সঙ্গে যাইবার সুবিধা হইতেছে না — কাজকর্ম গোছাইয়া দুই একদিন পরে যাইব। আমার কন্যার মাসী ছোটবেলা থেকে তাকে মানুষ করেছে তার সঙ্গে মেয়ে পাঠাইলেই হইবে। সে আগে তোমার সঙ্গে মেয়ে নিয়ে যাক্ আমি দুদিন পরে গিয়া উপস্থিত হইব। তাঁর অনুমতিক্রমে রাধা তার মাসীর সঙ্গে চলিল আমিও অন্যান্য নিমন্ত্রণকার্য শেষ করিয়া তাহাদের সহিত পথে মিলিয়া নাসিক স্টেশনে রেলগাড়ীতে উঠিয়া বোম্বাই যাত্রা করি। সেখানে ১০০ টাকায় একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখি। বিবাহের ঠিক পূর্বদিনে কাশীবা দুইচারজন বন্ধুর সহিত আসিয়া পড়িলেন — আমি স্টেশনে গিয়া বিবাহের বাটীতে তাহাদের লইয়া আসি। সেদিন গেল — পরদিন গায়ে হলুদ হইয়া গেল — ভোজন শেষ হইল তখনো কোন কথা নাই তারপর থেকে কাশীবা নিজমূর্তি ধারণ করিলেন। যে টাকা পূর্বে ঠিক হইয়াছে তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট নন — তিনি আঁরো অধিক হাঁকিয়া বসিলেন — আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না। মহা

গোল, শেষে আমি তাহাকে বিবাহসভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম। খানিক পরে তিনি পুলিশের দলবল লইয়া উপস্থিত — তখন বর কন্যার শুভদৃষ্টি হইয়া গিয়াছে — চাউল বৃষ্টি চলিতেছে এমন সময় পুলিশের হাঙ্গামা। পুলিশের সাহেব আমাদের ডাকিয়া পাঠান — সেখানে লোকেদের মহা ভীড় — এই গোলমালে কাশীবা তাহার কন্যা লইয়া যে কোথায় পালাইলেন তাহা ঠিক পাইলাম না। দুদিন খুঁজিলাম কিন্তু কোন সন্ধান নাই — পরে আর একজন পাত্রী দেখিয়া আমার ভায়ের বিবাহ দিই।

এদিকে কাশীবাও গৃহে প্রত্যাগমন কবিযা আব একজন বব ঠিক করিয়া তাহাব সহিত কন্যাব বিবাহ দেন। দুপক্ষেরই গোল মিটিয়া গেল — মধ্যে থেকে বেচারী মাসীর এই যন্ত্রণা ভোগ।

বোম্বাই রায়ত

প্রথম ভাগ

বঙ্গদেশে ভূমি সম্পর্কীয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গসমাজের ইষ্টজনক কি অনিষ্টজনক এই বিষয় লইয়া সর্বদাই বাদানুবাদ শ্রবণ করা যায়। অধিকাংশ আংলো-ইন্ডিয়ানের মত এই যে এ বন্দোবস্ত ভাল হয় নাই। ইহাতে জমিদারদিগের ধনাগমের সুবিধা হইয়াছে বটে কিন্তু প্রজাদিগের অকল্যাণ। ইহা যে কেবল বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুরবস্থার মূল কারণ তাহা নহে — কিন্তু ইহাতে সমুদয় ভারতবর্ষের ক্ষতি। ইহাতে গবর্নমেন্টের স্পৃহণীয় রাজস্ব জমিদাবের ঘরে যাইতেছে এবং সে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের উপব অযথোচিত করভার ন্যস্ত হইতেছে। তাহার দৃষ্টান্তে তাঁহারা বলেন যে দেখ বঙ্গদেশের আয়তন ও বসতি অনুসারে তাহা হইতে যে নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করা হয়, বোম্বাইয়ের আয়তন ও বসতিব তুলনায় তাহা হইতে তদপেক্ষা অধিক টাকা নিষ্পীড়িত হইতেছে ও যতদিন এ বন্দোবস্ত বিদ্যমান থাকিবে ততদিন এইরূপ চলিবে। এই সকল লোকের বাক্য কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা নির্ণয় করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। ইহা নিশ্চয় যে ভারতীয় গবর্নমেন্ট বঙ্গদেশে নিজ ভূস্বত্ব কতকটা শিথিল করিয়া এইক্ষণে অনুতাপ করিতেছেন। অন্যান্য অনেক কৃতবিদ্য লোকের মত এই যে বঙ্গদেশের যাহা কিছু উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায় সে কেবল এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে। বঙ্গদেশে জমিদার প্রজামধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অন্যান্য স্থলে গবর্নমেন্ট ও প্রজার মধ্যে সে সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। ধনী জমিদাব রাজ্যেব স্তম্ভস্বরূপ। অন্ন-চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া দেশের উন্নতি সাধনে তিনি সময় পান ও তাহার যোগ্য উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। সে যাহা হউক এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এই বন্দোবস্তে যেমন জমিদারের লাভ সেই অনুসারে প্রজার কল্যাণ কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নহি, কেন না বঙ্গদেশের প্রজাদের অবস্থা কিরূপ সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে বোম্বাই প্রদেশে ভূমি সম্বন্ধে যে নিয়ম তাহাতে প্রজারা যে সুখে আছে তাহা বোধ হয় না। এখানকার অস্থায়ী বন্দোবস্তবশতঃ ও অন্যান্য কারণে প্রজাদের উপর লক্ষ্মী অপ্রসন্না সন্দেহ নাই ও অনেকের বিশ্বাস এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহাদের দারিদ্র্য মোচনের এক প্রধান উপায়।

এ প্রদেশে প্রজাদের যে দুরবস্থা তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তাহাদের অধিকাংশই আপাদমস্তক ঋণগ্রস্ত — ও কোন বৎসর অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি কি অন্য কোন উৎপাত উপস্থিত হইলে তাহাদের দুর্দশার আর পরিসীমা থাকে না। এক বৎসর শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মিলে তাহাদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়, এতটুকু সঙ্গতি নাই যে তাহার বলে তাহারা দৈবের ক্ষণস্থায়ী বিঘ্ন সকল অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে। এই দুর্ভিক্ষে তাহার পরিচয় বিলক্ষণ

পাওয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশে মহাজনদের বিরুদ্ধে যে রায়তের বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তাহা বোধ করি পাঠকগণ শুনিয়া থাকিবেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে এই বিপ্লব উপস্থিত হয়। ঐ বৎসরে মে মাসের দ্বাদশ দিবসে পুনা জিলায় সুপা নামক গ্রামে ইহার প্রথম সূত্রপাত। সে দিন হাটের দিন, পার্শ্ববর্তী পল্লী হইতে অনেক লোকজনের সমাগম হইয়াছে, এমন সময় সহসা বণিক ও মাড়ওয়ারীর দোকানে লুটপাট আরম্ভ হইল। রায়তেরা ঐ সকল দোকানদারদের খাতাপত্র, কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী একত্রিত করিয়া জ্বালাইয়া দেয়। এই বিদ্রোহের সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র জিলার ম্যাজিস্ট্রেট পদাতিক ও অশ্বারোহী পুলিশ সিপাহি ও এক দল সৈন্য সমভিব্যাহারে সুপায় গিয়া উপস্থিত হন — এদিকে পুলিশের অধ্যক্ষ তাঁহার দলবল লইয়া উপস্থিত। তাঁহাদের যত্নে গ্রামের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রায় ৬।৭ হাজার টাকার সামগ্রী উদ্ধার করা যায় — শতাধিক রায়ত গ্রেফতার হয় ও তাহাদের মধ্যে সাব্যস্ত অপরাধীগণ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দণ্ডিত হয়। এই বিপ্লব সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া অন্যান্য গ্রামেও এই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। এ সকলেরই লক্ষণ একই প্রকার, রায়তেরা মহাজনদের নিকট হইতে তাহাদের খৎ-পত্র কাড়িয়া লইয়া ভস্মসাৎ করে ও মহাজনেরা কাগজপত্র বাহির করিতে বিলম্ব করিলে তাহাদের উপর নানাবিধ অত্যাচার করে। কাগজপত্রই মহাজনদের প্রখর অস্ত্র, ইহার জ্বালায় অস্থির হইয়া প্রজারা ভাবিল — এই কাগজপত্রগুলি জ্বালাইয়া দিতে পারিলেই আমরা পরিত্রাণ পাই। এইরূপে শত শত দলিল দস্তাবেজের ধ্বংস — ও অনেকানেক মহাজনের নাক কান কর্তন, দ্রব্যাদি লুণ্ঠন আরম্ভ হইল। পুনা হইতে আহমদনগরের স্থানে স্থানে এই উৎপাত প্রবেশ করে। পরিশেষে কর্তৃপুরুষ ও পুলিশের যত্নে বিদ্রোহানল প্রশমিত হয়। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয় মহাজনদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল কিন্তু এক উপকার এই হয় যে তথাকার রায়তদের অবস্থার প্রতি গবর্নমেন্টের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য কয়েকজন প্রবীণ ও বিচক্ষণ জুডিসিয়াল ও রেবেনিউ কর্মচারীর এক কমিশন নিযুক্ত হয় ও কমিশনারগণ বিস্তর অনুসন্ধানের পর অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গবর্নমেন্ট রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তাহার স্থূল মর্ম এই যে, রায়তদের দারিদ্র্য নিবন্ধন কষ্ট ও দুর্দশার সীমা নাই। জুডিসিয়ল মেম্বারেরা বলেন — রায়তেরা গবর্নমেন্টের রাজস্বভারে প্রপীড়িত, তাহার লাঘব করা কর্তব্য — রেবেনিউ মেম্বারদের মতে আদালত ও মকদ্দমার হাঙ্গামেই রায়তের সর্বনাশ — তৎসংক্রান্ত নিয়ম সংশোধন করা কর্তব্য। এই সকল রিপোর্টের কি হইল এখন এখন আর তাহার বিশেষ কিছু শুনা যায় না। রিপোর্টাবলীর চিরনিদ্রার স্থান — অকেজো কাগজের ঝুড়িতে তাহার গতি না হইলে রক্ষা। আশা হয় না, কমিশনারগণ রায়তের দুর্গতি নিবারণের যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন তাহা অচিরাৎ অবলম্বিত হইয়া তাহাদের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হইবে। তালুকদার, জাইগীরদার প্রভৃতি বড় বড় জমিদারদের ঋণমুক্তি লাভ উদ্দেশ্যে ভূরি ভূরি আইন বর্ষিত হইতেছে কিন্তু গরীব রায়তের পক্ষে হইয়া কেহ কোন কথা কহিলে তাহাতে সহজে কর্ণপাত প্রত্যাশা করা যায় না।

বোম্বাই অঞ্চলে অধিকাংশ ভূমি সম্বন্ধে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত দৃষ্ট হয়। এই বন্দোবস্তের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে বোম্বাই প্রদেশের রেবেনিউ কার্যপ্রণালী কিরূপ তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত করা সঙ্গত বোধ হইতেছে।

নিম্নলিখিত কর্মচারীদিগের হস্তে বেবেনিউ কার্য পরিচালনেব ভার সমর্পিত।*

কর্মচারী		মোট মাসিক বেতনসংখ্যা
৩ জন রেবেনিউ কমিশনর	......	১০০০০
১২ জন বরিষ্ঠ (সিনিয়র) কলেক্টব	.. ...	২৭৯০০
৬ জন কনিষ্ঠ (জুনিয়র) কলেক্টব	......	১০৮০০
১৫ জন প্রথম সহকারী কলেক্টর	.. ...	১৩৫০০
১৫ জন দ্বিতীয় সহকাবী কলেক্টর	. ....	১০৫০০
৩৫ জন ডেপুটি কলেক্টর	......	১৪০০০

ইহাবাই স্থায়ী কর্মকর্তা — এতদ্ব্যতীত কতকগুলি অতিবিক্ত সহকাবী কলেক্টর আবশ্যক-মতে স্থানে স্থানে নিযুক্ত হয। ইহাদেব সর্বশুদ্ধ মাসিক বেতন সংখ্যা ১ জানুয়াবী ১৮৭৭ পর্যন্ত — ২৩,৪১৪ টাকা।

সিন্ধুদেশ ও নিজ বোম্বাই শহরের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। তাহা ছাড়িয়া দিলে এই প্রেসিডেন্সিব অন্তর্গত ব্রিটিশ রাজ্য অষ্টাদশ কলেক্টরেটে বিভক্ত ও তাহা উল্লিখিত কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রশাসিত। ইঁহাদের মোট বেতন সংখ্যা মাসিক এক কোটিরও অধিক টাকা।

প্রতি কলেক্টরেট কতকগুলি তালুকে বিভক্ত ও প্রত্যেক তালুকের প্রধান বেবেনিউ কর্তৃপুরুষ এক এক জন মামলৎদার, গ্রামস্থ অপরাপর রেবেনিউ কর্মচারীগণ তাঁহার অধীন।

এতদিন পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে দুই জন রেবেনিউ কমিশনর নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি মধ্যভাগের জন্যে একজন তৃতীয় রেবেনিউ কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন। রেবেনিউ কমিশনরগণ পুলিশেরও প্রধান অধ্যক্ষ। পূর্বে তাঁহাদের নাম 'রেবেনিউ ও পুলিশ কমিশনর' ছিল। সম্প্রতি তাঁহাদের হস্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় সংস্থানের রাজকার্য তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হইয়া তাঁহাদের উপাধি 'কমিশনরে' পরিবর্তিত হইয়াছে। কতকগুলি 'পোলিটিকল এজেন্ট' যাঁহাদিগের পূর্বে গবর্নমেন্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পত্র লেখালেখি চলিত তাঁহাদিগকে এক হিসাবে কমিশনবদের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে এই নিয়ম এক বৎসরের জন্য ধার্য হইয়াছে। এক বৎসরকাল কিরূপ চলে তাহা দেখিয়া পরে তাহার স্থায়িত্ব নির্ণীত হইবে। কমিশনরদের হস্তে মাজিস্ট্রেটের কোন অধিকার নাই। — রেবেনিউ সংক্রান্ত তত্ত্বাবধান

* Revenue Handbook Bombay

তাঁহাদের প্রধান কার্য। শীতকালে তাহারা নিজ নিজ বিভাগ পরিদর্শনার্থে বাহির হইয়া কলেক্টরদের কাজকর্ম হিসাবপত্র পর্যবেক্ষণ করেন। প্রত্যেক কমিশনরের অধীনস্থ কনিষ্ঠ কর্মচারীদিগের উপর একজন সহকারী কমিশনর প্রতিষ্ঠিত — তাঁহারা ডেপুটি কলেক্টরের সঙ্গে সমান।

প্রত্যেক কলেক্টরেটে এক একজন কলেক্টর বিরাজিত — তিনিই আবার জিলার মাজিস্ট্রেট। জিলার মধ্যে তিনিই সর্বেসর্বা হর্তাকর্তা বিধাতা। কলেক্টর নাম তাঁহার কার্যের ঠিক উপযোগী নয়। এই নামে লোকে মনে করিতে পারে যে গবর্নমেন্টের কর আদায়ের জন্যই তিনি নিযুক্ত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহার কর্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ — জিলার মধ্যে এমন কোন কার্য নাই যাহা তাঁহার দৃষ্টিবহির্ভূত। বাণিজ্য ব্যবসার উন্নতি অবনতি — অর্থের হ্রাস বৃদ্ধি — ন্যায় ও শিক্ষাকার্যের শৃঙ্খলা — পথ ঘাট সেতু কোথায় কি আবশ্যক — নগরের শোভা সৌন্দর্যবর্ধন — যে কোন কার্য তাঁহার অধীনস্থ প্রজাপুঞ্জের সুখসমৃদ্ধি সাধনের উপযোগী তাহার সহিত তাঁহার কোন-না-কোন রূপ সংস্রব দেখা যায়। তাঁহার পক্ষে পরাধিকার চর্চা বর্জনীয় সত্য বটে কিন্তু তাঁহার নিজাধিকার-বহির্ভূত কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা দেখিলে বিবেচনাপূর্বক হস্তক্ষেপ করা তাহার কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

কলেক্টর এবং সহকারী কলেক্টরের পদে সিবিলিয়ন ভিন্ন কেহ আরূঢ় হইতে পারে না। সহকারী কলেক্টরের সংখ্যা অল্প কমাইয়া তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধির সম্প্রতি এক প্রস্তাব হইয়াছে। কোন একজন সিবিলিয়ন প্রথমে এদেশে পদার্পণ করিলে তিনি অতিরিক্ত সহকারীরূপে একজন কলেক্টরের অধীনে নিযুক্ত হন। পরে প্রথম ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে তিনি দুই এক তালুকের স্বতন্ত্র অধিকার প্রাপ্ত হয়েন ও ক্রমে কার্যগতিকে তাঁহার পদের উন্নতি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি হয়। গ্রামস্থ ও তালুকের কর্মচারীদিগের তত্ত্বাবধান সহকারী কলেক্টরের প্রধান-কার্য। তিনি কোন গ্রামে গিয়া তাম্বু করিলে প্রথমে পটেল, কুলকর্ণী অথবা তলাটীদিগকে ডাকাইয়া তাহাদের সহিত কৃষিকার্য রাস্তা বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিষয়ে কথোপকথন করিয়া গ্রামের কার্য বিবরণ অবগত হইবেন। পরে কোন এক দিবস স্থির করিয়া রায়তদের দাখিলা প্রভৃতি হিসাবপত্র অবলোকন করিবেন — তাহারা যে খাজানা দিয়াছে তাহা তাহাদের রসিদ পুস্তকে বরাবর জমা হইয়াছে কিনা ও তাহাদের কাহার কি আবেদন কি অভাব এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিবেন। গ্রামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি করিবেন — বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন, ক্ষেত্রের সীমাচিহ্ন সকল ঠিক আছে কিনা বিশেষ করিয়া দেখিবেন। পথ ঘাট বাঁধ পুষ্করিণী ছায়াতরু সকলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবেন। গ্রাম পরিদর্শন কার্য সমাপ্ত হইলে তালুকের কাচারী, ত্রিজুরী মামলতদারদিগের হিসাবপত্র পরীক্ষা করা ইত্যাদি অনেক কাজ সহকারী কলেক্টরের হস্তে। তাঁহার কার্যদক্ষতা ও বিচক্ষণতার উপর তালুকের মঙ্গল অনেকটা নির্ভর করে।

ডেপুটি কলেক্টরগণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত — সর্বোচ্চ শ্রেণীর ডেপুটির বেতন মাসিক ৭০০ টাকা। তাঁহাদের কর্মবিভাগ অনুসারে — হজুর ডেপুটি ও সহকারী কলেক্টরের কার্য ও অধিকার প্রায় সমান। হজুর ডেপুটি জিলার প্রধান নগরীতে ত্রিজুরী সম্বন্ধীয় ও অপর কার্যে নিযুক্ত — তদ্ভিন্ন আর আর রেবেনিউ কর্মচারীগণ বর্ষার চতুর্মাস ভিন্ন নিজ নিজ বিভাগ পরিদর্শনের জন্য তাম্বু করিয়া ভ্রমণে বাহির হয়েন।

তালুকের প্রধান রেবেনিউ কর্মাধ্যক্ষের নাম মামলৎদার। তাঁহার অধীনস্থ গ্রামসমূহের কর্মচারী মুখী পটেল কুলকর্ণী তলাটী প্রভৃতি তাঁহার আজ্ঞাবহ। তালুকের ত্রিজুরী, যাহাতে গ্রাম-সংগৃহীত গবর্নমেন্টের সমুদয় খাজানা জমা হয় ও যাহা হইতে তালুকের নির্দিষ্ট সমস্ত ব্যয় নির্বাহিত হয় — তাহার তিনিই পরিরক্ষক। কলেক্টর যাহাকে যে কোন অনুজ্ঞা প্রেরণ করেন তাহা মামলৎদারের হস্ত হইতেই প্রেরিত হয়। মামলৎদারদের কার্যকুশলতা অনুসারে তাহাদের প্রথম, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের অধিকার। তদ্ব্যতীত পোলিশাধ্যক্ষ এঞ্জিনিয়র, ইন্সপেক্টিং পোষ্টমাস্টার, রেজিষ্ট্রার প্রভৃতি সকলেরই মামলৎদারের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পত্রব্যবহার চলে। কোন ভ্রমণকারী যে কোন কারণেই হউক তাঁহার সীমার মধ্যে আগমন করিলে তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হয় তাহার জন্য মামলৎদারের নিকটেই আবেদন করেন। ইহা হইতে মামলৎদারের উপবে যে অগাধ কার্যভার নিপতিত তাহা সহজে বোধগম্য হইতে পারে। রেবেনিউ ও অপরাপর বিষয়ে মামলৎদার যে কোন আদেশ প্রদান করেন তালুকের সহকারী কলেক্টরের নিকট সামান্যতঃ তাহার আপীল হইয়া থাকে। কেবল এক বিষয়ে কোন আপীল নাই। কোন ব্যক্তি কোন ভূমি, বাটী, বৃক্ষ, ফসল, জলকর অথবা তাহার উপস্বত্ব হইতে অন্যায়পূর্বক বেদখল হইলে অথবা ইজারার মেয়াদ অতীত হওয়াতে কি অন্য কোন কারণে ঐ সকল বস্তুব ন্যায্য অধিকার লাভে স্বত্ববান হইয়া তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে সে প্রতিকার উদ্দেশে ছয় মাসের মধ্যে মামলৎদারের নিকটে আবেদন করিতে পারে ও তাহা হইলে মামলৎদার তাহাকে তাহার অপহৃত বিষয় প্রত্যর্পণ অথবা তাহার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করিতে পারেন অথবা এই সকল বিষয়ের অধিকার হইতে কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিলে মামলৎদার সেই আকাঙ্ক্ষিত অত্যাচার নিবারণের জন্য আজ্ঞা প্রচার করিতে পারেন। বোম্বাই আইন অনুসারে এই সকল মকদ্দমার উপর আপীল নাই। মামলৎদার ব্রাহ্মণের গরুটির মত মহোপকারী ভৃত্য অথচ অল্পাহারে সন্তুষ্ট। তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত — প্রধান শ্রেণীস্থ মামলৎদারের মাসিক ২৫০ টাকা বেতন মাত্র।

যে সকল কর্মচারী গবর্নমেন্ট ও রায়তের মধ্যবর্তী তাঁহাদের শৃঙ্খল সম্পূর্ণ বাঁধিতে গেলে গ্রামস্থ কর্মচারীগণের উল্লেখ করিতে হয়। এই সকল কর্মচারীর মধ্যে পটেল কুলকর্ণী প্রধান। গুজরাটে পটেলের নাম মুখী ও কুলকর্ণীর তলাটী। আক্ষেপের বিষয় এই যে পল্লীগ্রামে পূর্বে কাজকর্মের যে সুন্দর ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল ইংরাজদের আমলে তাহা ভগ্নদশা প্রাপ্ত

হইতেছে। মুখী অথবা পটেল গ্রামের মণ্ডল — রায়ত ও গবর্নমেন্টের মধ্যে সকল কার্যস্থলে পটেল রায়তের মুখপাতস্বরূপ। পটেলের কার্য অনুসারে সে — হয় রেবেনিউ কিম্বা পুলিশ পটেল — এই দুই নাম ধারণ করে। রেবেনিউ পটেলের হস্তে গ্রামের রেবেনিউ সমুদয় কার্য; পুলিশ পটেলের হস্তে পুলিশ সংক্রান্ত সমুদয় কার্য। কোন কোন স্থলে রেবেনিউ ও পুলিশ পটেলের কার্য একই জনের হস্তে সম্যস্ত দেখা যায়। রায়তের নিকট হইতে সরকারী খাজানা আদায় করা ও সর্বতোভাবে গ্রামের কৃষি ও আর আর বিষয়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখা পটেলের কার্য। অনেক স্থলে পটেলের কার্য বংশানুক্রমে পিতা হইতে পুত্রে অবতীর্ণ হয় ও কার্যকর্তা চাকরা জমি বেতনের বিনিময়ে উপভোগ করে।

গ্রামের হিসাবপত্র রাখা কুলকর্ণীর কার্য। ইহার পদও অনেক স্থলে বংশপরম্পরাগত ও ভূমির উপস্বত্ব হইতে সে তাহার বেতন লাভ করে। পটেলের ন্যায় তাহার হস্তেও সরকারী খাজানা আদায়ের ভার। খাজানা আদায় হইলে তাহা সরকারী দফতরে প্রবিষ্ট করা ও রায়তকে তাহার দাখিলা লিখিয়া দেওয়া এই সকল লেখাপড়ার কর্ম কুলকর্ণীর। সে সচরাচর ব্রাহ্মণজাতীয় — গ্রামের সরকারী খাজাঞ্চি। গ্রামে যে খাজানা জমা হয় তাহা মামলৎদারের তহবিলে ও তথা হইতে হজুর ত্রিজুরীতে প্রেরিত হয়।

এতদ্ভিন্ন আরো কতকগুলি কর্মচারী আছে যাহাদের কতক গবর্নমেন্টের কাজে — কতক গ্রামবাসীদের কাজে নিযুক্ত; যথা — মাহার, গ্রাম পরিরক্ষক — ফসল ও সীমাচিহ্ন রক্ষণাবেক্ষণ করা, সরকারী খাজানা তালুকের তহবিলে পৌঁছান — চিঠিপত্র লইয়া যাওয়া — পথিকদিগের পথ প্রদর্শন করা ইত্যাদি তাহার কার্য। ছুতার, লৌহকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, পোদ্দার, ধোবা, নাপিত, দৈবজ্ঞ, গুরু ইত্যাদি লোকেরা প্রচলিত প্রথা অনুসারে গ্রামবাসীদের কার্য করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চাকরা জমি উপভোগ করে, কেহ বা অন্য প্রকারে রায়তের নিকট হইতে কিছু কিছু করিয়া পায়।

এই ত রেবেনিউ কার্যপ্রণালী ও কর্মচারীদিগের বিষয় বলা হইল — এইক্ষণে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এই বন্দোবস্তের মূলসূত্র এই যে রাজার প্রজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ — তাহাদের মধ্যবর্তী কোন ভূস্বামী নাই। গবর্নমেন্টই জমিদার ও গবর্নমেন্টের কর্মচারীদিগের প্রতি খাজানা আদায়ের ভার অর্পিত। পূর্বে দেশীয় রাজার রাজত্বকালে সামান্যতঃ এইরূপে বন্দোবস্ত ছিল যে, জমিতে শস্য জন্মিত রাজা তাহার অমুক অংশ গ্রহণ করিতেন, এক্ষণে আর শস্যের ভাগ গৃহীত হয় না। তাহার পরিবর্তে নির্ধারিত খাজানা মুদ্রাকারে গ্রহণ করা হয়। এইরূপ সমুদয় রায়তওয়ারী ভূমির জরিপ হইয়া তাহার জমাবন্দি নিরূপিত হইয়াছে। ১৮৩৬-৩৭ সালে এই অঞ্চলে জরিপ কার্য আরম্ভ হয় ও তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী ১৮৬৫ সালের বোম্বায়ের ১ আইনে বিধিবদ্ধ হয়।

জরিপ বিভাগের কার্য দুই জন কমিশনর, কতকগুলি সুপারিন্টেডেন্ট ও তাহার অনেকানেক সহকারী ও কনিষ্ঠ কর্মচারীগণ কর্তৃক নির্বাহিত হয়। জরিপ ও জমাবন্দি করিবার নিয়ম এই—

১। ভূপৃষ্ঠ পরিমাপ।

২। জমির গুণাগুণ নির্ণয় করিয়া তাহা শ্রেণীবদ্ধ করা।

৩। জলবায়ু বাজাব কৃষিব অবস্থা অনুসারে এক এক তালুক কতকগুলি পল্লীশ্রেণীতে বিভাগ করা।

৪। প্রতি পল্লীশ্রেণীর জন্য এইরূপ নিয়মে কর নির্ধারণ করা যে তাহা রায়তেরা সহজে দিতে পারিবে — অর্থাৎ যাহা দিয়া উদ্বৃত্ত মুনাফায় তাহারা কৃষিকার্যেব খবচ ও উন্নতি সাধনে সমর্থ হইতে পারে।

৫। প্রতি ক্ষেত্রের জমা নিরূপণ কবা।

১। ভূমি পরিমাপ, এই কার্যের জন্য এক দল আমীন তালুকে প্রেবিত হয — তাহাবা এক এক গ্রামের আবাদযোগ্য ও পতিত ভূমি কতকগুলি ক্ষেত্রে বিভক্ত কবিযা প্রত্যেক ক্ষেত্রেব এক এক 'জরিপ নম্বর' স্থির করে। একজোড়া বলদের সাহায্যে যত বিঘা জমি সহজে আবাদ করা যায় তাহা দেখিয়া ক্ষেত্রের আয়তন স্থির হয। তত বিঘা হইতে তাহার দ্বিগুণ বিঘা পর্যন্ত এক এক ক্ষেত্রেব আযতন, তাহা অপেক্ষা নিতান্ত বড়ও নয় ছোটও নয়। আয়তন স্থির হইলে ক্ষেত্রেব সীমা নিরূপিত ও সীমাচিহ্ন স্থাপন ও রক্ষণের বিহিত উপায় অবলম্বিত হয।

২। ক্ষেত্রের গুণাগুণ নির্ণয়।

ইহার জন্য পরে আর এক দল আমীন আসিয়া উপস্থিত হয়। যে সকল কাবণে জমি মূল্যবান হয় — যেমন তাহার ফলবত্তা — জলসেচের সুবিধা, বাজারের সন্নিধি ইত্যাদিব প্রতি লক্ষ করিয়া কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ শ্রেণীতে গণ্য তাহারা তাহা নির্ণয় করে। ইহার অনেক নিয়ম আছে প্রস্তাব বাহুল্য-ভয়ে তৎপ্রদর্শনে ক্ষান্ত হইলাম।

৩-৪ পল্লী শ্রেণীতে তালুকের বিভাগ — ও প্রত্যেক শ্রেণীর দর নিরূপণ।

ইহা খাজনার হারের সমীকরণের জন্য। ক্ষেত্রের জরিপ নকশা ও শ্রেণীবিভাগ হইয়া গেলে গ্রাম-শ্রেণীতে তালুকের বিভাগ করা হয় ও প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য তাহার উর্ধ্বসংখ্যক হার নিরূপিত হয়। এই হার জরিপ সুপারিন্টেডেন্ট কমিশনের মত লইয়া বন্ধন করেন ও গবর্নমেন্টের সম্মতি হইলে তাহা ধার্য হয়।

৫। প্রতি ক্ষেত্রের জমা নিরূপণ —

তৎপরে প্রত্যেক ক্ষেত্রের শ্রেণী অনুসারে তাহার জমাবন্দির হার নির্ধারিত হয়। উত্তর, পশ্চিম ও অন্যান্য প্রদেশে গ্রামের জন্য সদর খাজানা ধার্য হয় ও প্রত্যেকের জমির জন্য কত করিয়া খাজানা দিতে হইবে তাহা গ্রামবাসীগণ আপনাদের মধ্যে স্থির করে কিন্তু বোম্বায়ে সেরূপ নয়। এখানে আমীনেরা প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য খাজনার দেয় অংশ স্থির করিয়া দেন। ক্ষেত্রের জমাবন্দি স্থির হইলে গ্রামস্থ রায়তদিগের আহ্বান করিয়া প্রতি জনের জমির জন্য যাহা দেয় তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া — তাহাদের কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি করা — অনধিকৃত জমির উপর প্রজাপত্তন — রেবেনিউ আমীনদিগের এই শেষ কার্য। এই সকল শেষ হইলে কাগজপত্র কলেক্টরের নিকট প্রেরিত হয় ও আমীনগণ দলবল লইয়া অন্যত্র প্রস্থান করেন। এই যে জমাবন্দি সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত ইহাকেই রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত কহে — সামান্যতঃ ইহা ত্রিংশৎ বৎসর ব্যাপী।

এইরূপে যে খাজানা নির্দিষ্ট হয় রায়ত তাহা যতদিন দিতে পারিবে ততদিন জমির উপর তাহার সম্পূর্ণ স্বত্ব — সে স্বত্ব হইতে কেহই তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। তাহার সে স্বত্ব বিক্রি কিম্বা বন্ধক দ্বারা হস্তান্তর করা তাহার সম্যক ইচ্ছাধীন — যে তাহা গ্রহণ করিবে সেই গবর্নমেন্টের নিয়মিত খাজানার জন্য দায়ী। জমাবন্দি সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত সাধারণতঃ ত্রিংশৎ বৎসর ব্যাপী, তাহার মধ্যে জমার হ্রাসবৃদ্ধি হইবার নহে। সেই কাল অতীত হইলে রায়তের অযত্ন সম্ভূত কারণে জমি ও ফসলের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন বন্দোবস্তে গবর্নমেন্টের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সেই খাজানা দিতে পারিলে রায়তের স্বত্ব বংশপরম্পরা চালিত হইবার কোন বাধা নাই।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের বিশেষ গুণ এই যে ইহা ত্রিশ বৎসর কাল গবর্নমেন্টের উপর বন্ধনকারী — সেই কালের মধ্যে গবর্নমেন্ট খাজানা বৃদ্ধি করিতেও পারেন না ও খাজানা দিতে ত্রুটি না করিলে রায়তকে স্থানান্তরিত করিতেও পারেন না অথচ তাহা রায়তের উপর বন্ধনকারী নহে। রায়ত ইচ্ছা করিলে ফসলী সালের প্রারম্ভে তাহার উপভোগ্য জমির সম্পূর্ণ অথবা এক ক্ষেত্রের অন্যূন কিয়দ্ভাগ পরিত্যাগ করিতে পারে এবং অন্যান্য অনধিকৃত ক্ষেত্র আবাদের জন্য গ্রহণ করিতে পারে। এ নিয়ম রায়তের পক্ষে সামান্য হিতকরী নহে। এই বন্দোবস্তে ত্রিশ বৎসর ইজারার যে লাভ তাহা সম্পূর্ণ রায়তের অথচ তন্নিবন্ধন দায়িত্ব হইতে সে মুক্ত। তাহাতে তাহার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই, কেন না ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিলে নিজ স্বত্ব ছাড়িয়া দিবার তাহার কোন বাধা নাই। ছাড়িতে হইলে তাহার হস্তস্থিত সমস্ত ভূমি ছাড়িয়া দিতে হইবে তাহাও নহে — সে আপন ইচ্ছামত আপনার শক্তি অনুসারে অল্প কিম্বা অধিক ভূখণ্ড রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগে ইস্তফা দিয়া তাহার খাজানার দায়

হইতে মুক্ত হইতে পাবে। মনে কর, এক জন রায়তের দশটি ক্ষেত্র আছে, তাহার সমুদায়ে ১৫০ টাকা ও প্রত্যেকের জন্য ১৫ টাকা করিয়া খাজানা দিতে হয়। মনে কর, তাহার অবস্থা সচ্ছল — হাতে কিছু টাকা আসিয়াছে ও সেই টাকা দিয়া তাহার জমির স্থায়ী উন্নতি সাধনে সে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে; যথা — তাহার ভূমির এক ভাগে জলসেচের জন্য কূয়া খনন করা। এক্ষণে বিবেচনা কর, যদি তাহার সমগ্র ভূমির জন্য বৎসর বৎসর তাহাকে ১৫০ টাকা করিয়া খাজানা দিতে হয় তাহাতে তাহার সুবিধা অথবা তাহার প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য পৃথক খাজানা ১৫ টাকা নিরূপিত হয় ও সে তাহার যতগুলি ইচ্ছা রাখিতে ও ছাড়িয়া দিতে পারে তাহা হইলে তাহার সুবিধা হয়? পূর্বোক্ত প্রকার নিয়ম হইলে হয়ত কোন আপদবিপদে সে অত টাকা দিয়া উঠিতে অক্ষম হইতে পারে ও যে টাকা সে ভূমির উৎকর্ষ সাধনে ব্যয় করিয়াছে, ভূমির সঙ্গে সঙ্গে সে টাকাও তাহার নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শেষোক্ত প্রকার নিয়মে তাহার অবস্থা বুঝিয়া কতকগুলি ক্ষেত্র সে ইচ্ছামত ছাড়িয়া দিতে ও তন্নিবন্ধন খাজানার দায় হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয়। আর যে সকল ক্ষেত্র অধিক মূল্যবান ও যাহার উৎকর্ষ সাধনে তাহার অর্থব্যয় হইয়াছে তাহা রক্ষা করিতেও কৃতকার্য হইতে পারে। উল্লিখিত প্রকাব দুই নিয়মের মধ্যে যে নিয়ম রায়তের পক্ষে অধিক সুবিধাজনক, যাহাতে জমির উন্নতি সাধনের জন্য অর্থব্যয়ে তাহার অধিক প্রবৃত্তি জম্মে — অধিক সাহসের সঞ্চার হয়, সেই নিয়মটিই এই রায়তওয়ারী বন্দোবস্তেব অন্তর্গত। এদিকে ত্রিশ বৎসর অন্তব বন্দোবস্ত পবিবর্ত করিবার নিযম থাকাতে সরকারী খাজানাব কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। খাজানা দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তৎসমুদায়ই রায়তের ভোগ্য — জমির উপস্বত্বভাগী জমিদার কি পত্তনীদাব আসিয়া তাহার যথাসর্বস্ব হরণ করিতে পারে না। রায়ৎ তাহার নিজ স্বত্বের উপর সম্পূর্ণ অধিকারী — গবর্নমেন্টের খাজানা দিবার ব্যতিক্রম না ঘটিলে কেহই তাহাকে সে স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। গবর্নমেন্টের কর্মচারিগণ তাহার স্বত্ব হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ। রায়তের দেয় খাজানা নিয়মিত সময়ে গ্রহণ করা ভিন্ন তাহারা আর কিছুই করিতে পারে না। এই সময়ে খাজানার টাকা লইয়া প্রস্তুত থাকিলে রায়ত নিজের জমি আবাদ করিয়াছে কিনা — ফসল ভাল কি মন্দ হইয়াছে — এসকল বিষয়ের তদারক করিবার কোন আবশ্যক নাই। নূতন বন্দোবস্ত কবিবার নিয়ম এই যে, রায়ত নিজ যত্ন ও পরিশ্রমে যাহা কিছু উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা বিচারস্থলে আনীত না হইয়া অন্যান্য কারণে জমি ও ফসলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া খাজানার হার নিরূপিত হইবে। রায়তের লাভের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া খাজানা বৃদ্ধি করিলে সে ভূমি কর্ষণ হইতে বিরত হইবে। সুতরাং তাহাতে গবর্নমেন্টকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। রায়ৎ অযথাবিধ খাজানা বৃদ্ধির আশঙ্কা না রাখিয়া ইচ্ছামত ভূমির উৎকর্ষ সাধনে তৎপর থাকিতে পারে। অতএব কে না স্বীকার করিবে যে রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে সরকারী খাজানা আদায়ের যেমন সুবিধা তেমনি তাহা আবাদ কার্যের উন্নতি ও কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিদানভূমি।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্তে নিম্নলিখিত চারিটি প্রধান নিয়ম হইবে।

(১) প্রত্যেক রায়তের সহিত গবর্নমেন্টের পৃথক বন্দোবস্ত।

(২) ত্রিশ বৎসর, কি অন্য কোন নিয়মিত কালের জন্য ইজারা দান — সেই ইজারার অন্তর্গত সমুদয় অথবা কিয়দংশ ভূমি রায়ত ইচ্ছামত বৎসরের শেষে ছাড়িয়া দিতে পারে, কিন্তু খাজানা দিবার ক্রটি না হইলে গবর্নমেন্টের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

(৩) রায়ত নিজস্ব ইজারা বিক্রয় কিম্বা বন্ধক দ্বারা হস্তান্তরিত করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী।

(৪) নিয়মিত কাল অতীত হইলে রায়তের স্বকৃত সাধনের উপর লক্ষ করিয়া খাজানার হার বৃদ্ধি হইবার নহে।

যে সকল রায়তের নিকট হইতে নিয়মিত খাজানা গৃহীত হয় তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে — গতকুলী অথবা উপরী ও মিরাসদার। উপরী রায়তেরা রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত হইতে যাহা কিছু স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন ভূমির উপর তাহাদের কোন স্থায়ী স্বত্ব নাই। কিন্তু মিরাসদার পূর্ব হইতেই জমির প্রকৃত মালিকরূপে পরিগণিত। তাহাদের স্বত্ব বংশপরম্পরাগত ও বিক্রয়ের পাত্র ও নিয়মিত খাজানা দিতে পারিলে তাহারা তাহাদের ভূমি হইতে পরিচ্যুত হইতে পারে না। মিরাস-স্বত্ব এরূপ প্রবল যে মিরাসদার যদি তাহার ভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায় ত যখনি ফিরিয়া আসিয়া নিজ ভূমি প্রতিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবে তখনি তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে। এক্ষণে কেবল তামাদিবিষয়ক আইন প্রচলিত হইয়া তাহার সেই অধিকারের কিঞ্চিৎ খর্বতা ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা দৃষ্ট হইবে যে জরিপি বন্দোবস্তে উপরী রায়তদের প্রতি যেসকল অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ফলে তাহাদের ও মিরাসদারদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই — এই মাত্র প্রভেদ যে উপরী রায়ত একবার তাহাদের জমি ছাড়িয়া দিলে তাহা প্রতিগ্রহণের দাওয়া করিতে পারে না। মহারাষ্ট্র দেশে মিরাস ভূমি বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

রায়তওয়ারী জমির উপর যে নির্ধারিত জমা তাহার প্রত্যেক টাকায় এক আনার হিসাবে এক অতিরিক্ত কর রায়তের নিকট হইতে গৃহীত হয়। তাহার নাম 'লোকল ফন্ড সেস'। তাহা লোকল ফন্ডে জমা হয় ও পল্লীসমূহে বিদ্যাপ্রচার ও পথনির্মাণ ও সংস্করণ প্রভৃতি স্থানিক কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিয়ম এই যে, এই টাকার দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষা ফন্ডে ও এক-তৃতীয়াংশ রথ্যাফন্ডে প্রযুক্ত হইবে। স্থানিক ফন্ড নিম্নলিখিত ফন্ডের সমষ্টি।

রথ্যাফন্ড।

শিক্ষাফন্ড

গোষ্ঠগৃহ ফন্ড

এই গৃহে অনিষ্টকারী গোমেষাদি ধৃত হইয়া রক্ষিত হয়। তাহাদের ছাড়াইবার জন্য যে দণ্ড দিতে হয় তাহা হইতে এই ফন্ড সংগৃহীত।

তরণ নৌকাফন্ড

টোল ফন্ড

পান্থশালা ফন্ড

এই সকলের উৎপন্ন টাকা হইতে নিজ নিজ ব্যয় নির্বাহিত হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সাধারণ লোকল ফন্ডে জমা হয়।

এই সম্বন্ধে মুসলমান রাজাদের যে রীতি ছিল তদ্বিষয় Sir Henry Lawrence বলেন ঃ—

"মুসলমান রাজাদের সমুদয় কার্যের প্রবর্তন কেবলি স্বার্থপরতা। রাস্তা, সবাই, আবাদ — এ সকল কি প্রজাদের জন্য? না, তাহা নহে, সকলি রাজার চলাচলের সুবিধার জন্য। একটি বাদসাহি সরাই নির্মাণে যে ব্যয় তাহাতে প্রজাদের জন্য দশটা সরাই নির্মিত হইতে পারিত। এদেশের সকল স্থানেই এই নিয়ম যে স্থান দিয়া রাজার পরিভ্রমণ করিবাব সম্ভাবনা সেখানে সুবিস্তীর্ণ পথ ও অন্যান্য অশেষবিধ সুবিধা। অন্যত্র পথ, পানীয়, আশ্রমেব জন্য প্রজাদের বৃথা ক্রন্দন। অযোধ্যার নবাব — জোয়ানপুর ও মহারাষ্ট্রের মুসলমান রাজাদেরও ঐরূপ পদ্ধতি। তাহাদের প্রিয় বাসগৃহের সন্নিহিত স্থান সকলকে সজ্জিত ও শোভিত করা — তাহাদের ক্রীড়াকাননে যাইবার জন্য পথ মুক্ত করা — তাহাদের পথের বিঘ্নকারী নদীর উপর সেতু বন্ধন করা — সুন্দর কূপ খনন ও ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষাদি রোপণ, এ সকল কার্যে তাহারা তৎপর ছিলেন কিন্তু সকলই স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে, কিন্তু হিন্দুরাজারা যে প্রজাদের কল্যাণ উদ্দেশ্যে পথঘাট নির্মাণ — পান্থশালা স্থাপন — বাপী পুষ্করিণী খনন — ছায়া-বৃক্ষ-রোপণ প্রভৃতি কার্যে উৎসাহী ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

পূর্বে রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের বিষয় যাহা কিছু বলা গিয়াছে তাহাতে তাহার ভাল দিকটাই দেখান হইয়াছে কিন্তু তাহা শুনিতে যেমন শ্রুতিমধুর, কার্যে তেমন ফলোপধায়ী হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের দোষগুণ নিরূপিত করিবার পূর্বে বিবেচনা করা উচিত যে গবর্নমেন্টের খাজানার প্রকৃত লক্ষণ কি? কি হিসাবে তাহা নির্ধারিত হইলে রায়তের সুখ-সমৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে। আমাদেব বিবেচনায় — চাষ আবাদের খরচ দিয়া যে মুনাফা অবশিষ্ট থাকে গবর্নমেন্টের খাজানা তাহার অর্ধাংশ কি আরো কিঞ্চিৎ অধিক হইলে ক্ষতি নাই। কৃষকের পরিশ্রমের বেতন ও হল বলদ প্রভৃতি কৃষিসাধন জিনিসের মূল্য অবশ্য আবাদের খরচের মধ্যে ধরিতে হইবে। তাহা বাদ দিয়া অবশিষ্ট মুনাফার অংশ সরকারী

খাজানাতে নির্ধারিত হওয়া উচিত — এ কথা রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের প্রধান প্রতিপোষকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। এইক্ষণে প্রশ্ন এই যে, ফলে সরকারী খাজানা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে কিনা? তাহার উত্তর 'না' বলিতে হইবে। ইহা নিশ্চয় যে কৃষিকার্যের খরচ ও সরকারী দেনা বাদ দিয়া রায়তের অবশিষ্ট মুনাফা কিছুই থাকে না। অনেক স্থলে সরকারী খাজানা দিবার জন্যও রায়তকে মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়। সে তাহার নিজের ও পরিবারের সম্বৎসরের মত গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইবার জন্য যাহা কিছু কষ্টেসৃষ্টে উপার্জন করে তাহা 'মুনাফা' বলা যাইতে পারে না — তাহা তাহার পরিশ্রমের বেতন। কোন এক শুভবর্ষে যদি তাহার অল্প মুনাফা উদ্বৃত্ত হয় ত তাহা অন্য এক অনাবৃষ্টিজনিত অশুভ বৎসরে সকলি ব্যয় হইয়া যায়। কৃষক বৎসর বৎসর ক্লায়ক্লেশে ভূমি কর্ষণ করিয়া প্রতি বৎসর আশা করিয়া থাকে — কবে সুদিন হইবে — মহাজনের দেনা পরিশোধ করিতে পারিবে — সে সুদিন আর দেখা দেয় না। স্বোপার্জিত অর্থ সে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া উঠে তাহা অনেক সময় তাহার সম্বৎসর উপজীবিকা চলিবার জন্য যথেষ্ট হয় না — অন্য স্থান হইতে ধারকর্জ করিয়া তাহার সংসার খরচ নির্বাহ করিতে হয়। রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের পরিণাম যদি এই হইল ত কোন্ মুখে তাহার প্রশংসা করা যায়। জরীপকর্তারা মুখে যাহা বলুন, কার্যে তাহা প্রকাশ পায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দেখা যাইতেছে যে গবর্নমেন্টের খাজানা রায়তের মুনাফার অংশ নহে — বেচারী রায়ত তাহার নিজ বেতন হইতে এবং কখন কখন মহাজনের নিকট হইতে ধার করিয়া তাহা যোগাইতে বাধ্য হয়।

পূর্বকালে এ প্রদেশে নিয়ম এই ছিল যে, যে পরিমাণে ফস্‌ল উৎপন্ন হইবে রাজা তাহার ভাগগ্রাহী। রাজার ষষ্ঠাংশ বৃত্তি ইহা আমাদের শাস্ত্রসম্মত বাক্য। ভাল বৎসরে প্রজার মঙ্গল অবস্থা হইলে রাজভাণ্ডার পূর্ণ হইত — মন্দ বৎসরে শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মিলে খাজানাও সেই পরিমাণে অল্প আদায় হইত। কোন বৎসর রায়ত তাহার জমি কারণবশত আবাদ করিতে না পারিলে তাহার জন্য খাজানা দিতে হইত না। কিন্তু এক্ষণে আর সে কাল নাই। ভাল বৎসরই হউক, মন্দ বৎসরই হউক — সুবৃষ্টিই হউক অনাবৃষ্টিই হউক, — ফসল হউক আর নাই হউক — জমি আবাদ হউক, কি পতিত থাকুক — নিয়মিত খাজানাটি রাজভাণ্ডারে আনিয়া দিতেই হইবে। নতুবা জমি নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। আগে কখন কখন কার্য-বিশেষের জন্য রায়তকে ধার দিবার প্রথা ছিল — কোন কারণে তাহাকে খাজানা হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যাইত, কিন্তু এক্ষণে সে নিয়ম বন্ধ হইয়াছে।

খাজানা আদায়-নিয়মের কঠোরতা, এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ভারতীয় গবর্নমেন্ট উল্লসিত হইয়াছেন, সেক্রেটারি অফ্ স্টেট্ মহাসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন যে, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত রায়তের নিকট হইতে এবার প্রায় তাহার দেয় সমুদয় খাজানা আদায় করা যাইবে। করগ্রাহীর পক্ষে ইহা অতিশয় সন্তোষজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু করদাতার পক্ষে

কতদূর তাহা সন্দেহ। সচরাচর সরকারী খাজানা দিতে যাহাদের গলদঘর্ম হয়, দুর্ভিক্ষের বৎসর অস্থিচর্মসার সেই সকল রায়তের নিকট হইতে দুই বৎসরের খাজানা এককালে আদায় করা সামান্য নিষ্ঠুরতার কার্য নহে। এই দ্বিগুণ কর দিবার সামর্থ্য-সাধনোপযোগী এ বৎসর যে দ্বিগুণ ফসল হইয়াছে, কৈ তাহা তো শুনা যায় না। এই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার কিরূপে সংসাধিত হইল বলা যায় না। এই প্রেসিডেন্সিতে সমুদয় সরকারী খাজানার সমষ্টি ২।।০ কোটি টাকারও অধিক। তাহার মধ্যে ২ কোটি ৩৩ হাজারেরও অধিক আগষ্ট মাসের শেষে আদায় করা হইয়াছে। যে ক-হাজার টাকা ছুট গিয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ আদায় হইবার প্রত্যাশা। ১৮৭৭-৭৮ সালেরও সমুদয় খাজানা সমাহৃত হইবে এইরূপ শুনা যাইতেছে।

পুণা সার্বজনিক সভা রায়তদের অবস্থা বিষয়ে বিস্তর অনুসন্ধানের পর এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের প্রথম সূত্রপাত হইবার সময় জমির উপর যে গবর্নমেন্টের খাজানা নিরূপিত হয় তাহা অপেক্ষাকৃত লঘু, জমি ও কৃষি-কার্যের অবস্থাব প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উদার ও পরিমিতভাবে তাহার দর নির্ণীত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম ত্রিশ বৎসর অতীত হইলে নূতন বন্দোবস্ত জারি করিবার সময় এত অধিক পরিমাণ খাজানা বৃদ্ধি করা হইয়াছে যে তাহাতে মহারাষ্ট্র দেশের অধিকাংশ রায়তের ওষ্ঠাগতপ্রাণ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, নূতন বন্দোবস্তের নিয়ম এই যে, রায়তের বিনা যত্ন ও পরিশ্রমে জমি ও ফসলের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাজানা বৃদ্ধি করা বিধেয়। কিন্তু সুবিবেচনা ও দূরদর্শিতার সহিত সে নিয়ম রক্ষা না করিলে অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা। মনে কর ইংরাজি ১৮৩৫ সালের প্রারম্ভে প্রথম বন্দোবস্তের সূত্রপাত হইল। ৩০ বৎসর অতীত হইলে ১৮৬৫ সালে দেখা গেল যে, সকল জিনিস আক্রা — জমির মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে — রায়তের অবস্থা সচ্ছল হইয়াছে — তাহা দেখিয়া ঐ ত্রিশ বৎসরের শেষে পাঁচ বৎসরকার জিনিসের দরের সরাসরিতে যদি সরকারী খাজানা বর্ধিত হয় তবে রায়তদের কি দুর্দশা। ঐ বর্ধিত মূল্য আগামী ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত অটল থাকিবে তাহার স্থিরতা কি? ১৮৬৪-৬৫ সালে রায়তের শ্রীবৃদ্ধি হইবার কারণ কি? না, আমেরিকার যুদ্ধজনিত এ দেশে তুলার ব্যবসায়ের উত্তেজনা। ইহা বিবেচনা করা উচিত যে এ উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী — যুদ্ধ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ইহা তিরোহিত হইবে। অতএব এই সম্ভবতঃ ক্ষণস্থায়ী মূল্যবৃদ্ধি অনুসারে আগামী ত্রিংশৎ বৎসরব্যাপী খাজানার দর নির্ধারণ করা অন্যায়। এইরূপে অতীত ত্রিশ বৎসরের কোন এক ভাগের উপর লক্ষ করিয়া খাজানার দর বন্ধন করিলে তাহাতে যে ভ্রমোৎপত্তির সম্ভাবনা তাহা সহজে অনুধাবন করা যাইতে পারে। সেই কালের মধ্যে ৫ বিঘার ১০ বৎসরের সরাসরি দর যে আগামী ত্রিশ বৎসর কাল স্থায়ী থাকিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। বাস্তবিক পরীক্ষাতেও এই দেখা যাইতেছে যে, জিনিসের দরের কোন স্থিরতা নাই — নানা কারণে মধ্যে মধ্যে তাহার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। যদি অতীত ত্রিশ বৎসরের সমুদায় কালের জিনিসের দরের

সরাসরি লইয়া তাহার পূর্ববর্তী ত্রিশ বৎসরের সরাসরি জিনিসের মূল্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যায় ও সেই অনুসারে খাজানার দর নিরূপিত হয় তাহা হইলেও কতকটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে মহাত্মাদের হস্তে এই বন্দোবস্তের ভার সমর্পিত তাঁহারা তত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতে তৎপর নহেন। সুতরাং নূতন বন্দোবস্তে মনঃকল্পিত নিয়ম অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহারা যে প্রজাপীড়ন দোষে দোষী হইয়াছেন ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায়। আর কথা এই যে, জিনিসের দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের মূল্যও অধিক হয়, সুতরাং কৃষিকার্য চালাইবার খরচ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা এটিও মনে রাখা কর্তব্য। নূতন বন্দোবস্তের সময় জরিপ অধিকারীদিগের এই দুই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। প্রথম — জমি ও ফসলের মূল্যবৃদ্ধি যাহা দৃষ্টি হইতেছে তাহা ভবিষ্যৎ ত্রিশ বৎসব কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা কিনা? দ্বিতীয়তঃ মূল্যবৃদ্ধির সমতুল্য খাজানার দরবৃদ্ধি বিধেয় নহে, কেন না জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হইলে শ্রমের বেতন বৃদ্ধি, সুতরাং কৃষিকার্যের ব্যয় অধিক হইবে। এই সম্বন্ধে আর একটি বিষয় বক্তব্য এই যে, যে সকল তালুকে বর্ধিত জমা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে জমির জরিপ প্রভৃতি সমুদয় কার্য পুনর্বার নবানুষ্ঠিত হইয়া সেই দর ধার্য হয়। এইরূপ করাতে জমির মূল্যের বিস্তর তারতম্য ঘটিয়া অনেক ভূস্বামী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৩০ বৎসর বন্দোবস্তের বচন পাইয়া রায়ত মনে করিতে পারে — আমি এই জমির মালিক — নিয়মিত খাজানা দিতে পারিলে আর আমার কোন ভাবনা নাই। ত্রিশ বৎসর কাল নিজ সম্পত্তি ভোগ করিয়া পরে যখন সে দেখে, আমার ২০ বিঘা ভূমি এক্ষণে ২৫ বিঘা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও পূর্বাপর প্রচলিত খাজানা ত্রিগুণ কি চতুর্গুণ ধার্য হইয়াছে, তাহা না দিতে পারিলে আমার সমুদয় ভূমিসম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে হইবে তখন তাহার কি যন্ত্রণা। রায়তের সর্বনাশ ও গবর্নমেন্টের বচনের প্রতি তাহার হতশ্রদ্ধা — ইহা রাজা প্রজার উভয়েরই অনিষ্টকর সন্দেহ নাই।

যাহা বলা হইল তাহাতে পাঠকগণ রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের দোষগুণ কতকটা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। এইক্ষণে এই বন্দোবস্তের অধীনস্থ রায়তের অবস্থা যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিবার ইচ্ছা রহিল।

বোম্বাই রায়ত

দ্বিতীয় ভাগ

রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত ও তাহার দোষগুণ সংক্ষেপে এক প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণে এই বন্দোবস্তের অধীনস্থ প্রজাদিগের অবস্থা আলোচনা করা যাউক। ইহা কাহারো অবিদিত নাই যে বোম্বাই রায়তের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ফসলের মূল্যবৃদ্ধি — বিশেষতঃ তুলার ব্যবসার উন্নতিবশত ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ পর্যন্ত রায়তের যে শ্রীবৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যাইতেছিল তাহা জিনিসের দরের পুনঃপতন ও স্থানে স্থানে খাজানাবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রেই বলো, গুজরাটেই বলো, এদেশের কৃষিদল ঋণপাশে এরূপ জড়িত যে তাহা হইতে তাহাদের নিষ্কৃতি লাভের উপায় নির্ধারণ করা সহজ নহে। মহারাষ্ট্রে মহাজনেরা অধিকাংশ মারওয়াড়ী, গুজরাটে অধিকাংশ বণিকজাতীয় লোক উত্তমর্ণ ব্যবসায়ী, কোন রায়তের হয়ত বলদ কিনিবার জন্য টাকা ধার দিতে প্রস্তুত, অথবা কোন কৃশবীর পুত্রের বিবাহ কিম্বা পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য টাকার প্রয়োজন এই সকল উপলক্ষ্যে মহাজনের আশ্রয় ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। অনেক সময় রায়তের গবর্নমেন্টের খাজানা দিবার সঙ্গতি হয় না — তাহা না দিলেও তাহার স্বত্ব নিলামে বিক্রয় হইয়া যায় — অগত্যা তাহাকে বণিকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ যে কোন কারণেই হউক, একবার সাহুকারের* ঋণজালে আবদ্ধ হইলে আর তাহার নিস্তার নাই। মহাজনের নিকট ধার করিতে হইলে মাসে শতকরা দুই টাকা সুদের — নিদান পক্ষে এক টাকার — হিসাবে ধার করিতে হয়। ধার করিতে হইলে রায়ত খত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। সে নিজে তো লেখাপড়ার ধার ধারে না — হিসাব করিয়া ঋণের টাকা নির্ণয় করা — সে সকলি মহাজন ও তাহাব আশ্রিত জনের কথার উপর নির্ভর করে। কখন কখন যে সুদ ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে তাহা আগে হইতেই আসল টাকার সঙ্গে মিলিত করিয়া ঋণের সংখ্যা নিরূপিত হয়, অর্থাৎ রায়ত হয়ত ৮০ টাকা ধার করিতেছে কিন্তু তাহার ভাবী সুদ কষিয়া হয়ত তাহাকে একশত টাকার খত লিখিয়া দিতে হয় — তাহার উপর নিয়মিত কাল অতীত হইলে নিয়মিত দরের সুদ সঞ্চিত হইতে থাকে। খত প্রস্তুত হইলে রায়ত হয়ত তাহার নীচে হলাকৃতি চিহ্নে নিজের নাম স্বাক্ষর করে। সেই সময়ে মহাজনের দোকানে যদি কেহ উপস্থিত থাকে কিম্বা রাস্তা হইতে লোক ডাকিয়া তাহাদের নাম খতের উপর সাক্ষীস্বরূপ স্বাক্ষরিত হয়। অনেক স্থলে লেখক ও সাক্ষীর ব্যবসাই খত লেখা, স্বাক্ষর করা ও কোর্টে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করা — ইহাদের সাক্ষ্যের কত মূল্য তাহা অনায়াসেই অনুধাবন করা যাইতে পারে। খত লিখিবার সময় রায়তের সঙ্গে সঙ্গে তাহার একজন জামিন উপস্থিত থাকে, ও কখনো বা তাহার বৃদ্ধ মাতা কিম্বা স্ত্রীকে সাহুকার তাহার ঋণপাশে বদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত থাকে না। তাহার কারণ

* মহাজনকে এদেশে সাহুকার বলে।

এই, টাকা আদায়ের সুবিধা। বৃদ্ধ মাতার কি গৃহিণীর কারাবাস-ভয়ে রায়ত যেমন করিয়াই হউক ঋণশোধ করিতে তৎপর হয়। যখন আগামী বৎসরের ফসল প্রস্তুত হয়, আর গবর্নমেন্টের টাকা মুখী কিম্বা তলাটীর হস্তে গচ্ছিত হয়, তখন সাহুকার রায়তের দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। অনেক কাকুতিমিনতির পর রায়ত আপনার সংসার খরচের জন্য যৎকিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়া অবশিষ্ট সুদের টাকা বলিয়া হয়ত মহাজনের হস্তে অর্পণ করে। দেনা বৃদ্ধি হইলে মহাজন হয়ত সমস্ত ফসলই গৃহে লইয়া যায়, ও রায়ত যখন আপনার পরিবার পোষণের জন্য অল্প কিছু প্রার্থনা করে তখন সাহুকার তাহাকে বুঝাইয়া দেয় — তোর ভাবনা কি? তোর যখন যাহা প্রয়োজন হইবে আমার দোকান হইতে সকলি পাইবি। পর বৎসর শস্য বপন করিবার বীজ চাই, রায়ত অমনি মহাজনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত। মহাজন তাহাকে বীজ ধার দেয়; ধারের নিয়ম এই যে, শস্য পরিপক্ক হইলে ঋণের দ্বিগুণ শস্য সুদসমেত প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে বীজ বপনের জন্য — জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতি বৎসর তাহাদের বণিকের দোকানে ধার করিতে হয়। পর বৎসর ফসল কাটিবার সময় উপস্থিত কিন্তু এইরূপ গবর্নমেন্টের খাজানা দিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয় তাহা গত বৎসরের দেনার সুদ পরিশোধ করিতে গিয়া সকলি নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই সুদ ক্রমে মূলধনের উপর সঞ্চিত হইয়া কর্জ ক্রমিক বাড়িয়া যায়, ও যখন খত তামাদি হইবার উপক্রম হয় তখন মহাজন অবসর বুঝিয়া সুদের হিসাব করিয়া বর্ধিত আকারে এক নূতন তমসুক প্রস্তুত করিয়া লয়। এবার কিন্তু সহজ তমসুকে সাহুকার সন্তুষ্ট নয়, তাহার সঙ্গে বন্ধক চাই — রায়তের ক্ষেত্র ও বসত বাটী বন্ধক লিখিয়া এক নূতন তমসুক লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রকারে গরীব বেচারী আটেঘাটে এরূপ বদ্ধ হইয়া পড়ে যে তাহার পলাইবার পথ থাকে না। অবশেষে যখন দেনা পরিশোধ করিবার আর তাহার কিছুমাত্র সঙ্গতি থাকে না, তখন মহাজন তাহার তমসুক লইয়া রায়তের বিরুদ্ধে আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত করে। এই সকল মকদ্দমার অধিকাংশ রায়তের অবর্তমানেই নিষ্পত্তি হয়। খতের লেখক ও এক স্বাক্ষরকারীর সাক্ষ্য লইয়া জজ স্বকীয় কোর্ট হইতে ডিক্রী বাহির করেন। সেই ডিক্রী জারি হইয়া রায়তের ঘর জমি সকলি অল্প মূল্যে নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। অনেক সময় মহাজন নিজেই হয়ত তাহার সমুদয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লন। মহাজন রায়তের জমি লইয়া কি করিবেন, তিনি কিছু নিজ হাতে চাষ করিতে পারেন না, সুতরাং রায়তকেই হয়ত তাহা ইজারা দিয়া পাট্টা লিখিয়া লন। যে রায়ত এককালে ভূস্বামী ছিল সে হয়ত মহাজনের করদ প্রজা হইয়া সেই জমি উপভোগ করে, ও কখনো-বা তাহার দাসত্ব করিয়া যথাকিঞ্চিৎরূপে দিনপাত করিতে বাধ্য হয়।

রায়ত-মক্ষিকার উপর মহাজন মাকড়সার জাল অল্পে অল্পে কিরূপে বিস্তৃত হয় তাহা বলা হইল। কিন্তু এই তো গেল সাধারণ নিয়ম। এতদ্ব্যতীত কত সময় কত জাল তমসক — হিসাবে কত প্রতারণা — মিথ্যা মকদ্দমা প্রভৃতি সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া মহাজন রায়তের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হয়; তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আদালতের দফ্‌তরে দেখিতে পাওয়া যায়।

রায়ত যে বিষম ঋণভার-প্রপীড়িত তাহার উদাহরণ দক্ষিণ রায়তদের উপর যে কমিশন বসিবার কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার রিপোর্টে অনেক সংগৃহীত দেখা যাইবে।

মহাজনদের খাতা হইতে কতকগুলি কৃষকের কর্জের হিসাব পর্যবেক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে যে, যে টাকা ধার দেওয়া গিয়াছে তাহার সমষ্টি ৪৯১৭ টাকা — যত টাকা শোধ হইয়াছে তাহার সমষ্টি ৫৯১৮ আর তাহা দিয়া এখনো ৫৯০৬ টাকা বাকি দেনা করিয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত মনে রাখিতে হইবে যে প্রজারা এই বলিয়া অনেক সময় হাহাকার করে যে খতপত্রে যত টাকা দেনা বলিয়া লিখিত আছে তাহার সম্পূর্ণ তাহারা পায় না কিম্বা ধার শুধিতে তাহারা যত টাকা মহাজনকে গনিয়া দিয়াছে তাহা তাহাদের হিসাবে জমা হয় নাই।

ঐ রিপোর্ট হইতে আরো কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইলে রায়তের দৈন্যাবস্থা পাঠকাদিগের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কত্তিরে পরিবার, যাহারা পার্ণেজ গ্রামের পাটেলকী কর্ম বংশপরম্পরা ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহারা দক্ষিণ দেশের নামাঙ্কিত পরিবার মধ্যে গণ্য ছিল। বার বৎসর হইল তাহাদের গৃহস্বামী ২০০ টাকা ধার করেন। তিনি ৩৩৫ টাকা প্রত্যর্পণ করেন, বাকি ৩৮৫ টাকার জন্য তাহার উপর মকদ্দমা আনা হয়, তাহাতে ভূমি সম্পত্তি — প্রায় ৪০ বিঘা জমি নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়, ও এক্ষণে তিনি দাসত্ব করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। বালাজী আট টাকা ধার করিয়া ১৫ টাকা দেনা পরিশোধ করেন। মহাজন তাঁহার উপর ৩০ টাকা ডিক্রী পাইয়া সেই ডিক্রী জারি করিয়া তাহার ৪০ বিঘা জমি ও ১২টা বলদ বিক্রী করাইয়া স্বয়ং তাহা কিনিয়া লন। শ্রীপতি এক মণ দানা (দাম তার বড় জোর ৪ টাকা) ধার করিয়া প্রত্যর্পণ করেন। সুদের জন্য তাঁহাকে ১৫ টাকার খত সুদ শুদ্ধ লিখিয়া দিতে হয়। আবার দেনা শুধিবার জন্য উত্ত্যক্ত হইলে সে দশ টাকা নগদ দিয়া ২৫ টাকার এক নূতন খত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। ২৫ টাকা শুধিবার জন্য মহাজনের চাকরীতে নিযুক্ত হয়, ও অবশেষে মকদ্দমার হাঙ্গামে পড়িয়া তাহার বসতবাটী ও জমি ৬ টাকায় বিক্রয় হইয়া যায়। রাওজী ১৫ বৎসর পূর্বে ৬০ টাকা ধার করে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সে মহাজনকে ১০০ টাকা নগদ, ২২৫ টাকার শস্য, ৪টা বলদ, ১টা ঘোড়া ও তিনটা ক্ষেত্র বন্ধক দিয়াও এখনো সে দেনা হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয় নাই। ১১ বৎসর পূর্বে আনন্দজী দোকানের দেনার জন্য ২৫ টাকার এক খত লিখিয়া দেয়, আর এক্ষণে তাহার আবশ্যক কতকগুলি জিনিসপত্র আছে কিন্তু হাতে নগদ টাকা নাই। সে তাহার মহাজনকে একটি ক্ষেত্র, ৮ বলদ ও ৪ গো দান করিয়াছে। একে একে ৫০।১০০। ২০০। ৩০০। ৩৫০ টাকার খত লিখিয়া দিয়াছে ও এক্ষণে তাহার দেনা ৫০০ টাকায় বর্ধিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ ৮ টাকার কাপড় কিনিয়া ঋণগ্রস্ত হয় — রামজী তাহার জামিন হয়। লক্ষ্মণ তিন টাকা শোধ দিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সাহুকার রামজীকে পেড়াপীড়ি করাতে সে তিন বৎসর হইল ২২ টাকার এক খত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। গত বৎসরে সেই খতের সর্তে তাহার উপর মকদ্দমা আনিয়া মহাজন খরচা

সমেত এক ৫৬ টাকার ডিক্রী করিলেন। ডিক্রী জারি হইবার পরে সে ২২ টাকা নগদ দিয়া ৪৫ টাকার এক নূতন খত লিখিয়া দেয়। বিবিজান নামক একজন বৃদ্ধা বিধবা স্ত্রী তার পুত্রের বিবাহের জন্য অনেক বৎসর হইল ১৫০ টাকা কর্জ করে। ১৩ বৎসর পূর্বে এই দেনার জন্য সে ৩০০ টাকার এক বন্ধকখত লিখিয়া পাতকুয়া শুদ্ধ ২০ বিঘা জমি তাহার হস্তে বন্ধক রাখে। সেই অবধি মহাজন তার সমুদয় উপস্বত্ব ভোগ করিতেছে, সে হিসাবও দেবে না, জমি ফেরত দিতেও চায় না। বিশ বৎসর হইল আজু নামক এক ব্যক্তি ১৭ টাকা নগদ ও এক মণ দানা ধার করিয়াছিল। সেই দেনা শোধ করিতে সে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ৫৬৭ টাকা দিয়াছে, অনেকগুলি খত লিখিয়া গিয়াছে তাহার দুইটির দরুণ ৮৭৫ টাকা এখনো পর্যন্ত অদেয় রহিয়াছে।

বোম্বাই রায়তের অবস্থা কতদূর শোচনীয় তাহা উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে সহজে প্রতীয়মান হইবে। এইরূপ ধার্য হইয়াছে* যে, কোন এক প্রদেশে ৬০০ জন রায়তের অবস্থা দেখিতে গেলে তাহাদের ঋণের পরিমাণ ৩ কোটি টাকারও অধিক দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ তাহাদের দেনা গবর্নমেন্টেব সদর খাজনার ১৬ গুণ ও মোট বার্ষিক উপস্বত্বের প্রায় ১।।০ গুণ হইবে। ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে বিগত ১৫ বৎসরের মধ্যে যে কালের প্রারম্ভে মহারাণী স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করাতে সকলেই রায়তের ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা করিতেছেন, যে কালের অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ আইন ও আদালত সকল প্রতিষ্ঠিত হইল কোথায় তাহাতে রায়তদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে — না তাহাদের ঋণভার শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অনেক সময় মহাজনে ডিক্রী জারি করিয়া তাহার ঋণের ভূমিসম্পত্তি নিলামে বিক্রি করিয়া অল্প মূল্যে স্বয়ং কিনিয়া লয় তাহাতেও ডিক্রীর সমুদয় টাকা পরিশোধ হয় না। হতভাগ্য রায়তকে তাহার নিজের জমি অনেক খাজানা দিয়া মহাজনের নিকট হইতে পাট্টা লইয়া ভোগ করিতে হয়। না হয়তো জন্মভূমি ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া তাহাকে নবজীবন আরম্ভ করিতে হয়। কখনো কখনো সে কতক বৎসরের জন্য হয়তো মহাজনের দাসত্ব স্বীকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে বাধ্য হয়। কমিশনরগণ একজন রায়তের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে একজন রায়তের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেলে সে নিজে ও তাহার স্ত্রী বার্ষিক খাওয়া, তামাক ও একখানা করিয়া কম্বলের বিনিময়ে ১৩ বৎসর পর্যন্ত তাহার দেশ বিদেশ দাসত্ব স্বীকার করিয়া খত লিখিয়া দেয়।

কমিশনরগণ রায়তের এইরূপ দুর্দশার অনেকগুলি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। গৃহকার্য ও উৎসব ক্রিয়ার জন্য দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ধার কর্জ করা — গবর্নমেন্টের খাজানা আদায়ের কড়াক্কড় নিয়ম — শস্য বিক্রয়ের উপযুক্ত বাজারের অভাব, এই সকল তাহার মধ্যে অবশ্য ধর্তব্য।

* Famine and debt in Inaia Ninteenth Century, September, 1887.

রায়তদেব দুরবস্থার প্রধান কারণ রায়তের অজ্ঞান ও ভীরুতা আর মহাজনের অত্যাচার। আদালত সকল এই অত্যাচারের এক অব্যর্থ হাতিয়ার। দুঃখের বিষয় এই যে আদালতে লেখা বিতরণ করিয়া কোথায় এই অত্যাচার নিবারণ করিবে, না জনতা হইতেই অন্যায় অত্যাচার আরো প্রশ্রয় পায়। আদালতে যে আইন ও কার্যবিধি তাহাতে গরীবের উপর ধনীর জয় নিরীহ অজ্ঞানের উপর স্বার্থপর প্রখর-বুদ্ধির জয় এ তো ধরা কথা। ন্যায়ান্যায়-বিচারহীন বাদী যখন একজন অজ্ঞান দীনহীন রায়তের বিরুদ্ধে মকদ্দমা উপস্থিত করে তখন সেই রায়তের পরাজয়ই অবশ্যম্ভাবী বলা যাইতে পারে। আইন আবার রায়তের উপর এমন খড়্গহস্ত যে মহাজনে একবাব তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী বাহির করিতে পারিলেই তাহার যথাসর্বস্ব লুঠিয়া লইতে পারে — তাহার ঘর দ্বাব ভূমি সম্পত্তি সমুদয়ই বিক্রীত হইয়া যায় ও অবশেষে হয়তো দেনার জন্য তাহাদের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। এ দিকে আবার বিচারপতির হাতে যে অগাধ কর্মভার, আদালতের যেরূপ কার্যপ্রণালী তাহাতে প্রত্যেক মকদ্দমার তন্ন তন্ন বিচার হইয়া উঠা এক প্রকার অসম্ভব — তাঁহারা ন্যায় অন্যায় না দেখিয়া আইনের প্রতিই দৃষ্টি করেন — তাঁহারা আইনমতে কার্য করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট, সত্য-নির্ণয়ের জন্য সময় ব্যয় সময়ের অপব্যয়ই বিবেচনা করেন।

আদালতে যে অর্থী প্রত্যর্থী উপস্থিত হয়েন তাঁহারা আইনের চক্ষে উভয়েই সমান। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রায়ত ও মহাজনের মধ্যে যে বিবাদ তাহা দুগ্ধপোষ্য শিশু ও বলিষ্ঠ পাহালওয়ানের মল্লযুদ্ধের ন্যায়। মকদ্দমার কার্যপ্রণালী যতই সহজ হউক না কেন, সামান্য রাযতের পক্ষে তাহাই নিতান্ত দুরূহ, তাহাতেই সে খতম খাইয়া যায়। যদি কোন রায়ত মহাজনের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয় — প্রথমতঃ তাহাকে গ্রাম ছাড়িয়া, কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া কত দূরে আসিয়া সংগ্রাম করিতে হইবে — তারপর ষ্ট্যাম্পের ব্যয় ও উকীল খরচা, কত কারণে মকদ্দমা স্থগিত হইতেছে ও তাহার পুনঃপুনঃ আদালতে আসিযা কষ্টভোগ — তারপর নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা সেও তাহার পক্ষে সহজ নহে। এই সকল কারণে বুঝিতে পারা যায় মকদ্দমার সময় কেন প্রতিবাদীগণ প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। নথি অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে শতকরা ৯০ মকদ্দমা রায়তের অবর্তমানেই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। আর এই সকল ধার-কর্জের মামলায় শতের একটাতে যদি রায়তে জয়লাভ করিতে পারে তাহাই ঢের অর্থাৎ একশতের মধ্যে একজন রায়ত যদি মহাজনের ষড়চক্রেব বিরুদ্ধে জয়লাভে সমর্থ হয় তবে তার ভাগ্য বলিতে হইবে। এ অতি ভয়ানক কথা। ফৌজদারী মকদ্দমায় এ অপেক্ষা সুবিচারের সম্ভাবনা। যদি চুরির অভিযোগ আনিয়া কাহারো বিরুদ্ধে নালিশ করা যায় সে হয়তো দুই এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু সে বিচারের সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সাক্ষীদের জেরা করিতে পারে, শত্রুর অভিযোগ খণ্ডন করিতে পারে — আপনার নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয়।

মকদ্দমার ব্যয়বাহুল্য হেতু যে রায়তেরা অনেক সময় মকদ্দমা চালাইতে অক্ষম হইয়া

মিথ্যাবাদী বাদীর নিকটেও পরাভূত হয় তাহা বায়ত কমিশনরগণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে মকদ্দমার ব্যয়াধিক্য গরীব রায়তদের গুরুভারজনক। এই ব্যয় যদি মকদ্দমার ন্যায্য খরচার অধিক না হইত তবে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু দেখিতে গেলে ষ্ট্যাম্প ও কোর্ট ফী হইতে যে রাজস্ব উৎপন্ন হয় তাহা হইতে মূল ও আপীল কোর্টের সমুদয় খরচা বাদেও এই বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জন্যই প্রায় ৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়।

মকদ্দমার ব্যয়বাহুল্য প্রতিপাদন করিবার জন্য এক্ষণকার আইন অনুসারে প্রতিবাদীর উপর কি কি খরচা পড়ে তাহা দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। মনে কর এক খতের টাকা আদায়ের দাওয়া। প্রতিবাদীর বক্তব্য এই যে খতের টাকা সে পায় নাই। এই কথা সমর্থন করিবার জন্য তার চারি সাক্ষীর প্রয়োজন। সমন জারি হইয়াও তাহাদের মধ্যে একজন সাক্ষী উপস্থিত হয় নাই। ইহাও অনুমান করা যাউক যে সেই মকদ্দমায় প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য একজন উকীল নিযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ হইলে প্রতিবাদীর যে খরচ পড়িবে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

	২৫ টাকার মকদ্দমায়	৫০ টাকার মকদ্দমায়
আরজীর উত্তর	১ ”	৮ ”
উকীল পত্রের উপর কোর্ট ফী	৮ ”	৮ ”
২ আনার হিসাবে ৪ সাক্ষীর সমন খরচ	৮ ”	১ ”
৩ আনার হিসাবে সাক্ষীর ভাতা খরচ	১২ ”	১২ ”
একজন সাক্ষীর ওয়ারেন্ট খরচ	৪ ”	৮ ”
নকলের জন্য কোর্ট ফী ইত্যাদি	১২ ”	১২ ”
উকীল ফী	১” ৪	২
সমষ্টি	৪” ১	৬

উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে ২৫ টাকার মকদ্দমায় প্রায় দাওয়ার ষষ্ঠাংশ খরচ — ৫০ টাকার মকদ্দমায় প্রায় অষ্টমাংশ। এক্ষণে যে ষ্ট্যাম্প সংক্রান্ত আইন প্রবর্তিত হইবার কথা হইতেছে তাহার বিধানানুসারে মকদ্দমার খরচ আরো বর্ধিত হইবে। এই ব্যয়ভার লইয়া গরীব রায়তেরা চলৎশক্তিহীন। যাহাতে তাহারা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিচারালয়ে সহজে উপস্থিত হইতে পারে তাহার জন্য মকদ্দমাসংক্রান্ত ব্যয়ের হ্রাস করা নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা তাহাদের নিকট হইতে ন্যায়ের দ্বার এক প্রকার রুদ্ধ করা যায়। এইক্ষণকার আইন অনুসারে যেসকল খরচা বাদী প্রতিবাদী উভয়কেই বহন করিতে হয় তাহা এই ঃ—

১। কোর্ট ফী আইন অনুসারে আরজী দরখাস্ত-নকল প্রভৃতির উপর কোর্ট ফী।

২। সমন প্রভৃতির জন্য নির্দ্ধারিত কোর্ট ফী।

৩। সাক্ষীর ভাতা খরচ।

৪। ডাকের খরচ।

৫। উকীলের ফী।

৬। নকল লইবার খরচ।

ইহার প্রত্যেক বিষয়ে খরচ কমাইবার দিকে আইনকর্তাদিগের লক্ষ থাকা উচিত। বিশেষতঃ অল্প টাকার মকদ্দমাসংক্রান্ত ফীর স্বল্পীকরণ অবশ্য কর্তব্য। দুইজন ধনীব মধ্যে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে উকীল মোক্তার আটর্নীগণ ভূরিভোজন করিয়া লন তাহাতে তত ক্ষতি নাই কিন্তু ন্যায়প্রার্থী গরীবের পথের কণ্টক তুলিয়া না দিলে তাহার আর কোনরূপে নিস্তার নাই। ববং গবর্নমেন্টের উচিত যে এই সকল লোকদের বিনা বেতনে উকীল পাইবার সুবিধা করিয়া দেন — তাহা হইলে বাস্তবিকই তাঁহাদের রাজোচিত কার্য হয় ও তাঁহারা সহস্র সহস্র প্রজার আশীর্বাদের পাত্র হয়েন। বিচারালয়ের ব্যয় নির্বাহই ষ্ট্যাম্প ও কোর্ট ফী গ্রহণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অর্থী প্রত্যর্থীর নিকট হইতে টাকা লইয়া সাধারণ রাজস্ব বর্দ্ধিত করা কখনও ন্যায়পরায়ণ সুসভ্য গবর্নমেন্টের কর্তব্য নহে।

আদালতে মকদ্দমা আনিবার দরুণ যে অর্থনাশ ও মনস্তাপ তাহা হইতে মুক্ত করিবার এক সহজ উপায়, সালিসী বিচারের উত্তেজনা। গ্রামের পাঁচজনে মিলিয়া বিবাদ-ভঞ্জন প্রথা এ দেশের চিরন্তন প্রথা। জাতিসংক্রান্ত ও অন্যান্য বিবাদে এখনো পর্যন্ত ইহা প্রচলিত দেখা যায়। মহারাষ্ট্রীয় রাজত্বকালে পঞ্চায়েতের বিচারের উপর লোকেরদের বিশেষ আস্থা ছিল। এদেশে কথায় বলে “পঞ্চ পরমেশ্বর” অর্থাৎ পঞ্চের বিচার ঈশ্বরের বিচারের সমান। Vox populi vox dei মহারাষ্ট্রীয়দের আমলে সামান্যতঃ গ্রামের পঞ্চায়েত কর্তৃক সকল দেওয়ানী মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইত — হয় বাদী প্রতিবাদী নয় স্বয়ং গবর্নমেন্টের কর্তৃপক্ষগণ সেই সকলের মীমাংসা পঞ্চায়েতের হস্তেই সমর্পণ করিতেন। বেতনভুক্ কর্মচারীগণ প্রায়ই সে-

সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতেন না। এ প্রদেশে ইংরাজ রাজ্যের প্রারম্ভে কর্তৃপক্ষগণ এই রীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। খ্রিস্টাব্দ ১৮২৭ পর্যন্ত গবর্নমেন্টের কর্মচারীগণ পঞ্চায়েতের উপরেই দেওয়ানী মকদ্দমার ভার নিক্ষেপ করিতেন, পঞ্চায়েতের হুকুম অনুমোদন ও জারি করাই তাঁহাদের কার্য ছিল। ১৮২৭-এর দেওয়ানী আইন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে প্রচলিত হইলে পঞ্চায়েত-সংক্রান্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়া এক স্বতন্ত্র আইন (১৮২৭-এর ৭) সংসৃষ্ট হয়। লোকের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ যাহাতে আপসে মিটিয়া যায় তাঁহার উত্তেজনা দেওয়াই ঐ আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। গবর্নমেন্টের কর্মচারীগণ পঞ্চায়েতের কার্যভার গ্রহণে আদিষ্ট। সত্য নিরূপণের জন্য যেরূপ প্রমাণ ও বিচারের আবশ্যক সেই সকল প্রমাণ সংগ্রহ করা ও সেইরূপ বিচার অবলম্বন করা পঞ্চায়েতের ক্ষমতাধীন ছিল ও তাহাদের নিকট সাক্ষী হাজির করিবার ভার আদালতের উপর। তাহাদের ব্যবস্থার উপর ষ্ট্যাম্প ছিল না ও তাহা আদালতে দাখিল হইলে ডিক্রীর সমান ফলোপধায়ী। তাহার উপর আপীল ছিল না। ১৮৫৯-এর ৮ আইন প্রচলিত হওয়া পর্যন্ত ঐ আইন জারি ছিল, ক্রমে তাহার নিয়ম সকল শিথিল হইয়া এই পঞ্চায়েত প্রথা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে মহারাষ্ট্রীয় কতকগুলি দেশানুরাগী ব্যক্তি এই পুরাতন প্রথা পুনরুদ্দীপ্ত করিতে তৎপর হইয়াছেন ও তাঁহাদের যত্নে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের স্থানে স্থানে সালিসী কোর্টসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল কোর্ট স্থাপন করিবার প্রযত্ন কয়েক বৎসর হইল পুনা জিলায় ইন্দাপুর নগরে প্রথম আরম্ভ হয়। এই সকল কোর্ট জনসাধারণের এত প্রার্থনীয় ও তখনকার আইন তৎস্থাপন পক্ষে এরূপ অনুকূল ছিল যে দুই বৎসরের মধ্যে পুনা, সাতারা, সোলাপুর, অহমদনগর, থানা, রত্নাগিরী, নাসিক, আহমদাবাদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে সালিসী কোর্ট সকল স্থাপিত হয় ও তাহাদের শাখা আরো নানা স্থানে বিস্তারিত হয়। জানুয়ারী ১৮৭৬ সালে পুনার 'লওয়াদ' কোর্টের কার্যারম্ভ হয়। পুনানগরবাসীদের এক সাধারণ সভাতে বিরেশী জন নানা শ্রেণীস্থ ভদ্রলোক কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। ইহাদের মধ্যে এক কিম্বা একাধিক জনকে বাদী প্রতিবাদীগণ ইচ্ছামত বাছিয়া লইয়া আপনার বিবাদ নিষ্পত্তির ভার অর্পণ করিতে পারেন। বিচারকগণের পালায় পালায় অধিবেশন হয় ও তাঁহারা বিনা অর্থে কার্য করেন। এই পুনা কোর্টে দুই বৎসর মধ্যে প্রায় ৩ সহস্র মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে। এই ৩০০০ মকদ্দমা স্বল্প ব্যয়ে আপসে মিটিয়া গেল, আদালতে যাইতে হইলে কত অর্থ ও সময় ব্যয়, কত মিথ্যাসাক্ষী, কিরূপ মনঃপীড়া, এই সকল নির্ধারিত হইল — এ কি সামান্য লাভ! — এ বিষয়ে পুনানিবাসী গণেশ বাসুদেব জোশী একজন প্রধান উদ্যোগী। এই দেশহিতৈষী ব্যক্তি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া এই শুভ কার্যে দেশীয়দের উৎসাহ বর্ধন করিবার জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন নাই।

বোম্বাই রায়ত

তৃতীয় ভাগ

একদিকে এই সকল সালিসী কোর্ট আর একদিকে কঠোর আইনবদ্ধ আদালত। বিনা ব্যয়ে আপসে বিবাদ ভঞ্জন একের কার্য — অপরের কার্য বিবাদানল প্রজ্বলিত করিয়া অর্থী প্রত্যর্থী উভয়েরই অর্থনাশ করা। একবার আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে আর শান্তি নাই — বিরাম নাই। ইহার চূড়ান্ত হইতে যে কালবিলম্ব হয় তাহাতে কত ধূর্ততা প্রবঞ্চনা মিথ্যা সাজাইবার সময় পাওয়া যায়। প্রথম কোর্টে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে জিলা জজের নিকট আপীল — তারপর বোম্বাই হাইকোর্টে কখনো বা বিলাতে রাণীর বিচারালয় পর্যন্ত না গিয়া পরাজিত পক্ষ ক্ষান্ত হয় না। ইহাতে কত বিলম্ব ও অর্থব্যয়, বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে কি ভয়ানক বিবাদ বিদ্বেষ প্রদীপ্ত হয়। ইহা অপেক্ষা সালিসী কোর্টের সহজ ও শান্তিময় প্রণালী কত প্রার্থনীয়। বোম্বাই অঞ্চলের একজন জিলা জজ সালিসী কোর্ট ও আদালতের কার্যপ্রণালীর সম্মিলন প্রস্তাব করিয়া East Indian Association সভায় এক প্রবন্ধ * পাঠ করেন। তাঁহার মতে এই উভয় কোর্ট একত্রে মিলিয়া কার্য করিলে তাহা হইতে অনেক শুভফল প্রসূত হইতে পারে। তিনি বলেন ইহার প্রত্যেক কোর্টেরই দোষ গুণ লক্ষিত হয়। এই উভয় কোর্টের বিচারক বিদ্যাবুদ্ধিতে সমান নহে। পঞ্চায়েতের একজন মেম্বর সুশিক্ষিত মুন্সেফের তুল্য বিচক্ষণ বুদ্ধিমান কার্যদক্ষ আইনজ্ঞ হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু তেমনি আবার আর কতকগুলি বিষয়ে পঞ্চায়েতের কোর্টের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। পঞ্চায়েতের লোকেরা গ্রামের মধ্যে থাকিয়া আপনার গ্রামের বৃত্তান্ত সকল জানিতেছে শুনিতেছে — গ্রামবাসীদিগের চরিত্র রীতিনীতি তাহারা বিশেষ রূপে অবগত। হয়ত সাক্ষীদের হাবভাব দেখিয়া তাহারা সাক্ষ্য ভাল করিয়া ওজন করিতে পারিবে, সাক্ষ্যের সত্যাসত্য সহজে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে। তাহারা মোটামুটি বিচার করিয়া যেরূপে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে মুন্সেফ হয়তো সহস্র আইন খাটাইয়া তাহাতে কৃতকার্য হইবেন না। আর একদিক দেখিতে গেলে মুন্সেফ হয়তো তাহাদের অপেক্ষা বিচারক্ষম বহুদর্শী, মুন্সেফ হয়তো অপক্ষপাতে বিচার করিয়া দিবেন — পঞ্চায়েতের পক্ষপাতদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। এইক্ষণে এই দুই কোর্ট পৃথক পৃথক কার্য করিতেছে বলিয়া তাহারা তাদৃশ ফলোপধায়ী হয় না, কিন্তু তাহারা সম্মিলিত হইলে তাহাদের পরস্পরের দোষ খণ্ডন ও উপকারিতা বর্ধন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এইরূপে উভয় কোর্টে মিলিয়া কার্য করা আমাদের প্রাচীন প্রথার অনুযায়ী, পূর্বে মহারাষ্ট্র দেশে বাদী প্রতিবাদী প্রথমে পঞ্চায়েতের নিকটে যাইয়া আপনাদের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য আবেদন করিত — সে বিচার মনের মত না হইলে অসন্তুষ্ট পক্ষ রাজকর্মচারী

* "The Panchayat, a remedy for Agrarian disorders in India," read before The East India Association by Mr. William Wedderburn (Bombay Civil Service)

ন্যায়াধীশের শরণাপন্ন হইত। এখনো কতকটা এই নিয়ম প্রবর্তিত হইতে পারে। প্রত্যেক বড় বড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীসমূহে এক একটি পঞ্চায়েত কোর্ট স্থাপিত হউক। তাঁহাদের নিকট প্রথমতঃ সামান্য ঋণসম্বন্ধীয় মকদ্দমার বিচার হইবে। তাঁহারা যতগুলি মকদ্দমা আপসে মিটমাট করিয়া দিতে পারেন তাহা সাধ্যমত করিয়া দিবেন — অবশিষ্টগুলি যাহা সহজে নিষ্পত্তি হওয়া দুষ্কর তাহা মুন্সেফের বিচারালয়ে আনীত হইবে। মুন্সেফ কোর্ট এক স্থানে আবদ্ধ থাকিবে না — মুন্সেফ গ্রামে গ্রামে সরকিট ভ্রমণ করিয়া বিচারকার্য নির্বাহ করিবেন। যে গ্রামে পঞ্চায়েত কোর্ট প্রতিষ্ঠিত, তথায় উপস্থিত হইলে তিনি পঞ্চায়েতের মতে তাহার সভাপতি হইয়া বিচারাসনে বসিবেন ও তাহাদের সাহায্যে গুরুতর মকদ্দমা সকলের নিষ্পত্তি করিবেন। যাহাতে অর্থী প্রত্যর্থী পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা অমান্য করিয়া অকারণে আদালতে মকদ্দমা আনিতে না পারে তাহার জন্য ঐ সকল মকদ্দমার উপর ষ্ট্যাম্প-কর নির্ধারিত করা আবশ্যক। আর মুন্সেফ কোর্টের কার্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল রূপে চলিতেছে কিনা ও তাহার বিচারকার্য ভাল মন্দ কিরূপ হইতেছে তাহার তত্ত্বাবধানের ভার জিলা জজের উপর থাকিবে। জিলা জজ ও তাঁহার সহকারিগণ মধ্যে মধ্যে সরকিট গমন করিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

এই পঞ্চায়েত-প্রথা প্রবর্তিত হইলে দেশের অশেষ হিত সাধিত হয়, বোধবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। কিন্তু এ বিষয়ে গবর্নমেন্ট মনোযোগী না হইলে কিছুই হইবে না। গবর্নমেন্টের সাহায্য ব্যতীত এই মৃতপ্রায় তরু পুনরুজ্জীবিত হওয়া সম্ভব নহে। পঞ্চায়েত সভার সভাসদদিগকে কোন সম্মানসূচক পদবী প্রদান করা মন্দ নয়। তাহা হইলে জমিদার, উচ্চশ্রেণীর বণিক, পেনসনভুক লোক যাঁহাদেব হাতে অগাধ সময় পড়িয়া আছে তাহা কিরূপে কাটাইবেন ভাবিয়া পান না, তাঁহারা স্থানীয় সভার সভাসদ হবার প্রার্থী হইতে পারেন। এইরূপ সভা লোকের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জন করিয়া জনসমাজে শান্তিরক্ষণে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ রাইয়ত কমিশনরগণ প্রস্তাব করিয়াছেন যে ছোট ছোট ঋণসম্বন্ধীয় মকদ্দমার বিচার জন্য কতকগুলি বিশেষ কোর্ট স্থাপিত হওয়া উচিত। সরকিট কোর্টের ন্যায় স্থানে স্থানে তাহাদের অধিবেশন হইবে ও এই সকল কোর্টের তত্ত্বাবধানে প্রচলিত আদালতের মুন্সেফ প্রভৃতি বিচারকগণ নিযুক্ত থাকিবে। রাইয়তদিগকে আপনাদের ঘরবাড়ী কৃষিকার্য ছাড়িয়া দূরস্থিত আদালতে যাইতে বাধ্য করা তাহাদের উপর সামান্য অত্যাচার নয়। সরকিট কোর্টে ইহার অনেকটা উপশম হইতে পারে। তদ্ভিন্ন তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে বিচারের সৌকর্য ও বিলম্ব হ্রাসের সম্ভাবনা। অবিচারের নীচেই বিচারে কালবিলম্ব দূষণীয়। এইক্ষণকার বিচার-প্রণালীতে বিলম্ব ও দীর্ঘসূত্রতা বিশেষ প্রশ্রয় পায় বলিয়া বাদী প্রতিবাদী অনেক সময় সুবিচারের ফল হইতে বঞ্চিত হয়। এই সকল অমঙ্গল নিবারণ উদ্দেশে কমিশনরগণ বলেন যে বিচারকেরা ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রধান প্রধান গ্রামে গিয়া আদালত খুলিবেন ও সেই সময়ে গ্রামের

অধীনস্থ পল্লীসমূহের সমুদায় মকদ্দমা তাঁহাদের কোর্টে উপস্থিত করিতে হইবে। গ্রামের মণ্ডলেরা প্রতিবাদীদিগকে আনিয়া হাজির করিতে আদিষ্ট হইবে — কার্যপ্রণালী যতদূর সহজ হইবার তাহা হইবে এবং প্রতিবাদীর যদি আপনার পক্ষে কিছু বলিবার থাকে সে তাহা ব্যক্ত করিবে, এইরূপ হইলে অনেক জাল প্রতারণা মিথ্যাসাক্ষ্য উঠিয়া যাইবে, প্রতিবাদীগণ মন খুলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে সক্ষম হইবে, সাক্ষীরাও অকুতোভয়ে অন্যের পক্ষ হইয়া সাক্ষ্যদান করিতে পারিবে। প্রতিবাদীগণের প্রবাস যাপনের কষ্ট দূর হইবে। এইক্ষণে যে সকল মকদ্দমার বহুকষ্টে দীর্ঘকালে মীমাংসা হয় তাহা অনতি পরিশ্রমে অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি হইবে — বিচারে ন্যায় ও ত্বরা উভয়েই রক্ষা পাইয়া অর্থী প্রত্যর্থীর সন্তোষ সাধন করিবে।

অধুনাতন আদালতে কার্যপ্রণালী রাইয়তের পক্ষে বিষম সঙ্কটাবহ তাহাব আব সন্দেহ নাই। দাবীদার আসিয়া তাহার দাওয়ার আরজী দাখিল করিলে পর প্রতিবাদীর প্রতি কোর্টে হাজির হইবার সমন জারি হয়, কিন্তু অনেক সময় এই সমন যথাস্থানে পৌঁছে কিনা সন্দেহ। এমন হইতে পারে যে বেলিফ বাদীব টাকায় ক্রীত, সে সমন জারী না করিয়াও কোর্টে মিথ্যা রিপোর্ট প্রেরণ করিল। ডিক্রী জারির সময় রাইয়ত হযতো প্রথম জানিতে পারিল যে তাহার সর্বনাশ উপস্থিত — সে অমনি দৌড়িয়া কোর্টে গিয়া নিবেদন করিল, "দোহাই ধর্মাবতার, আমি এ মকদ্দমার কিছুই জানি না।" সে আপনার কথা সমর্থন করিতে পারে না পারে তাহা দৈবের উপর নির্ভর। রাইয়ত যদি বা সমন পাইল, তাহাকে কোর্টে আসিয়া দাওয়ার উত্তব দিতে হইবে — উকীল নিযুক্ত করিতে হইবে — সাক্ষীর ডাকিবার খরচা দিতে হইবে, এই সকল বিভীষিকা দেখিয়া সে আদালতে ঘেঁসিতেই সঙ্কুচিত হয়। অতএব অধিকাংশ মকদ্দমা যে প্রতিবাদীর অবর্তমানে নিষ্পত্তি হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? তদনন্তর রাইয়তের উপর একবার ডিক্রী করিয়া লইতে পারিলেই মহাজনের কার্যসিদ্ধ হইল। সে যে সদ্য সদ্য ডিক্রী জারি করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে কিন্তু সে সেই ডিক্রী রাইয়তের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া সময়ে সময়ে তাহার নিকট হইতে টাকা শস্য গ্রহণ করে, অথবা তাহাকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করে। তৎপরে ইচ্ছা হইলে আবার সম্পূর্ণ ডিক্রী জারি করিয়া লয়। এইরূপ প্রবঞ্চনায় আইন তাহার সহায়, কেন না আইনানুসারে ডিক্রীর টাকা কোর্টে আনিয়া অথবা কোর্টকে জানাইয়া ডিক্রীদারকে দিতে হইবে। কিন্তু রাইয়ত তো এ নিয়মের কিছুই জানে না। সে একবার আপনার যথাসর্বস্ব বেচিয়া কিনিয়া ডিক্রীর টাকা শুধিয়াছে — তাহার উপর আবার ডিক্রী জারির সংবাদ পাইয়া কোর্টে গিয়া কাঁদিয়া পড়ে, "দোহাই ধর্মাবতার, আমি ডিক্রীর সব টাকা শুধিয়াছি — বাদীর আর এক পয়সাও পাওনা নাই।" বিচারক কি করিবেন — তাঁহার হাত পা বদ্ধ — হয়তো বলিতে বাধ্য হন "তুই আপসে বাদীকে টাকা দিয়াছিস্ — কোর্টে হাজির করা হয় নাই — এখন আর আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না।" — এই বলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দেন। দৈবাৎ কখনও এই অত্যাচার মাজিস্ট্রেটের কর্ণগোচর হইলে ফৌজদারীতে ইহার বিচার হইতে দেখা যায় ও তখন মহাজন তাহার দুষ্কৃতির উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

উল্লিখিত বিবরণ পাঠে সহজে প্রতীতি হইবে, দরিদ্র প্রতিবাদীর ন্যায়-লাভ কিরূপ দুর্ঘট। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার যন্ত্রণাভোগ। প্রথমতঃ মকদ্দমার ব্যয়বাহুল্য হেতু তাহার পক্ষে আদালতের দ্বার তো একপ্রকার রুদ্ধ বলিলে হয়। যদি কখনও প্রবেশ করিতে পায় তো আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া জয়লাভ করাও তাহার পক্ষে সহজ নহে। আর তাহার বিরুদ্ধে একবার যদি ডিক্রী বাহির হইল তাহা হইলে আর তাহার নিস্তার নাই। তখন হইতে তাহার মন্দভাগ্য উদয় — তাহার সুখশান্তি সকলি অস্তমিত হইল — সেই অবধি হয়তো মহাজনের দাসত্বে তাহার সমুদায় জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়।

রাইয়তরা প্রায়ই অজ্ঞান — লেখাপড়া কিছুই জানে না — আপনাদের হিতাহিত কিছুই বুঝে না। সামান্য হিসাব-জ্ঞান না থাকায় অনেক সময় তাহারা প্রতারিত হয়। তাহারা বুঝে এক, লেখায় দাঁড়ায় আর একপ্রকার। রাইয়তরা যে টাকা কর্জ করিতে চায় ও যাহার জন্য সে খত লিখিয়া দেয় অনেক সময় তাহা পুরাপুরি প্রাপ্ত হয় না — কখনো বা একেবারে কিছুই পায় না। অনেক সময় মহাজন দেনার টাকা অথবা শস্য পাইয়াও তাহা রাইয়তের হিসাবে জমা করিয়া লন না। দেনার টাকা পাইলে তাহার রসিদ দিবার তো নিয়ম নাই, সুতরাং দেনা শুধিয়াও তাহা আদালতে সপ্রমাণ করা রাইয়তের পক্ষে সামান্য কঠিন ব্যাপার নহে ও কাজেই দেনা বারবার পরিশোধ করিয়াও অনেক সময় তাহার নিস্তার নাই।

রাইয়তের উপর মহাজনের যে অত্যাচার — আদালতে যেসকল ঋণ সম্বন্ধীয় মকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা হইতে তাহার রাশি রাশি প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। বোম্বাই হাইকোর্ট রিপোর্ট পাঠ করিলে পাঠকেরা তাহার কতক আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য নিম্নলিখিত মকদ্দমাটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহা হইতে রাইয়তের ব্যবহার-জ্ঞান সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।*

এই মকদ্দমার পত্তন একটি বন্ধক খতের উপর। দুইজন রাইয়ত মহাজনের নিকট হইতে ৩০০ টাকা কর্জ করিয়া প্রায় বিশ বিঘা জমি বন্ধক দিয়া ১৮৬২ সালে এক খত লিখিয়া দেয়। খতের কড়ার এই যে সুদের পরিবর্তে রাইয়তের উৎপন্ন শস্যের অর্ধভাগ মহাজনের বাটীতে প্রতিবর্ষে আনিয়া উপস্থিত করিবে। প্রতিবর্ষে ২০ টাকা করিয়া ৩০০ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। ১৫ বৎসরের পূর্বে সে ঋণ পরিশোধ হইয়া গেলেও মহাজনকে ১৫ বৎসর পর্যন্ত শস্যের অর্ধভাগ বর্ষে বর্ষে আনিয়া দিতে হইবে আর খতের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে যদি সরকারী দফতরে মহাজনের নামে জমি দাখিল করা না হয় তাহা হইলে সেই জমি মহাজনের নিকট ১০০ টাকায় বিক্রীত হইবে। অবশিষ্ট ২০০ টাকা এক বৎসর পরে চাহিবা মাত্র সুদ সুদ্ধ আনিয়া দিতে হইবে। রায়ইত যদি বার্ষিক শস্যার্ধভাগ দিতে

* Bombay High Court Reports Vol 3.

অক্ষম হয় অথবা জমি মহাজনের নামে করার মত দাখিল করা না হয়, কিম্বা প্রতিবর্ষে ২০ টাকা দিবার ব্যতিক্রম ঘটে, কি জমি পতিত রাখা হয় তাহা হইলে একশত টাকার মূল্যে সেই জমির উপর মহাজনের সম্পূর্ণ অধিকার হইল। শস্যার্ধভাগের মূল্য যতই হউক না কেন — আসল টাকার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহা কখনই অদেয় থাকিবে না।

এই খতের চারিজন জামীন। তাহারাও দেনা পরিশোধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। তাহাদের দুইজনে আপনাদেরও জমি বন্ধক দিয়া এই অঙ্গীকার করে যে মূল ঋণী দেনা পরিশোধে অক্ষম হইলে জামীনদারদের সেই জমিসুদ্ধ একশত টাকার মধ্যে বিক্রীত গণ্য করা যাইবে। অপর দুই ব্যক্তি এই কড়ার করে যে উক্ত বন্ধক জমি হইতে ঋণ আদায় না হইলে আমরা যেমন করিয়া হউক আমাদের ঘর বলদ কৃষিযন্ত্র গৃহসামগ্রী সমস্ত বেচিয়াও তোমার টাকা পরিশোধ করিব।

মহাজনেরা ১৮৬৪ সালে ৫০০ টাকা মায় খরচ আদায় করিবার জন্য নালিশ করে ও তাহাদের আবেদন এই যে আসল ঋণী ও জামীনদেব জমির স্বত্বের উপর তাহাদের ক্রয়াধিকার আদালত হইতে নিরূপিত হয ও সেই সকল জমি ও ফসলে তাহাদের দখল দেওয়া হয আর বন্ধকীকৃত ঘর বলদ কৃষিযন্ত্র গৃহসামগ্রী বেচিয়া তাহাব ৫০০ টাকা আদায করা হয়।

প্রতিবাদীগণ উত্তর দেয, আমবা এ খত লিখিয়া দিই নাই, আর একটি খত লিখিয়া দিয়াছি — যাহার কড়ার অপেক্ষাকৃত সহজ। তাহাতে আমরা শস্যের কতক ভাগ দিতে স্বীকৃত হইয়াছি বটে কিন্তু আমাদেব দোষ নাই — আমরা সেই ভাগ বাদীদের দিতে প্রস্তুত হইলেও তাহারা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই।

মুন্সেফের বিচারে বন্ধক খত সাব্যস্ত হইল ও তিনি নির্ণয় করিলেন যে মূল ঋণী তাহাদের কড়ার মত কার্য করিতে সমর্থ হয় নাই সুতরাং তাহাদের জমির উপর বাদীদের সম্পূর্ণ স্বত্ব জন্মিয়াছে ও তাহারা খরিদদার রূপে জমি দখলের অধিকারী। আদালতের ডিক্রী হইল যে ১০০ টাকা মূল্যে বাদীদিগকে সেই জমি দখল দিতে হইবে। আরো হুকুম হইল যে ঋণী ও তাহার অভাবে জামীনদের মহাজনদিগকে মূল ঋণের অবশিষ্ট ২০০ টাকা ও সুদের হিসাবে ৩০০ টাকার শস্য দেওয়া বিধেয়।

জিলা জজের নিকট আপীলে সেই হুকুমনামা বহাল রহিল। পরে প্রতিবাদীরা এই ডিক্রীর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিল।

চীফ জাস্টিস সাহেব বলিলেন; — আমরা এই Equity কোর্টের বিচারাসনে বসিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই বন্ধক খত সদৃশ অন্যায় ও কঠোর কড়ার পূর্ণ খত অনুমোদিত ও কার্যে পরিণত হওয়া কখনই উচিত নহে। ইহা সত্য যে, যে স্থলে প্রতারণা নাই সে স্থলে উপযুক্ত মূল্যের অসদ্ভাবে কোন চুক্তি রহিত করা অথবা তাহা পরিণত হইতে না দেওয়া

যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু মূল্যের স্বল্পতার সঙ্গে যখন প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, যথার্থ মূল্য গোপন, বিষয়ের অযথা বর্ণন, অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন — জড়বুদ্ধি কিম্বা অজ্ঞান ইহার কিছু না কিছু সম্মিলিত দেখা যায় তখন Equity কোর্টের বিবেচনা-যোগ্য যে এরূপ কড়ার গ্রাহ্য হইবে কিনা — তাহা কার্যে পরিণত করা উচিত কিনা? এই সকল কারণে অনেক সময় অল্প মূল্যের বিক্রী রহিত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

আমরা এরূপ কোন সাধারণ নিয়ম বাঁধিয়া দিতে চাহি না যে জানিয়া শুনিয়া কোন ব্যক্তি কোন কড়ারে প্রবিষ্ট হইলে তাহার কঠোরতা নিবন্ধন সে তাহা হইতে মুক্তিলাভের অধিকারী হইবে। কিন্তু এই মকদ্দমায় যখন দেখা যাইতেছে যে অজ্ঞান রায়ত যাহারা লেখাপড়া কিছুই জানে না — আপনাদের নাম স্বাক্ষর করিতেও যাহারা অক্ষম, তাহারা যে সময়ে আপনাদের কৃষিকার্য নির্বাহের জন্য কর্জ করিতে উদ্যত, তাহাদের তখনকার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন দেখিয়া মহাজনেরা এমন কঠোর কড়ার তাহাদের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছে — যখন দেখিতে পাই রাইয়তেরা লিখিয়া দিয়াছে যে তাহারা শস্যের নিয়মিত অর্ধাংশ যোগাইতে অক্ষম হইলে এবং অন্যান্য কারণ উপস্থিত হইলে তাহারা আপনাদের জমি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত — এত অল্প মূল্যে যে তাহা ঋণের তৃতীয়াংশ মাত্র — যে ঋণের টাকা জমির বার্ষিক উপস্বত্বের অর্ধাংশেরও অধিক নহে — আর এরূপ করিয়াও তাহারা ঋণের অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের জন্য সুদ সুদ্ধ দায়ী — যখন দৃষ্ট হইতেছে যে বার্ষিক উৎপন্ন শস্য দিবার কোন ত্রুটি না হইলেও, কড়ার মত অপরাপর কার্য করিতে পারিলেও ১৫ বৎসর পর্যন্ত তাহারা শস্যার্দ্ধভাগ দানে বাধ্য, তখন এই অন্যায় পীড়নকারী কঠোর-কড়ার-পূর্ণ খত রহিত করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি, কেন না ইহাতে ঋণিগণ একপ্রকার প্রতারিত হইয়াছে অনুমান না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। আমরা কোন মতে বুঝিতে পারি না কেমন করিয়া কোন মনুষ্য সহজ বুদ্ধিতে এইরূপ লিখিয়া দিতে সম্মত হইবে যদি তাহারা কি লিখিয়া দিতেছে তাহা ভাল করিয়া স্পষ্ট জানিতে পারে ও তাহার ফলাফল বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়। যদিও জিলা জজের মতে আমরা মত দিতে বাধ্য হইতেছি যে এই খত রাইয়তেরা লিখিয়া দিয়াছে — এই খত তাহারা লিখিয়া দিয়াছে ইহা যদিও সত্য হয় তথাপি লিখন পঠনে অসমর্থ অবোধ লোকের নিকট একবার এইরূপ লেখা পাঠ করিলেও যে তাহা তাহাদের বোধগম্য হইবে তাহা প্রত্যাশা করা যায় না — এই সকল অসাধারণ দুরূহ কড়ার তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

এই বলিয়া এই ঘোর অন্যায় কঠোর বন্ধক খত হাইকোর্ট হইতে অগ্রাহ্য হয় ও রায়তেরা তাহাদের যথার্থ দেনার টাকা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে। যদি হাইকোর্টে এই মকদ্দমার আপীল না হইত তবে গরীব বেচারী রাইয়তদিগকে কি অত্যাচারই ভোগ করিতে হইত।

দুষ্টবুদ্ধি মহাজনেরা গরীব রাইয়তের উপর শাঠ্য-জাল বিস্তার করিতে না পারে এইজন্য কমিশনারগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রত্যেক তমসুক হয় কোন রেজিস্ট্রার

কি কোন গবর্নমেন্টের উচ্চ কর্মচারীর সমক্ষে লিখিত পঠিত ও স্বাক্ষরিত হয়। এইরূপ কোন নিয়ম প্রচলিত হইলে কেবল যে রাইয়তের লাভ তাহা নহে। কিন্তু অনেক সময় সদাশয় মহাজনেরও তাহা কার্যকর হইতে পারে। অনেক মকদ্দমায় এইরূপ দেখা যায় যে, যেসকল খত সত্য সত্যই লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে ঋণী তাহা অস্বীকার করে ও গ্রামস্থ লোকদিগকে আপনার পক্ষে ডাকিয়া তাহা লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয় নাই ইহা আদালতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পায়। উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইলে এইরূপ মিথ্যা শপথের পথ অবরুদ্ধ হয়। কোন্ পক্ষ সত্য তাহা আপীলে নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন — কারণ প্রথম কোর্টের জজ সাক্ষীদের ভাব ভক্তি দেখিয়া তাহাদের সাক্ষ্যের সত্যাসত্য কতকটা নিরূপণ করিতে সক্ষম হয়েন — আপীল কোর্টে সুকৌশল গ্রথিত শিক্ষিত সাক্ষীদলের অসত্যজাল আবিষ্কৃত হওয়া সহজ নহে। অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে ঋণী খত লিখিয়া দিবার সময় নাবালক ও আপনার হিতাহিত বোধে অসমর্থ, খতের মর্ম সে কিছুই বুঝে না, তথাপি ছলবল কৌশলে তদুপরি তাহার নাম স্বাক্ষরিত হয়। যখন সেই খতের দাবীতে মকদ্দমা উপস্থিত হয় তখন ঋণী অজ্ঞান আলস্য ভয় নিরাশাবশতঃ বিচারালয় হইতে দূর থাকে, সুতরাং অবর্তমানে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়া যায়, কড়ারের প্রকৃত স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। যদি কোন নিযুক্ত কর্মচারীর সমক্ষে তমসুক লিখিয়া দিবার নিয়ম প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে নাবালকের উপব এরূপ অত্যাচার স্থান পায় না। এক দিকে অবোধ রাইয়ত ধূর্ত মহাজনের প্রবঞ্চনা হইতে নিষ্কৃতি পায়, অন্য দিকে মহাজনের ন্যায্য টাকা মিথ্যা সাক্ষ্যে ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা দূর হইয়া সুদের দব কমিয়া যায়, তাহাতে রাইয়তের মঙ্গলের সম্ভাবনা। যদি মহাজনের ন্যায্য পাওনা ডুবিয়া যাইবার ভয় দূর হয় — যদি ঋণের পরিমাণ সহজে সপ্রমাণ হইবার উক্তরূপ কোন উপায় নির্ধারিত হয় — তবে যে সকল স্বল্প সম্পত্তি সম্পন্ন মহাজন এক্ষণে ভয়ে অগ্রসর হইতে চায় না তাহারা বড় বড় মহাজনের প্রতিস্পর্ধী হইতে সাহসী হইবে ও এই স্পর্ধিতায় সুদের দর আপনা হইতে কমিয়া গিয়া পরিণামে রাইয়তের কল্যাণ সাধিত হবে।

কেহ কেহ পরামর্শ দেন যে এইক্ষণে মহাজনেরা ঋণীর নিকট হইতে অপরিমিত সুদ গ্রহণ করেন তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। তাঁহাদের মতে সুদের এক নিয়মিত দর বন্ধন করা উচিত, তাহা অপেক্ষা অধিক দরের সুদ ধার্য হইলে আদালতে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। এইরূপ সুদের সীমা বন্ধনকারী কোন আইন করা তাঁহাদের অভিপ্রেত। হিন্দুশাস্ত্রে অপরিমিত সুদ গ্রহণ করা নিষেধ। মনু লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতি সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে পারেন কিন্তু সুদ নিয়া টাকা ধার দিতে পারিবেন না। যথা —

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবাপি বৃদ্ধিং নৈব প্রযোজয়েৎ
কামং তু খলু ধর্ম্মার্থং দদ্যাৎ পাপীয়সেহল্পিকা।

দশম অধ্যায় — ১১৭।

ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় বৃদ্ধি যোজনা করিবেন না কিন্তু যে পাপবুদ্ধি চাহিবে তাহাকে ধর্মার্থে অল্প সুদ ইচ্ছামত দিতে পারিবেন —

সুদের প্রতিরোধক আরো কতকগুলি নিয়ম আছে, যথা —

বশিষ্টবিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেৎ বিত্তবিবর্দ্ধিনীং
অশীতি ভাগং গৃহ্নীয়াম্মাসাদ্বার্দ্ধুষিকঃ শতে।। ১৪০
দ্বিকং শতং বা গৃহ্নীয়াৎ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরণ্।
দ্বিকং শতং হি গৃহ্নানো ন ভবত্যর্থ কিল্বিষী।। ১৪১
দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কং চ পঞ্চকং চ শতং সমং।
মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্নীয়াদ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ ।। ১৪২

অষ্টম অধ্যায়

বৃদ্ধি ব্যবসায়ী ব্যক্তি বিত্তবর্ধনকারী বশিষ্টবিহিত সুদ গ্রহণ করিতে পারিবেন অর্থাৎ মাসে শতের অশীতি ভাগ গ্রহণ করিবেন।

সতের ধর্ম স্মরণ করিয়া শতকরা দুয়ের হিসাবে গ্রহণ করিবেক, — যে ব্যক্তি শতকরা দ্বিক গ্রহণ করেন, তিনি অর্থ দোষে দোষী হয়েন না।

বর্ণানুক্রমে শতকরা দ্বিক ত্রিক চতুষ্ক অথবা পঞ্চক মাসিক বৃদ্ধি গ্রহণ করিবেক অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দ্বিক, ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে ত্রিক, বৈশ্যের নিকট হইতে চতুষ্ক এবং শূদ্রের নিকট হইতে পঞ্চক।

সুদ গ্রহণ সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের এক বিশেষ নিয়ম এই যে, এককালে সুদ সুদ্ধ দেনা গ্রহণ করিলে মূলধন অপেক্ষা অধিক সুদ গৃহীত হইবে না। যথা —

কুসীদবৃদ্ধির্দ্বৈগুণ্যং নাত্যেতি সকৃদাহৃতা।
ধান্যে সদে লবে বাহ্যে নাতিক্রমতি পঞ্চতাং।। ১৫১
কৃতানুসারাদধিকা ব্যতিরিক্তা ন সিধ্যতি।
কুসীদপথমাহুস্তং পঞ্চকং শতমর্হতি।। ১৫২

অষ্টম অধ্যায়।

ঋণের টাকা এককালে আহৃত হইলে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক সুদ গৃহীত হইবে না — ধান্য, ফল, লোম অথবা বাহক জন্তু সম্বন্ধে ঋণের পঞ্চগুণ অতিক্রম করিবেক না।

নির্দিষ্ট নিয়মের অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করিলে তাহা অসিদ্ধ — তাহাকে কুসীদপথ কহে। উর্ধ্ব সংখ্যা শতকরা পঞ্চকমাত্র ঋণীর নিকট হইতে প্রাপ্য।

উক্ত নিয়মকে "দাম দুপট" কহে ও এ প্রদেশের আদালত সকলে ঐ নিয়ম প্রচলিত। ঋণ আদায় করিবার সময় মহাজন কখনও আসল অপেক্ষা সুদের টাকা অধিক লইতে পারে

না — আসলের দ্বিগুণ পর্যন্ত 'সকৃদাহৃত' সুদের সীমা। হিন্দুশাস্ত্রের এই নিয়ম ছাড়িয়া দিলে এক্ষণকার আইন অনুসারে সুদের দর অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় চুক্তি অনুসারে নিরূপিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আইনকর্তাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত কিনা এই লইয়া অনেক সময় তর্ক-বিতর্ক শুনা যায়। কমিশনারদিগের মত এই যে আইন দ্বারা সুদের দর নির্ধারিত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। আইন দ্বারা সুদের দর বাঁধিয়া দিলে তাহাতে যে ঋণীদিগের লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা পরীক্ষায় প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বার্তাশাস্ত্রেরও সিদ্ধান্ত এই যে, এ বিষয়ে আইন বাঁধিতে গেলে ফলোপধায়ী হইবে না। ঋণীর টাকার প্রয়োজন ও তাহাকে ধার দিবার মত মহাজনের অর্থের প্রাচুর্য — এই দুয়ের উপর সুদের দর নির্ভর করে। যদি আইনের দ্বারা সুদের দর বাজার দর অপেক্ষা অধিক স্থিরীকৃত হয়, তাহা সুতরাং কোন কার্যেরই হইবে না। যদি বাজারদর অপেক্ষা সুদের দর অল্প নির্ধারিত হয় আর এইরূপ নিয়ম করা যায় যে, এই নির্ধারিত দরের ঊর্ধ্বে সুদ গৃহীত হইবে না, তাহা হইলে হয়তো ধার কর্জ একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। অথবা কাহারো টাকা কর্জ করিবার যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে সে নিয়মিত দরের অপেক্ষা এত অধিক সুদ দিতে বাধ্য হয়, যাহাতে আইন ভঙ্গের আশঙ্কা না বাখিযাও মহাজন তাহাকে ধার দিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সুদের দর বৃদ্ধির জন্য যে মহাজনেরই দোষ এরূপ মনে করা অন্যায়। যদি মহাজনেরা মিলিয়া এইরূপ চক্রান্ত করে যে, চলিত দর অপেক্ষা অধিক দরে সুদ না পাইলে টাকা ধার দিব না, তাহা হইলে উত্তমর্ণেব ব্যবসাযে এত অধিক লাভ দেখিয়া অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া সে চক্রান্ত ভাঙিয়া দিবে সন্দেহ নাই। সামান্যতঃ বিবেচনা করিতে গেলে ঋণপ্রার্থীকে নিজ স্বার্থ বুঝিয়া দর করিতে দিলেই ভাল হয় — মহাজনের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, তাহাতে দরের সামান্যভাব আপনা আপনিই দাঁড়াইবে। কিন্তু একটি কথা এই যে, যে স্থলে চুক্তিশাস্ত্রের নিয়ম খাটাইলে অন্যায় করা হয়, সে স্থলে কি কর্তব্য। একজন রাইয়ত যদি নিতান্ত গরজে পড়িয়া কর্জ করিতে আসে, আর মহাজন তাহার গরজ বুঝিয়া তাহার নিকট হইতে কোন অন্যায় কঠোর সর্ত লিখাইয়া লন, তবে সে সর্ত হয়তো আদালতে অগ্রাহ্য হইবে। এই প্রকার অল্প টাকার ধার কর্জকারী রাইয়তের মহাজনের সহিত এরূপ অধীনতা সম্বন্ধ — একের উপর অন্যের অন্যায় ব্যবহার এরূপ সহজসাধ্য যে, এই সকল রাইয়তের রক্ষার জন্য কোন বিশেষ আইন করিলে অযুক্তিযুক্ত হয় না। ৫০০ টাকার অনধিক দেনার মকদ্দমায় শতকরা ৯ টাকার হিসাবে কিম্বা অন্য কোন নিয়মিত দরে সুদ ধরিয়া দেওয়া ও তদতিরিক্ত টাকা অগ্রাহ্য করা — কোর্টের এইরূপ সম্পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। এইরূপ হইলে মহাজনের অত্যাচার হইতে রায়তেরা অনেকটা নিবৃত্তি লাভ করে। যে সকল লোকেরা ৫০০ টাকার অধিক টাকা ধার কর্জ করে, তাহারা প্রায়ই আপনার হিতাহিত বুঝিতে সক্ষম আর যে সকল মহাজনের অধিক টাকার কারবার তাহাদের ভদ্রতা সততার উপরও বিশ্বাস করা যাইতে পারে, সুতরাং এই সকল লোকের জন্য কোন বিশেষ আইন আবশ্যক করে না — তাহাদের পরস্পর চুক্তিই তাহাদের উপর বন্ধনকারী।

বোম্বাই প্রদেশে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত প্রচলিত বলিয়া সুদের কতকটা বর্ধিতাকার দৃষ্ট হয়। এই বন্দোবস্তে সদর খাজনা সময়ে সময়ে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকাতে রাইয়তের ভূস্বত্বের অনিশ্চিত মূল্য — টাকা ধার দিবার সময় মহাজন তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক দরে সুদ লইতে বাধ্য হয়।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দেনার টাকা আদায় করিবার ১২ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদ ছিল, ঐ মেয়াদ অতীত না হইলে ঋণীর নিকট হইতে নূতন খত করিয়া লইবার রীতি ছিল না। তখনকার আইন অনুসারে শতকরা ১২ টাকার অধিক সুদ আদালতে অগ্রাহ্য হইত ও আসলের অধিক সুদ এককালীন পাইবার নিয়ম ছিল না, সুতরাং কোন মহাজন ১০০ টাকা কর্জ দিয়া এককালে তাহা আদায় করিতে গেলে বার বৎসর অন্তে তিনি উর্ধ্ব ২০০ টাকার ডিক্রী পাইতে পারিতেন। এক্ষণে ঐ বিষয়ে তামাদির নিয়ম ৩ বৎসর, কাজেই রাইয়তেরা প্রায় দুই বৎসর অন্তর সুদ সমেত নূতন খত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। অতএব ১০০ টাকার খত, শতকরা ২৫ টাকা মায় সুদ তাহা উল্লিখিত প্রকারে পুনঃপুনঃ নবীকৃত হইয়া ১২ বৎসরের শেষে ঋণীর স্কন্ধে ১১৩৯ টাকার বোঝা নিক্ষেপ করিবে। রাইয়ত কমিশনর মধ্যে শম্ভুপ্রসাদ নামক একজন দেশীয় কমিশনর তামাদি সংক্রান্ত ৩ বৎসরের নিয়ম রাইয়তের ঋণভারগ্রস্ত হইবার এক প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং তিনি রাইয়ত ও মহাজনের অনেকানেক পরীক্ষিত হিসাব হইতে, স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল হিসাব হইতে জানা যায় যে ১৮৫৯ এর পর থেকে প্রজাদিগের ঋণভার ক্রমিকই বৃদ্ধি পাইতেছে। যথা —

১৮৫৯ র পূর্বে			
কর্জের টাকার সমষ্টি	......	....	২৬০০
সুদ	......	....	১৪৬০
			৪০৬০
দেনা শোধ	....	....	৩৪৭০
বাকী	....	......	৬০০
১৮৫৯ এর পরে	......	....	২৯৩০
কর্জের টাকার সমষ্টি	......	....	৪৪২০
সুদ			৭৩৫০
দেনা শোধ	......	....	২৭৪০
বাকী	......	....	৪৬১০

শম্ভুপ্রসাদের মতে তামাদির পূর্বকার মত দীর্ঘ মেয়াদ হইলে রাইয়তের বিস্তর উপকারের সম্ভাবনা। অন্যান্য কমিশনরেরা কিন্তু এই কথা বলেন যে, যদিও তামাদির নিয়ম পরিবর্তনে

রাইয়তের কতকটা অসুবিধা হইয়াছে, তথাপি তাহাদের হিসাব ১২ বৎসর ফেলিয়া রাখা অপেক্ষা ৩ বৎসর অন্তর দেনার নূতন বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়স্কর ও তাঁহারা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে অন্যান্য বিহিত উপায় অবলম্বিত হইলে আগেকার ১২ বৎসর মেয়াদ প্রত্যাবর্তন অনাবশ্যক হইবে।

প্রচলিত নিয়মানুসারে মারওয়াড়ীর অনুগ্রহের উপর রাইয়তের সকল নির্ভর। মারওয়াড়ীর হস্তেই খত রক্ষিত হয়, রাইয়ত তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসর পায় না। মারওয়াড়ী আপন ইচ্ছামত হিসাব প্রস্তুত করে, রাইয়ত তাহা গৃহে লইয়া গিয়া সময়মত পর্যবেক্ষণ করিতে পারে না। অনেক সময় এমন দেখা গিয়াছে যে রাইয়ত ঘোরতর কষ্টে পড়িয়া তাহার ভূমি সম্পত্তি মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিয়াছে — অনেক বৎসর পরে তাহার অবস্থা একটু ভাল হইলে সে অথবা তাহার সন্তানসন্ততিগণ আপনাদের বন্ধক বিষয় ছাড়াইয়া লইবার জন্য যত্নশীল হয়, কিন্তু তখন মহাজন অথবা তাহার বংশজ লোকেরা বহুল কালভুক্ত বিষয় ছাড়িয়া দিতে সম্মত নহে। রাইয়ত আদালতে যাইতে বাধ্য হয়। মহাজন উত্তর দেয় — "এ সম্পত্তি বাদীর নহে — ইহা তো আমাদেরই হস্তে বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে — আমরা বন্ধকের কিছুই জানি না।" খত মহাজনেরই হস্তে রক্ষিত — বাদী সে বন্ধক কি রূপে সপ্রমাণ করিবে? এই সকলের প্রতিবিধান করা নিতান্ত আবশ্যক। এই প্রকার অন্যায় আচরণের একটি সহজ উপায় আমাদের মনে হইতেছে। যে সকল ষ্ট্যাম্পের কাগজের উপর খত লিখিত হয়, তাহার যদি দুই ভাগ পরস্পর সংযুক্ত থাকে — মধ্যে ছিদ্রময় রেখা (যেমন চেক বহিতে সচরাচর দৃষ্ট হয়) — আর যখন তাহার এক ভাগে খত লিখিত হয় তখন যদি তাহার সারাংশ অপরভাগে লিখিবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে সেই শেষোক্ত ভাগটি খত হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া রাইয়তকে দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ হইলে মূল খতের এক প্রস্থ রাইয়তের হস্তে রক্ষিত হয়। এই দুই ভাগ সহজে মিলাইয়া দেখিবার জন্য দুয়ের উপরই সমান নম্বর থাকা আবশ্যক ও এইরূপ নিয়ম করা উচিত যে এক প্রস্থের উপর ঋণীর নাম স্বাক্ষরিত হইবে। যদি রাইয়তের হস্তস্থিত কাগজে কোন ভুল কি মিথ্যা বিষয় সন্নিবেশিত হয়, তাহা সহজে ধরা পড়িবে ও ঋণী তাহা মহাজনের নিকট হইতে তখনি শোধন করিয়া লইতে পারিবে। মহাজন রাইয়তকে মিথ্যা লিখিয়া দিতে সাহসী হইবে না, কেন না যদি সে তাহার খতের দাবীতে প্রকৃত ঋণের অধিক টাকার জন্য নালিশ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার নিজনাম স্বাক্ষরিত অপর প্রস্থ আদালতে উপস্থিত হইলেই তাহার প্রতারণা আবিষ্কৃত হইবে। এখানকার নিয়ম অনুসারে দেনার টাকার কতক ভাগ পরিশোধ করিলে তাহা কখনও কখনও মূল খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সে খত মহাজনের নিকটেই থাকে — ঋণী কখনও তাহা দেখিতে পায় না ও কর্জের টাকা লইয়া "এখন খত কাছে নাই পরে লিখিয়া দিব" এই বলিয়া মহাজন অনেক সময় ওজর করিয়া কাটায়। কিন্তু খতের অপর প্রস্থ

ঋণীর হাতে থাকিলে আর এরূপ হইতে পারে না — টাকা দিবার সময় সে তাহার সংখ্যা সেই কাগজের উপর লিখিয়া দিতে মহাজনকে সহজেই বাধ্য করিতে পারে। এইরূপ হইলে রাইয়ত তাহার নিজের হিসাব সহজেই বুঝিতে পারে ও মহাজন কর্তৃক তাহার প্রতারিত হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে আর এক প্রকার প্রবঞ্চনার দ্বার রুদ্ধ হয়। কখনও কখনও এরূপ ঘটে যে, খতের মেয়াদ অতীত হইলে পরেও রাইয়তের ধার শুধিবার সঙ্গতি নাই, মহাজনেও তাহারে বিরক্ত করিতেছে ও আদালতে যাইবার জন্য ব্যস্ত, তখন রাইয়ত অনেক বলিয়াকহিয়া পুরাতন খতের পরিবর্তে তাহাকে এক নূতন খত লিখিয়া দেয়। এই সকল স্থলে নূতন খত লিখিয়া লইয়াও প্রলুব্ধ মহাজন তাহাতে পুরাতন দেনার পরিশোধ স্বীকার করেন না। পুরাতন খতের পরিবর্তে নূতন খত লিখিত হইয়াছে রায়তের তাহা সপ্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। যদি নূতন খতে পুরানো ঋণের কোন উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে মহাজন এই দুই খতের পৃথক টাকা আদায় করিয়া লইতে সক্ষম হয় — তাহার বিরুদ্ধে ঋণীর কোন কথা কহিবার উপায় থাকে না। আবার ইহার বিপরীতে কখনও কখনও দেখা যায় যে ঋণী তাহার ঋণভার হইতে মুক্ত হইবার জন্য মিথ্যা করিয়া বলে যে পুরাতন দেনার পরিবর্তে সে নূতন খত লিখিয়া দিয়াছে। উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইলে, রাইয়ত ও মহাজন উভয়েরই এই প্রকার অসত্য ব্যবহারের দ্বার রুদ্ধ হইবে, সুতরাং মিথ্যা মকদ্দমা উঠিয়া ন্যায়ের আদালতকে কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।

এক্ষণকার আইনের বলে মহাজনের কর্জ আদায় করিবার যেরূপ সুবিধা, রাইয়ত তাহার পাকচক্র হইতে সে পরিমাণে সুরক্ষিত নহে, এই বিষয় লইয়া কমিশনরগণ অনেক কথা কহিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রচলিত আইন মহাজনের অত্যাচারের বিশেষ পোষকতা করে। পূর্বকার দেশীয় প্রথানুসারে মহাজন রাজার নিকট হইতে ঋণ আদায় করিবার বিশেষ কোন সাহায্য পাইত না। তখনকার ঋণ আদায়ের প্রথা স্বতন্ত্র ছিল। মহাজন ইচ্ছামত ঋণীকে কারারুদ্ধ করিয়াও খাটাইয়া লইতে পারিতেন। ঋণ আদায়ের জন্য যেসকল উপায় অবলম্বিত হইত তাহা এই ঃ—

"তাগাদা" অর্থাৎ ঋণীকে টাকার জন্য বার বার তাগাদা করিয়া উত্যক্ত করা —

"মোহস্‌সলী" অর্থাৎ তাগাদা করিবার জন্য ঋণীর নিকট দূত পাঠান ও ঋণীকে তাহার খোরাক যোগাইতে বাধ্য করা —

"ধন্না" ঋণীর দ্বারে ধন্না দিয়া বসিয়া থাকা—

"ত্রাগা" অর্থাৎ টাকা না পাইলে ঋণীকে আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখান—

ইত্যাদি অনেক প্রকার নিয়ম ছিল;ইহাতে যেমন ঋণীর উপর পীড়ন তেমনি মহাজনেরও সামান্য কষ্টভোগ নহে। মহাজনের টাকার জন্য রাইয়তের বলদ কৃষিযন্ত্র প্রভৃতি ক্রোক করিয়া তাহাকে নিঃসম্বল করিবার নিয়ম দেশীয় রাজত্বকালে প্রচলিত ছিল না। ঋণের জন্য

বংশপরম্পরা ভোগ্য সম্পত্তি বিক্রীত হইত না। মহারাষ্ট্র দেশে কখনই এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। সেখানকার রাইয়তেরা অধিকাংশই মিরাসদার বলিয়া গণ্য ছিল ও মিরাসী স্বত্বের নিয়মই এই যে রাইয়ত সে স্বত্ব হইতে কখনই বঞ্চিত হইবার নয় — ছাড়িয়া দিলে যখনি ইচ্ছা তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারিত। ১৮২৭ সালের আইনে মহাজনের ঋণ আদায় সম্বন্ধে নিজস্ব ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হইয়া তৎপবিবর্তে আদালত সকল স্থাপিত হয়। তথাপি তখনকার আইন ঋণীর পক্ষে অনেক সুবিধাজনক ছিল — সুদের দরের সীমা নিরূপিত ছিল, মহাজনেরা তদতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করিতে পারিত না;অপিচ কৃষকেরা স্বীয় জীবিকা ও কৃষিকার্য নির্বাহের জন্য যে সকল বস্তুর প্রয়োজন, তাহার ক্রোক ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল। কাল সহকারে এই সকল নিয়ম পরিবর্ত হইল। বর্তমান আইন সম্বন্ধে কমিশনরগণ নিম্নলিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন; —

ঋণ আদায় করিতে হইলে হয় ঋণীর উপার্জিত ও অর্জনীয় বিষয় বিক্রয়, নয় তাহার ও তাহার পরিবারের কায়িক পরিশ্রম গ্রহণ করা — এই দুই উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। যে আইনে অবাধে এই সকল উপায় নিয়োজিত হয়, তাহা পারতপক্ষে মহাজনেরই বিশেষ অনুকূল। এদেশের আইন এ বিষয়ে মহাজনেব যেমন পক্ষপাতী আব কোন আধুনিক আইন তেমন আছে কিনা সন্দেহ। এই আইন মতে ঋণী সপরিবারে মহাজনের নিকট ধন- প্রাণে যেরূপ আবদ্ধ , তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যদিও আইনে দাসত্বের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তথাপি যখন অশক্ত ঋণীকে বন্দীখানায় প্রেরণ করা মহাজনের ইচ্ছাধীন, তখন পক্ষান্তবে দাসত্বই প্রশ্রয় পাইতেছে বলিতে হইবে। কেন না অনেক দেনাদার কাবাবাস অপেক্ষা মহাজনেব দাসত্ব অল্প যন্ত্রণাদায়ক জ্ঞান করিয়া তাহাতেই ব্রতী হইবে সন্দেহ নাই। কারাবাস ভয়ে যে অনেক সময় রাইয়তকে মহাজনের দাসত্ব স্বীকাব করিতে হইয়াছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই তো ঋণের জন্য ঋণীর কায়িক দায়িত্বের কথা বলা হইল। তাহার বৈষয়িক দায়িত্ব সম্বন্ধে দৃষ্ট হইবে যে, আইনে মহাজনের হস্তে ঋণীর বিষয়সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইবার অগাধ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। ঋণীর নিজের কিম্বা তাহার স্ত্রী-পুত্র পরিবারের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুও সে ক্ষমতার বহির্ভূত নয়। ঋণীর পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত বিক্রয় করিবার কোন বাধা নাই, একবার মাত্র তাহাকে হৃতসর্বস্ব ও নিঃসম্বল করিয়া ছাড়িয়া দিলেই যে, সে নিস্তার পাইল তাহা নহে, কিন্তু যখনি আবাব সে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করিতে আরম্ভ করে, অমনি মহাজন আসিয়া তাহা নিঃশেষ করিয়া লইতে পারে। এইরূপে তাহাকে পুনঃ পুনঃ পীড়ন করিবার ক্ষমতা আইন কর্তৃক মহাজনের হস্তে অর্পিত। সভ্য জাতির আইনে মহাজনকে যতদূর আশ্রয় দেওয়া কর্তব্য, তাহার অধিক প্রদত্ত হইয়াছে। যে সাধারণ সর্ববাদীসম্মত আইন অনুসারে দেউলিয়া হইয়া ঋণের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিয়ম আছে, এদেশের বাইয়র্তের ভাগ্যে সে লাভটুকুও নাই। এ বিষয়ে আর কোনো দেশে ভারতবর্ষের আইনের ন্যায় কঠোর আইন আছে কিনা সন্দেহ। মুসার বিধানেও "ঋণী সাত বৎসর চাকরী করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হইত।"

কমিশনরগণ যখন এদেশীয় আইনের উপর উক্তরূপ দোষারোপ করিয়াছিলেন, তখন নূতন দেওয়ানী কার্যবিধি আইন (Civil Procedure Code) প্রচলিত হয় নাই, আইন-প্রস্তুতকারী জাঁতায় পেশিত হইতেছিল মাত্র। এই আইনের গুণে পূর্বকার ঋণ সম্বন্ধীয় কঠোর নিয়মসকল অনেকাংশে সংশোধিত হইয়াছে। ঋণী মহাজনের নানাবিধ অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এক্ষণে আর তাহার হলবলদ প্রভৃতি আবশ্যক সামগ্রী সকল ডিক্রী জারি দ্বারা ক্রোক ও বিক্রয় করিবার নিয়ম নাই। দেনার দরুণ কারাবাসের মেয়াদ স্বল্পীকৃত হইয়াছে — যাহাতে রায়তের ভূসম্পত্তি প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অনেক অল্প দরে বিক্রীত হইতে না পারে তাহার বিহিত উপায় সকল প্রবর্তিত হইয়াছে ও সে যাহাতে অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে ঋণবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহার উপযোগী (Insolveney) নিয়ম সকল রচিত হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। দেনার জন্য রাইয়তের জমি হস্তান্তর হইতে দেওয়া উচিত কিনা, এ বিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকানেক বিদ্বানের মত এই যে — স্থাবর সম্পত্তি একশ্রেণীর লোকের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবার নিয়ম কখনও হিতাবহ হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভূমির ব্যবস্থাও প্রতিজনের স্বেচ্ছাধীন রাখা কর্তব্য। প্রকৃতির নিয়মই এই যে বলীর হস্তে দুর্বলের পরাজয় — ধনীর নিকট দরিদ্রের পরাজয়। ধনবান্ জমিদার নির্ধন রাইয়তের স্থান অধিকার করিলে মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল নাই। যে সকল লোক আপনাদের বিষয় আপনারা রক্ষা করিতে অক্ষম — বিষয়ের উন্নতি সাধনে অসমর্থ তাহাদের ঠেকা দিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? তাহাতে কি দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে? গবর্নমেন্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে? আধুনিক ব্রিটিশ বাজ্যের নিয়মই এই যে যাহারা ইহার নবোত্থিত ঘটনাস্রোতের সহিত সন্তরণ করিয়া কার্য করিবে তাহাদেরই জয়। লক্ষ্মী তাহাদের প্রতিই প্রসন্ন। ধন সঞ্চয় করিলেই ভূমি সম্পত্তি করিবার স্বাভাবিক স্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়, তাহা কি কতকগুলি কৃত্রিম নিয়ম দ্বারা নির্বাপিত করা উচিত? রাইয়ত আবহমান কাল হইতে একখণ্ড ভূমি কর্ষণ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই কি তাহার স্বত্ব চিরস্থায়ী রাখিতে হইবে? সে যদি ঋণভারে এরূপ আক্রান্ত হইয়া পড়ে যে গবর্নমেন্টের খাজানার জন্যও তাহাকে মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয় তাহা হইলে তাহার দ্বারা কি কৃষিকার্য সুন্দররূপে নির্বাহ হইতে পারে — সে জমি তাহার হস্ত হইতে মহাজনকে দিলে কি ভাল হয় না?

ইহার বিপক্ষ দলের লোকেরা বলেন, এরূপ যুক্তি যেমন শ্রুতিমধুর কার্যে তেমন ফলোপধায়ী দেখা যায় না। বার্তাশাস্ত্রের সমুদয় নিয়ম এদেশে খাটে না। দেখিতে হইবে যে প্রস্তাবিত নিয়ম এদেশের সামাজিক অবস্থার উপযোগী কিনা। জাতিভেদ প্রথা — চিরন্তন দেশাচার — কুলাচার সকল দিক্ ভাবিয়া তাহার ফলাফল নিরূপণ করিতে হইবে। অহিফেন সেবন অনিষ্টকারী সত্য, কিন্তু তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে

হয়। ভূমির উপর দেশীয়দের মমতা এরূপ প্রগাঢ় — সামাজিক নিয়ম ও কুলাচারের সঙ্গে তাহা এরূপ অনুস্যূত, যে তাহা ভগ্ন করিয়া সেই ভূমি পরহস্তগামী করা সামান্য কঠোর কার্য নহে। এতৎ সম্বন্ধে হিন্দু সামাজের একান্নবর্তী পরিবারের নিয়ম বিবেচনাযোগ্য। এক পরিবারের মধ্যে প্রতিজন স্ব স্ব অংশ হস্তান্তর করিবার অধিকারী অথবা এইরূপ স্থলে পরিবারস্থ সমস্ত লোকের সাধারণ সম্মতি আবশ্যক কি না — এ বিষয়ে হিন্দু আইন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় মতভেদ দৃষ্ট হইবে। বোম্বাই অঞ্চলে বৈধ বিক্রয়ের জন্য সর্বসম্মতি আবশ্যক, এই নিয়ম হিন্দু শাস্ত্রসম্মত বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। একত্রিত পরিবারের অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে অপর কোন ব্যক্তি প্রবিষ্ট হইলে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এক পরিবারের বসতি বাটীর এক ভাগ ক্রয় করিয়া তাহাতে যদি একজন ভিন্ন জাতীয় আগন্তুক আসিয়া বাস করে, তাহা হইলে হয়ত সমুদায় পরিবারকে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য করিতে পাবে।

তুমি বলিতেছ ধন হইলেই ভূমি সম্পত্তি করিবার ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু তাহা না করিলেই বা ক্ষতি কি? সেই ধন বাণিজ্য ব্যবসায়ে পরিচালিত হইলে কি দেশেব শ্রীবৃদ্ধি হয় না? আরো জিজ্ঞাস্য এই, যখন মহাজন রাইয়তের যথাসর্বস্ব বিক্রয় করাইয়া তাহাব ভূমি দশমাংশ মূল্যে কিনিয়া অধিকার করে, তখন তাহারা কি সেই ভূমির উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়? কৃষি-কার্যের উন্নতি সাধন, বাপী পুষ্করিণী খনন — ভূমির সারবত্তা বর্ধন — মহাজন জমিদার কি এই সকল কার্যে মনোযোগী হন? তাঁহাদেব যত্নে কি ভূমির মূল্যবৃদ্ধি — কৃষির উন্নতি — কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে দেখা যায়, অনেক সময় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটে। মহাজন সেই পুরাতন রাইয়তকেই নিযুক্ত করেন — ভূমি ও ফসলের অবস্থা সমানই থাকে — কৃষি কার্যের উন্নতি নাই, কেবল কৃষকের অবস্থান্তর উপলক্ষিত হয় — পূর্বে যে ব্যক্তি স্বয়ং ভূস্বামী ছিল, সে এক্ষণে মহাজনের খেডুত হইয়া সেই ভূমি কর্ষণ করে ও আপনার শ্রমজাত সমস্ত দ্রব্য, প্রভুর চরণে ঢালিয়া দেয়। এই সকল মহাজনের অর্থোপার্জনশক্তি ভিন্ন এমন আর কি শক্তি — কি ঔদার্য — পৌরজনোচিত এমন কি গুণ আছে, যে তাহা দেখিয়া রাজা রাইয়তের সর্বনাশ করিয়া তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে প্রবৃত্ত হইবেন?

যে সকল প্রদেশে রাইতওয়ারী বন্দোবস্ত প্রচলিত, রাজাই সেখানকার ভূস্বামী — রাজাই জমিদার। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ভূমিদান করিতে পারেন। তিনি যদি এরূপ নিয়ম করেন যে কোন মহাজন রাইয়তকে তাহার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, তাহাতে কাহারো কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। রাজা বলিতে পারেন, "আমি কোন মধ্যবর্তী ভূস্বামী চাহি না। তুমি হয় নিজে ভূমি কর্ষণ কর কিম্বা অন্য কোন কৃষককে তোমার স্থান অধিকার করিতে দেও। যদি তোমার স্বত্ব বিক্রয় করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহা মহাজনের নিকট করিও না। যে ব্যক্তি স্বয়ং কৃষিকার্য চালাইতে অক্ষম, সে যেন ভূম্যধিকারী না হয়।" রাজা এইরূপ নিয়ম করিতে পারেন যে তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোন রাইয়ত তাহার অধিকৃত ভূমি হস্তান্তর

করিতে পারিবে না। তিনি এইরূপ নিয়ম প্রচার করিতে পারেন যে, যতটুকু ভূমির উপস্বত্ব হইতে একটি পরিবারের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে, তাহাতে কোন মহাজনের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিবে না। সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির ফসল ও তাহা চাষ করিবার উপযোগী হল বলদ প্রভৃতি এবং রাইয়তের বসতিবাটীর উপর ডিক্রী জারি করিয়া তাহা কেহ নিলামে বিক্রী করাইবার অনুমতি পাইবে না। তাহার অতিরিক্ত ভূমি এবং কেবল ততটুকু মাত্র কোর্টের আদেশক্রমে নিলামের পাত্র হইতে পারে।*

রাইয়তকে ঋণভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য যেসকল উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য উপায় বিবেচনাপূর্বক অচিরাৎ অবলম্বন করা গবর্নমেন্টের কর্তব্য। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের আইনসভা হইতে প্রজাদিগের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া তাহাদের জন্য বর্ষে বর্ষে ভূরি ভূরি আইন বর্ষণ হইতেছে। ইহা হইতে দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিয়া এক ভয়ঙ্কর আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে রাজস্ব বর্ধনকারী ভীষণ-দর্শন আইন-বাক্সসকল প্রসূত হইতেছে। কিন্তু ১৮৭৫ সালে যে কমিশন বসে, তাহার দ্বারা বোম্বাই বাইয়তের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোপযোগী যেসকল উপায় সূচিত হয়, তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া আইন প্রস্তুত করিতে এত বিলম্ব হইবার কারণ কি? রাজাই যখন জমিদার — জমিদারের অধিকারের সঙ্গে জমিদারের কর্তব্যভার তাঁহাকে বহন করিতে হইবে। শুদ্ধ নিয়মিত খাজানা আদায় করিযা রাজভাণ্ডার স্ফীত করিতে পারিলেই যে তিনি সে ভার হইতে মুক্ত হইলেন তাহা নহে — রাইয়তের সুখদুঃখের প্রতি তাঁহার বিশেষরূপ দৃষ্টি করা আবশ্যক। তিনি যদি মহাজনের অত্যাচার হইতে রাইয়তকে উদ্ধার করিতে চাহেন, তবে তিনি নিজেই মহাজনের স্থান গ্রহণ করুন। গবর্নমেন্ট হইতে যদি রাইয়তদিগকে প্রয়োজন মত অল্প সুদে টাকা ধার দিবার নিয়ম জারী হয়, তাহা হইলে বিস্তর শুভফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এইরূপ নিয়ম জারি করিবার বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক নাই। যেখানে মহাজন বৎসরে শতকরা ৩৬ টাকার হিসাবে সুদ না লইয়া ক্ষান্ত হয় না, সেখানে গবর্নমেন্ট তাহার ষষ্ঠাংশ সুদ গ্রহণ করিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। মহাজনের টাকা আদায় করিবার যে বিঘ্নবিপত্তি, গবর্নমেন্টের তাহার শতাংশের একাংশও নহে। গবর্নমেন্ট মহাজনের স্থান অধিকার করিলে রাইয়ত প্রবঞ্চনার ভয় হইতে মুক্ত হয়। জাল খত, হিসাবে গোল, সকলি ঘুচিয়া যায়। গবর্নমেন্ট রাইয়তের মহাজন হউন, গবর্নমেন্ট আবার তাহাদের কোষাধ্যক্ষ হউন। রাইয়ত অনেক পরিশ্রমে অল্পস্বল্প যাহা কিছু জমাইতে পারিবে, তাহা সে গবর্নমেন্টের হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া নিঃশঙ্ক হউক। এক্ষণে যেমন Saving's Bank স্থানে স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সর্বত্র বিস্তারিত হউক, যহাতে ক্ষুদ্র পল্লীর রাইয়ত পর্যন্ত তাহার ফলভাগী হইতে পারে।

* The land and the law in India By Raymond West.

ব্রিটিশ শাসন যদি অসংখ্য অসংখ্য রাইয়তের কল্যাণকর না হইল, তবে আর কি হইল। পরিশ্রমী মিতাচারী বিনীত রাইয়ত, মোগল, মহারাষ্ট্রী, পিণ্ডারীদিগের লুটপাট দৌরাত্ম্যের মধ্যে যদি উন্নতশির থাকিয়া আত্মরক্ষণে সমর্থ হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ আশ্রয়ে তাহাদের কত কল্যাণের সম্ভাবনা। কত বৎসর যুদ্ধ বিপ্লবের নামগন্ধ পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে — অন্যায় অত্যাচারের স্থানে বিশুদ্ধ ন্যায়ের আদালত সকল স্থাপিত হইয়াছে — বাণিজ্য ব্যবসা প্রমুক্ত হইয়াছে — অনিয়মিত করের পরিবর্তে ভূমির পরিমিত খাজানা নির্ধারিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও রাইয়তের এরূপ দুর্দশা কেন? চতুর্দিক হইতেই তাহার আর্তনাদ শ্রবণ করা যায়। সে দুরূহ ঋণভারে আক্রান্ত। মহাজনের দৌরাত্ম্যে তাহারা ধনপ্রাণে মারা যাইতেছে। মহাজন আদালতের সাহায্য লইয়া তাহার যথাসর্বস্ব হরণ করিতেছে — তাহার বসতবাটী — ধন ধান্য — পশু — পরিবার বস্ত্র পর্যন্ত ডিক্রী জারি করিয়া লুটিয়া লইতেছে। তাহার পিত্রার্জিত ভূমিসম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করিয়া তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতেছে — তাহাকে চিরদাসত্বে নিযুক্ত অথবা কারাবদ্ধ করিয়া পীড়ন করিতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার ঔষধ কি? এই সকল অত্যাচার নিবারণের উপায় কেন অচিরাৎ অবলম্বিত হয় না?

আমাদেব বিবেচনায় সকল অপেক্ষা রাইয়তের কল্যাণ সাধনের উৎকৃষ্ট উপায় তাহাকে শিক্ষাদান। শিক্ষাদান ব্যতীত আর আর সমস্ত উপায় ব্যর্থ হইবে। যতদিন রাইয়তেরা অজ্ঞান জালে আবৃত থাকিবে, যতদিন না তাহারা আপনার হিতাহিত বুঝিয়া কার্য করিতে পারিবে, ততদিন তাহাদের নিস্তার নাই। তাহার মঙ্গল উদ্দেশ্যে যতই কর না কেন, শিক্ষার অভাবে সে তাহার সম্যক্ লাভ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবে। কাল যদি গবর্নমেন্ট আইনের বলে তাহার সমুদায় দেনা পরিশোধ করিয়া দেন, রাইয়ত সেই অজ্ঞানান্ধ থাকিলে পরশ্ব আবার হয়তো ঋণপাশে বদ্ধ হইয়া পূর্বদশা প্রাপ্ত হইবে। শিক্ষাদানই এই সকল দুর্গতি নিবারণের একমাত্র ঔষধ। যেমন উচ্চশ্রেণীর লোকেদের হিতকারী উচ্চশিক্ষা দানে গবর্নমেন্ট ব্রতী হইয়াছেন, সেইরূপ নিম্নশ্রেণীস্থিত সাধারণ জনগণের উপযোগী সহজ লিখন পঠন শিক্ষা প্রচারেও তাঁহাদের মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তে গ্রামে গ্রামে ও ক্ষুদ্র পল্লীসমূহেও বিদ্যালয় পাঠশালা সকল স্থাপিত হউক। শুদ্ধ লেখাপড়া শিক্ষা নয়, অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় কৃষিবিদ্যা শিক্ষাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। স্থানে স্থানে কৃষিবিদ্যালয় — স্থানে স্থানে উন্নত কৃষিকার্যের উৎসাহ-বর্ধনকারী আদর্শ ক্ষেত্রসকল (Model farms) প্রতিষ্ঠিত হউক — অসংখ্য অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হউক — তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল মার্জিত হউক — তাহাদের অবস্থার উপযোগী শিক্ষালাভের উপায়সকল কল্পিত হউক। তাহা হইলে রাজা প্রজা উভয়েরই কল্যাণ — তাহা হইলেই ব্রিটিশ রাজ্যের কীর্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষে এরূপ বদ্ধমূল হইবে যে তাহা কোনকালেই বিলুপ্ত হইবে না।

লিখিতে লিখিতে "দাক্ষিণাত্য কৃষিকষ্টনিবারণী বিল" আমাদের হস্তগত হইল। এই বিল সম্প্রতি কক্রেল সাহেব ভারতবর্ষীয় আইনসভায় উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, রাইয়ত কমিশনের পরিশ্রম ব্যর্থ যায় নাই, তাঁহারা রাইয়তদিগের ঋণ মোচনের যে সকল উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন, তাহা লইয়া কর্তৃপক্ষদের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছে ইহা এক শুভ চিহ্ন। প্রস্তাবিত আইন সেই আন্দোলনের ফলস্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে।

কক্রেল সাহেবের বক্তৃতা হইতে জানা যাইতেছে যে গতবর্ষে বোম্বাই গবর্নমেন্ট, ভূতপূর্ব গবর্নর সাহেব কর্মত্যাগ করিবার কিছু পূর্বে, কমিশনের সমুদায় রিপোর্টখানি সমালোচন করিয়া ইন্ডিয়া গবর্নমেন্টে এক পত্র লেখেন। মহারাষ্ট্রীয় রাইয়তদের ঘোরতর ঋণভার ও তৎকারণ বিষয়ে কমিশনরগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বোম্বাই গবর্নমেন্ট তাহার সহিত একমত হইয়াছেন, কিন্তু প্রচলিত খাজানার আকার অথবা সেই খাজানা আদায়ের কঠোর নিয়মাবলী যে রাইয়তদের বর্তমান দুর্দশার কারণ তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন নাই।

ভূমি সম্পর্কীয় খাজানার আকার ও রাজস্ব আদায় বিষয়ে কমিশনরগণ যেসকল অস্ফুট মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বোম্বাই গবর্নমেন্টের বিবেচনায় কার্যে পরিণত করা কঠিন। তাহা করিতে হইলে ফসলের খাজানা গ্রহণ করিবার প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করিতে হয়। এই অবনতিকারক প্রথার পুনঃপ্রবর্তনে গবর্নমেন্ট কখনই সম্মতি দিতে পারেন না। আর যদি খাজানার কোন নিয়মিত দর বাঁধিয়া না দেওয়া যায়, তাহা হইলে রাইয়তের কি দেয়, তাহা লইয়া গোল উঠিবার সম্ভাবনা। গবর্নমেন্ট ও রাইয়তের এই অনিশ্চিত সম্বন্ধ থাকিলে তাহা হইতে যে অমঙ্গল নিরাকৃত হইবার কথা হইতেছে, তদপেক্ষাও অধিক অমঙ্গল প্রসূত হইবে।

এক্ষণকার আইন ও আদালতের হাঙ্গামে রাইয়তের যে অবস্থান্তর লক্ষিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে গবর্নমেন্ট এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, রাইয়তের বর্তমান দুর্দশার দুই প্রধান কারণ — এক দেনা আদায় সম্বন্ধীয় মকদ্দমায় তামাদি মেয়াদের স্বল্পীকরণ ও রাইয়তের বিরুদ্ধে মকদ্দমার একতরফা নিষ্পত্তির সুলভতা। অতএব তাঁহারা কমিশন রিপোর্ট প্রস্তাবিত বিষয়ের মধ্যে এই কয়েকটি বিষয় অনুমোদন করিয়াছেন।

১। রাইয়তেরা মহাজনদিগকে যে সকল কর্জখত লিখিয়া দেয়, তাহা একজন গবর্নমেন্ট কর্মচারীর সমক্ষে লিখিত ও রেজিস্ট্রি করা হয়।

২। দেনার টাকা পাইলে রাইয়তকে অবশ্য তাহার রসিদ দিতে হইবে। রাইয়তের ইচ্ছামত তাহাকে মধ্যে মধ্যে হিসাব দেখাইতে ও লিখিয়া দিতে হইবে।

৩। দেনার মকদ্দমা উপস্থিত হইলে আদালতে যাহাতে তাহার সুবিচার হয় তাহার উপায় বিধান করা।

৪। ১৮৫৯ সালের পূর্বে দেনার জন্য যে তামাদি আইন প্রচলিত ছিল, বোম্বাই গবর্নমেন্ট তাহা পুনঃস্থাপন করিবার পরামর্শ দেন।

দেনার জন্য গ্রেপ্তার ও কারাবাস উঠাইয়া দেওয়া ও স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রী জারি করিয়া তাহা নিলাম হইতে মুক্ত রাখা — এই দুই প্রস্তাব তাঁহাদের মনঃপূত হয় নাই।

ইহার পর আবার এই বর্ষে বোম্বাই গবর্নমেন্ট নিম্নলিখিত বিষয়সকল আইনে বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন।

প্রথমত (ক) যে কোন মকদ্দমা উপস্থিত হউক না কেন, প্রতিবাদী উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, কোর্ট তাহার সম্পূর্ণ বিচার করিতে বাধ্য হইবে।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি কোর্টে আসিয়া পৈতৃক ঋণ শুধিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে সে অন্য কথা, কিন্তু তাহা না হইলে কেহ পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নয়।

(গ) চক্রবৃদ্ধি সুদ (Compound Interest) অগ্রাহ্য, আসল টাকার অধিক সুদ কেহ এককালীন দিতে বাধ্য হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ (ক) কোন ঋণী উপস্থিত হইয়া ঋণ পরিশোধে অসামর্থ্য জানাইলেই সে তাহা হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে, তাহাকে কোর্টে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার আবশ্যক নাই।

(খ) যে জমি দেনার জন্য বন্ধক রাখা না হয় আর সেই বন্ধক খত আইন মত রেজিষ্টরি করা না হয়, কোর্টের হুকুমে সে জমির নিলাম হইবে না।

প্রস্তাবিত আইনে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবার কথা হইতেছে তাহা এই;—

১। প্রতিবাদী গ্রেপ্তার না হইয়াও যদি কোর্টে আসিয়া ঋণমুক্তির জন্য আবেদন করে, তবে তাহার অবস্থানুসারে তাহাকে দেউলিয়া স্থির করা কোর্টের ক্ষমতা থাকিবে।

২। যে জমি দেনার জন্য বন্ধক রাখা হইয়াছে তাহা ব্যতীত অপর কোন জমি দেনার ডিক্রীতে নিলামের পাত্র নহে।

৩। স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সম্বন্ধীয় চুক্তি লিপিবদ্ধ ও রেজিষ্টরি করিতে হইবে।

উপরিউক্ত আইন এইক্ষণে কেবল মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত কয়েকটি তালুকে আবদ্ধ — ইহার ফলাফল দেখিয়া ভবিষ্যতে ইহা অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত হইবে এইরূপ আশা করা যাইতে পারে।

বোম্বাই রায়ত

পরিশিষ্ট

১২৮৫ সালের কয়েক সংখ্যক ভারতীতে প্রকাশিত 'বোম্বাই রায়ত' শিরস্ক প্রবন্ধ পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, — তাহা প্রকাশিত হইবার অনতিকাল পরে কৃষিকষ্টনিবারণী নূতন বিধি * বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ বিভাগে পুনা, সাতারা, সোলাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রবর্তিত হয়। ১৮৭৯ সালে এই আইন জারী হইয়া ১৮৮২ সালে ইহার তৃতীয় সংস্করণ হয়। কৃষিদের ঋণ মোচন, বিবিধ উপায়ে তাহাদের সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন এই আইনের উদ্দেশ্য। উল্লিখিত প্রবন্ধে রায়ত ও মহাজনের পবস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম পরিবর্তন অত্যাবশ্যক বলিয়া সূচিত হয় বিচার্য আইনে তাহার কতকগুলি নিয়ম সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইবে। এই আইন সম্মত প্রধান প্রধান নিয়মগুলি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

ঋণ সম্বন্ধীয় ছোট ছোট মকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য গ্রামের পটেল কিম্বা অন্য যোগ্য ব্যক্তি গ্রাম্য মুন্সিফরূপে নিযুক্ত হইতে পারে।

গ্রাম্য রেজিষ্ট্রারের নিকট কৃষকের দলিল দস্তাবেজ রেজিষ্ট্রি করা বিধেয় নতুবা তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

আমরা পঞ্চায়েত সূত্রে মকদ্দমা নিষ্পত্তির সূচনা করিয়াছি — স্থলবিশেষে এইরূপ পঞ্চায়েতে মকদ্দমা বিচারের ভার সমর্পণ করিবাব সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিচারকের হস্তে অর্পিত এবং বাদী প্রতিবাদী ইচ্ছা করিলেই তাহারা আপন আপন মধ্যস্থ নিয়োগে সক্ষম।

কিন্তু এই আইনের বিশেষ বিধান এই যে গবর্নমেন্টকে রায়ত মহাজনের মধ্যে কতকগুলি সন্ধিকর্তা (Conciliators) নিযুক্ত করিতে হইবে। আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্বে অর্থীকে সন্ধিকর্তার নিকট যাইতে হইবে। তিনি রায়ত মহাজনের বিবাদ আপসে মিটাইয়া দিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন ও তাহাতে কৃতকার্য না হইলে অর্থীকে আদালতে যাইবার অনুমতি দিবেন, তাঁহার সার্টিফিকেট ভিন্ন কোন দাওয়া আর্জী গ্রাহ্য হইবে না। এই পাঁচ বৎসরে যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে এই সন্ধি-নিয়ম হিতাবহ বলিয়া অনুভূত হয়। অনেক স্থলে সন্ধিকর্তার সুপরামর্শে অর্থী প্রত্যর্থী আপসে বিবাদ মিটমাট করিয়া মকদ্দমার অর্থ নাশ মনস্তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। ইহাতে আমাদের প্রাচীন পঞ্চায়েত প্রথার গুণস্পর্শ কিয়দংশে উপলক্ষিত হয়।

রায়ত ঋণ শোধের টাকা মহাজনের কাছে আনিয়া দিলে মহাজন তাহাকে স্বতন্ত্র রসিদ,

* The Dekhan Agriculturist's Relief Act 1879.
Amended by Acts 23 of 1881 and 22 of 1882.

অথবা পাসবহি মধ্যে রসিদ লিখিয়া দিতে ও প্রতিবর্ষে রায়তের হাতে তাহার দেনাপাওনার হিসাব দিতে বাধ্য।

আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে বিচারকের কর্তব্য প্রতিবাদীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার জবানবন্দি লওয়া। দেনাপাওনার হিসাব সমস্ত আদ্যোপান্ত পরীক্ষা করিয়া ঋণের আসল টাকা নিরূপণ করা ও জজের বিচারে যাহা ন্যায্য সুদ তাহাই ধরিয়া হিসাব ঠিক করিয়া দেনা নির্ণয় করা কর্তব্য। সুদের উপর সুদ কিম্বা অতিরিক্ত অন্যায় সুদ চুক্তিসম্মত হইলেও ধরা হইবে না।

ডিক্রী দিবার অথবা জারী করিবার সময় দেয় টাকা উচিত মত কিস্তিবন্দি করিয়া দেওয়া সকল সময়েই কোর্টের সাধ্যায়ত্ত।

রায়তের ভূমিসম্পত্তি বন্ধক না থাকিলে দেনার জন্য তাহা বিক্রী হইবার নহে।

দেনার ডিক্রী জারিজনিত কারাবাসের আদেশ নিষিদ্ধ। ডিক্রী জারির দরুণ রায়ত গ্রেপ্তার না হইলেও, তাহার মালক্রোকের হুকুম বাহির না হইলেও ৫০ টাকা ও ততোধিক ঋণে যে রায়ত ঋণগ্রস্ত সে ইচ্ছানুসারে ইন্সল্‌বেন্সির জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবে।

কড়ার নির্দিষ্ট মেয়াদ ফুরাইবার পূর্বেও কোন বন্ধকদাতা কৃষক বন্ধক ছাড়াইবার মকদ্দমা আনিতে সক্ষম। বন্ধক-কড়ার লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

ঋণদায় সম্বন্ধীয় তামাদির মেয়াদ ত বৎসরের পরিবর্তে ৬ বৎসর কাল বিস্তৃত।

এই আইনের গুণাগুণ বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। এ আইন প্রবর্তিত হইয়া অবধি এ অঞ্চলের প্রজারা দুর্ভিক্ষ দুষ্কালের করাল গ্রাসে আজ পর্যন্ত পতিত হয় নাই, সুতরাং ইহা পরীক্ষার কষ্টিপাথরে এখনো উত্তীর্ণ হইয়াছে বলা যায় না। এই বিধির চিরন্তন জনরূঢ়ি বিরুদ্ধ বিধান-সমূহ জনসাধারণের বাস্তবিক ইষ্ট কি অনিষ্টজনক — ভবিষ্যতেই তাহা সম্যক অনুভূত হইবে। আপাতত দেখা যাইতেছে এই আইন মহাজনের পক্ষে যেমন কঠোর, রায়তের তেমনি লাভজনক। ইহার প্রভাবে অনেকানেক ঘোর দুর্দশাপন্ন রায়ত ঋণমুক্ত ও নিজ নিজ পৈত্রিক ভূমি সম্পত্তি মহাজনের গ্রাস হইতে পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইয়াছে। অন্যদিকে মহাজনের পক্ষ দেখ। মহাজন রায়তের উপর ডিক্রী পাইলেও তাহার তাহাতে বিশেষ লাভ নাই কেন না সে ডিক্রী জারি করা সামান্য কষ্টসাধ্য নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, মহাজন সম্বন্ধে রায়তের কল্যাণ সাধনে যেমন গবর্নমেন্ট তৎপর, তাঁহাদের নিজের বেলায় — নিজের স্বার্থের সঙ্গে যেখানে বিরোধ সেখানে কি তদ্রূপ মনোযোগী? গবর্নমেন্টই এ প্রদেশের জমিদার — রায়ত সরকারকেই মা-বাপ বলিয়া জানে, সরকারের কৃপাদৃষ্টি ভিন্ন রায়তের দুর্দশা সম্পূর্ণ ঘুচিবার নহে, রায়তেরা কতদূর করভারে প্রপীড়িত, তাহাদের ধারকর্জের সুবিধার

জন্য ব্যাঙ্ক খুলিবার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা কতদূর যুক্তিযুক্ত, রাজস্ব আদায়ের কঠোর নিয়ম সকল শিথিল করা কতদূর প্রার্থনীয়, ৩০ বৎসর অন্তর যে রাজস্ব পরিবর্তনের নিয়ম আছে তাহার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত করা সুসঙ্গত কিনা,* এই সকল বিষয়ে বিবেচনাপূর্বক গবর্নমেন্ট যথাকর্তব্য বিধান করুন— পরিশেষে এই আমাদের প্রার্থনা।

* নূতন জমাবন্দী বাঁধিবার সময় রায়তের স্বযত্নসম্ভূত উন্নতির প্রতি লক্ষ করিয়া করবৃদ্ধি করা বিধেয় নহে এই সাধারণ নিয়ম কিন্তু কার্যতঃ অনেক সময় ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, এই নিয়ম সংশোধিত হইয়া বোম্বায়ে এক নূতন আইন প্রবর্তিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

সিন্ধু কাহিনী

প্রথম ভাগ

সিন্ধুদেশের কি দুর্ভাগ্য। ভারতবর্ষের মোহাড়ায় তার অধিষ্ঠান সুতরাং আততায়ীদের প্রথম পাদক্ষেপ তাহার উপরে গিয়াই পড়ে। প্রাচীনকাল হইতে পূর্বাপর তাহার উপর দিয়া কত উৎপাত কত ধাক্কাই গিয়াছে। প্রথমে সেকেন্দর বাদশাহের সিন্ধু আক্রমণ দেখ।

সেকেন্দর বাদশা

পারস্যাধিপতি দরায়ুসকে ধনপ্রাণে বিনাশ করিয়া সেকেন্দর সা সৈন্য- সামন্ত সমভিব্যাহারে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া হিন্দুকুশ পর্বত উল্লঙ্ঘন ও খাইবারের দুর্গম পথ অতিক্রমপূর্বক ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন, অবশেষে তাহার রণমত্ত সৈন্যগণ সিন্ধুতীরস্থিত আটকে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। আটকের বাধা না মানিয়া মাসিডনবীর সিন্ধুপার হইয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করিলেন। পঞ্জাবে তক্ষশীলের প্ররোচনায় বীরশ্রেষ্ঠ পুরুরাজের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয় তাহা প্রসিদ্ধই আছে, এস্থলে বর্ণন করিবার আবশ্যক নাই। আশ্চর্য এই যে, যে রণক্ষেত্রে গ্রীক ও হিন্দু এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বীরদলের সম্মিলন হইয়াছিল সেই স্থলেই দুই সহস্রাধিক বৎসরান্তে ইংরাজ ও শিখদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটন হয়। দুবারই পঞ্জাবীদের পরাজয় কিন্তু সে পরাজয়ে শত্রুরাও তাহাদের বীরত্বের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে নাই। বন্দীকৃত পুরুরাজের সঙ্গে রাজার মত ব্যবহার করিয়া সেকেন্দর তাঁহার সিংহাসন প্রত্যর্পণ করেন। বিজয়ী গ্রীকরাজ জয়স্থলে নগরদ্বয় পত্তন করিয়া চেনাব ও রাবী নদী পার হইলেন। এই সময়ে মগধ রাজের বিপুল কীর্তি তাহার কর্ণগোচর হইল। ৬ লক্ষ পদাতিক ও সহস্র সহস্র অশ্ব গজারোহী সেনা যে রাজার সৈন্যবল তাঁহাব রাজধানী পাটলীপুত্রে জয়স্তম্ভ নিখাত করেন এই তাঁহার ইচ্ছা। তাঁহার লোভের অন্ত নাই, কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রাংশুলভ্য ফলে উদ্বাহু বামনের ন্যায় তাঁর দশা হইল। বেয়াস (বিপাশা) নদী পর্যন্ত পৌঁছিয়া তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যদল কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে চায় না। সম্রাট তাহাদের বশ করিতে কত চেষ্টা করিলেন, তাঁহার সকল সাধ্যসাধনা নিষ্ফল, — ভৎসনা গঞ্জনা কাকুতিমিনতি কিছুতেই কিছু হইল না, সুতরাং ঐখানে রণে ভঙ্গ দিয়া তাঁহাকে অগত্যা ফিরিতে হইল।

পুরুরাজের হস্তে সপ্তরাজ্য সমর্পণ করিয়া সেকন্দর তাঁর সৈন্য সামন্ত লইয়া ঝিলমে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় রণতরী সজ্জিত হইল। অনন্তর তিনি সৈন্যদের দুই দলে বিভক্ত করিলেন। সেনাপতির অধীনে একদল পৃথক পাঠাইলেন আর আপনি একদল লইয়া পঞ্জাবের নদী বাহিয়া সিন্ধুনদী দিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। এই যাত্রার কতিপয় মাস সিন্ধুদেশ সেকন্দরের বীরদর্পে কম্পিত ও রাজ্যে বিপুল বিপ্লব সমুত্থিত হয়। সিন্ধু প্রবেশ পূর্বে মল্লীদের যুদ্ধে হারাইয়া মূলতান অধিকার করেন এবং আরো দক্ষিণে পঞ্চনদীর সঙ্গমে এক নগর পত্তন করিয়া যান।

সেকেন্দর বাদশার সিন্ধু আক্রমণের হিন্দু লেখ্য কিছুই নাই — যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গ্রীক্ ভাষায় লিখিত। এই হেতু নাম লইয়া বড় গোল। গ্রীক্ ও চীন লেখকেরা এদেশের নামাবলীর যেরূপ শ্রাদ্ধ করিয়াছেন তাহা হইতে দেশের প্রকৃত নামসকল উদ্ধার করা সহজ নহে। গ্রীক্‌রাজ যেখানে যুদ্ধে জয়লাভ করেন সেখানে নগর দুর্গ প্রভৃতি কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল স্থাপন করিয়া যান — গ্রীক্ ইতিহাসের এইরূপ বর্ণনা, কিন্তু এক্ষণে এদেশে সেই সকল কীর্তিকলাপের কোন নামগন্ধ নাই — কোথাও যদি তাহার চিহ্ন থাকে তাহা কেবলি অনুমান ও কল্পনা।

পুরাকালে আলোর সিন্ধুদেশের রাজধানী ছিল কিন্তু গ্রীক্ গ্রন্থে এরূপ কোন নাম পাওয়া যায় না। "মুষিকানুস্" নামক এক রাজার সমৃদ্ধশালী রাজ্যের বর্ণনা আছে সম্ভবতঃ আলোর তাঁহার রাজধানী। আর একটি প্রাচীন শহরের নাম ব্রাহ্মণাবাদ। কনিংহাম সাহেব ইহা "মুষিক" রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অনুমান করেন। এককালে ইহা সধন সজন হিন্দু নগর বলিয়া প্রখ্যাত ছিল — ইহার অভ্যন্তরে বিরাজিত ১৪০০ বুরুজের এক প্রকাণ্ড দুর্গের চিহ্ন-সকল অদ্যাপি বিদ্যমান। এই স্থান গ্রীক্ ইতিহাসে হর্ম্মতেলিয়া (ব্রাহ্মণ-স্থল) বলিয়া অভিহিত ও কথিত আছে। এখানে সেকন্দরের একজন সৈনিক বিষাক্ত তরবারাঘাতে আহত হন। আরব ইতিহাসেও ব্রাহ্মণাবাদের অনেক কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণাবাদ

সিন্ধু-হাইদ্রাবাদের কিয়ৎ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে একটি প্রোথিত নগরের ভগ্নস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কর্তা বেলাসিস্ সাহেব স্থির করেন তাহাই পুরাবৃত্তের চিরপরিচিত ব্রাহ্মণাবাদের ভগ্নাবশেষ, প্রবাদ এই যে এই নগর দুষ্ট রাজা দলুরায়ের পাপাচারে ভূমিকম্পে বিধ্বংস হয়। সিন্ধী ইতিহাসে তার বিবরণ এই ঃ—

প্রোথিত নগব

আলোর রাজধানী বিলুপ্ত হইলে পর দলুরায় ব্রাহ্মণাবাদে আসিয়া বাস করেন। ছোটা আমরানী নামক তাঁহার এক ভ্রাতা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। এই ছোটাসাহেব তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া মক্কা হইতে একজন মুসলমানী বিবাহ করিয়া আনেন। ফাতিমা সিন্ধুদেশে পদার্পণ করিয়া অবধি দলুরায়ের হস্তে অশেষ অপমান যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ছোটা এই সকল অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া স্ত্রীকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইলেন। এমন সময় দৈববাণী উঠিল "ব্রাহ্মণপুরী যায় যায় — সাবধান!" তাহা শুনিয়া কেহ কেহ সতর্ক হইল। প্রথম রাত্রে একজন বুড়ী চরখা কাটিতে কাটিতে জাগিয়া চৌকী দিতে লাগিল তাহাতেই নগর রক্ষা পাইল। দ্বিতীয় রাত্রে একজন কলুর সতর্কতায় নগর রক্ষিত হইল। তৃতীয় দিন সুযোগ পাইয়া পুরী একেবারে পাতালে প্রবেশ করিলেন — তাহার একটিমাত্র দুর্গস্তম্ভ দৃষ্টান্তস্বরূপ বশিষ্ট রহিল।

বেলাসিস্ সাহেব এই ভগ্নস্তূপ খনন ও বিস্তর অনুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন যে নগরী ভূকম্পন প্রভৃতি প্রকৃতির কোন প্রবল উৎপাতে সহসা এইরূপ প্রলয়দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেলাসিস্ সাহেবের খননে ভূমিকম্পই ব্রাহ্মণের প্রলয়ের কারণ বলিযা সপ্রমাণ হয়। তিনি

যেসকল নরকঙ্কাল দেখিতে পান তাহা প্রধানতঃ দ্বারমুখে — কতকগুলি ঘরের কোণে;— যেন লোকেরা কেহ প্রাণভয়ে পলায়নোদ্যত — কেহ বা ভয়ে জড়সড় হইয়া এক কোণে বসিয়া মরণ প্রতীক্ষা করিতেছে। কথিত আছে এই ভগ্নস্তূপে চরখায় উপবিষ্টা একটি স্ত্রীলোকের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে যেন স্ত্রীলোকটি চরখা কাটিতে কাটিতে হঠাৎ চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত। অগ্ন্যুৎপাতে এরূপ হয় নাই, কেন না কয়লা, দগ্ধকাষ্ঠ প্রভৃতি এমন কোন পদার্থ পাওয়া যায় নাই যাহাতে আগ্নেয় উপদ্রব সূচিত হয়। প্রাচীরে দহনের কোন চিহ্ন নাই।

এই সকল ভগ্নরাশির মধ্যে কত ভাল ভাল খোদিত প্রস্তর, মাটির ও কাচের বাসন, গজদন্ত, পিতল ও কাচের আভরণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা — ধান্যের জালা — সতরঞ্চি ও পাশা খেলার সামগ্রী — অশ্ব গো উষ্ট্র কুকুর কুক্কুট মানব অস্থিসকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। অস্থিসকল জীর্ণদশা প্রাপ্ত, অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই সমস্ত দৃষ্টে ব্রাহ্মণাবাদ এককালে ধনধান্যপূর্ণ জনাকীর্ণ বিস্তীর্ণ নগর ছিল তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়। বেলাসিস্ সাহেব এই স্থানের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন : "এই সমস্ত ভগ্নরাশির মধ্যে অনেকগুলি খোলা জায়গা বা চৌক দৃষ্ট হইল — সেসকল হয়তো পুরাণ নগরের হাটবাজার, ক্রয়বিক্রয়ের স্থান। ইহাদের কোন কোনটা দীর্ঘায়তন — কেল্লার ভিতর দিয়া গিয়াছে। কল্পনা এতটুকু ছাড়িয়া দেও, দেখিতে পাইবে এইখানে সৈন্যদের বারাক, এই খোলা ময়দানে তাহাদের প্যারেড হইত। এই পোদ্দারের টাকাকড়ি বিনিময়ের দোকান। এই নগরের প্রবেশদ্বার, যেখানে মালের উপর কর আদায় হইত। আবার সহজে মনে করিতে পারা যায় এই প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া পুণ্যবতী সিন্ধুনদী মহাস্রোতে কলকল রবে বহিয়া যাইতেছে — নানাজাতীয় তরণী তাহার বক্ষের উপর এখনকার মত শোভা পাইতেছে — ধীবরেরা পল্লামৎস্য ধরিতে কলসীর উপর ভর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। এখন মনে কর এই নদীতীরে, এই প্রাচীরতলে বাণিজ্য ব্যবসার প্রকাণ্ড কারখানা — এইখানে কত মাল- বোঝাই নৌকা নোঙড় করিয়া আছে — এই স্থলে নানান্ বাণিজ্যসামগ্রী বস্তায় বস্তায় বিক্রয়ার্থ রাশীকৃত ও যেমন এখন দেখা যায় — শ্রীমন্ত হিন্দু সওদাগরগণ ক্রয়বিক্রয়ের হট্টগোলে ব্যাপৃত।"

হায়, এই শ্রীসমৃদ্ধিসম্পন্ন জীবন্ত নগর এক্ষণে মৃত্যুপাশে চিরনিদ্রিত। ইহার প্রবল কেল্লা দুর্গ ভূমিসাৎ হইয়াছে। সবে একটি মাত্র বুরুজ স্মরণচিহ্ন স্বরূপ অবশিষ্ট। ইহার প্রাসাদ অট্টালিকা গৃহাবলী ইষ্টক ধূলি ও বালুরাশিতে পরিণত, "পেচক ও বাদুড়, শৃগাল ও শার্দুলের আবাসস্থান।" নদীতীরে এককালে যেসকল সুরম্য সুন্দর উদ্যান কানন নগরের শোভা সম্পাদন করিত তাহা কন্টকাবৃত বন জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সে স্রোতস্বতী আর নাই। তাহার প্রবাহ অন্যত্রে বিবর্ত হইয়া গিয়াছে, চতুর্দিক শুষ্ক নীরস মরুভূমি।*

* Cunningham's ancient Geography of India (Western India. The Buried City of Brahmanabad By H.M. Birdwood (Bombay C.S.)

সিন্ধু কাহিনী

দ্বিতীয় ভাগ

এবার মুসলমানদের সিন্ধু-আক্রমণের পালা। সেকন্দর বাদশা চলিয়া যাইবার পর সিন্ধুদশ অনেককাল পর্যন্ত হিন্দু রাজাদের অধীন ছিল, মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা বলেন রাজপুত বংশীয় পঞ্চরাহী সিন্ধুদেশে ১৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। আলোর তাঁহাদের রাজধানী ও তাঁহাদের রাজত্বকালে প্রজাসকল সুখ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে রাহী সাহসীর মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন পুত্র সন্ততি ছিল না। রাজ্ঞীর এক ব্রাহ্মণ উপপতি ছিল তাহার নাম কচ্ছ*। কথিত আছে যে ন্যায্য উত্তরাধিকারীগণকে সবংশে ধবংস করিয়া রাণী স্বীয় প্রণয়ী কচ্ছের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। অবশিষ্ট রাজপুত বলীদিগকে ছলেবলে কৌশলে পরাজিত করিয়া কচ্ছ রাজা অন্যায়লব্ধ সিংহাসনে সুস্থির হইয়া বসিলেন। এই কচ্ছ রাজা ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাব পুত্র ডাহির সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন।

রাজা ডাহিব

ডাহীরের রাজত্বকালে সিন্ধুদেশ ধর্মান্ধ যবনদল কর্তৃক আপ্লুত হয়। আরবেরা প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিত। তাহাদের একটি জাহাজ দেওয়াল** বন্দরে ধৃত হওয়াতে রাজা ডাহিবের নিকট তাহা প্রত্যার্পণের জন্য আবেদন করা হয়। রাজা সে আবেদন অগ্রাহ্য করেন — এই সামান্য কারণে যুদ্ধের সূত্রপাত।

৭১১ খৃষ্টাব্দে কালিফ ওয়ালিদের রাজত্বকালে মহম্মদ কাশিম (২০ বৎসরের বালক বৈ নয়) একদল সৈন্য লইয়া দেওয়াল বন্দরে উপনীত হন। প্রথমে একটি মন্দিরের উপর তাঁর যত আক্রোশ। ইহা বন্দরের প্রান্তবর্তী প্রস্তর প্রাচীর-বেষ্টিত একটি বিখ্যাত হিন্দু দেবালয় — অন্তরে ব্রাহ্মণ বসতি ও রাজপুত সৈন্য কর্তৃক সুরক্ষিত। মন্দিরের একটি স্তম্ভের উপর এক নিশান উড়িতেছিল। কাশিম তাহার প্রতি বাণপ্রয়োগ করিয়া ধরাশায়ী করিলেন। পতাকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদিগের এমনি ভয়ের সঞ্চার হইল যে তাঁহাদেরও যবন হস্তে পতনের আর বিলম্ব রহিল না। মন্দির অধিকার করিয়া ব্রাহ্মণদের বলপূর্বক মুসলমান করা এই কাশিমের প্রথম কাজ। তাহাদের অসম্মতি দেখিয়া কাশিম এমনি ক্রুদ্ধ হইলেন যে বয়স্ক পুরুষদের সমূলে নিপাত, বালক ও স্ত্রীলোকদের দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধনের আদেশ জারী হইল।

মহম্মদ কাশিম

মন্দির পতনের পর বন্দর শীঘ্রই যবনদের হস্তগত হইল ও তদান্তর কাশিম নিবণকোট (এক্ষণকার হাইদ্রাবাদ) দেওয়াল প্রভৃতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইলেন।

* অথবা চচ্;— নাম ঠিক করা সহজ না — ইংরাজীতে — Chah — Burton's Sindh

** Elphinstone বলেন 'দেওয়াল' করাচীর নিকটবর্তী কোন বন্দর ছিল।

এ পর্যন্ত কাশিমের ভাগ্য সুপ্রসন্ন — অনন্তর ডাহিরের রাজধানী আলোরের নিকট এক মহাযুদ্ধ হয়। রাজা স্বয়ং ৫০ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার রাজধানী সংরক্ষণার্থে অগ্রসর হইলেন। কাশিম পারস্য হইতে নবাগত ২০০০ অশ্বারোহী ও পূর্বকার অবশিষ্ট বল লইয়া হিন্দু সেনার আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। রাজা যে গজপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন দৈবঘটনায় এক অগ্নিগোলা তাহার উপর পড়িয়া হুলুস্থুল বাধাইয়া দিল, অবাধ্য হস্তী রণভূমি হইতে রাজাকে লইয়া পলায়ন করিল। এই ঘটনায় যুদ্ধের পরিণাম সূচিত হইল। রাজা অশ্বারূঢ় হইয়া জর্জরিত দেহে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহার কোন ফল হইল না, রণোন্মত্ত আরব সৈন্য-মাঝে ক্ষতবিক্ষত হইয়া কালকবলে পতিত হইলেন।

এই সঙ্কটের সময় রাজ্ঞীর অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিক্ষিপ্ত সেনাদল একত্রিত করিয়া সেই বীরাঙ্গনা ব্রাহ্মণাবাদ রক্ষার একবার শেষ চেষ্টা দেখেন, যতক্ষণ পারিলেন শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন, পরিশেষে অন্নাভাবে সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। আর তাহারা তিষ্ঠিতে পারে না। পরে তাহারা রাজপুত বীরোচিত 'জোহর' ব্রতে ব্রতী হইয়া স্ত্রী-পুত্রদিগকে জ্বলন্ত চিতানলে আহুতি প্রদান করিল — পুরুষেরা নগরদ্বার খুলিয়া তরবার হস্তে অরিদলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ইহার পর ডাহিরের রাজ্য মুসলমানদের চরণতলে ন্যস্ত হইল। মূলতানে যবন জয়পতাকা উড্ডীন হইল।

বীরাঙ্গনা রাজমহিষী

ক্রমে হিন্দু ও আরবদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার সূত্রপাত হইল। হিন্দু শ্রেষ্ঠীরা যবনকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। হিন্দু দেবালয় উচ্ছন্ন — পূজার্চনা বন্ধ হইয়া পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন হইয়াছে — ব্রাহ্মণদের দেবত্র ব্রহ্মত্র ভূমিসম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে — করদ রাজ্যে কি এই সকল নষ্টাধিকার প্রত্যর্পণ করা যাইতে পারে? তাহা হইলে কি পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? কাশিমের মনে এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি তাহার প্রভুর সন্নিধানে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। সেখান হইতে হিন্দুদের প্রীতিজনক উত্তর পাওয়া গেল। তাহা এই যে, যে সকল হিন্দু করদানে প্রতিশ্রুত তাহারা করদ রাজ্যের প্রজার ন্যায় সমস্ত অধিকার পাইবার যোগ্য। তাহারা দেবালয় পুনঃস্থাপন করিয়া পূজার্চনা করুক তাহাতে কোন আপত্তি নাই, অপহৃত ভূমি সম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যর্পণ করা হউক — হিন্দু রাজার আমলে তাহাদের যাহা ন্যায্য পাওনা তাহা হইতে তাহারদিগকে বঞ্চিত করা বিধেয় নহে।

কাশিম জয়লাভে স্ফীত হইয়া হিন্দুস্থান আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ তাহার ভাগ্য ফিরিল। ডাহিরের পরাজয় ও পতনের পর তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যাদ্বয় যবনদের হস্তে পতিত হয়। কাশিম রাজকুমারীদিগকে দমাস্কসের কালিফের নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। কালিফের সম্মুখে আনীত হইলে জ্যেষ্ঠা যিনি তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিবেদন

করিলেন, "আমি মহারাজের যোগ্য নই — কাশিম আমাকে বিদায় করিবার পূর্বে আমার প্রতি ব্যভিচার করিয়াছে।" কালিফ রাজকুমারীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া ভৃত্যের প্রতি রোষানলে প্রজ্বলিত হইলেন। রাগের মাথায় আদেশ দিয়া পাঠাইলেন, "কাশিমকে কাঁচাচর্ম-থলিতে পুরিয়া মুখ সেলাই করিয়া এখনি আমার সম্মুখে হাজির কর।" কালিফের আদেশ সম্পন্ন হইলে পর রাজকুমারীকে ডাকিয়া আনিয়া কাশিমের মৃতদেহ দেখাইলেন। রাজকুমারী আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! কাশিম বাস্তবিক নিরপরাধী — আমার পিতার মৃত্যু ও কুল কলঙ্কের এই প্রতিশোধ।"*

Elphinstone's History of India.

সিন্ধু কাহিনী

তৃতীয় ভাগ

কাশিমের সিন্ধু আক্রমণ হইতে ইংরাজ রাজ্য সংস্থাপন পর্যন্ত সিন্ধু দেশে অনেক রাষ্ট্র-বিপ্লব অনেকানেক রাজবংশের উত্থানপতন সংসাধিত হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দী হইতে এ পর্যন্ত যত শতাব্দী গত হইয়াছে প্রায় ততগুলি রাজবংশ সিন্ধুরাজ্যে অবতীর্ণ। ৮৭১ খৃষ্টাব্দের পর ঐ দেশ মূলতান ও মনসুরা এই দুই মুসলমান রাজ্যে বিভক্ত হয়। মুলতান উত্তর হইতে আলোর পর্যন্ত বিস্তৃত। মনসুবা সিন্ধু বিজয়ের অনতিকাল পরে ব্রাহ্মণাবাদের নামধাম অধিকার করিযা সমুখিত হয়, আলোর হইতে দক্ষিণ সাগর পর্যন্ত তাহার সীমা। কালিফ-প্রতিনিধিগণ প্রায় ৩০০ বৎসর সিন্ধুদেশ শাসন করেন। তদনন্তর যবনাধিপত্য ক্ষণকালের জন্য অস্তমিত হইয়া যায়। তৎপরিবর্তে সুমবা ও সম্মা রাজপুতগণ কয়েক শত বৎসর উত্তবোত্তর রাজ্য করেন। তন্মধ্যে সম্মা বংশীয় রাজগণ অনেকে মুসলমান ধর্মাক্রান্ত। সম্রাট আকবরের সময় সিন্ধুদেশ মোগল রাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৪০ অব্দে পারস্যরাজ নাদির শা হিন্দুস্থান আক্রমণান্তর সিন্ধু নদীর পশ্চিমের কতক প্রদেশ দিল্লী সম্রাটের প্রসাদে আত্মসাৎ করেন। ইহার কতিপয় বৎসর পবে মহারাষ্ট্র-বিজেতা আহ্মদ খাঁ দুরাণী সিন্ধুদেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন কবেন। তাঁহার সময় হইতে কতককাল আফগান আমীরদের নাম সিন্ধু ইতিহাসে মিশ্রিত দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের অধিকার নামমাত্র। যিনি যখন পারিতেন কর আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। সেও অধিক কালের জন্য নয় — ব্রিটিশ ধূমকেতু অকস্মাৎ উদয় হইয়া সকলি উলটপালট করিয়া দিল।

ইতিহাস

ইংরাজ শাসন আরম্ভ হইবার পূর্বে যে দুই রাজবংশ সিংহাসন অধিকার করেন তাহা কাল্‌হোরা ও তালপুর। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাল্‌হোরা রাজবংশের পত্তন ও প্রায় অশীতি বৎসর ঐ বংশের রাজত্বকাল। ঐ বংশীয় রাজা গোলাম শা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও সুশাসনে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে (১৭৬৫) হাইদ্রাবাদ দুর্গ প্রতিষ্ঠা হয়। তার ছয় বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু। লোকের বিশ্বাস এই যে গোলাম শা তাঁহার প্রাসাদ নির্মাণ কালে এক ফকিরের কুটীর ভূমিসাৎ করিতে আদেশ করেন সেই ফকিরের অভিশাপে তাঁহার অকালমৃত্যু হয়। আবদুল নবী কাল্‌হোরা বংশের শেষ রাজা — বলোচ বিদ্রোহে তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হয়।

কালহোরা

১৭৮০ কিম্বা তার দুই তিন বৎসর পরে তালপুর বংশীয় বলোচ আমীরগণ কাল্‌হোরাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইংরাজদের দেশাধিকার কালে এই আমীরদের আধিপত্য ছিল। তালপুর বংশের মূলপুরুষ ফতে আলি খাঁ, তিনি বংশের গৌরব বর্ধন ও কলহ বিদ্রোহ নিবারণ মানসে স্বীয় ভ্রাতৃগণ

তালপুর

সাথে একত্রে রাজ্য শাসনের সূত্রপাত করেন। তাঁহারা চার ভাইয়ে মিলিয়া একমতে একচিত্তে এমনি সুশৃঙ্খলা পূর্বক কার্য করিতেন যে 'চার ইয়ার' বলিয়া তাঁহাদের নাম রাষ্ট্র। ক্রমে তালপুর বংশের স্বতন্ত্র তিন শাখার সৃষ্টি হইল — হাইদ্রাবাদ, মীরপুর, খয়েরপুর তিন আমীরের তিন রাজ্য বিভাগ। নিয়ম এই যে আমীরেরা মিলিয়াজুলিয়া রাজকার্য করিবেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যিনি বড়, তিনি কর্তা — তাঁহার পদবী 'রাইস্' — রাইসের মান মর্যাদাও বিশিষ্ট রূপ।

আফগান যুদ্ধাবসানের পর লর্ড এলেনবারা (Lord Ellenborough) সিমলা হইতে আজ্ঞাপত্র প্রচার করিলেন যে ভারতীয় গবর্নমেন্ট প্রকৃতি-নির্দিষ্ট রাজ্য সীমায় সন্তুষ্ট থাকিয়া এইক্ষণ অবধি শান্তি স্থাপন ও রাজ্য রক্ষণে একান্ত যত্নবান্ হইবেন। এই অভিপ্রায়ে "আসিয়ার শান্তি" চিহ্নিত এক মেডাল বাহির হইল। কিন্তু ফলে ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটিল। ইহার ছয় মাসের মধ্যেই সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত বলিয়া দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র জারী হইল। পূর্বোল্লিখিত প্রকারে সিন্ধুদেশ তখন তিন রাজ্যে বিভক্ত — উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য সিন্ধু — প্রত্যেক রাজ্যের এক এক জন আমীর অধিস্বামী।

'আসিয়ার শান্তি

১৮৩৯ অব্দে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট ও আমীরদের মধ্যে এক সন্ধি বন্ধন হয় তাহা হইতেই দেশের ভাবী দুর্গতির সূত্রপাত। এই সন্ধিসূত্রে ইংরাজেরা সিন্ধুদেশে প্রবেশ লাভ করেন। এই সন্ধি যদিও আমীরদের মনঃপূত হয় নাই কিন্তু কি করেন দায়ে পড়িয়া ব্রিটিশ যুগে গ্রীবা অবনত করিতে হইল। আফগান যুদ্ধের পর তিন বৎসর কাল আমীরদের আচরণে দোষ ধরিবার কিছুই ছিল না। দেশের মধ্য হইতে ব্রিটিশ সৈন্য চলাচলের পথ উন্মুক্ত রাখা — জাহাজে খোরাক যোগান —, কিছুতেই তাঁহাদের কোন ত্রুটি হয় নাই। কাবুল সৈন্য ছারখার হইবার পরেও তাঁহারা বাহন খোরাক প্রভৃতি যোগাইতে সাধ্যমত ত্রুটি করেন নাই। General Nott — জেনেরল নট কাবুল প্রয়াণ কালে সিন্ধু হইতে তিন সহস্র উটের সাহায্য লাভ করেন। ইহা সত্ত্বেও কোন কোন আমীর ইংরাজদের পরাজয় দেখিয়া দাঁত দেখাইতে সাহস করিয়াছিলেন এই এক ছুতা ধরিয়া তখনকার এজেন্ট Major Outram আমীরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সন্ধিপত্রের পরিবর্তন প্রার্থনা করেন। লর্ড এলেনবরো আদেশ করিলেন ব্রিটিশরাজের বিপত্তির চিহ্ন দৃষ্টে যদি কোন আমীর তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে তাহার যথোচিত শাস্তি দেওয়া হয়।

১৮৩৯ অব্দের সন্ধি

৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৪২-এ সর্ চার্লস্ নেপিয়র সর্বেসর্বা হর্তাকর্তা বিধাতা হইয়া সিন্ধুদেশে প্রেরিত হন। রাজদ্রোহ অভিযোগ বিচারের ভার তাঁহার হস্তে ও তাঁহার প্রতি আদেশ এই যে দোষের স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত আমীরদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা হয়। সে যাহা হউক তিনি বিচারে তাহারদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন ও বলিলেন ১৮৩৯-এর সন্ধি অনুসারে কার্য করা হয় নাই। আমীরগণ সন্ধিভঙ্গ অপরাধে অপরাধী।

Sir Charles Napier

পূর্বকার সন্ধিপত্রের পরিবর্তে এক নূতন সন্ধিলেখ্য প্রস্তুত হইবার কথা। মেজর আউট্রাম তাহার এক নমুনা তৈয়ার করিয়া লর্ড এলেনবরোর কাছে পাঠান। তাহা গবর্নর জেনেরেলের নিকট হইতে ১২ই নভেম্বর নেপিয়রের হস্তে আসে। তখন আউট্রাম দেখিতে পাইলেন তাহা ঠিক হয় নাই — তাহার কতকগুলি কঠোর অনুশাসন সংশোধন করা আবশ্যক নতুবা বেচারা আমীরদের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করা হয়। তিনি এই বিষয়ে নেপিয়র সাহেবের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গবর্নর জেনেরেলের অনুমতি প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করিলেন। সেনাপতি এই নমুনাপত্র প্রায় দেড়মাস কাল আপনার কাছে রাখিয়া দেন ও পরিশেষে যখন ভ্রম সংশোধনের অনুজ্ঞা আইসে তখন যতদূর অনিষ্ট হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার আর কোন ফল হইল না। সন্ধিপত্রে আমীরদের নিকট হইতে যেসকল ভূমিসম্পত্তি কাড়িয়া লইবার কথা ছিল, সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে সেসকল কবলীকৃত হইল — আর বিলম্ব সহিল না। ওদিকে যে বলোচ সরদারগণ ঐ ভূমিসম্পত্তির অধিকারী তাহাদের মধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার পড়িয়া গেল।

Major Outram

এই সকল দুর্ঘটনার মূল আমীরদের গৃহবিচ্ছেদ। আমীরদের রাইস তখন ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধ মীর রোস্তম। রাজা প্রজা সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। তাঁহার কনিষ্ঠ আলি-মোরাদ ইংরাজদের আগমনে নিজ কাজ গোছাইবার অবসর পাইলেন ও স্বার্থসাধন মানসে ব্রিটিশ সেনাপতির তোষামোদ আরম্ভ করিলেন। সেনাপতিকে মীর রোস্তমের বিরুদ্ধে চটাইবার মতলব, আর চেষ্টা এই যে রোস্তম কোন বিদ্রোহের কাজে ধরা পড়েন। আলি-মোরাদের প্ররোচনায় সেনাপতি মীর রোস্তমকে কটুকাটব্যপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন ও যখন মীর নেপিয়রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন তাহা অগ্রাহ্য হইল। ইত্যবসরে আলি-মোরাদ তাঁহার ভ্রাতার স্বাক্ষরিত এক পত্র সেনাপতির নিকট প্রেরণ করেন তাহাতে জানান হয় যেন রোস্তম ইচ্ছাপূর্বক তাঁহার পাগড়ী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সৈন্যসামন্ত দেশ দুর্গ সকলি সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত। নেপিয়র বলিয়া পাঠাইলেন মীর রোস্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবশেষে যথাকর্তব্য বিধান করিবেন। এরূপ হইলে আলি-মোরাদের সব জুয়াচুরি ধরা পড়ে — এই সাক্ষাৎকার নিবারণ অভিপ্রায়ে তিনি মধ্যরাত্রে তাঁহার ভ্রাতাকে উঠাইয়া বলিলেন, "এই বেলা পালাও নহিলে জেনেরেল সাহেব সকালে গ্রেফতার করিতে আসিবেন।" বৃদ্ধ মীর শশব্যস্ত হইয়া অরণ্যে পলায়ন করেন। অমনি নেপিয়র ঘোষণা করিয়া দিলেন যে মীর রোস্তম ব্রিটিশরাজের অপমান করিয়াছেন। আলি মোরাদকে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। মীর রোস্তমের ঘোর বিপদ উপস্থিত। তিনি নেপিয়রের নিকট তাড়াতাড়ি আপন মন্ত্রীকে এই বলিয়া পাঠান যে আলি-মোরাদ তাঁহাকে কয়েদ ও জোর জবরদস্তি করিয়া পত্র স্বাক্ষর করিয়া লন — তাঁহারি প্ররোচনায় তিনি পলায়ন করিয়াছেন। নেপিয়র ইহার এক তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ণ উত্তর প্রেরণ করেন এবং অরণ্যে গিয়াও ব্রিটিশ হস্ত এড়াইবার উপায় নাই

গৃহবিচ্ছেদ

মীর রোস্তমের পলায়ন

ইহা জানাইয়া দিবার জন্য একদল সৈন্য পলাতক মীরের পশ্চাৎ ইমামগড়ের কেল্লার উপর হল্লা করিতে পাঠান।

ইমামগড় আক্রমণ

ইমামগড়ের কেল্লা নেপিয়রের মতে সিন্ধুর Gibralter। তাহা দখল করিতে পারিলে ব্রিটিশ গৌরবের সীমা থাকিবে না এই ভাবিয়া তিনি দুর্গ আক্রমণ করিয়া বারুদে উড়াইয়া দিয়া ফিরিয়া আসেন। এই সাহসের কার্যের জন্য Duke of Wellington পর্যন্ত নেপিয়রের যুদ্ধ-কৌশল প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু মীর মহম্মদ যিনি দুর্গের অধিপতি তিনি যখন ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের প্রতি কোন অপরাধ করেন নাই তখন তাঁহার উপর এ অত্যাচার আমাদের সহজ বুদ্ধিতে প্রশংসার যোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হয় না।

মীর রোস্তমকে রাজ্যচ্যুত ও আমীরদের ভূমিসম্পত্তি হস্তগত করিয়া সন্ধি স্বাক্ষর উদ্দেশে ব্রিটিশ সেনাপতি আমীরদিগকে খয়েরপুরে মিলিত হইতে আদেশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ আদেশ মতে উপস্থিত না হওয়াতে হাইদ্রাবাদ সমিতির স্থান নির্দিষ্ট হইল। তাহার দুদিন পরেই দক্ষিণ সিন্ধুর আমীরদের উকীলেরা সেনাপতি-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সন্ধি স্বীকার করিবার ইচ্ছা জানাইল। তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিলে সমস্ত গোল মিটিয়া যায় কিন্তু নেপিয়র বলিলেন তা হইবে না — হাইদ্রাবাদে ফিরিয়া যাও। পরস্পর-বিরোধী দুই দলের একত্র সম্মিলনে যে গোলযোগ বাধিবার আশঙ্কা তাহাই ফলে দাঁড়াইল।

হাইদ্রাবাদ সমিতি

হাইদ্রাবাদ সমিতিতে আমীরগণ সম্মিলিত। তাঁহারা আপনাদিগকে নিরপরাধী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন — যেসকল পত্রে তাঁহাদের দোষ সপ্রমাণ বলিয়া ধার্য হয় তাহা দেখিতে চাহিলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী তাহারা নব সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন কিন্তু মেজর আউট্রামকে স্পষ্ট বলিলেন যে ব্রিটিশদের আচরণে, বিশেষত মীর রোস্তমের প্রতি তাহাদের অত্যাচারে, বলোচ সৈন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তাহারা যদি হঠাৎ কোন বিদ্রোহাচরণ করে তজ্জন্য তাঁহারা দায়ী নন। এই অবসরে সেনাপতি নেপিয়র স্বীয় সৈন্য-সামন্ত লইয়া অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে আরো গোল বধিবার উপক্রম হইল। সন্ধি স্বাক্ষরের পর আউট্রাম যখন কেল্লা হইতে বাহির হয়েন তখন লোকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্রিটিশদের উপর ধিক্কার ও গালিবর্ষণ আরম্ভ করিল। আমীরেরা অনেক কষ্টে মেজরকে বাটী পৌঁছিয়া না দিলে তাঁহার প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইত। ইহার তিন দিন পরে একদল বলোচ সৈন্য রেসিডেন্সি আক্রমণ করে — মেজর অসামান্য সাহস ও পরাক্রমের সহিত প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়া নদীতে সেনা-রক্ষিত স্টীমারে উঠিয়া নিস্তার পান।

এখন যুদ্ধের সমূহ কারণ উপস্থিত — এস্পার কি ওস্পার যুদ্ধে যাহা হয় স্থির হইবে। নেপিয়র রাজধানীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া বলোচ সৈন্য দলেবলে

আসিতে আরম্ভ করিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাহারা মিয়ানি ক্ষেত্র অধিকার করিয়া দাঁড়াইল — তাহাদের সংখ্যা ২০,০০০। নেপিয়র ২৭০০ সেনা লইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। বলোচেরা বীরোচিত বিক্রম ও সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল কিন্তু ইউরোপীয়দের শিক্ষিত বল ও মারাত্মক শস্ত্রের বিরুদ্ধে তাহাদের বলবিক্রম কতক্ষণ চলিবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা শেষ হইল — বলোচেরা তাহাদের তাঁবু অস্ত্রশস্ত্র ব্রিটিশদের হস্তে ফেলিয়া সরিয়া পড়িল। চার্লস নেপিয়র সৈন্যদের জয়ধ্বনির মধ্যে দিয়া হাইদ্রাবাদ দুর্গ প্রবেশপূর্বক আমীরদের রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া সৈন্যদের মধ্যে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। ইহার পর ডব্বায় আর এক যুদ্ধ হয় — স্বাধীনতা রক্ষার সেই শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। আমীরেরা বন্দীকৃত ও নির্বাসিত হইয়া কষ্টসৃষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন — সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ রাজ্যে মিলিত হইল।

মিয়ানির যুদ্ধ

এই তো ইংরাজদের সিন্ধু বিজয় কাহিনী। ইহাতে কি দেখা যায়? ইংরাজ রাজ্যলাভের মূলে যে ঘোর অন্যায় অত্যাচার তাহা কি ইহাতে প্রকাশ পায় না? সর্ চার্লস নেপিয়র পূর্ব হইতেই দেশ দখল করিবার আশয়ে কার্যারম্ভ করেন — আমীবদের সঙ্গে তাঁর যে বিবাদ তাহা মেষদলের সহিত ব্যাঘ্রের বিবাদের অনুরূপ। তাঁহার নিজ হস্তাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন —

ইংবাজ রাজনীতি

"আমীরদের দমন করিবার জন্য আমরা কেবল একটা ছুতো চাই। যে রাজ্য দুর্বল সে শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক বলবানের গ্রাসে পতিত হইবেই হইবে। আমাদের সিন্ধুদেশ অধিকার যদিও অন্যায় কিন্তু এ অন্যায়েও বিস্তর লাভ ও উপকার — এ যে পেজমি (a humane piece of rascality)।"

তাঁহার নীতিশাস্ত্রে সৎকার্য সিদ্ধির নিমিত্তে অসৎ উপায়ে যোজনা দোষের নহে।*

Marshman's History of India chapter 13, Burton's Sindh.

সিন্ধু কাহিনী

চতুর্থ ভাগ

সিন্ধুদেশ (গ্রীকদের সিন্দমালা) প্রাচীনকাল হইতেই তিনভাগে বিভক্ত; দক্ষিণ উত্তর ও মধ্য সিন্ধু। লার, অথবা দক্ষিণ সিন্ধু হাইদ্রাবাদের দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। করাচী ও ঠাট্টা এই অঞ্চলের দুই প্রধান শহর। পূর্বকালে করাচী মক্রান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল — ঐ বন্দর খেলাত-সরদারের নিকট হইতে তালপুর আমীরেরা রাজ্যসাৎ করেন ও এক্ষণে ইহা ইংরাজ সিন্ধু রাজ্যের রাজধানী। সাগর সান্নিধ্য, উত্তম আবহাওয়া ও বাণিজ্য ব্যবসার সৌকর্যবশতঃ উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে।

সিন্ধু ভূগোল

ইহার উত্তর ও দক্ষিণ যেখানে মিষ্ট জল পাওয়া যায় সেখানে কতকগুলি শাকসবজী ফলের বাগান দৃষ্ট হয় নতুবা এ অঞ্চল সাধারণতঃ লবণাক্ত মরুভূমি। করাচীর তিন ক্রোশ উত্তরে মগরপীর নামক এক উপত্যকা আছে তাহা দর্শনীয়। ঐস্থানে কুঞ্জবন পরিবৃত একটি মন্দির ও মন্দিরের কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমন্বিত এক উষ্ণ জলাশয়, তাহাতে বড় বড় কুম্ভীর (মগর) কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় মগ্ন দেখিতে পাইবে। খর্জুর বন-নিঃসৃত গন্ধকাক্ত উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে ঐ জলাশয়ের উৎপত্তি ও উহাতে স্নান মহোপকারী বলিয়া গণিত। আমি ঐ জলে গিয়া স্নান করিলাম। এমন গরম যে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলাম না। মগরপীর এখানকার তীর্থের মধ্যে গণ্য। কাহারও কোন বাসনা পূর্ণ করিতে হইলে সে মগরপীরে গিয়া ছাগাদি উপহার দানে কুম্ভীররাজের পরিতোষ সাধন করে।

মগবপীর

এ অঞ্চলের অপর একটি তীর্থস্থান হিঙ্গুলাজ। ইহা হিন্দু তীর্থ। করাচীর পশ্চিম সোনমিয়ানী বন্দরের অনতিদূরে এই তীর্থ স্থাপিত। হিঙ্গুলা দেবী কালীর নামবিশেষ। হালা পর্বতশ্রেণীর ধার দিয়া ইহার রাস্তা গিয়াছে ও অঘোর নদ পার হইয়া যাইতে হয়। এই প্রদেশ রাম কাহিনীতে পূর্ণ। নদীর ক্রোড়ে কতকগুলি তরল কর্দম কুণ্ড আছে তাহা "রামচন্দ্রের কূপ" বলিয়া বিদিত। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র হিঙ্গুলাজ তীর্থযাত্রায় বাহির হন। প্রথমে তিনি সসৈন্যে গমনোদ্যোগ করাতে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন, পরে সন্ন্যাসীবেশে তথায় প্রবেশ লাভ করেন। যে স্থান হইতে তিনি যাত্রারম্ভ করেন তাহার নাম রামবাগ। যাত্রীরা রামবাগে সম্মিলিত হয় ও যে পথ দিয়া রামচন্দ্র যাত্রা করিয়াছিলেন — যেখানে প্রথমে তাঁহার সৈন্যের পরাভব হইয়াছিল সেই সেই স্থান দর্শনকরতঃ তাহারা পুরোহিত সঙ্গে গমন করে। দ্বারিকা তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া হিঙ্গুলাজ — হিঙ্গুলাজ হইতে লাহোরের জ্বালামুখী — জ্বালামুখীর পর কুরুক্ষেত্র — কুরুক্ষেত্র হইতে হরিদ্বার — হরিদ্বার হইতে গয়া, কাশী — পরে মহানদী (জগন্নাথক্ষেত্র) গোদাবরী (নাসিক পঞ্চবটী) প্রভৃতি দর্শনপূর্বক সেতুবন্ধ রামেশ্বর পৌঁছিতে পারিলে ভারতের তীর্থমণ্ডল একপ্রকার প্রদক্ষিণ করা হইল।

হিঙ্গুলাজ

গ্রীক ইতিহাসে সেকন্দরের ভারত যাত্রা উপলক্ষে 'রামবেকিয়া' নামক স্থানের উল্লেখ আছে, কনিংহাম সাহেব তাহা রামবাগের অপভ্রংশ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সেই ২,০০০ বৎসর পূর্বেও এদেশে রামনাম মাহাত্ম্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

রামবেকিয়া

ঠাট্টা মুসলমান আমলে দক্ষিণ সিন্ধুর প্রধান শহর ছিল। এক সময়ে সিন্ধুনদী ইহার প্রাচীর দিয়া বহিয়া যাইত ও বাণিজ্য এক্ষণে করাচীর ভোগে আসিতেছে তাহা ইহারই দ্বারে আনিয়া ঢালিয়া দিত। এইক্ষণে নদী প্রায় তিন মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। ১৫২২ অব্দে এই নগর নির্মিত হয় ও ১৭৪২-এ যখন নাদির শা তথায় পদার্পণ করেন তখন সেখানে ৪০,০০০ ঘর তাঁতী ২০,০০০ অপর শিল্পী ও ৬০,০০০ বণিক সৌদাগর বাস করে এইরূপ বর্ণনা আছে।

ঠাট্টা

হাইদ্রাবাদ ঠাট্টার উত্তরাধিকারী মধ্যসিন্ধুর রাজধানী। ইহা প্রাচীন হিন্দু নগর নীরণকোটের স্থান অধিকার করিয়া আছে ও ১৭৫৮ অব্দে গোলাম সা কাল্‌হোরা ইহার পত্তন করেন। হাইদ্রাবাদ তালপুর আমীরদের প্রিয় নিকেতন ছিল — নদী হইতে তাঁহাদের শীকার স্থানে যাতায়াতের সুবিধা তাহার এক কারণ; দুর্গের মধ্যে তাঁহাদের যেসকল সুসজ্জিত বাসগৃহ ছিল তাহা এইক্ষণে প্রায় সকলি বিলুপ্ত হইয়াছে — মীর নসীর খাঁর প্রাসাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে। নিজ শহরে কতকগুলি মাটির ঘরবাড়ী, — দেখিবার মত ইমারত অট্টালিকা কিছুই নাই। দুর্গই ইহার মধ্যে শোভন দৃশ্য, সিন্ধু শাখা ফুলেলী তাহার প্রাচীর পাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। শহরের প্রান্তে কাল্‌হোরা ও তালপুর আমীরদের কতকগুলি সমাধি মন্দির আছে তাহা অতীব মনোহর। নদী শহর হইতে কতক মাইল দূর। সিন্ধুতীর গিধু বন্দর পর্যন্ত দোধারী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে এক সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা গিয়াছে তাহাই হাইদ্রাবাদের রাজপথ। এই শহর রেশম ও জরির কাপড় — সূক্ষ্ম মিনার কাজ ও অন্য প্রকার কারুকার্যের জন্য সুবিখ্যাত।

হাইদ্রাবাদ

উত্তর সিন্ধু দক্ষিণ ভাগ হইতে অনেক তফাৎ। হাইদ্রাবাদের উত্তরে আর সমুদ্রবায়ু সেবন করা যায় না; গ্রীষ্মকালে বায়ু বন্ধ হইয়া ঐ অঞ্চল উত্তাপকুণ্ডে পরিণত হয়। ৮।৯ মাসব্যাপী গ্রীষ্মকাল — বর্ষা নাই বলিলেই হয় — কখনও একটু মেঘ কিম্বা এক পসলা বৃষ্টি এইমাত্র। শীতকাল আবার তেমনি ঠান্ডা। মাঝে মাঝে মরুদেশের প্রবল বালুময় ঝড় উঠিয়া প্রকৃতিরাজ্য তোলপাড় করিয়া তোলে। সিন্ধু নদী যেখান দিয়া গিয়াছে তাহার আশপাশের ভূমি ফলবতী — নদী হইতে যতদূরে যাওয়া যায় ততই বালুময় মরুভূমি স্বীয় রুদ্রমূর্তি প্রকাশ করিতে থাকে।

উত্তর সিন্ধু

উত্তর সিন্ধুতে কতকগুলি নব্য ও প্রাচীন প্রখ্যাত শহর আছে। নদীর পশ্চিমে সেওয়ান — আরবদিগের সেউইস্তান। নগরের আশপাশে অনেকগুলি সুন্দর মসজিদ ও গোরস্থান ও

নগরের মধ্যে লাল সা বাজ নামক মুসলমান পীরের এক সুচারু মসজিদ বিরাজিত। লাল সা বাজ খোরাসান হইতে সমাগত সিন্ধুর একজন লোকমান্য পীর, ১২৭৪-এ সেওয়ানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধি মন্দির মুসলমানদের এক প্রধান তীর্থক্ষেত্র, বহুদূর হইতে যাত্রীরা তথায় সমাগত হয়। প্রতিবর্ষে এক একটি তরুণী কন্যকা এই গোরের সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হয় — এই বিবাহ নাচ বাদ্য ঘোরঘটা করিয়া অতি সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হইয়া থাকে। অনেক ফকির লাল-সা বাজের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত। এই পন্থী ফকিরের দীক্ষা-বিধি কৌতূহলজনক। শিষ্যের শিরোমুণ্ডন ও মুখের ভ্রূ শ্মশ্রু সমুদয় কেশ মোচন হইলে গুরুজী তাহার মুখে কালি মাখাইয়া গলে একখণ্ড রজ্জু সংলগ্ন করিয়া সম্মুখে এক দর্পণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করেন "কেমন রূপ দেখ্‌ছ বাবা!" সে উত্তর করে "সুন্দর দেখ্‌ছি!" অনন্তর তাহার স্কন্ধে তপ্ত লৌহের দাগ দেওয়া হয় ও অঙ্গে ভস্ম লেপন হইয়া দীক্ষাকার্য সম্পন্ন হয় — ও সে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ফকির হইয়া বাহির হয়। সেওয়ানে একটি পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। তাহা সেকন্দর নির্মিত দুর্গ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

সেওয়ান

সেওয়ান ছাড়াইয়া লাড়খানা — ইহা জলময় শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন উর্বরা প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত। সিন্ধুর পরপার খয়েরপুর অবশিষ্ট তালপুর রাজ্যের রাজধানী। মীর আলি মোরাদ তাহার অধিপতি। খয়েরপুরের উত্তরে সক্কর বক্কর ও রোঢ়ী মুসলমান আমলের তিন প্রখ্যাত শহর। বক্কর সিন্ধুর ক্রোড়ে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ — পূর্বে তাহা দেশের প্রবেশদ্বার বলিয়া গণ্য হইত। এই প্রদেশে মুসলমানদের বিদ্যালয় ও তাহাদের পীর পণ্ডিতদিগের বসতি ছিল, তাই অনেকানেক গোর মস্‌জিদ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। সক্কর এইক্ষণকার ইংরাজ সেনালয় এক বড় ষ্টেশন।

খয়েরপুর

সক্করের উত্তর পশ্চিমে শিকারপুর, ইহা উত্তর সিন্ধুর জজ কালেক্টরের প্রধান মহল। এখনকার সৌদাগরেরা বাণিজ্যকার্যে পরিপক্ক — সমরকন্দ প্রভৃতি দূর দূর দেশে তাহাদের কারবার ও গতিবিধি।

শিকারপুর

সিন্ধু নদীই সিন্ধুদেশের সর্বস্ব। ইহা স্বীয় জন্মভূমি তিব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া মধ্যে মধ্যে শাখাপ্রশাখা বিস্তারপূর্বক প্রধান প্রধান নগরের মধ্য দিয়া উত্তর-দক্ষিণ প্রায় ১৭০০ মাইল বহিয়া সহস্রধারে সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইতেছে। ইহা বসুন্ধরার ফল শস্য প্রসবিনী — চলাচলের মার্গ পরিরক্ষিণী — বাণিজ্য সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকারিণী অশেষ গুণধারিণী সিন্ধুজননী। উত্তরের বর্ষাবারি ধারা প্রবাহে ও হিমাচলের বরফ গলিয়া এই নদীতে যে পূর প্রসূত হয় তাহা মার্চ মাস হইতে আরম্ভ — অগষ্টে পূর্ণতা প্রাপ্ত ও সেপ্টম্বর হইতে হ্রাসোন্মুখ হয়। এই কয়েক মাস নদী ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিয়া মহাপূরে

সিন্ধু নদী

ফুলিয়া উঠে ও স্রোতের বেগে বালুচর ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই পূর কতকটা বর্ষার অভাব পূরণ করে। সিন্ধু নদী না থাকিলে সমুদয় দেশ লবণাক্ত মরুভূমিতে পরিণত হইত।

সিন্ধুদেশে অধিকাংশই মুসলমান — অন্যত্রে হিন্দু সম্বন্ধে যেমন মুসলমান, এখানে মুসলমান সম্বন্ধে হিন্দুদের সমাজিক অবস্থা তদ্রূপ। মুসলমানদের মধ্যে কতক আদিম নিবাসী আসল সিন্ধী — কতক বা আফগান বলোচ প্রভৃতি বিদেশী মুসলমান।

বাসন্দা পাঠান

আফগান বা পাঠান হাইদ্রাবাদ ও উত্তর সিন্ধুতে সচরাচর দৃষ্ট হয়। ইহাদের অনেকে বংশাদি ক্রমে সিন্ধুতে আসিয়া বাস করিতেছে ও অগাধ ভূমিসম্পত্তির অধিকারী। দেখিতে ইহারা বলিষ্ঠ সুগঠন ও সুশ্রী — আসল সিন্ধী হইতে ইহাদের পার্থক্য সহজেই প্রতীয়মান হয়।

কালহোরা রাজ্যের পত্তনকালে সিন্ধুতে বলোচবসতি আদবেই ছিল না। কাহেলারা বংশধর মীর মহম্মদ অনেক লোভ দেখাইয়া দুইজন বলোচ সর্দারকে দেশে

বলোচ

ডাকিয়া আনেন — সেই যত অনর্থের মূল। এই সময় হইতে বলোচগণ তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলপতি সঙ্গে দলেবলে সমুপাগত হইয়া সিন্ধুর ভিন্ন ভিন্ন উর্বরা প্রদেশ অধিকার করিয়া বসে। অনতিকালের মধ্যে প্রজা রাজা অপেক্ষাও প্রতাপশালী হইয়া উঠিল ও বলোচ সর্দার মীর ফতে আলি খাঁ তালপুর কালহোরাদের রাজ্যচ্যুত করিয়া বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করিলেন। বলোচেরা সিন্ধীদের অপেক্ষা দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও গৌরবর্ণ। শিকার ও যুদ্ধে তাহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ। মীরদের আমলে বলোচদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। পরে Sir Charles Napier যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন তাঁহার কঠোর শাসনে ঐ জাতি অল্পকালের মধ্যে বশীকৃত হয়। বশীকরণ মন্ত্রের তিন অঙ্গ — প্রথম, তাহাদের অস্ত্রহরণ, দ্বিতীয়, তাহাদের অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান, তৃতীয়, তাহাদের বড় লোকদের হাত হইতে শাসনক্ষমতা সমস্ত কাড়িয়া লওয়া। এইরূপে তাহাদিগকে নিরস্ত্র, নির্বীজ ও খর্বাধিকার করিয়া শীঘ্রই তাহাদের বিষদন্ত ভাঙিয়া ফেলেন।

সিন্ধুতে অনেক কাফ্রিরও বসতি আছে। আমীরদের সময় বৎসরে বৎসরে আফ্রিকা হইতে ৬০০।৭০০ কাফ্রি দাসদাসীর আমদানী হইত। তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন

কাফ্রি

দিয়া মুটে মজুর সইস্ চাকর ছুতার কামার এই সকল কাজে সচরাচর নিযুক্ত করা হইত — কখন কখন নিজ কর্মগুণে তাহারা বিলক্ষণ কর্তৃত্বপদেও আরোহণ করিত। সিন্ধী মুসলমান ও হাবসী স্ত্রীর বিবাহে সিন্ধুদেশে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়াছে।

সিন্ধুদেশে বহু সংখ্যক মুসলমান সুফী পন্থী। প্রচলিত মুসলমান ধর্মের সহিত সুফী ধর্মের অনেক প্রভেদ, এমনকি গোঁড়া মুসলমানেরা সুফীকে সধর্মী বলিয়া স্বীকার

সুফী

করিতে চাহে না। সুরস মধুর কবিত্ব-রস যোগে, কতক বা হিন্দু ধর্মের সংস্রবে

অথবা অন্য কারণে কঠোর মহম্মদী ধর্ম স্থানে স্থানে ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সুফী ধর্ম তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এ ধর্মের আকর স্থান হিন্দুস্থান বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। তাঁহারা বলে মুসলমানদের আক্রমণকালে যবন ধর্মগ্রাহী এদেশের জনৈক হিন্দু ঋষি কর্তৃক এই মত প্রবর্তিত হয়। বস্তুতঃও ইহার সহিত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের কতক সাদৃশ্য দেখা যায়। সুফীদের ঋজায়ৎ প্রণালী হিন্দু যোগ-শাস্ত্রের প্রকারান্তর। এই যোগ বলে জীবাত্মা ঈদৃশ উন্নত অবস্থায় উপনীত হয় যে সে স্বৈর ভাবে যথা ইচ্ছা বিচরণ করিতে পারে — শত্রু দমন, পীড়া প্রশমন, প্রেম প্রজনন, ব্যোম সঞ্চরণ প্রভৃতি বিচিত্র শক্তি উপার্জন করে — ভূতপ্রেত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত আদি নাই অন্ত নাই — ইহা পরমাত্মার প্রতিকৃতি — পরমাত্মাই উহার চরম গতি। সাদী হাফেজ প্রভৃতি বড় বড় পারস্য কবি এই ধর্মের অনুরাগী ছিলেন তাহাতেই অনুমান হয় ইহাতে অবশ্য কিছু সার থাকিবে। এ ধর্ম প্রেমের ধর্ম — সৌন্দর্য্যের ধর্ম, ভাবুক কবি ইহার পুরোহিত — আধ্যাত্মিক মন্দিরা নৃত্য গীত ইহার অনুষ্ঠানোপকরণ — সুমন্দ বায়ু-সেবিত ফুটন্ত গোলাব সুবাসিত, সুকণ্ঠ বিহগ-গীত-নিনাদিত সুরম্য উদ্যান কানন ইহার ভজনালয়। হাফেজ যেমন পারস্য দেশের সুফী কবি সিন্ধুর তেমনি সা ভেতাই। হাফেজের চমৎকার কল্পনা-প্রসার, ঈশ্বরভক্তি, বিশ্বব্যাপী বিমল প্রেম কোন্ সহৃদয় পাঠককে মোহিত না করে? ভাবুক তাঁহার প্রত্যেক বাক্যে গূঢ় অর্থ দেখিতে পান — ইন্দ্রিয়-সুখকর সামান্য পদার্থসকল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এক অপূর্ব রাগে রঞ্জিত হয়। সিন্ধুদেশে সা ভেতাইয়ের কবিতাও লোকের তদ্রূপ হৃদয়গ্রাহী।

এ দেশে সুফী সম্প্রদায়ের দুই শাখা — জলালী ও জমালী। জলালীদের কতকটা শাক্ত ধরণ — তাহারা অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পান ইত্যাদি দুর্ব্যসন পরবশ, বল্লভপন্থী বৈষ্ণবদের ন্যায় পুষ্টিমার্গ বিহারী। জমালীদের অন্য ভাব। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, গুরুভক্তি, উপোষণ, ভজন পূজন, ধ্যানধারণ ইত্যাদি সাধনে তাহারা অনুরত। তাহাদের যোগ শিক্ষার নাম সুগল — তাহার নানা প্রকরণ আছে। ইহাতে পরিপক হইলে পর সাধক উচ্চতর তপশ্চর্যায় নিযুক্ত হন। এইরূপ সাধনাকে "হুজুর" বলে কারণ উহাতে সর্বদাই হাজির অর্থাৎ নিবিষ্টচিত্ত থাকিতে হয়। "হুজুর" ধ্যানের অনেকগুলি সোপান। গুরু পীর মহাপুরুষদের চিন্তা ধ্যান প্রথম সোপান। তাহার উপরের সোপান মহম্মদে মিলন — জ্ঞান ভাব কার্যে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ রূপে মিলিত হওয়া চাই। এই সোপান পরম্পরা হইতে অবশেষে ঈশ্বরে মগ্ন হওয়া — জীব ব্রহ্মে লয়ের ভাব, যে অবস্থায় সুফী "আত্ম ক্রীড় আত্মরতি" ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় "সোহহং" (আনা'ল্ হক্) জ্ঞানের অধিকারী হয়েন।

হিন্দু

হিন্দুরা সামান্যতঃ ব্রাহ্মণ বণিক ও শূদ্র এই তিন বর্ণে বিভক্ত। ব্রাহ্মণদের পোকর্ণ ও সারস্বত দুই শ্রেণী। পোকর্ণ ব্রাহ্মণেরা মহারাজ-ভক্ত বৈষ্ণবপন্থী। ইহারা ভাটিয়া বণিকদের পুরোহিত।

সারস্বত পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণ প্রায় ২০০ বৎসর হইতে সিন্ধতে আসিয়া বাস করিতেছেন। আচার ব্যবহার কুলশীলে ইঁহারা বোম্বায়ের সেনই ব্রাহ্মণদের সমতুল্য, ইঁহাদের মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে।

বণিক

বণিক জাতির মধ্যে লোহানা ও ভাটিয়া এই দুই শাখা অগ্রগণ্য। মুলতানের লোহানপুর লোহানা বণিকদিগের মূল নিবাস। ঐ স্থান হইতেই তাহারা জাতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা বলোচস্থান আফগানস্থান প্রভৃতি দূরদেশে বাণিজ্য-ব্যবসা সূত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ম্লেচ্ছ দেশে গমন করিলে লোহানা জাতিভ্রষ্ট হয় না। তাহাদের জাতভাইদের অন্যান্য হিন্দুদের তুলনায় এই সকল বিষয়ে অধিকতর উদার দৃষ্টি বলিয়া বোধ হয়।

আমীল *

লোহানা ব্যবসা অনুসারে আমীল ও বণিক প্রধানতঃ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বণিকেরা শ্মশ্রু-মুণ্ডন, শিখারক্ষণ ও হিন্দুদের মত কাপড় ও পাগড়ী পরিধান করে। আমীলদের চালচলন কতকটা ভিন্ন। আমীলেরা সিন্ধী হিন্দুদের অগ্রণী। মুসলমান রাজত্বকালে এই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। রাজকার্যে, বিশেষতঃ হিসাবপত্রের কাজে মুসলমান রাজাদের হিন্দুব সাহায্য ব্যতীত চলিত না। আমীলেবা আমীরদের মন যোগাইয়া চাকরী আরম্ভ করে ও ক্রমে নিজ বিদ্যাবুদ্ধি চাতুর্য প্রভাবে জনসমাজে বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া লয়। অন্যান্য হিন্দুদেব তুলনায় আমীলেরা দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট সুশ্রী। মুসলমানদের সংসর্গে ও মুসলমান প্রভুদের অনুরোধে তাহারা মুসলমানদের মত বেশভূষা পাগড়ী ও শ্মশ্রুধারণ করে — কপালে তিলক এইমাত্র প্রভেদ। আহার পানে তাহাদের অনেকটা শাক্ত ধরন— মদ্য মাংসে অরুচি নাই। এইক্ষণে গবর্নমেন্ট আপিস ও বিদ্যালয়ে আমীলদেরই প্রাধান্য দেখা যায়। ইংরাজ রাজ্যে কি উপায়ে উন্নতি সাধন করিতে হয় তাহা তাহারা যেমন ভাল বুঝে অন্য জাতিরা তেমন বুঝে না, সুতরাং তাহারা আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে — অন্যেরা পিছিয়া পড়িয়া আছে।

শিখ

এই সকল হিন্দু ভিন্ন হাইদ্রাবাদ, সেওয়ান ও অন্যান্য স্থানে অনেক শিখের বসতি প্রত্যক্ষ হয়। খালসা ও নানকশাহী তাহাদের দুই শাখা হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই শিখ ধর্ম গ্রহণের অধিকারী। দীক্ষার সময় শিষ্যকে স্নান করাইয়া শিখ ঠিকানায় (ধর্মশালায়) লইয়া যাওয়া হয় তথায় তিনি গুরু নানককে উপঢৌকন দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পুরঃসর শিখধর্মে দীক্ষিত হন।

সৎনাম কর্তা পুরুখ
নির্ভউ, নির্বৈর, অকাল মূরত
অযোনি সম্ভব, গুরুপ্রসাদ।
জপ — আদ সচ্, যুগাদ সচ্,
হৈ ভি সচ্ — নানক হোসী ভি সচ্।

* আমীল, আমলা, অমলদার, মামলা, মামুল এ সব একই শব্দমূলক। মূল শব্দ অ-ম-ল।

শিখ ধর্মশালায় উদাসী (আচার্য) শিষ্যমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া আধিপত্য করেন।

সিন্ধুদেশে হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানে অনেক শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। পূর্বের মত এখন জবরদস্তি নাই তথাপি অনেকানেক হিন্দু এখনো স্বেচ্ছাপূর্বক মুসলমান ধর্ম আশ্রয় করে মুসলমান হইয়াও প্রায়শ্চিত্তের পর অনেকে হিন্দুধর্মে পুনরায় ফিরিয়া আসে। বিধর্মীকে স্বদলভুক্ত করা, দায়ে ঠেকিয়া হিন্দুধর্মের এতটুকু অবনতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। মুসলমান ও শিখধর্মের সংমিশ্রণে ইহার বিলক্ষণ রূপান্তর ঘটিয়াছে। ওদিকে আবার হিন্দুধর্মের কুসংস্কার সকল মুসলমানদের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। পৌত্তলিকতার সংশ্রবে মুসলমান ধর্মেব একেশ্বরবাদও কলুষিত হইয়া গিয়াছে। অনেক সময় হিন্দু যেমন মুসলমানের শিষ্য তেমনি আবার মুসলমানও কখন কখন হিন্দু আচার্যের উপদেশে দীক্ষিত হয়। মুসলমান পীরদের মধ্যে অনেকের হিন্দুনাম ও কোন কোন পীরস্থানে লিঙ্গ প্রভৃতি হিন্দুদের দেবচিহ্নসকল উপলক্ষিত হয়। পীরপূজা সাধারণ্যে প্রচলিত, ইহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের যোগসূত্র। এই সকল পীর ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যস্থ হইয়া জীবের সদগতি সাধনে তৎপর এই বিশ্বাসে লোকেরা পীব বিশেষের শরণাপন্ন হয়। পীরেরা অমর — পীবেরা ঐশীশক্তিসম্পন্ন — তাঁহাদেরই অনুগ্রহে যাচকের প্রার্থনা ঈশ্বর সন্নিধানে উপনীত হয়। কত অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ঘটনা তাঁহাদের জীবনীর সহিত সংশ্লিষ্ট। লোকেদের পীরমাহাত্ম্যে অগাধ বিশ্বাস। মগরপীবের যে এত মাহাত্ম্য তাহার কারণ এই যে একজন পীর একটি ফুলকে কুমীর বানাইয়া দেন। তাহারই বংশজেরা মগরপীর জলাশয়ের অধিবাসী বলিয়া সম্ভজনীয। এমন অনেকগুলি পীর আছেন যাঁদেব উপর হিন্দু-মুসলমানদের সমান ভক্তি, তন্মধ্যে সেওয়ানের পীর লাল সাবাজ একজন গণ্য। লাল-সা'র স্তুতিবাদ পীর-ভক্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে প্রকটিত হইল।

পীর মহাপীর তুমি রাজ রাজেশ্বর,
শঙ্কট সহায় ভবে সর্ব দুঃখ হর।
তব ধন্য পুণ্য নাম নিখিল প্রচার,
তাপিত জনের তুমি হর তাপভার।
পাথর সুবর্ণ হয় তব কৃপাগুণে,
আশ্রয় ভেলায় তব তরে পাপী জনে।
করুণা অপার স্মরি লয়েছি শরণ,
অনুদানে বঁধু মোরে করহ পোষণ।
মহারাজ বিতর তোমার কৃপাবারি
তরাও ভকতে ওহে বিপদ কাণ্ডারী।
আমার যে দশা প্রভু জানিছ সকল,
জীবন শরণ তুমি, সহায় সম্বল।

আশালতা নবীন পল্লবে প্রভু ছাও
কৃপার দুয়ার তব দাও খুলে দাও।
ভুবন বিদিত নামে ধরেছি আশ্বাস
অভাগারে কোরো নাহে নিরাশে নিরাশ।
দুখ শোক পাপ তাপ করহ মোচন,
মেরবন্দ * মীর তুমি ঈশ্বরের জন,
অগতির প্রতি কর কৃপা বরিষণ।

জেণ্ডা পীর নামে অপর একটি মহাপুরুষ আছেন তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এই প্রস্তাব উপসংহার করি। এই পীর হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির পূজার পাত্র। হিন্দুরা ইঁহাকে সিন্ধু নদীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। ইঁহার নামে ভক্তেরা যে স্তুতিমালা পাঠ করেন (পঞ্জাবা দরিয়া সা জা) তাহার কিয়দংশ ভাষান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সরিৎ সুহৃদ সম কল্যাণ-নিলয়
মহারাজ মহিমা অপার,
ঢালিছ অজস্র স্রোত বল বেগময়
পূরাও হে বাসনা আমার।

অগণ্য অগণ্য পাপে তাপিত অন্তর
দূর কর প্রভু পাপভার,
তোমার দুয়ারে যাচে কত শত নর
পূরাও হে বাসনা আমার।

দীন হীন অজ্ঞান এজন
জানে না গো ভজন সাধন
স্তুতি মোর শুনহে রাজন্
পূরাও হে বাসনা আমার।

অধীনে শরণ দেয় মহৎ যে জন
উজ্জ্বল তুমি হে তব উজ্জ্বল বরণ,
মর্ত্যধামে নাহি কেহ তোমার মতন
পূরাও হে বাসনা আমার।

অন্নদাতা তুমি সদা কর অন্নদান
হৃদে দেহ সত্য পুণ্য হার।

* লাল সা বাজের জন্মভূমি।

চৌদিকে ঘিরেছে মোরে সঙ্কট মহান্
পূরাও হে বাসনা আমার।

রাজ রাজেশ্বর তুমি বলী সুলতান
দুর্বলেরে কর বলবান্।
সকলি জানিছ প্রভু কি জানাব আর
পূরাও হে বাসনা আমার।

বিদ্যায় তুমি হে মহামতি
অপার প্রভুতা অপাব শকতি,
মায়াজাল রচয়িতা, অগতির গতি
পূরাও হে বাসনা আমার।
তব কৃপাগুণে তাপিত জুড়ায়
ক্ষুধার্ত জনের অন্নকষ্ট যায়
ধরে নব বল যবে মৃত প্রায়
পূবাও হে বাসনা আমাব।

শরণ পরমগতি বহু শক্তিধারী
কর পার অনিবার যত ভগ্ন তরী,
বিপদ তরঙ্গ মাঝে তুমিই কাণ্ডারী
পূরাও হে বাসনা আমার।

থাক মোর সাথে সর্বকাল,
লোক মাঝে দেহ ধৈর্য বল,
সম্পদে বিপদে তুমি একই সম্বল
পূরাও হে বাসনা আমার।

সতত তোমায় সখা করিহে স্মরণ
কাঙ্গালের তুমিই আধার
এ দাসের স্তবস্তুতি করহ গ্রহণ
পূরাও হে বাসনা আমার।

বিজাপুর

প্রথম ভাগ

শহর

ষোড়শ শতাব্দীর কিছু পূর্ব হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রায় দুইশত বৎসর (১৪৯০-১৬৮৬) বিজাপুর দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর ও আদিল শাহি রাজাদের রাজধানী রূপে প্রখ্যাত ছিল। এই শহর সোলাপুরের ৬০ মাইল দক্ষিণে ভীমা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অধিত্যকায় অবস্থিত। ইহা দাক্ষিণাত্যের পূর্বদক্ষিণ রেলওয়ের একটি নামাঙ্কিত স্টেশন। ইহার আশেপাশে প্রকৃতির শোভাসৌন্দর্য বিশেষ কিছুই নাই, বৃক্ষপল্লব-পরিবর্জিত তরঙ্গায়মান মাঠ ময়দান — মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র, — এই যা প্রকৃতির মুখচ্ছবি। রেলগাড়িতে যাইতে যাইতে দূর হইতে বিজাপুরের দূতস্বরূপ "গোল গুম্বজ" ইমারতখানি পথিকের নয়ন আকর্ষণ করে — ক্রমে তাহার বিবৃদ্ধ আকার দক্ষিণ আকাশ ব্যাপিয়া দৃশ্যপটে উদ্ভাসিত হয়। পরে শহরের যত নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততই গোর মসজিদে অন্যান্য ছোটবড় ইমারতের ভগ্নমূর্তিসকল নেত্রপথে পতিত হয়। শহরের চতুর্দিকে প্রস্তর প্রাচীর। উহার পরিধি অন্যূন ৩ ক্রোশব্যাপী। এই প্রাচীর গভীর প্রশস্ত পরিখায় বেষ্টিত ও বিচিত্রাকার বিচিত্র বলের শতাধিক বুরুজে সুরক্ষিত। কথিত আছে ইহার এক একটি বুরুজ নির্মাণের ভার এক একজন আমীরের হস্তে ন্যস্ত হয়, যাহার যেমন রুচি যাহার যেরূপ ক্ষমতা তদনুসারে সংগঠিত — ইহাদের আকার প্রকারের বৈষম্য ঘটিবার কারণ এই। এই সমস্ত বুরুজের মধ্যে সেরজী, লাণ্ডা কসব, ফিরঙ্গী ও উপরি বুরুজ, আকার বল ও নির্মাণ কৌশলে, এই চারিটি ব্যাখ্যাযোগ্য। সেরজী (সিংহ রাজ) বুরুজের উপর প্রকাণ্ড বিজাপুর-তোপ "মালক ময়দান" স্থাপিত। এই তোপ কার্যে কত দূর ফলোপধায়ী বলা যায় না, কিন্তু ইহার হুঙ্কারেই শত্রুরা কাছে ঘেঁসিতে সাহস করিত না। কামানটা এত বড় যে একজন মানুষ তাহার গোলার স্থান অধিকার করিয়া অনায়াসে তাহার খোলের মধ্যে নিদ্রা যাইতে পরে। "মালক ময়দানের" নির্মাণকর্তা মহম্মদ রুমি খাঁ। জনশ্রুতি এই যে তিনি আপন পুত্রের বলিদান দিয়া ঐ তোপ নরশোণিতে অভিষিক্ত করেন। এই কামান হিন্দুদের পূজার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, — (এমন কি কোন জিনিস আছে হিন্দুরা যার পূজা করে না)? ছাগবলি, চাউল, নারিকেল, পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে "ক্ষেত্রপতির" পূজার্চনা সমাহিত হয়। "উপরি" বুরুজ আলি আদিল শার বিখ্যাত সেনাপতি হাইদর খাঁ কর্তৃক নির্মিত। তালিকোটের যুদ্ধের পর আলি আদিল শা শহরের প্রাচীর নির্মাণে কৃতসংকল্প হইয়া এক এক ভাগ নির্মাণে এক একজন আমীর নিযুক্ত করেন। সে সময়ে হাইদর খাঁ যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বিজাপুরে অনুপস্থিত ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে প্রাচীর নির্মাণ শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি এই মহৎ কার্যে যোগ দিতে পারিলেন না বলিয়া আক্ষেপ করাতে রাজা

শহর বর্ণনা

মালক ময়দান

আদেশ করিলেন "এমন একটা বুরুজ নির্মাণ কর যাহা আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিবে।" এই আদেশের ফল "উপরি" বুরুজ। ইহা শহরের উন্নত ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত; বাস্তবিকই আর সকল বুরুজের উপর টেক্কা দিতেছে— চারিদিক হইতে ইহা নজরে আইসে ও ইহার পৃষ্ঠ হইতে শহরের প্রাচীরসমেত সমুদয় ক্ষেত্র নেত্রগোচর হয়। ইহার উপর দুইটি তোপ স্থাপিত। তাহার একটি প্রকাণ্ড লম্বা, নাম, "লম্ব-চারী"। লাণ্ডা কসবের পৃষ্ঠেও এক বৃহৎ লৌহ-কামান দৃষ্ট হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে যখন ঔরঙ্গজীব বিজাপুর আক্রমণ করেন, তখন এই বুরুজের উপরেই তাঁহার সমুদয় শস্ত্রবল প্রয়োগ করা হয় — তাঁহার গুলিগোলার নিশান এখনও পর্যন্ত ইহার প্রাচীরে ও কামানের গায়ে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই বুরুজের অনতিদূরে "মঙ্গল তোরণ" নামক শহরের যে প্রবেশ দ্বার ছিল, ঔরঙ্গজীব সে নাম বদলাইয়া "ফতে ফটক" নামকরণ করেন। বিজয়ী সম্রাট এই ফতে ফটকের মধ্য দিয়া বিজাপুর সহরে প্রবেশপূর্বক স্বকীয় জয় ঘোষণা করেন।

পঞ্চ তোরণের মধ্য দিয়া শহরে প্রবেশ করা যায়। তাহার চারিটি অক্ষত রহিয়াছে; পঞ্চম দ্বার সরকারী অফিস প্রভৃতি ইমারত সংঘাতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে দিক দিয়া প্রবেশ কর সেই দিকেই শহরের এক সুমহান্ অপূর্ব দৃশ্য আবিষ্কৃত হয়। বিজাপুরের প্রাচীর, বুরুজ, ইমারতমালার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে ইহা এক সুবিস্তীর্ণ জনাকীর্ণ নগর বলিয়া সহসা ভ্রান্তি জন্মে। অন্তরে প্রবেশ করিলে সে ভ্রম দূর হয়। শহরের বসতগুলি কেমন খাপছাড়া ও গুটি-কত প্রাচীন ইমারত ছাড়িয়া দিলে দেখিবার জিনিস কিছুই নাই। প্রাচীন ও নব্য শহরে আকাশ পাতাল প্রভেদ। শহরের বসতির ঠিকানার বাড়িঘরগুলি অন্যান্য প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভের তুলনায় কি দীনহীন যৎসামান্য রূপে প্রতীয়মান হয়। আধুনিক ঘরবসতি পশ্চিম দ্বারের সন্নিহিত। পশ্চিম লোকালয় ছাড়াইয়া গেলে অন্তরের ভগ্ন বিজনতা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়া চিত্তকে ঘনবিষাদে পূর্ণ করে। নগরের মধ্যভাগে দোধারী বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া যে রাজপথ গিয়াছে তাহা পথিককে মধ্য দুর্গে লইয়া যায়। এই দুর্গের নাম "আর্ক কেল্লা"। ইহা গোলকৃতি ও ইহার বেষ্টন প্রায় ১ মাইল হইবে। আর্ক কেল্লায় যত বড় বড় সাহেব সুবার বাসগৃহ, গবর্নমেন্টের কার্যালয় প্রভৃতি সার্বজনিক ইমারতশ্রেণী। কেল্লার মধ্যগত "সাত মজলী" প্রাসাদ, "আনন্দ মহল", "গগন মহল", বাহিরে "আসার মহল", "মালক জাহান" মসজিদ ও আলি আদিল শার অসম্পূর্ণ সমাধিমন্দির মিলিয়া যে সুন্দর সৌধমালা উন্মীলিত হয় তাহা বিজাপুরের প্রাচীন কীর্তি-স্মৃতিতে পূর্ণ। এই পূর্ব গৌরবের কঙ্কালসকল শহরময় বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। কোথাও বা বনজঙ্গল পরিবৃত ছাদহীন ভগ্ন গৃহ— কোথাও একটি গোর কিম্বা মসজিদ ঝোপঝাড়ের মধ্য হইতে উঁকি দিতেছে— কোথাও ভগ্নস্তূপের মধ্যে ফোয়ারা ও জলযন্ত্র সংযুক্ত মনোহর উদ্যানের চিহ্নসকল পড়িয়া আছে। ফোয়ারা ভগ্ন, জলযন্ত্র শুষ্ক, ফলফুল বৃক্ষসকল বনজঙ্গলে আচ্ছাদিত, কোন স্থানে হয়তো অযত্নসম্ভূত একটি জুঁইলতা ভগ্ন প্রাচীর বাহিয়া উঠিয়াছে। হায়! সেই জগদ্বিখ্যাত বিজাপুরের এই দুর্দশা —

আর্ক কেল্লা

যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তরকোশলা
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনস্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ।।

কোথা মথুরাপুরী গেছে
যদুপতির
রঘুপতির কোশলাও
সেই পথে।
সবে এতেক ভাবি মন
করহ স্থির
জেনো কিছুই স্থির নহে
এ জগতে!

আর্ক কেল্লা বিজাপুরের শোভনতম স্থান — ইমারতরাজির রত্নভাণ্ডার। য়ুসফ আদিল শা প্রথম সুলতান এই দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করেন। ইব্রাহিম আদিল শার আমলে ইহার কার্য শেষ হয়। ইহার প্রাচীরে হিন্দু মন্দিরের প্রস্তরগাঁথুনী হইতে চোরা মাল ধরা পড়ে। দুর্গের অভ্যন্তরে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় ও একটি মন্দির এখনো জীবন্তভাবে অধিষ্ঠিত তাহা নরসোবার মন্দির। কথিত আছে যে দ্বিতীয় ইব্রাহিম বাদশা স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এই মন্দিরে আসিয়া হিন্দু মতে পূজা করিতেন। এই মন্দিরে মধ্যে মধ্যে মেলা হয়। সে দিন একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে গেলাম। সে প্রথমে এইটুকু দুগ্ধ পান করিয়া থাকিত, তাহাও ক্রমে ছাড়িয়া দিয়া অনাহারে দিনযাপন করিতে লাগিল — শুদ্ধ একটু ভাং মাত্র জীবনের অবলম্বন। ক্রমে তাহার শরীর শুষ্ক শীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপ কতক দিন যায়, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এখানেই কি আপনার সমাধিস্থ হইবার ইচ্ছা?" সে বলিল, "যত দিন পর্যন্ত আমি এক শত সাধুর ভোজের অন্ন সংস্থান করিতে না পারি ততদিন এখান হইতে নড়িব না।" পরে শুনিলাম সে ইচ্ছামত অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে — তাহার অনশন ব্রত উদ্‌যাপিত হইল কিনা শুনিতে পাইলাম না। আর্ক কেল্লায় বিশাল, সুন্দর, নানা ধরনের ইমারত একত্রীভূত। চীন মহলের সৌধমালা

সাত মজলী

জজের আদালত, কলেক্টর মাজিস্ট্রেটের কাছারীতে পরিণত। চীন মহলের এক কোণে এক সরোবর তীরে সপ্ততম প্রাসাদ (সাত মজলী) গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। "গগন মহল" রাজাদের দরবারশালা।

গগন মহল

তাহার সম্মুখে যে বিশাল খিলান দ্বার (arch) মুখব্যাদান করিয়া আছে তাহা বিজাপুরের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট খিলান।

উদ্যান উৎসযুক্ত সুসজ্জিত "আনন্দ মহল" রাজাদের বিহারভবন ছিল। ইহা এক প্রকাণ্ড ভূতল গৃহ। রাণীদের বায়ু সেবনের জন্য উপরে প্রশস্ত ছাদ — ছাদের উপর হইতে অদৃশ্যভাবে বাহিরের তামাসা দেখিবার সুবিধা। এই গৃহে কত সিঁড়ি, কত খুপরি খুপরি ঘর তাহার অন্ত নাই। বোধ হয় যেন ইহা রাজারাণীদের মিলিয়া লুকাচুরি খেলিবার জন্য নির্মিত।

আনন্দ মহল

আর্ক কেল্লার প্রত্যেক গৃহ — প্রত্যেক ভূমিখণ্ড — প্রাচীন বিজাপুরের সহস্র স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। এখানেই রাজবিদ্রোহী মন্ত্রী কমাল খাঁ বালক সুলতান ইস্মায়লের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে গিয়া স্বয়ং প্রাণ খোয়াইলেন — এখানেই বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানার দরবার হইত — এখান হইতেই মন্ত্রীর কুহকে পড়িয়া তিনি বন্দী হইয়া সেতারায় নির্বাসিত হন — এখানেই বিলাসী মাহমুদ তাঁহার প্রিয়তমা নায়িকা রম্ভার সহিত রঙ্গরসে দিন যাপন করিতেন। এই দুর্গ আদিলশাহী রাজাদের কত লীলাখেলা যুদ্ধবিগ্রহের স্থান — ইহাই আবার সেই রাজবংশ-নিপাতের সাক্ষী। এই স্থানে বিজাপুর পতনকালে সুলতান সেকন্দর সহস্র সহস্র প্রজার হৃদয়ভেদী আর্তনাদের মধ্যে বিজয়ী ঔরঙ্গজীবের চরণে স্বীয় রাজমুকুট সমর্পণ করেন। যদিও ইহার সৌধাবলী ভগ্নপ্রায়, ইহার উদ্যানকানন তৃণকন্টকাবৃত, ইহার উৎসজল প্রণালীসকল শুষ্ক, তথাপি এক অনির্বচনীয় মহান্ গম্ভীর ভাব ইহার সহিত সংলিপ্ত — ইহা সেই সমুদ্ধত রাজবংশের সুমহান কীর্তিস্তম্ভরূপে বিরাজমান।

বিজাপুরে যে সমস্ত প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান তন্মধ্যে গোল গুম্বজই সর্বাগ্রগণ্য। ইহা সুলতান মাহমুদের সমাধিমন্দির। শহরের মধ্যে ইহা অদ্বিতীয় — পৃথিবীতেও দুই একটি ভিন্ন এমন বিশাল গুম্বজ আর নাই। গুম্বজরাজ বহির্ভাগ হইতে ১৯৮ ফীট উচ্চ ও যে চতুষ্কোণ প্রাকারের উপর স্থাপিত তাহার প্রত্যেক পার্শ্ব ১৩৫ ফীট দীর্ঘ। ইমারতখানি সমচৌরস ১৮,২২৫ ফীট, রোম নগরের প্যান্থিয়ান অপেক্ষাও বৃহত্তর। বাহিরের চারিকোণে চারিটি গবাক্ষময় মিনার। ইহার একটির সিঁড়ি ভাঙিয়া ছতালা পর্যন্ত আরোহণ করিলে ছাদের উপর হইতে চতুর্দিকের সুবিস্তৃত শোভন দৃশ্য সন্দর্শন করা যায়। নীচের নরকীটেরা কি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে। এই গুম্বজে প্রতিধ্বনি গ্যালেরি এক চমৎকার জিনিস — ছাদের উপর একটি সুঁড়ি পথ দিয়া গ্যালেরিতে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশ করিলে এক অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করা যায়। তথায় প্রতিধ্বনির বিরাম নাই। এক সীমায় কানে কানে কথা কহিলে সীমান্তর পর্যন্ত স্পষ্ট শুনা যায়। এক কণ্ঠ বিনির্গত সুর হইতে শত শত কণ্ঠধ্বনির প্রতিধ্বনি জাগ্রত হয়। আমাদের সঙ্গে "ব্রুনো" কুকুর ছিল, তাহার এক এক ডাকে শত সহস্র শৃগাল কুকুরের রব উঠিয়া এক, অদ্ভুত হাস্যরসের অভিনয় হইতেছিল; বেচারী "ব্রুনো" তাহার অদৃশ্য শত্রুদলের আস্ফালনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কি করিবে ভাবিয়া পায় না। দক্ষিণ দ্বার দিয়া সমাধিগৃহে প্রবেশ করিয়া এক প্রস্তরমঞ্চের উপর সুলতান মাহমুদ, তাঁহার মহিষী ও পুত্রদের গোরপ্রস্তরসকল

"বোল অথবা "গোল" গুম্বজ

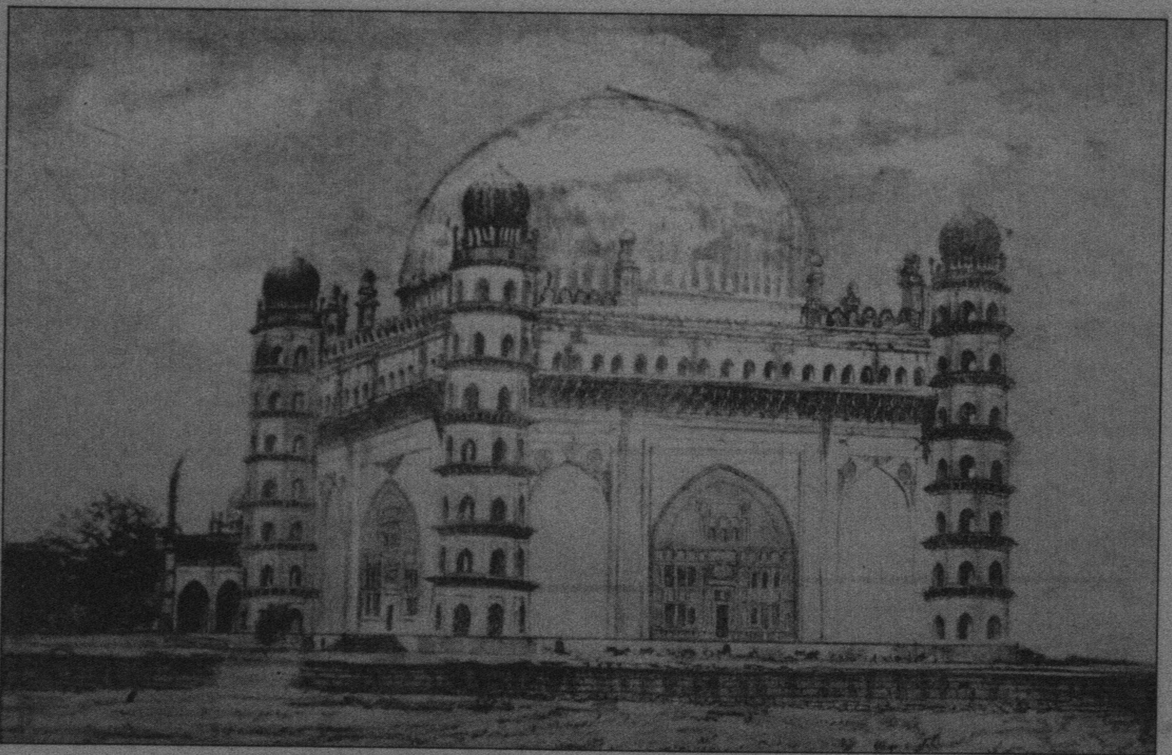
দেখা যায়। দক্ষিণ দ্বারের নিকটস্থ প্রস্তরের উপর কতকগুলি পারস্য লেখা আছে। তাহাতে সুলতান মাহমুদের স্বর্গারোহণের তারিখ পাওয়া যায় — তাহা ১০৬৭ অর্থাৎ ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দ। দক্ষিণ দ্বারের উপরিভাগে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড লৌহ-শৃঙ্খলে লম্ববান। লোকের বিশ্বাস এই পাথরের গুণে গুম্বজরাজ বজ্রবিদ্যুতের উৎপাত হইতে সুরক্ষিত। একবার যদিও ইহার উপর বজ্রপাত হইয়া গিয়াছে তথাপি সে বিশ্বাস চলিয়া যায় নাই।

বোল গুম্বজের পরেই "ইব্রাহিম রোজার" উল্লেখ করিতে হয় — ইহাতে ইব্রাহিম বাদশাহের গোর ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত। বোল গুম্বজ শহরের পূর্ব প্রাচীর ঘেঁসিয়া ভিতরের দিকে, — ইব্রাহিমের রোজা পশ্চিম প্রাচীরের কিঞ্চিৎ বহির্ভাগে অবস্থিত। বোল গুম্বজ অলঙ্কারহীন গুরুভার প্রকাণ্ড কাণ্ড — ইব্রাহিম রোজা তাহার উলটা, লঘু ও অলঙ্কারময়। ইহার গোর, মসজিদ, উদ্যান, মিনার মিলিয়া দূর হইতে অতি মনোহর দৃশ্য আবির্ভূত হয়। বিজাপুর আক্রমণ কালে মোগল সৈন্য কর্তৃক এই রোজা অধিকৃত হইয়া মালক ময়দানের গোলাঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এইক্ষণে মেরামতে তাহার পূর্বাবয়ব ফিরিয়া আসিয়াছে।

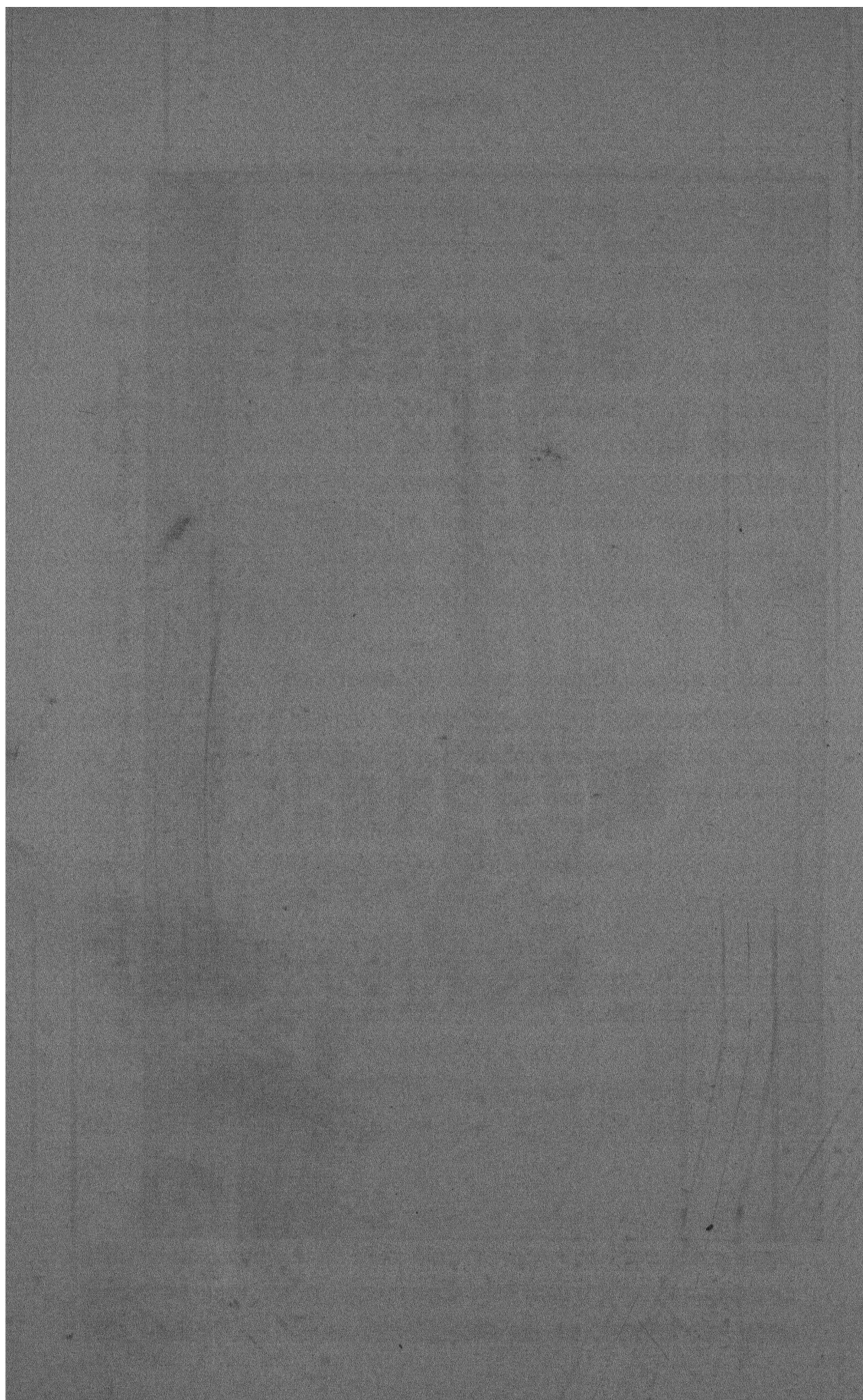
ইব্রাহিম রোজা

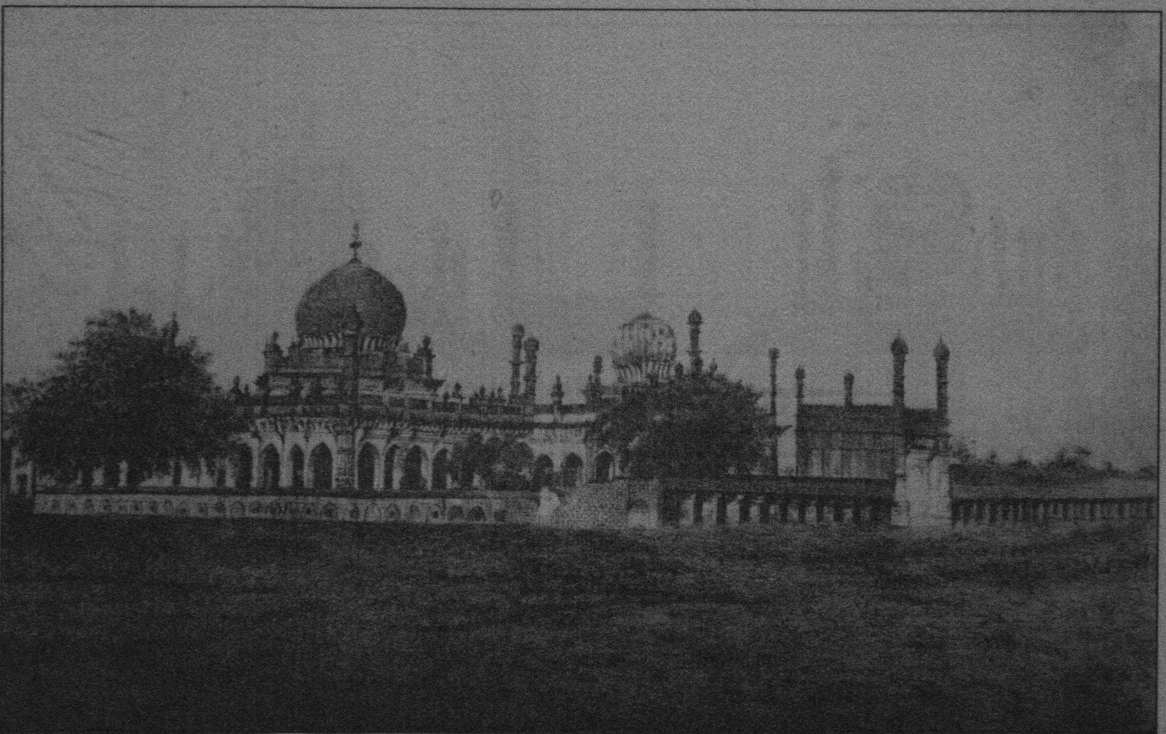
এই সকল বৃহৎ প্রস্তরের ইমারত, ইহাদের শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া লোকের মনে সহজে কৌতূহল জন্মিতে পারে, কি উপায়ে, কি কলকৌশলে এই সমস্ত কারখানার সৃষ্টি হইল — না জানি কত লোকজন মজুর-মিস্ত্রী ইহাতে কাজ করিত — কত না অর্থ ব্যয় হইয়াছে। ইব্রাহিম রোজার এক স্থানে পারস্য ভাষায় একটি শিলালেখ আছে, তাহাতে এই সকল বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ হয়। সে লেখ এই ঃ — "মালিক সান্দাল ১।।০ লক্ষ ৯০০ হুন ব্যয় করিয়া অনেক পরিশ্রমে এই গোর মন্দির নির্মাণ করেন।" হুনের মূল্য সাত সিলিং করিয়া হিসাব করিলে ৫২,৮১৬ পৌণ্ড দাঁড়ায় — মোটামুটি ধর, সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা। কিন্তু এ হয়ত শুদ্ধ গুম্বজ নির্মাণের ব্যয় — সমুদায় ইমারতের মূল্য নির্দেশক নহে। সমুদায়টা ধরিতে গেলে এক কোটি মুদ্রারও অধিক হইয়া যায়। ঐ লেখে আরো আছে যে এই কাজে ৬,৫৩৩ লোক খাটিত কার্য শেষ হইতে ৩৬ বৎসর ১০ মাস ১১ দিন লাগিয়াছিল। এই লোক সংখ্যায় মুটেমজুর প্রভৃতি সাধারণ শ্রমজীবী সামিল বিনা সন্দেহ — সম্ভবতঃ উহা শিল্পী, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর কারিগরের সংখ্যা নির্দেশক। তদ্ভিন্ন নিকৃষ্ট শ্রমজীবীদের অন্নবস্ত্র দিয়া ইচ্ছামত সংগ্রহ করা যাইত তাহার আর সন্দেহ নাই, নহিলে এই সকল ইমারত নির্মাণ কল্পনা করা দুঃসাধ্য।

জীবিত থাকিতে থাকিতে আপনার সমাধিমন্দির প্রস্তুত করা মুসলমানদের এক অদ্ভুত রীতি। হিন্দুরা মৃতদেহ ভস্মসাৎ করিয়া মৃত্যুর স্মরণচিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত করিতে উৎসুক, মুসলমানদের বাসগৃহ অপেক্ষা প্রেতালয়ের প্রতি অধিক মনোযোগ। সুলতান মাহমুদের পুত্র আলি আদিল শা গোল গুম্বজের সমস্পর্দ্ধী নিজের জন্য এক গোরমন্দির পত্তন করেন।

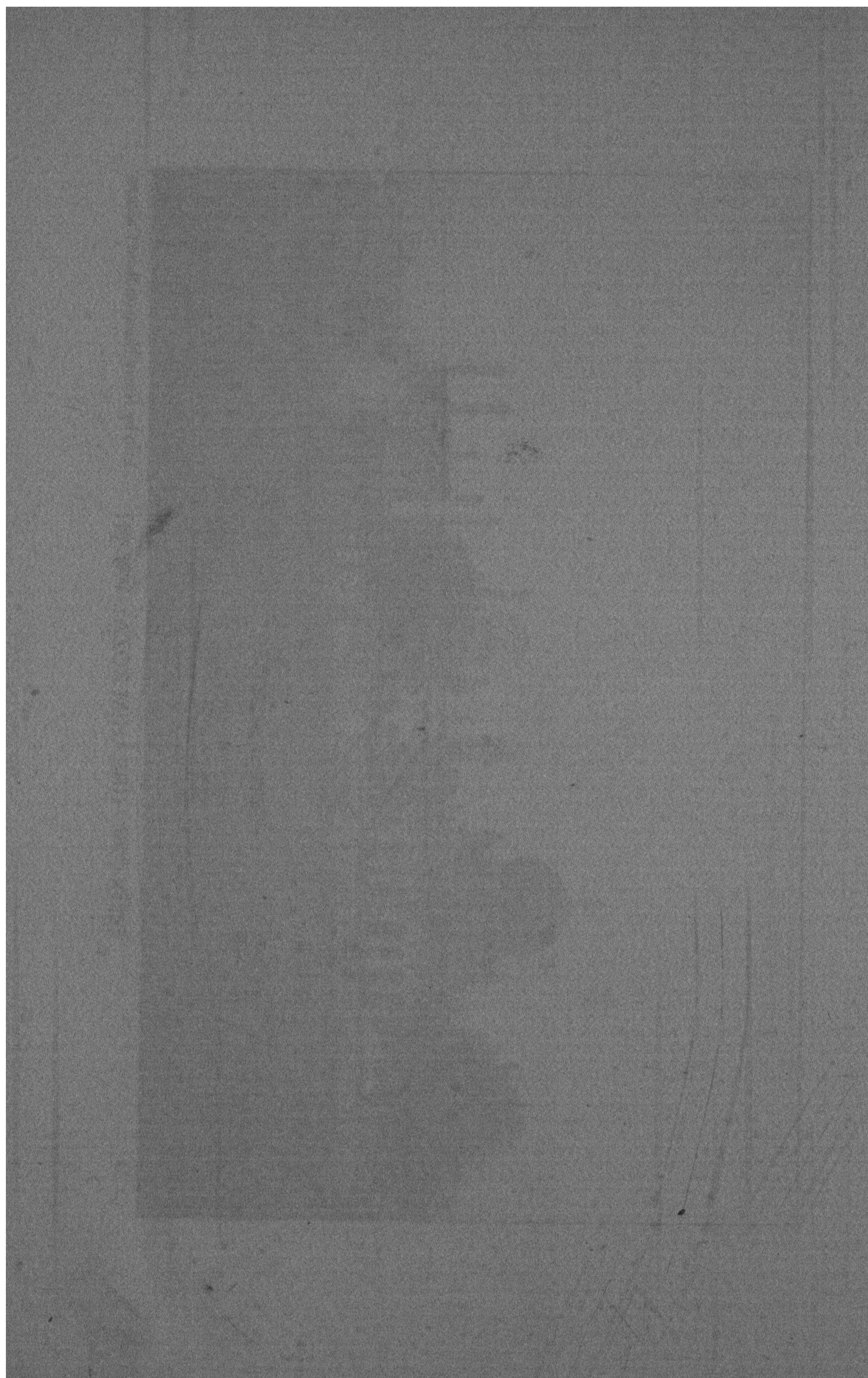


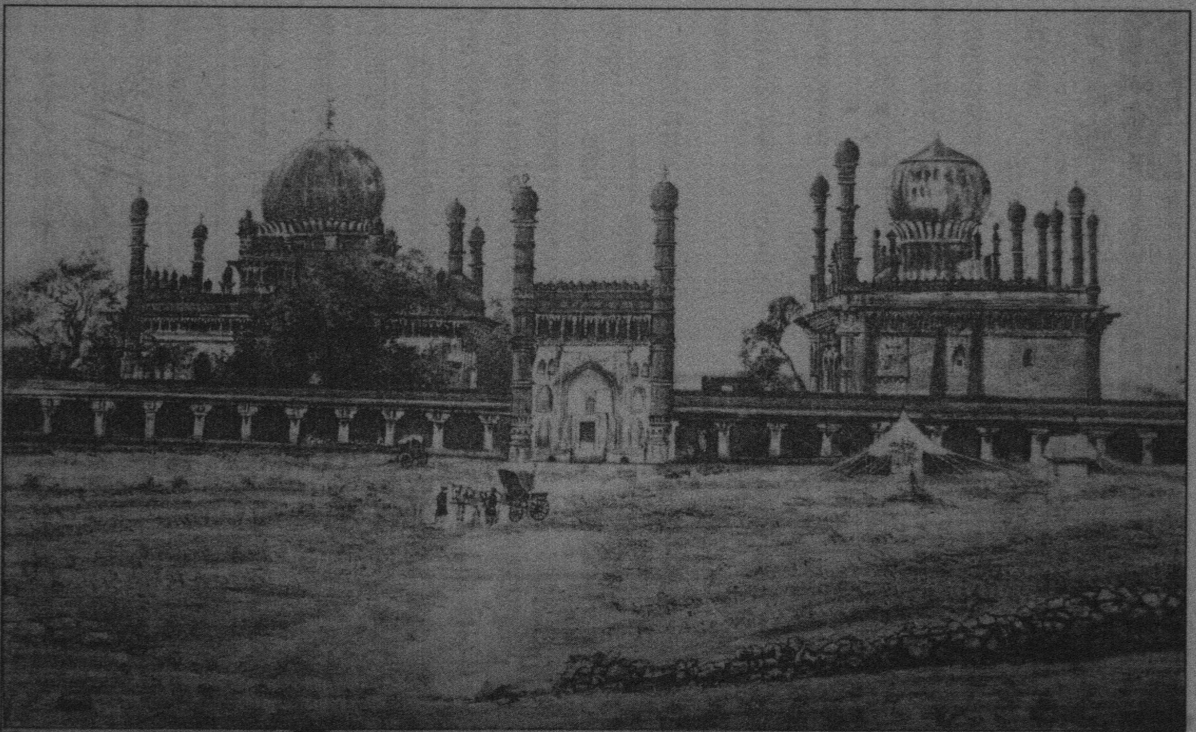
গোল গুম্বজ–(GOL GUMBAJ) –বিজাপুর। Lith by Hurry Narayon Bose Calcutta





ইব্রাহিম রোজা—(IBRAHIM ROZA)—বিজাপুর। Lith by Hurry Narayon Bose Calcutta





ইব্রাহিম রোজা (সম্মুখ দৃশ্য)–Ibrahim Roza –বিজাপুর। Lith by Hurry Narayon Bose Calcutta

তাহার ছায়া পিতার গোরমন্দিরের উপর গিয়া পড়ে এই তাঁহার ইচ্ছা; কিন্তু দরদৃষ্টক্রমে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। মন্দির প্রস্তুত হইতে না হইতেই রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন ও এই ভগ্ন গৃহেই তাহার সমাধি হয়। এই সমাধিমন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই এক্ষণে দৃষ্ট হয়।

আলি রোজা

ইহার নাম "আলি রোজা"। কিন্তু মৃত হস্তীরও লাখ টাকা মূল্য; সেইরূপ ইহার ভগ্নমূর্তিও চমৎকার ব্যাপার। ইমারত সম্পূর্ণ হইলে সত্য সত্যই ইহা বোল গুম্বজকে অতিক্রম করিয়া উঠিত — আলিও মনের সাধ মিটাইয়া সুখে মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইতে পারিতেন!

এই অসমাপ্ত সমাধিমন্দিরের এক কোণে একটি চাকচিক্যময় খোদিত হরিৎ প্রস্তরের

সুলতান সেকন্দরের গোর

গোর দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে তাহা হতভাগ্য সেকন্দরের গোর প্রস্তর, কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে বাস্তবিক তাহা নহে। সুলতান সেকেন্দরের গোর অন্যান্য সামান্য গোরশ্রেণীর মধ্যে শহরের অন্যত্রে স্থাপিত।

ইহার উত্তরে মক্কা ফটক হইতে কেল্লার পথ দুটি গোরমন্দিরে অলঙ্কৃত — তাহাদের

দুই বোন

পরস্পর সান্নিধ্যবশতঃ "দুই বোন" নামকরণ হইয়াছে। দ্বিতীয় আলির সচিব প্রধান খাওয়াস্ খান ও তাঁহার গুরু আবদুল খাদির এই দুই মন্দিরে শয়ান রহিয়াছেন। ইহাদের গোরপ্রস্তরসকল ভিত্তি-প্রস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন — গুম্বজ গৃহ যেন বাসস্থানের জন্য নির্মিত বোধ হয়। বস্তুতঃ ইহার একটি গুম্বজ বাসগৃহে পরিণত হইয়াছে। শ্মশান ভূমির উপর জীবন্ত মনুষ্য বাস করিতেছে।

দুই বোনের অনতিদূরে প্রাচীরবেষ্টিত একটি উদ্যানের মধ্যে ঔরঙ্গজীবের মহিষীর গোরস্থান। এই গোরের শ্বেত পাষাণ দিল্লী হইতে আনীত হয় — ওরূপ প্রস্তর বিজাপুর অঞ্চলে পাওয়া

ঔরঙ্গজীবের মহিষীর গোর

যায় না। কেহ কেহ বলেন ইহা সম্রাটের কন্যার গোরস্থান। এই সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। তাহা এই যে, শিবাজী রাজার দিল্লীপ্রবাস কালে রাজকুমারী তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হন। শিবাজী যদি মুসলমান ধর্ম স্বীকার করেন তাহা হইলে তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে ঔরঙ্গজীবের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু শিবাজী তাহাতে সম্মত হইলেন না। রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অনেকে উৎসুক ছিল, কিন্তু তিনি সেই অবধি আর বিবাহ করেন নাই। অপরিণীত অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয় ও বিজাপুর বিজয়ের তিন বৎসর পরে ঐ স্থানেই তিনি সমাধিস্থ হন।

এতদ্ভিন্ন "মোত্তি গুম্বজ" বারো পায়ার গুম্বজ প্রভৃতি অপরাপর গোরমন্দির সংখ্যাতীত, প্রস্তাব-বাহুল্য ভয়ে তাহাদের বর্ণনা হইতে বিরত হইতে হইল।

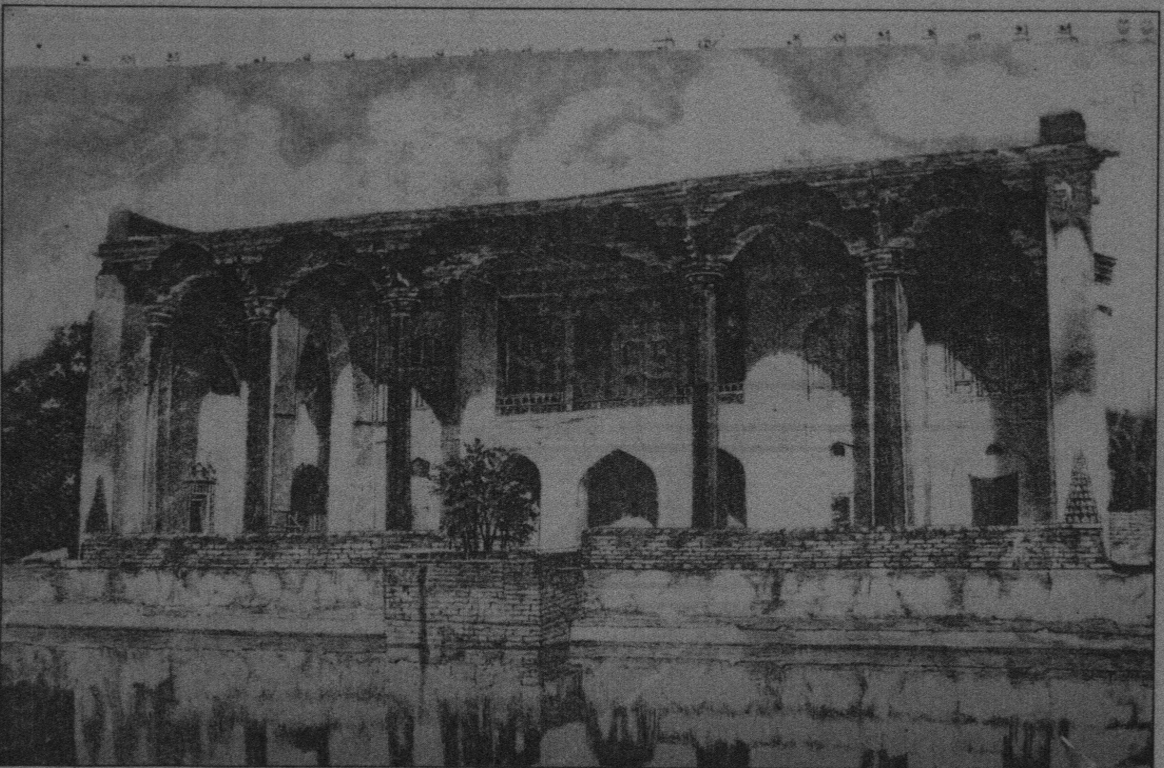
প্রাসাদের মধ্যে পূর্বেই দুই চারিটির উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে "আসার মহল" অপেক্ষাকৃত অক্ষত অবস্থায় দৃষ্ট হয়। ইহা সুলতান মাহমুদের রচিত। প্রথমে ইহা আদালতের

জন্য নির্মিত হয়। ইহার নাম "আদালত মহল" অথবা "দাদ মহল" ছিল। আচ্ছাদিত সেতুবন্ধনে ইহা রাজবাড়ীর সহিত সংযুক্ত ছিল, পরে এক নূতন আদালত প্রস্তুত হইলে ইহার নাম পরিবর্তন ও কার্যান্তরে নিয়োজন হয়। মহম্মদের শ্মশ্রুর দুইটি কেশ ইহার ভাণ্ডারজাত হওয়া ইহার পদোন্নতি ও সৌভাগ্যের মূল। অন্যান্য ইমারতের ন্যায় এই পবিত্র নিকেতনের উপর বিশেষ কোন উপদ্রব ঘটে নাই, মহম্মদের শ্মশ্রুর প্রসাদে সে অনেক বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। আদালত মহল বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু আসার-মহল আজ পর্যন্ত প্রায় যেমন তেমনিই রহিয়াছে। আসার মহল চতুষ্কোণাকৃতি, ১৩৫ ফীট প্রস্ত দ্বিতল গৃহ। ইহার চিত্রিত কাষ্ঠছাদ ৩৫ ফীট উচ্চ চারিটি সুদৃঢ় কাষ্ঠস্তম্ভের উপর স্থাপিত। দ্বিতীয় তলে কতকগুলি সুরঞ্জিত প্রকোষ্ঠ আছে, তাহার একটি মহম্মদের শ্মশ্রুর ঘর। এই ঘর প্রায়ই বন্ধ থাকে, বার্ষিক উৎসবে ভক্তদের দর্শনের জন্য কেবল সম্বৎসরে একবার মাত্র খোলা হয়। আর কতকগুলি প্রকোষ্ঠ কার্পেট, মখমলের চাদর ও বিছানা, চীনের বাসন প্রভৃতি পুরানো সামগ্রী সকলের ভাণ্ডারঘর। এই সকল ঘরের প্রাচীর ছাদ প্রভৃতি বিচিত্র লতাপাতা মানুষের ছবিতে চিত্রিত। শেষ প্রকোষ্ঠে প্রাচীরের গায়ে মাহমুদ বাদশাহের ছবি মোগল সম্রাটের বর্বর হস্তে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে। আর আর চিত্রাবলী কালের দংশনে বিবর্ণ ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। আসার মহলে বিজাপুর সম্বন্ধীয় কতকগুলি হস্তাক্ষর লেখা ছিল, তাঁহার কতক বিনষ্ট বা স্থানান্তরিত হইয়াছে।

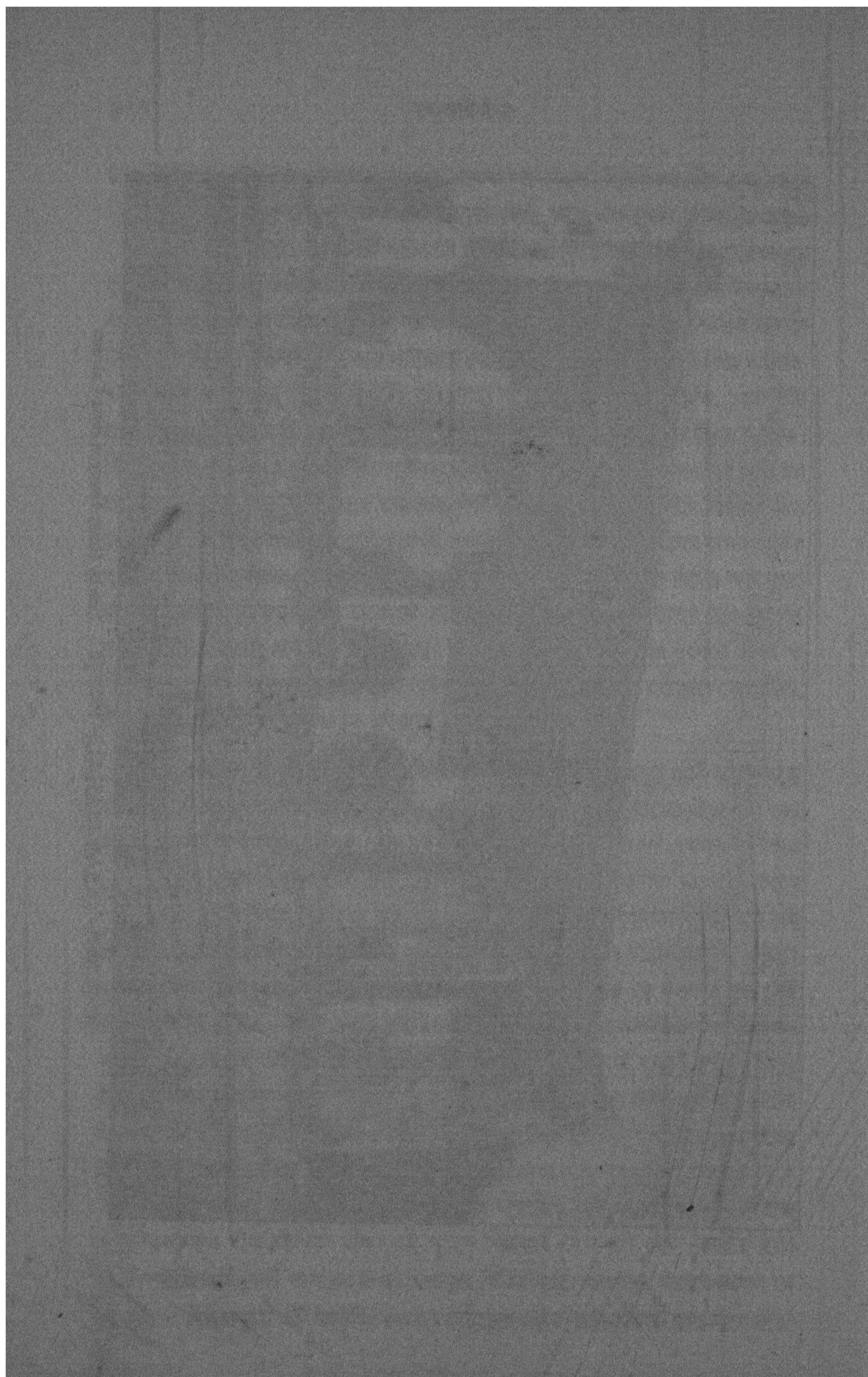
"আসার মহল"

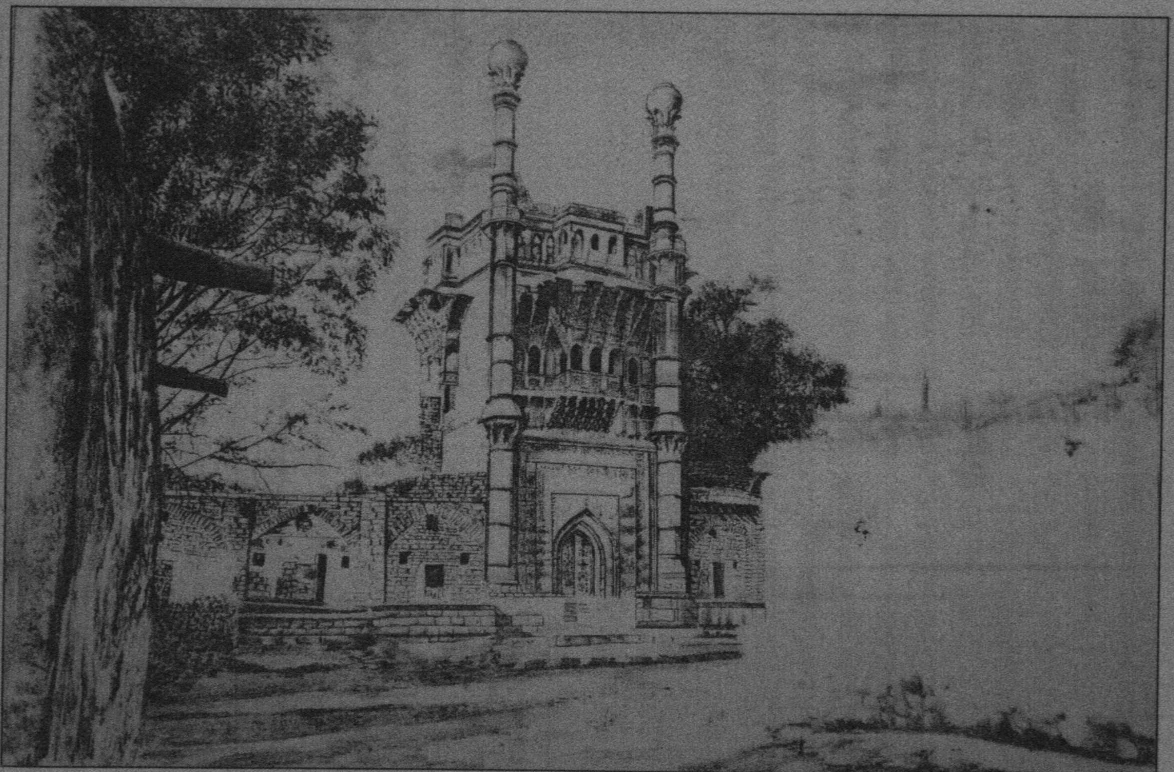
আর একটি বাড়ি কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত — নাম "মেহতর মহল"। এই নাম সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন একজন মেথরের নাম হইতে এই নামের উৎপত্তি। তার গল্প এই ঃ— ইব্রাহিম বাদশার কুষ্ঠ রোগ হইয়াছিল। অনেক চিকিৎসার পর একজন গণৎকার তাঁহাকে পরামর্শ দেয় যে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজ প্রথমে যার মুখ দেখিবেন তাহাকে ধনরত্ন দান করিবেন। পুণ্যকার্যে সেই অর্থ ব্যয় হইলে মহারাজ নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করিবেন। রাজার রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াই একজন মেথরের মুখাবলোকন করেন। তাহার যে ধনলাভ হয় সেই ধনে এই মহল নির্মিত — ইহা একটি মসজিদের প্রবেশদ্বার। অন্যমতে ফকীর দলের মেহতর অর্থাৎ প্রধান কর্তৃক নির্মিত বলিয়া ইহার নাম মেহতর মহল। নাম যাহাই হউক, ইহার কারুকার্য বাস্তবিক প্রশংসনীয়। দোতালার ছাদ এক অদ্ভুত ব্যাপার। উহা সমতল ও কড়িকাঠের উপর অবলম্বিত। কড়িকাঠ বলা ঠিক হইল না, কেন না উহা প্রস্তরময়। এই সকল পাথরের কড়িকাঠ যে কিসের উপর নির্ভর করিয়া আছে তাহা বোঝা যায় না। পৃথিবী বাসুকীর পৃষ্ঠে — বাসুকীর আশ্রয় কে? মেহতর মহলের ছাদ সম্বন্ধেও এই প্রহেলিকা — ইংরাজ এঞ্জিনিয়রদেরও ধাঁধা লাগিয়া যায়। এই গৃহের শিল্পকার্য যে দেখে সেই মোহিত হয়। কাঠের কাজের অনুরূপ পাথরের উপর ফলফুল বিবিধ নক্সা। ফরগাসন সাহেব বলেন যে অলঙ্কার ও শিল্পচাতুর্যে এই বাড়িটি মিশরের কায়রোর কোন বাড়ীর নিকট হার মানে না।

"মেহতর মহল"



আসার মহল –(ASAR MAHAL)–বিজাপুর। Lith by Hurry Narayon Bose Calcutta





মেহতর মহল।—(MEHTAR MAHAL)—বিজাপুর। · Lith by Hurry Narayon Bose Calcutta

এখানকার মসজিদের মধ্যে জুম্মা মসজিদ সর্বপ্রধান। দাক্ষিণাত্যে এমন সুন্দর মসজিদ প্রায় দেখা যায় না। লালিত্য, শিল্পকৌশল ও কার্যকারিতা ইহা সর্বপ্রকারেই প্রশংসার্হ। এ মসজিদ একজনের রচনা নহে। প্রথম আলি আদিল শা হইতে ঔরঙ্গজীব পর্যন্ত নৃপতিগণের হস্তচিহ্ন সকল ইহাতে বর্তমান। কিন্তু যদিও রাজারা ইহার নির্মাণ ও অলঙ্কার কার্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, তথাপি ইহা অসম্পূর্ণ — বহির্মিনারাভাবে যেন অঙ্গহীন হইয়া রহিয়াছে। প্রধান দ্বার দিয়া চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিবে তিনদিকে মসজিদের গৃহাবলী, প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে একটি শুষ্ক ফোয়ারা। মসজিদের খিলান স্তম্ভময় সুদীর্ঘ শালা, সুন্দর গুম্বজ, সুরাগরঞ্জিত ভজনালয় (মেহরাব) সকলি চমৎকার। চকচকে মেঝের উপর এক একজন বসিবার আঁচড় কাটা আসন আছে, সে সকল গণনা করিলে ইহাতে প্রায় ৪,০০০ উপাসকমণ্ডলীর বসিবার স্থান সংকুলান প্রতীয়মান হয়। মেহেরাবে কতকগুলি শিলালেখ আছে, তাহার চারিটি ধর্মনীতি সম্পর্কীয়, দিওয়ান হাফেজের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত; যথা —

জুম্মা মসজিদ

"জীবনে বিশ্বাস নাই — ইহা ক্ষণস্থায়ী"
"ক্ষণভঙ্গুর সংসারে শান্তি নাই"
"সংসার ইন্দ্রিয়সুখের আগার"
"জীবন অমূল্যদান কিন্তু অনিত্য,"

অবশিষ্ট দুইটি লেখ হইতে জানা যায় যে সুলতান মাহমুদের আদেশে তাঁহার ভৃত্য মালিক য়াকুব কর্তৃক ১০৪৫ (১৬৩৬) অব্দে এই মেহরাব নির্মিত ও অলঙ্কৃত।

আর্ক কেল্লার মধ্যভাগে আনন্দ মহলের সন্নিকটে মক্কা মসজিদ। মক্কায় যে মসজিদ আছে তাহার আদর্শে নির্মিত বলিয়া ঐ নাম। ইহা বেশ একটি সুন্দর ছোটখাট মসজিদ, ঠিক যেন একটি খেলানার জিনিস। ইহার ভজনকোষ্ঠ বিচিত্র, সুন্দররূপে খোদিত ও অলঙ্কৃত এবং মসজিদটি উন্নত প্রাকারে পরিবেষ্টিত। প্রবাদ এই যে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একজন খ্যাতনামা পীর এই মসজিদ নির্মাণ করেন। তখন বিজাপুর হিন্দুরাজাদের অধীন ছিল। পীর দলবলে এই স্থানে আসিয়া আড্ডা করিলে পর হিন্দুরা বিরক্ত হইয়া তাহাদের তাড়াইবার পন্থা দেখিতে লাগিল। বলে না পরিয়া তাহারা ভাবিল ইহাদের অন্নাভাবে শুকাইয়া তাড়াইতে হইবে। যবনদের কিছুই দিব না, তাহাদের নিকট কোন জিনিস বেচিব না গ্রামস্থ লোকদের এই প্রতিজ্ঞা হইল। মুসলমানেরা অন্নকষ্টে পড়িয়া ক্ষুধার জ্বালায় হিন্দুদের একটি গরু ধরিয়া মারে। এই সূত্রে হিন্দু-মুসলমান মধ্যে মহা দাঙ্গাহাঙ্গাম বাধিল। পীরকে রাজা বিজনরাও-এর সমক্ষে ধরিয়া আনা হইলে রাজা তাঁহাদের গোহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পীর উত্তর করিলেন, "আমরা আহারাভাবে বাধ্য হইয়া এই কাণ্ড করিয়াছি কিন্তু এই গরু পুনর্জীবিত করিয়া মহারাজকে প্রত্যর্পণ করি" এই বলিয়া প্রেতাস্থি সকল সংগ্রহ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিলেন

আর গরুও সজীব হইয়া উঠিল। রাজা পীরের ঈদৃশ প্রতাপ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ভূমিদান ও বাসের অনুমতি করেন। সেই ভূমির উপর মক্কা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়;নিকটে পীরের গোরস্থান।

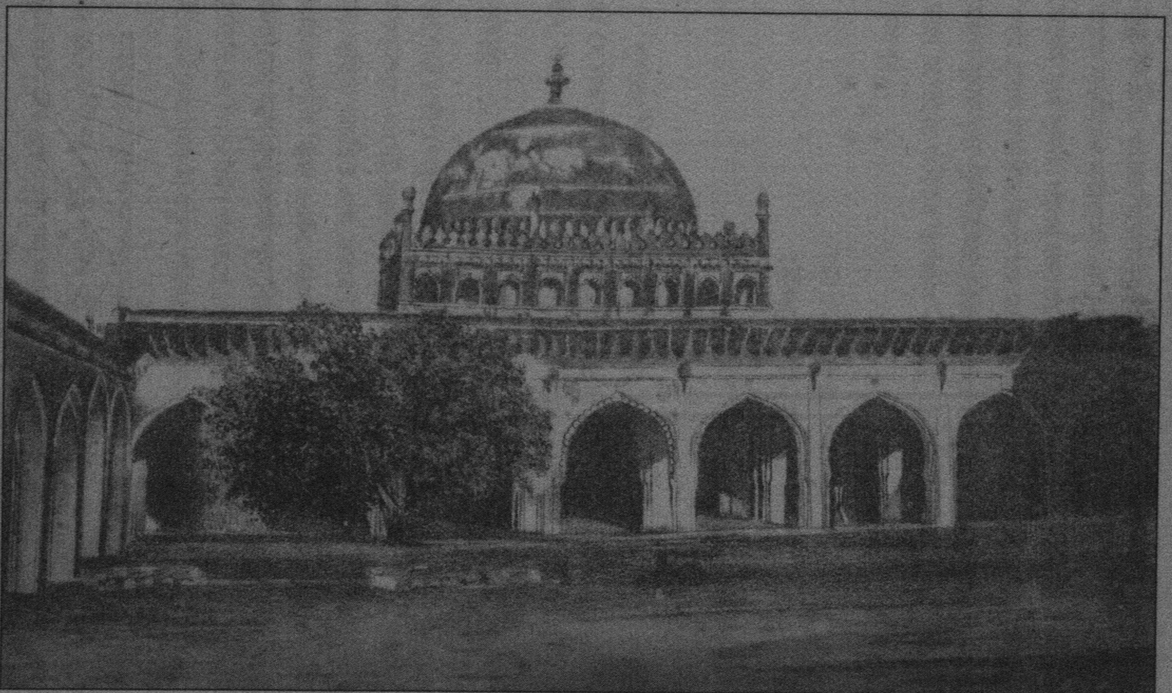
এতদ্ভিন্ন মালিকা জাহান, মালিক সান্দাল, আন্দু, বোখারা প্রভৃতি আরো কত কত মসজিদ আছে অহার ইয়ত্তা নাই। বিজাপুর গোর মসজিদে ছয়লাপ।

বিজাপুরে বেড়াইতে আসিয়া কূপ, বাপী, তোপ, বুরুজ, মসজিদ, গুম্বজ, প্রাসাদের মধ্যে দুইটি "গোরখ ইমলি" বৃক্ষ দেখিতে কেহ যেন ভুলিয়া না যান। এই দুই বৃক্ষ আর্ক-কেল্লার বড় রাস্তার ধারে "দুই বোনের" নিকটবর্তী ময়দানে মাথা তুলিয়া আছে। ইহাদের আকারপ্রকার যে কেবল দর্শনীয় তাহা নহে। তখনকার কালে প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় ব্যক্তিদের ফাঁসিবৃক্ষ বলিয়া ইহাদের বিশেষ গৌরব।

গোরখ ইমলি বৃক্ষ

বিজাপুরের সুখসৌভাগ্যের সময় মধ্যে মধ্যে এক একজন পরিব্রাজক আসিয়া বিস্ময়ানন্দে উচ্ছ্বাসে যে শহর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সে কালের অবস্থা কতকটা অবগত হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্থলে আসাদ বেগের লিখিত বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। আসাদ বেগ লোকটা কে তাহা জানা আবশ্যক। ১৬০০ অব্দের বৎসরেক পরে ইব্রাহিম আদিল শা ও সম্রাট আকবরের মধ্যে এক সন্ধিবন্ধন হয়। সেই উপলক্ষে সম্রাটের পুত্র রাজকুমার দানিয়েলের সহিত ইব্রাহিম স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সময়ে আসাদ বেগ মোগল সম্রাটের দূত স্বরূপ বিজাপুরে আসেন। তথায় সুলতান যথোচিত আতিথ্য সৎকারের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনাপূর্বক বহুমূল্য উপহার দিয়া রাজকুমারী সমভিব্যাহারে তাঁহাকে বিদায় করেন। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক ফেরিস্তাও কন্যাযাত্রীর দলে ছিলেন। এইসঙ্গে মোগল সম্রাটের জন্য অমূল্য মণিরত্ন ও বাছা বাছা হস্তী উপঢৌকন প্রেরিত হয়। হস্তীর মধ্যে একটির কথা এইরূপ কথিত যে, তাহার দুই মণ পরিমাণ মদ্য পান করিবার অভ্যাস ছিল, তাহা অনেক হাঙ্গামা করিয়া যোগাইতে হইত। রাজকুমারীর এই বিবাহে মত ছিল না। তিনি ভীমাতীর পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। রাত্রে এক প্রবল ঝড় উঠিল — তাম্বুকানাত ছিন্নভিন্ন হইল ও রক্ষকেরা ছত্রভঙ্গী হইয়া পড়িল। এই অবসরে রাজকুমারীও পলায়ন করিলেন। সকালে আবার তাঁহাকে ধরিয়া আনা হয় ও আসাদ বেগ যথানির্দিষ্ট স্থানে রাজকুমার দানিয়েলের নিকট তাহাকে পৌঁছাইয়া দেন। আসাদ বেগ বিজাপুর দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শহর বর্ণনা এই ঃ— "বিজাপুর সমুন্নত প্রাসাদ অট্টালিকাপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ নগর। বাজার ৬০ হস্ত প্রস্ত, দুই ক্রোশ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেক দোকানের সামনে একটি ছায়াতরু ও সমুদায় হাটবাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই সকল দোকানে যে সব জিনিস আছে তাহা অন্যত্রে সচরাচর দেখা যায় না। গহনা, বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, রুটি, মৎস্য, মাংস, মদ্য, মসলায় সুসজ্জিত বিপণী শ্রেণী শহরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। গহনার দোকানে নানাবিধ অলঙ্কার ও খড়্গ, ছুরি, দর্পণ প্রভৃতি মণিমুক্তাখচিত

আসাদ বেগের বিজাপুর বর্ণনা



জুম্মা মসজিদ –(JUMMA MUSJID)–বিজাপুর। Lith by Hurry Narayon Bose Calcutta

সুন্দর সুন্দর সামগ্রী প্রস্তুত। পরে রুটিওয়ালার দোকান, কাপড়ের দোকান, আতর গোলাবে সুবাসিত চীনা কাচের শিশিতে সুসজ্জিত আতরের দোকান, ফলমিষ্টান্নভরা ময়রার দোকান, গায়ক নর্তকীদের নাট্যশালা এই সকল বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন — এক কথায়, সমুদায় মার্কেট সুরা সুন্দরী, আতর গোলাব, বস্ত্রালঙ্কার বিপণীহারে সুশোভিত। কোন স্থানে সহস্র সহস্র লোক নৃত্যগীত আমোদে মত্ত। বিবাদ নাই, কলহ নাই, অবিরাম আমোদ-প্রবাহ। এরূপ সুচারু দৃশ্য পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। তিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মহম্মদের অবিকল স্বর্গবর্ণনা — মর্তে যদি কোথাও বেহস্ত (স্বর্গ) থাকে তবে তাহা বিজাপুর —

অগর বেহস্ত অন্দর জমীন হস্ত্ —
হমীনস্ত্ ও হমীনস্ত্ ও হমীনস্ত্!

স্বর্গ যদি কোথাও থাকে মর্ত্যধামে
সে তবে এইখানে — এইখানে — এইখানে!

পুরাতন বিজাপুরের কথায় আমরা যেন নিজ শহরটুকু কল্পনা করিয়া মনে না করি যে এই সে বিজাপুর। শহর অপেক্ষা শহরতলি ভারি — শহরের শাখাপ্রশাখা অনেক দূর বিস্তৃত ছিল, আর আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোকের বসতির বিবরণ শুনিতে পাই সে শহর শহরতলি সবটা ধরিয়া। সাহাপুর, জোরাপুর, ইব্রাহিমপুর, নৌরসপুর, আল্লাপুর, আয়নাপুর প্রভৃতি পুররাজি প্রাচীন বিজাপুরের অন্তর্গত। এই সকলের মধ্যে সাহাপুরই প্রধান। অধুনাতন পাশ্চাত্য চতুঃপুর — সাহাপুর, জোরাপুর, পীর আমীনের দরগা, আফজুলপুর — সেই পুরানো সাহাপুরের ভগ্নাবশেষ। এই সাহাপুর-বিজাপুর মিলিয়া অনেকটা স্থান জুড়িয়া অবস্থিত এবং সাধারণ বিজাপুর সংজ্ঞায় অভিহিত। ইহাতে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। ১৬৩৫ অব্দে মাহমুদ বাদশা মোগল আক্রমণ প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে বিজাপুরের আশপাশ অনেক স্থান বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। সেই সঙ্গে সাহাপুরও অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে যখন শত্রুভয়ে কেল্লার বাহিরে বাস সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠিল তখন হইতে ক্রমে সাহাপুর পুরবাসী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইল।

শহরতলি

সাহাপুরের অন্তর্গত আফজুলপুর শিবাজীর শিকার নামদার আফজুল খাঁর বাসস্থান ছিল। নিজ গ্রামের বিশেষ কিছুই বর্ণনীয় নাই, কিন্তু কিয়দ্দূরে নবাব পরিবারের কতকগুলি গোর আছে তৎসম্বন্ধে এক মজার গল্প আছে। গোরগুলি সকলই স্ত্রীলোকের গোর, আম তেঁতুলবন পরিবৃত একটি সরোবরতীরে স্থাপিত। তাহার জল এখন শুকাইয়া গিয়াছে। এক লাইনে সাতটি গোর, এমন ১১ লাইন। গোরগুলির সকলেরই আকার প্রকার প্রায় সমান। গল্পটা এই যে আফজুল খাঁ যখন শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন

আফজুল পুর

গণৎকারেরা গনিয়া বলে এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা — আর তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইবে না। তাহাদের কথায় প্রত্যয় করিয়া তিনি পূর্ব হইতেই গৃহকার্যের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে সমৎসুক হলেন। তাঁহার সপ্তসপ্ততি বেগম ছিল, তাহাদের গতি কি হইবে? তিনি এক উপায় স্থির করিলেন। বেগমদের পুষ্করিণীর জলে ডুবাইয়া পুষ্করিণীর ধারে তাহাদের সারি সারি গোর দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া যুদ্ধযাত্রায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গল্পটা সত্য কিনা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু এক ধরনের এতগুলি সারি সারি স্ত্রীলোকের গোর দেখিয়া নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

সাহাপুরের পশ্চিমে নৌরসপুর। দ্বিতীয় ইব্রাহিম বিজাপুর ছাড়িয়া এই এক নূতন রাজধানী পত্তনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঐ উদ্দেশে ঐ স্থানে ১৬০০ অব্দে অনেক বড় বড় ঘরবাড়ী নির্মাণ আরম্ভ হয়। স্থানটি গিরিকানন পরিবৃত, বিজাপুর অপেক্ষা দেখিতে সুদৃশ্য বটে। ইব্রাহিমের সাধ কিন্তু অপূর্ণ রহিল। আবার সেই গণৎকারের অন্তরায়। তাহারা তাহাকে রাজধানী পরিবর্তনে অমঙ্গল বলিয়া সতর্ক করাতে তিনি সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে আর সাহস করিলেন না। সে যাহা হউক, এই ধাক্কায় নৌরসপুরে অনেক প্রাসাদ উদ্যান গৃহাবলী নির্মিত হইয়া পুরবাসীদের কাজে আসিল। তাহাদের বেড়াইবার জায়গা — আরামবিরামের স্থান ঐ। উহার গৃহাবলীর ভগ্নাবশেষ এই ক্ষণে যাহা দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে "সঙ্গীত মহল" প্রসাদটি অতীব মনোহর, বিজাপুরের কোন প্রাসাদ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। বাড়ীর সম্মুখে বেশ বড় একটি উৎস ও জলাশয় তোরবীর জলপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত। বাড়ীর দুই পাশ দিয়া ক্ষুদ্র নদী স্রোত বহিতেছে — দূরে পাহাড়ের শোভা — চতুর্দিকের বৃক্ষলতা ভগ্নস্তূপের মধ্যে সঙ্গীত মহলের 'অকথিত' সঙ্গীত লহরী সমুত্থিত হইতেছে।

নৌরসপুর

বিজাপুরের চারিদিকে মরুভূমিসদৃশ শুষ্ক ক্ষেত্ররাজি দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয় — কি করিয়া এ স্থান এই বিপুল রাজ্যের রাজধানী রূপে মনোনীত হইল। তাহার এক কারণ বোধ করি বিজাপুরের জলের প্রাচুর্য। বাহিরের দিকটা যেমন শুষ্ক, ভিতরে তেমনি জলের অনেক উৎস। সেই উপপ্লবপূর্ণ বিশৃঙ্খল কালে ঈদৃশ অবস্থাই তাহার আত্মরক্ষার উপায়। উত্তর দিক হইতে আক্রমণের অধিক সম্ভাবনা — সেই দিকেই ভূমি অনুর্বরা — আক্রমণকারী শত্রুদলের আহারসামগ্রীর অপ্রতুলতাবশতঃ সে দিকটা সুরক্ষিত। দক্ষিণ হইতে পুরবাসীদের অন্নের সংস্থান ও শহরের মধ্য হইতে জলকষ্ট নিবারণ হইত। নগরের মধ্যে তাজ-বাউড়ী প্রভৃতি যে সমস্ত জলাশয় আছে তাহাতে অকুলান হইবার আশঙ্কায় রাজারা দূর হইতে জল আনাইবার অশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তোরবী জলপ্রণালীর ভগ্নাবশেষ ও সুলতান মাহমুদের "বেগম তলাও" এ বিষয়ে তাঁহাদের যত্ন ও উৎসাহের অব্যর্থ প্রমাণ।

মরুদেশে রাজধানী

বিজাপুর

দ্বিতীয় ভাগ

ইতিহাস

বিজাপুর রাজ্য সংস্থাপক য়ুসফ আদিল শা তুরস্ক সুলতান মুরাদের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৪৪৩ অব্দে তাঁহার জন্ম। সুলতান রাজবংশে একটি মাত্র পুত্রসন্তান জীবিত রাখিয়া অবশিষ্টগুলিকে বিনষ্ট করিবার এক নৃশংস রীতি ছিল। এই প্রথানুসারে সুলতান মহম্মদ সিংহাসনারূঢ় হইবা মাত্র তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণের নিধন সাধনের আদেশ জারী করেন — য়ুসফ তাহাদের মধ্যে একজন। য়ুসফের মাতা সন্তানের প্রাণরক্ষার অনেক চেষ্টা দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া তিনি এক কৌশল করিলেন। ইমামুদ্দীন নামক জনৈক পারস্য বণিক কনস্তান্তানিয়ায় বাস করিতেন; তাঁহার সাহায্যে আপন পুত্রের স্থানে অপর একটি বালককে সাজাইয়া দিয়া য়ুসফকে বণিকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বণিক তাঁহার জীবন রক্ষার্থে প্রতিশ্রুত হইয়া য়ুসফকে পারস্যদেশে লইয়া যান ও তাঁহার বিদ্যাধ্যয়নের সুব্যবস্থা করিয়া দেন। সেখানেও তাঁহার জীবন-রহস্য প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ঘোর বিপদার্ণবে মগ্ন করে। অবশেষে অনেক ফাঁড়া কাটাইবার পর য়ুসফের স্বপ্ন হয় যে ভারতবর্ষে প্রয়াণেই তাঁহার কল্যাণ, সেই স্বপ্নানুসারে ১৪৬১-এ তিনি পারস্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া দাভোলে (রত্নগিরি) উত্তীর্ণ হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর — রূপবান বিদ্যাবিনয় সম্পন্ন। জনৈক পারস্য বণিকের আমন্ত্রণে তিনি দাভোল হইতে বাহ্মন-রাজধানী বিদুরে গমন করেন। তথায় রাজমন্ত্রী মহম্মদ গওয়ানের অনুগ্রহে সৈনিক পদে নিযুক্ত হয়েন। সত্বর তাঁহার পদোন্নতি হইল। বিদুর হইতে বল্লাড়ে গিয়া তিনি ১৫০০ অশ্বের অশ্বপতি ও আদিল খাঁ আখ্যাপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহম্মদ গওয়ান তাঁহাকে দৌলতাবাদের গবর্নর নিযুক্ত করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর বিজাপুরে বহমনী রাজার অধীনে তাঁহার কর্ম হয়। ১৪৮৯-এ অধীনতা-ব্যসন পরিত্যাগপূর্বক রাজপদবী গ্রহণ ও বিজাপুরে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করিলেন। ১৪৯৮-এ দক্ষিণ সুলতানেরা বাহমনী রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন, তখন গোওয়া ও তৎসমীপবর্তী প্রদেশ য়ুসফের ভাগ্যে আইসে। যখন ভাস্কো-ডি-গামা ভারতবর্ষের নূতন পথ আবিষ্কারপূর্বক কর্ণাটক তীরে আবির্ভূত হন, তখন য়ুসফ বিজাপুরের অধীশ্বর। পোর্তুগীসদের সঙ্গে গোওয়া লইয়া তাঁহার অনেক যুদ্ধ হয়। ১৫০৯-এ পোর্তুগীসদের রাজপ্রতিনিধি আলবুকার্ক বিজাপুর বিপক্ষে বিজয়নগরের রাজার সহিত সন্ধি বন্ধন করেন। পর বৎসরে আলবুকার্কের হস্তে বিজাপুর সৈন্যের পরাভব হইয়া গোওয়ায় পোর্তুগীস আধিপত্য সংস্থাপিত হয়।

য়ুসফ আদিল সা
১৪৮৯-১৫১০

বিজাপুরে দুই শত বৎসরের মধ্যে নয় জন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, কিন্তু তাঁহারা নির্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। সেকাল সুখশান্তি ভোগের কালই নহে। ঘোর উপদ্রব

— তুমুল বিপ্লব — গভীর অশান্তির মধ্যে তাঁহাদের রাজ্য কারবার। হয় বৈরনির্যাতনের চেষ্টা, নয় শত্রু হইতে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তন। সিয়া ও সুন্নী মুসলমানের যুদ্ধ — প্রতিবাসী সুলতানদের সহিত যুদ্ধ — বিজয়নগরের হিন্দু রাজাদের সহিত যুদ্ধ — মোগলদের সহিত যুদ্ধ — এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে বিজাপুর রাজারা কখন যে রাজ্যশাসন — রাজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের অবকাশ পাইতেন তাহা ভাবিয়া ওঠা যায় না।

যুসফ আদিল শা পারস্যে বাস ও শিক্ষালাভ করিয়া শিয়া ধর্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। স্বীয় রাজ্যে শিয়ামত সংস্থাপন করিতে গিয়া দেখিলেন যে ব্যাপারটা নিতান্ত সহজ নয়। তাঁহার সেনাদের মধ্যে তুর্ক প্রভৃতি অনেকে সুন্নী মুসলমান ছিল, আর প্রতিবাসী সুলতানেরাও এই নূতন মতের প্রতিপোষক ছিলেন না। এই সূত্রে যে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তাহা দাক্ষিণাত্যের ধর্মযুদ্ধ নামে অভিহিত। আহমদনগর, গোলকুণ্ডা, বিদুরের সুলতানগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে পর য়ুসফ অনেক কষ্টে এই ষড়চক্র ভেদ করিয়া পার পাইলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি তেমন গোঁড়া শিয়া ছিলেন না — স্বরাজ্যে শিয়া মত সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্নীদের ধর্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ নিষেধ করিলেন। ধর্মবিষয়ে তাঁহার উদার মত ছিল। তিনি বলিতেন, "যেমন স্বর্গের নানা নিকেতন তেমনি ইসলামের নানা সম্প্রদায়।" হিন্দুদের উপর তাঁহার বিশেষ মমতা ছিল, তিনি একজন মহারাষ্ট্রী রমণী বিবাহ করিয়া হিন্দুজাতির সহিত সহানুভূতির পরিচয় দিলেন।

শিয়া ও সুন্নী

মহারাষ্ট্রী মহিষীর ঔরসে তাঁহার এক পুত্র জন্মে — নাম ইস্মায়ল। য়ুসফের মৃত্যুর পর ইস্মায়ল আদিল শা সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন, রাজ্যাভিষেক কালে তিনি শিয়া, তাঁহার মন্ত্রী কমাল খাঁ সুন্নী। রাজা মন্ত্রীর মধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত। মন্ত্রীর মতলব স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়া বিজাপুরে সুন্নীধর্ম প্রত্যায়ন করেন।

ইস্মায়ল আদিল শা
১৫১০-১৫৩৪

বালক সুলতান ও তাঁহার মাতা, কমাল খাঁ কর্তৃক প্রাসাদে বন্দীকৃত হইলেন। মন্ত্রী স্বয়ং বলপূর্বক রাজ্যলাভের অভিলাষী ছিলেন কিন্তু গণৎকারেরা গনিয়া বলিল এখনো সময় হয় নাই, তাই তিনি নিজগৃহে শুভলগ্ন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

রাজ্ঞী তাঁহার পুত্রের সমূহ সঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া একজন বিশ্বাসী তুর্ককে কমাল খাঁ বধে নিযুক্ত করিলেন। তুর্ক মক্কা যাত্রার ভান করিয়া মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। মন্ত্রী তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। মন্ত্রীবর যেমন তুর্কের হাতে পান দিতে হাত বাড়াইলেন, অমনি সে তড়িতের ন্যায় ত্বরিতে লুক্কায়িত খড়্গ বাহির করিয়া মন্ত্রীর বুকে বসাইয়া দিল; মন্ত্রীর অনুচরেরা সেই দণ্ডে তুর্ককে কাটিয়া ফেলিল। মন্ত্রী ও তাঁহার হন্তা দুজনেই একসঙ্গে প্রাণ হারাইলেন।

মন্ত্রীর মাতা, সুলতানা-সদৃশী সাহসিকা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি পুত্র হারাইয়া আপন পৌত্রকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার মনস্থ করিলেন। পৌত্রের নাম সফদর খাঁ। প্রচার করিয়া দিলেন যে তাহার পুত্র কমাল খাঁ মরেন নাই, আহত হইয়াছেন মাত্র। মৃতদেহ বসন ভূষণে সাজাইয়া বারান্দায় পালঙ্কের উপর বসাইয়া রাখিলেন যেন লোকদের অভিবাদন গ্রহণ করিতে রীতিমত বসিয়া আছেন। এদিকে সফদর খাঁ একদল সৈন্য লইয়া সুলতানের প্রাসাদ আক্রমণ করিতে চলিলেন।

রাজ্ঞীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। দিলসদ নামক রমণী তাঁহার সখী, এই দুই রমণী যুদ্ধবেশ ধারণ করিয়া গৃহপালদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ঘরে লোকজন বড় বেশী ছিল না, ভাগ্যবশতঃ বাহির হইতে একদল শিয়া পক্ষপাতী সেনার প্রবেশ লাভে তাঁহাদের বলবৃদ্ধি হইল। সফদর খাঁ যেমন তাঁহার সুন্নীদের লইয়া প্রাসাদ আক্রমণ করিবেন অমনি উপর হইতে তাহাদের উপর গোলাগুলি প্রস্তর বর্ষণ আরম্ভ হইল। শিয়া সুন্নীদের ঘোরতর সংগ্রাম। অনেকে হত ও আহত হইয়া পড়িল, পরিশেষে সফদর খাঁ দ্বার ভেদ করিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে এক বাণে তাঁহার নয়ন বিদ্ধ হইল, তিনি এক প্রাচীরের আড়ালে গিয়া আত্মরক্ষণে তৎপর হইলেন। সেই প্রাচীরের উপর বালক সুলতান উপবিষ্ট। শত্রুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইস্মাযল এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উপর হইতে নিক্ষেপ করিলেন তাহা সফদর খাঁব উপর পড়িয়া তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিল। এই বিদ্রোহ নিবারণের পর ইস্মায়ল নির্বিঘ্নে রাজত্ব কবিতে লাগিলেন।

ইস্মাযলের রাজত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। মুসলমান সুলতানদের সহিত তাঁহার যেসকল যুদ্ধ হয় তাহা এস্থলে বর্ণন করা অনাবশ্যক। তিনি শিয়া ছিলেন, পারস্য রাজা তাঁহার সম্মানার্থে বিজাপুরে দূত প্রেরণ করেন।

ইস্মায়লের পুত্র মল্লু তাঁহার উত্তরাধিকারী। মল্লু উগ্রচণ্ডা দুরন্ত নরপতি ছিলেন। রাজ্য উচ্ছন্ন যায় দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করাইবার পরামর্শ দেন। ছয়মাস রাজত্বের পব মল্লু অন্ধীকৃত বন্দীকৃত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিমকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইব্রাহিম সুন্নী ছিলেন।

উগ্রচণ্ডা মল্লু

সুন্নীদের মানবর্ধন, শিয়াদের নির্যাতন ও অপদস্থ করা তাঁহার কাজ; এমন কি, অনেক শিয়া মুসলমান তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া বিজয়নগর রাজার অধীনতা স্বীকার করে। ১৫৫৭-এ তাঁহার মৃত্যু হয়। অমিতাচারই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। তাঁহার রোগ প্রতিকারে অক্ষম বলিয়া অনেক রাজচিকিৎসকের মুণ্ডচ্ছেদন ও হস্তীপদ মর্দনে প্রাণদণ্ড বিধান হয়।

ইব্রাহিম
১৫৩৪-১৫৫৭

ইব্রাহিম বাদশাহের রাজত্বকালে বিজয়নগরে ঘোরতর রাজ্যবিপ্লব সংঘটন হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর ত্রিংশৎ বৎসর পরে হক্কা ও বুক্কা দুই ভাই শৃঙ্গিরি মঠাধিপতির সাহায্যে দাক্ষিণাত্যে

বিজয়নগর পত্তন করেন। ১৫৩৫-এ হক্কা হরিহর রায় নামে বিজয়নগরের রাজা হইয়া মুকুট ধারণ করেন। ঐ সময় আবার হসন গাঙ্গু নামক জনৈক পাঠান আল্লা উদ্দীন নাম ধারণপূর্বক দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ মুসলমান রাজ্যের সূত্রপাত করেন। হসন গাঙ্গু একজন ব্রাহ্মণ গণকঠাকুরের উপকার ঋণে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন মানসে তিনি "বামন" পদবী গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বংশ "বাহ্‌মনী" নামে বিখ্যাত। বিজয়নগর ও বাহ্‌মনী সুলতানদের মধ্যে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ চলিত। বিজাপুর স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া দাঁড়াইলে সেও বিজয়নগরের বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। ইব্রাহিম বাদশাহের সময় দেবরায় বিজয়নগরের রাজা। তিম্মা নামে তাঁহার মন্ত্রী ছিল। দেবরায়ের মৃত্যুকালে তাঁহার কোন প্রৌঢ়বয়স্ক পুত্র ছিল না। তিম্মা একজন বালক-রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজা যৌবনপ্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহাকে বধ করিয়া আব একটি বালকের মাথায় মুকুট দেওয়া হয় — এইরূপে উপর্যুপরি তিনজন বালক-রাজার অভিষেক ও মৃত্যু হয়। অবশেষে তিম্মা দেবরায়ের এক পৌত্রীর সহিত আপন পুত্র রামরায়ের বিবাহ দিয়া রামরায়কে সিংহাসনে স্থাপন করেন। রাজকুল সমূলে নির্মূল করা তিম্মার অভিপ্রায়। সে অভিপ্রায় সম্পূর্ণ না হউক অনেকাংশে সিদ্ধ হইল। কেবল তির্মল নামক একজন আধপাগলা জানোয়ার আর কন্যাকুলের একটি রাজকুমার এই দুই রাজবংশধর অবশিষ্ট বহিল।

বিজয়নগর

রামরায় অবাধে রাজ্যলাভ করিলেন কিন্তু নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ তাঁহার ভাগ্যে ছিল না। রাজপদ পাইয়া তিনি প্রগল্‌ভ ও গর্বিত হইয়া উঠিলেন। প্রজারা তাঁহার উপর চটিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল — তাহারা বলিতে লাগিল ইনি কোথাকার জাল রাজা, আমরা একজন খাঁটি রাজা চাই। রামরায় বেগতিক দেখিয়া অবশিষ্ট রাজকুমারটিকে সিংহাসনে বসাইয়া মন্ত্রী হইলেন। ক্রমে তাঁহার অরিকুল ধবংস করিয়া রাজাকে সরাইয়া পুনর্বার স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

ইহাতেও রাজ্যের শান্তি হইল না। এদিকে আবার আধপাগলা তির্মল গোলযোগ আরম্ভ করিল, তাহারও রাজা হইবার চেষ্টা। তির্মল ও রামরায়ের মধ্যে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। অনেকে রামরায়ের পক্ষ হইয়া তির্মলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। তির্মল এই সঙ্কটে বিজাপুর সুলতান ইব্রাহিমকে অনেক ধনরত্ন উপহার পাঠাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

ইব্রাহিম আহ্লাদের সহিত আমন্ত্রণ স্বীকারপূর্বক সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে বিজয়নগরে উপস্থিত — তির্মল তাহাকে স্বাগত বলিয়া বহু সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

হিন্দুদের মধ্যে হুলুস্থুল বাধিয়া গেল। হিন্দুরাজ্যে এইরূপে যবন রাজের হস্তক্ষেপ সকলেরই অসহ্য হইল। রামরায় ও তৎপক্ষীয় লোকেরা তির্মলকে সুলতান বিসর্জনে অনুরোধ করিল — বলিল, আমাদের কথামত কাজ করিলে আমরা চিরকাল আপনার অনুগত ভৃত্য হইয়া

থাকিব। তির্মল আশ্বাস পাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা দক্ষিণা দিয়া অনেক কষ্টে ইব্রাহিমকে বিদায় করিলেন। মুসলমানেরা যেমন কৃষ্ণা পার হইল প্রজারাও আপনাদের বচন ভুলিয়া দাঁত দেখাইতে আরম্ভ করিল। জনরব উঠিল প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া তির্মলকে ধরিতে আসিতছে। এই সংবাদে তির্মল একেবারে অধৈর্য ও কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনাশূন্য হইয়া পড়িলেন। অশ্বগজের চক্ষু উৎপাটন, রাজবাটীর গহনাপত্র জাঁতায় পিশিয়া চুরমার করণ, এইরূপ ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। পরে শত্রুরা রাজভবনে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় তিনি আত্মহত্যায় বিপদরাশি হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

রামরায় এখন নির্ভয়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন — তাঁহার শাসনে রাজ্যের পূর্ব সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিল। মুসলমানদের মধ্যে ঈর্ষা ও ভয়ের সঞ্চার হইল।

এদিকে ইব্রাহিমের পশ্চাৎ আলি আদিল শা বিজাপুরের সিংহাসন আরোহণ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ রামরায়ের সহিত মিত্রতাবন্ধন করেন। হিন্দু-মুসলমানের এরূপ মিলন আর কখনও শুনা যায় নাই। রামরায়ের পুত্রশোক ঘটনায় আলি বিজয়নগর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বিজয়নগরের রাজারাজ্ঞী আলিকে পুত্ররূপে বরণ করেন। আহমদনগরের সহিত আলির যখন যুদ্ধ হয় তখন রামরায় বিজাপুর সুলতানের সহায়তা করেন।

আলি আদিল শা
১৫৫৭-১৫৮০

হিন্দুদের গুমর বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধাবসানের পর রামরায় অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া যবন রাজ্য তৃণবৎ দেখিতে লাগিলেন — মনে করিলেন ভারতে আমার সমান রাজা আর নাই। মুসলমানদের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। মসজিদে ঘোড়ার আস্তাবল বসাইয়া তাহাদের ধর্মের অপমান — সুলতানেরা যেন তাঁহার পদানত ভৃত্য — তাঁহাদের দূতের অপমান। তখন সুলতানেরা চটিয়া উঠিয়া প্রগলভ হিন্দু রাজাকে দমন করিতে কটিবদ্ধ হইলেন। তাঁহারা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ বিসর্জন দিয়া বিদুর ও আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকণ্ডা এই চতুঃসুলতান বিজাপুরে আসিয়া একত্র হইলেন। তথা হইতে চারি সুলতান বিজয়নগরের উপর হল্লা করিতে কৃষ্ণা নদী পার হইলেন। নদীতীরে আসিয়া দেখেন রামরায়ের সৈন্যদল পরপারে সম্মিলিত। নদীর ঘাট সুরক্ষিত, পারাপার বন্ধ। সুলতানেরা এক ফন্দী করিলেন। তাঁহারা নদীর কিনারা দিয়া কতক দূর চলিয়া গেলেন যেন পার হইবার অপর স্থান অন্বেষণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে রামরায়ের সেনাপতি স্বস্থান ছাড়িয়া পরপারে শত্রুর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিতে লাগিলেন। তিনদিন এইরূপ চলিল। তৃতীয় রাত্রে সুলতানেরা সত্বর প্রত্যাবর্তনপূর্বক পূর্ব স্থানে আসিয়া নির্বিঘ্নে নদী পার হইলেন। পরদিন সন্ধ্যার সময় মুসলমানেরা রামরায়ের সৈন্যের ৫ ক্রোশ দূরে আসিয়া বিশ্রাম করিল।

প্রভাতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল পরস্পর সম্মুখীন হইল। উভয়েই বন্দুক কামান ও নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। হিন্দুরা মহারোখে আক্রমণ করিয়া মুসলমান সৈন্যেব বাহুদ্বয় ভাঙিয়া

ফেলিল, কিন্তু মধ্যভাগ অটল। মধ্যভাগের নেতা অহমদনগরের 'দিওয়ানা' সুলতান হুসেন নিজাম শা শীঘ্রই রামরায়ের সৈন্যদলের উপর আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে যে কামান ছিল তাহাতে পয়সা পুরিয়া হিন্দদের প্রতি বর্ষণ করিতে লাগিলেন — সেই মারাত্মক অর্থপাতে হিন্দু সৈন্যের মধ্যে মহা অনর্থপাত ঘটিল। ক্রমে হিন্দুগণ অবসন্ন হইয়া পড়িল। বামরায় তাঁহার পালকীতে উঠিয়া বেহারাদের দূরে যাইতে আদেশ করিলেন। বেহারাগণ খানিক দূর গিয়া পালকী রাখিয়া পলায়ন করিল। রামরায় অশ্বারোহণে পলায়নোদ্যত এমন সময় ধৃত হইয়া হুসেন শার সমক্ষে আনীত হইলেন। হুসেন শা তাঁহার "দিওয়ানা" উপাধীর উপযুক্ত রূপ কার্য করত মুণ্ডচ্ছেদের হুকুম দিলেন — তৎক্ষণাৎ সে আজ্ঞা পালিত হইল। সুলতানের অনুচরেরা রামরায়ের ছিন্ন মুণ্ড বর্ষাবিদ্ধ করিয়া সৈন্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। রাজার এই দশা দেখিয়া হিন্দুসৈন্য হতশ্বাসে পলায়নপরায়ণ — মুসলমানেরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। এই তালিকোটের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে দুপক্ষেব লোক মিলিয়া সমরক্ষেত্রে ন্যূনাধিক দুই লক্ষ সেনার সম্মিলন হয়। হিন্দুসৈন্য বিস্তর মারা পড়ে এবং বিজয়ীদের লুণ্ঠনজাত প্রচুর ধনরত্ন লাভ হয়। অতঃপর বিজয়ী সেনাগণ বিজয়নগরে প্রবেশপূর্বক নগর মাঝে যবন-জয়পতাকা উড্ডীন করিল। সেখানকার লুটপাটের ব্যাপার বর্ণনাতীত। নগরের বাড়ীঘর চুরমার, লণ্ডভণ্ড — হিন্দু কীর্তিচিহ্নসকল চকিতের মধ্যে বিলুপ্ত হইল। রামরায়েব ছিন্ন মুণ্ড জয়স্তম্ভস্বরূপ আহমদনগরে প্রেরিত ও তাহার এক প্রস্তর প্রতিমা বিজাপুরে স্থাপিত হয়। এই প্রস্তর মণ্ড আর্ক কেল্লায় সেদিন পর্যন্ত অনেকে দেখিয়াছেন। তালিকোটের যুদ্ধেই বিজয়নগরের ধ্বংস। এই যে তাহার পতন হইল আর তাহার উত্থানশক্তি রহিল না। দক্ষিণের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য চিরকালের মত প্রলয়সাগরে ডুবিয়া গেল।

তালিকোটের যুদ্ধ ১৫৮৫

১৫৮০ অব্দে আলীর মৃত্যু হয়। ইমারত নির্মাণে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল — জুম্মা মসজিদ, তাজ বাউড়ী, শহরের প্রাচীর, জলপ্রণালী প্রভৃতি অনেক জিনিস তাঁহার সময়কার। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে দিল্লীশ্বর আকবর প্রেরিত কয়েকজন দূত বিজাপুরে আগমন করেন, তাঁহাদের কি গূঢ় মতলব প্রকাশ পায় নাই, মোগলের গুপ্তচরেরা বিজাপুরের উপর সেই যে শনির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল অচিরাৎ তাহার গরল ফল ফলিত হইল।

ইতিহাস

(উপসংহার)

আলির উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ইব্রাহিম। পিতৃব্যের মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৯ বৎসর মাত্র। তাঁহার নাবালক অবস্থায় আলির মহিষী চাঁদবিবি রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কমাল খাঁ সচিব প্রধান, কমাল খাঁর বিদ্রোহ চেষ্টা প্রকাশিত হওয়াতে চাঁদবিবি তাঁহার প্রাণদণ্ড আদেশ করেন। তাঁহার পশ্চাৎ কিশোর খাঁ প্রধান পদে আরূঢ় হইয়া চাঁদবিবির শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন ও ছলেবলে কৌশলে রাজ্ঞীকে গ্রেপ্তার করিয়া সাতারা দুর্গে নির্বাসিত করিলেন। মন্ত্রীকে শীঘ্রই এই অত্যাচারের ফলভোগ করিতে হইল। চাঁদবিবি স্বপক্ষীয় সৈন্য সাহায্যে বন্ধনমুক্ত হইলেন, কিশোর খাঁ প্রাণভয়ে পলায়নান্তর গলকণ্ডায় একজন হন্তারকের হস্তে মারা পড়িলেন। অতঃপর মন্ত্রী দিলাবর খাঁ দক্ষতা ও বিজ্ঞতার সহিত কয়েক বৎসর রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার সুশাসনে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হইল। তিনি আহমদনগর ও গলকণ্ডা সুলতানদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন ও গলকণ্ডা সুলতানের ভগিনী চাঁদ সুলতানার সহিত ইব্রাহিমের বিবাহ দিয়া দিলেন। দিলাবর খাঁ ইব্রাহিম বাদশাহের প্রিয়পাত্র ছিলেন না। মন্ত্রীর অধীনতা সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন এবং তাঁহাকে পদচ্যুত ও নির্বাসিত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণপূর্বক রাজ্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন। ১৫৯৪-এ তাঁহার ভ্রাতা ইস্মায়ল বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। এই গোলযোগে আহমদনগর সুলতান বহ্রান নিজাম শা বিজাপুর আক্রমণ করিলেন কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ হইল না;প্রত্যুতঃ এই যুদ্ধই তাঁহার রাজ্যনাশের মূল। যুদ্ধারম্ভের অনতিকাল পরে বহ্রানের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রও রণক্ষেত্রে বিজাপুর সৈন্যহস্তে মারা পড়েন;আহমদনগরে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত।

দ্বিতীয় ইব্রাহিম
১৫৮০-১৬২৬

বহ্রান নিজাম শার মৃত্যুর পর আহমদনগর দুই দলে বিভক্ত হয়; চাঁদবিবি তন্মধ্যে একদলের অধিনায়িকা ছিলেন। অপর দলের দলপতি মোগল সম্রাটের শরণাপন্ন হইয়া আকবরের পুত্র যুবরাজ মোরাদকে পত্র লেখেন। মোরাদ তখন গুজরাটে ছিলেন। মোগলেরা দাক্ষিণাত্যে হস্তক্ষেপ করিবার অবসর অনেক কাল অন্বেষণ করিতেছিল, তাহারা এই সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নয়। সম্রাটের আদেশক্রমে মোরাদ আহমদনগরের সম্মুখে সসৈন্য উপনীত হইলেন। মোগল আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষার একজন প্রধান উদ্যোগী চাঁদ বিবি। তিনি কবচ ধারণপূর্বক তরবার হস্তে স্বয়ং দুর্গপালদের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের উৎসাহদান ও দুর্গরক্ষণের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিজাপুর সুলতান ইব্রাহিমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন;ইব্রাহিম আসিলেন বটে কিন্তু সময় মত আসিতে পারেন নাই। যখন আসিলেন তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। চাঁদবিবির যত্ন ও

চাঁদ বিবি

চেষ্টায় মোগলরা প্রথমবার অল্পে তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যায়। যুবরাজ প্রস্তাব করিলেন যদি বহ্লার-প্রান্ত (Berar) ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবেন। চাঁদ বিবি বিজাপুরের সাহায্য লাভে হতাশ হইয়া এই প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। এবারকার মত যেন কোন প্রকারে নিস্তার পাইলেন, কিন্তু দুই বৎসর পরে আবার যখন মোগলেরা দেশ আক্রমণ করিল তখন আর শত্রুহস্ত এড়াইতে পারিলেন না। রাজ্ঞী দেশরক্ষণে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এদিকে বাহিরের শত্রু, তাঁহার উপর আবার গৃহবিচ্ছেদ; উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগলদের সঙ্গে সন্ধি সাধনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় সৈন্যেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। একজন বিদ্রোহী সৈনিকের খড়্গাঘাতে রাণী প্রাণ হারাইলেন; তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আহমদনগর শত্রুহস্তে নিপতিত হইল। চাঁদ বিবি ভারতবীর নারীদের মধ্যে একটি রত্ন; দাক্ষিণাত্যে তাঁহার নাম ও যশ চিরস্মরণীয়।

দ্বিতীয় ইব্রাহিম শিল্পবিদ্যা বিশারদ সুশিক্ষিত সুযোগ্য নরপতি ছিলেন। মহারাষ্ট্রী ও পারস্য ভাষা মিশ্রিত ব্রজভাষাসদৃশ ভাষার রচয়িতা বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। জগদ্গুরু তাঁহার আখ্যা — লোকে তাঁহাকে ইব্রাহিম জগদ্গুরু বলিয়া জানে। গুরুচরিত্র নামক গ্রন্থে আছে যে ইনি পূর্বজন্মে দত্তাত্রেয় দেবের একজন অনুগত ভক্ত ছিলেন, দেবতার প্রসাদে নৃপকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্রাহিমের রাজত্বকালে দত্তাত্রেয়ের (নরসোবা) মন্দির নির্মিত হয় ও কথিত আছে ইব্রাহিম এই মন্দিরে গিয়া পূজা করিতেন। বিজাপুর-মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে তিনি ইস্‌লাম পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যরূপে হিন্দুধর্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার সময়কার কোন কোন প্রকাশ্য দলিলের উপর "শ্রীসরস্বতী প্রসন্ন" শিরোনামা দৃষ্ট হয়। ইব্রাহিমের মৃত্যুকালে বিজাপুরের পূর্ণ সৌভাগ্যের অবস্থা — রাজভাণ্ডার পূর্ণ — প্রজাগণ সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন — দুই লক্ষ পদাতিক ৮০০০০ অশ্বারোহী সৈন্যবল।

মাহমুদ ১৬২৬-১৬৫৬

ইব্রাহিমের পর মাহমুদ আদিল শা। মাহমুদের রাজত্বকাল ৩০ বৎসর। ইনি যদিও যুদ্ধে অনুরক্ত ছিলেন না তথাপি রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাপী সরোবর জলপ্রণালী সমস্ত রচিত হইয়া শহরের জলসৌকর্য সম্পাদিত হয়। জুম্মা মসজিদের সুবর্ণরঞ্জিত ভজনালয় তাঁহার রচিত। বিপুল কাষ্ঠস্তম্ভাবলম্বিত উচ্চচ্ছদ-চিত্রিত প্রকোষ্ঠ সমন্বিত আসারমহল তাঁহারই কীর্তিস্তম্ভ। আর বিজাপুরের বিশেষ ভূষণাস্পদ যে গোলগুম্বজ তাহা তাঁহারই সুযোগ্য সমাধিমন্দির।

শিবাজী

মাহমুদের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রী বীর শিবাজী আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা সাহাজী বিজাপুর সুলতানের অধীনে কর্ম করিতেন। পিতার সর্ববাদিসম্মত রাজভক্তির আড়ালে ও মাতার উৎসাহ বাক্যতলে তিনি

এক একটি করিয়া পাহাড় দুর্গ অধিকারপূর্বক বিস্তীর্ণ রাজ্যের পত্তন করিলেন। লোকে ভাবে যেন তিনি বিজাপুর রাজার হইয়া কার্য করিতেছেন। তাঁহার নিগূঢ় অভিসন্ধি কেহ সন্দেহ করিতে না করিতেই তিনি বিস্তৃত প্রদেশ আত্মবশ করিয়া লইলেন। ১৬৪৬-এ পুনার নিকটবর্তী তোরনা দুর্গ অধিকার ও তন্নিহিত গুপ্তধন আবিষ্কার করিয়া অবধি তিনি বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কোঙ্কনস্থ কল্যাণ হইতে বিজাপুরে রাজস্ব লইয়া একদল লোক আসিতেছিল শিবাজী সে ধন লুণ্ঠন করিয়া লন ও ক্রমে অন্যান্য দুর্গ দখল করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন, এই সকল কাণ্ড দেখিয়া রাজা তাঁহাকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া স্থির করিলেন। সাহাজী তখন কর্ণাটকে — তাঁহাকে বিজাপুরে আনাইয়া জেলখানায় বন্ধ করা হইল ও বলা হইল যে তাঁহার পুত্র যত দিন ধরা না দেন ততদিন তাঁহার মুক্তিলাভ নাই। শিবাজী মোগল সম্রাট সাজিহানের নিকট আবেদন করিয়া অনেক কষ্টে পিতার মুক্তিসাধনে কৃতকার্য হয়েন ও আবার পূর্ববৎ লুটপাটে রাজ্য বৃদ্ধি করিবার সন্ধি লাভ করেন।

দ্বিতীয় আলি
১৬৫৬-১৬৭২

মাহমুদের রাজত্বকালে শিবাজীর এই কাণ্ড, — দ্বিতীয় আলি আদিল শার সময়ে তাঁহার দৌরাত্ম্য ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মোগল ও মহারাষ্ট্রীদের উপদ্রবে বিজাপুরের মুহূর্তের তরে সুস্থির হওয়া দুষ্কর। ১৬৫৭ অব্দের পূর্বে শিবাজী বিজাপুরের অধীনস্ত অনেক প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন ও মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজীবের নিকট হইতে সনদ আনাইয়া আপন অধিকার বৈধ ও কায়েম করিয়া লন। পরিশেষে শিবাজীকে দমন করিবার ভার বিজাপুর সেনাপতি আফজুল খাঁর হস্তে সন্যস্ত হয়।

আফজুল খাঁ

আফজুল খাঁর যুদ্ধযাত্রার পরিণাম জানাই আছে। তিনি শিবাজীর বিরুদ্ধে ৭০০০ পদাতিক ৫০০০ ঘোড়সওয়ার কামান অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মহা আড়ম্বরে কুচকরতঃ মহাবালেশ্বর পাহাড়ের ক্রোড়ে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। শিবাজী দেখাইলেন যেন তিনি প্রাণভয়ে, সেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণে প্রস্তুত, প্রতাপগড়ে তাঁহাদের সাক্ষাৎকার সাব্যস্ত হইল। শিবাজীর অনুরোধ এই যে তাঁহাদের সম্মিলনে অন্য লোকজন উপস্থিত না থাকে। নবাব সাহেব তাহাতেই সম্মত হইয়া সৈন্য-সামন্ত পাহাড়ের নীচে রাখিয়া একটি মাত্র সহচর সঙ্গে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। শিবাজীকে ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে পদার্পণ করিতে দেখিয়া নবাবসাহেব তাঁহাকে আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইলেন। শিবাজীর হাতে বাঘনখ প্রচ্ছন্ন ছিল, কোলাকুলির সময় সেই গুপ্তাস্ত্রে তিনি আফজুলের বক্ষ বিদারণপূর্বক তাঁহাকে ধরাশায়ী করেন ও ভবানী খড়্গাঘাতে কর্ম শেষ করিয়া ফেলেন। এদিকে তাঁহার সৈন্যগণ ঝোপঝাপ অন্তরাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নবাব সৈন্যের উপর পড়িয়া তাহাদের ছারখার করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপে ছলেবলে কার্যোদ্ধার করিয়া শিবাজী মহারাষ্ট্র রাজ্যের মূল পত্তন করিলেন। তাঁহার যশের রব চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইল। ইহার পরেও

বিজাপুরের সহিত তাঁহার অনেক যুদ্ধ হয় কিন্তু যুদ্ধে হারাইয়াও তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। এক স্থানে পরাভূত হইয়া অপর স্থানে ফুঁড়িয়া উঠিয়া পূর্ব্ববৎ উপদ্রব আচরণ করিতে থাকেন। ১৬৬২ পর্যন্ত এইরূপ চলিল, অবশেষে বিজাপুর রাজা হার মানিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। শিবাজী যেসকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারই হইল। সে রাজ্যের আয়তন কল্যাণ হইতে গোওয়া পর্যন্ত সমুদায় কোঙ্কণ তীর ও ভীমা হইতে বর্ণা নদী পর্যন্ত ১৩০ মাইল দীর্ঘ ১০০ মাইল প্রস্থ সহ্যাদ্রির উত্তরস্থ ভূমিখণ্ড। শুদ্ধ তাহা নহে, শেষে এমন হইল যে শিবাজীর বর্গী নিষ্পীড়িত চৌথাই কর হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য বিজাপুর তাঁহাকে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা ঘুস দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মহারাষ্ট্রীদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও বিজাপুরে শান্তি নাই। ১৬৬৫-তে সম্রাট ঔরঙ্গজীব বিজাপুর বিজয় মানসে রাজা জয়সিংহকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন। আলি যদিও এই মোগল আক্রমণ অনেক কষ্টে প্রতিরোধ করিলেন কিন্তু দেখিলেন দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ মোগলদের হস্ত হইতে তাঁহার রাজ্য রক্ষা সুকঠিন। দু বৎসর পরে মোগল সম্রাটের সহিত তাঁহার এক সন্ধি হয় তাহাতে তিনি বিজাপুর রাজ্যের অনেক ভাগ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ছাঁটিয়াছুটিয়া ভীমানদী রাজ্যের উত্তর সীমা নিরূপিত হইল, ১৬৭২ অব্দে ১৬ বৎসরের বিচিত্র ঘটনা-পূর্ণ রাজত্বের পর দ্বিতীয় আলি আদিল সা ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।

সেকেন্দর আদিল শা ১৬৭২-১৬৮৬

আলির মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র সেকেন্দরের বয়স ৫ বৎসর। সেকন্দর আদিল শা বিজাপুরের শেষ সুলতান, ইহার রাজত্বকালে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজীব বিজাপুর আক্রমণ করেন।

ঔরঙ্গজীব ১৬৮৩

অনেকদিন হইতে বিজাপুর বিজয়ে তাঁহার সাধ — যদিও এ পর্যন্ত তাঁহার আশানুরূপ ফললাভ হয় নাই, তাঁহার সেনাপতিগণ বারম্বার বিফল প্রযত্নে বিজাপুরের দ্বার হইতে শূন্য-হস্তে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন তথাপি সে চিরপোষিত রাজ্যালোভ নিরস্ত হইবার নহে। ১৬৮৩-তে তিনি দক্ষিণবিজয় উদ্দেশে অসীম সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন — সেই যে দিল্লী ছাড়িলেন আর ফিরিবার অবকাশ পাইলেন না! তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬৩ বৎসর — তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ পথে পথে তাম্বুতে অতিবাহিত হইল। অনেক যুদ্ধে তিনি দক্ষিণের মুসলমান রাজ্যসকল জয় করিলেন বটে কিন্তু মহারাষ্ট্রীদের দমন চেষ্টায় তাহার সমস্ত বল হানি, সমস্ত আয়ুঃক্ষয় হইল। পরিশেষে প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে ঊনশতার্ধ বৎসর রাজত্বের পর অশেষ বিঘ্নবিপত্তির মধ্যে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার কি শোচনীয় অবস্থা! অতীতের দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর। ভবিষ্যৎও সকলি নিরাশা-অন্ধকারময়। পুত্রেরা বিদ্রোহী — উৎপীড়িত হিন্দু রাজগণ প্রতিপীড়নে সমুদ্যত। তিনি যদি দক্ষিণ সুলতানদের সহিত মিলিয়া মহারাষ্ট্রীদের দমনে সচেষ্ট হইতেন তাহা হইলে হয়ত কৃতকার্য হইতে পারিতেন

কিন্তু দক্ষিণের মুসলমান রাজ্যসকল গ্রাস করিয়া সে পথ বন্ধ করিলেন। তিনি স্বহস্তে প্রলয়ের বীজ বপন করিয়া গেলেন — অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার রচিত প্রকাণ্ড রাজ্য ভগ্ন চূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইল।

১৭৯৫-এ কাবেরি নামক ইতালিয়ন পরিব্রাজক ঔরঙ্গজীবের ক্যাম্প দেখিতে যান। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে মোগল সম্রাটের চালচলন ও যুদ্ধ প্রবাসের কতক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাবেরি রাজদরবারে সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঔরঙ্গজীব কৃশাঙ্গ, খর্বকায়, বৃহন্নাসা ও বয়োভারে অবনত — শুভ্রবেশ পরিহিত — মস্তক মুক্তাজড়িত জারির কিরীটে বিভূষিত। তাঁহার শ্যাম মুখে শুভ্রদাড়ী ফুটিয়া উঠিয়াছে। দরবার তাম্বুর মধ্যে সুরঞ্জিত উচ্চ সিংহাসন — চারিকোণে চারিটি রজত স্তম্ভ, উঠিবার একটি রজত পাদপীঠ। সম্রাট এই সিংহাসনে উপবিষ্ট — আমীর সভাসদেরা তাঁহার আগে আগে চলিয়াছে — দুইজন ভৃত্য চামর ব্যজন করিতেছে, একজন ছত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান। ঔরঙ্গজীব সহাস্যবদনে নিজ হস্তে প্রজাদের আর্জীসকল গ্রহণ করিতেছেন — বিনা চশমায় পাঠ করিয়া আপন হাতে হুকুম লিখিতেছেন। কাবেরি বলেন সম্রাটের সঙ্গে সৈন্যবল দশ লক্ষ পদাতিক — অশ্ব ৬০০০০ — মাল বহনের জন্য ৫০০০০ উষ্ট্র আর হস্তী ৩০০০; সেনা নিবাস ৩০ মাইল বিস্তৃত। এতদ্ভিন্ন ব্যাপারী দোকানদার কারিগর কর্মচারী প্রভৃতি লোক মিলিয়া জনসংখ্যা সর্ব সুদ্ধ ৫০ লক্ষ হইবে। নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সকল প্রকার সামগ্রী সমাকীর্ণ সম্রাটের ক্যাম্প এক প্রকাণ্ড জঙ্গম পুরী বলিলেই হয়। হাট-বাজার দোকানে ছয়লাপ। আপন আপন অনুচরবর্গের জন্য প্রত্যেক আমীরের আলাদা আলাদা হাট বাজার। সম্রাট ও রাজাদের তাম্বু প্রায় ৩ মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত ও বিহিত উপায়ে সুরক্ষিত; তীর ধনুক বর্শা তরবার পিস্তল বন্দুক — গুরু ও লঘু কামান এই সকল অস্ত্রশস্ত্র। গুরু কামানের উপর পোর্তুগীস ইংরাজ ওলন্দাজ জর্মন ফরাসিস প্রভৃতি ইউরোপীয় অধ্যক্ষ-সকল নিযুক্ত। বিদেশীগণ একবার মোগলের চাকরী গ্রহণ করিলে আর ছাড়িবার পথ পায় না — পলায়ন ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

ঔরঙ্গজীবের ক্যাম্প

এই এক দৃশ্য আর মহারাষ্ট্রী সেনাদের ধরন দেখ। সহস্র অশ্বারোহী সেনা, তাহাদের কোন নিয়ম নাই, বন্দেজ নাই — পূর্ব সঙ্কেত অনুসারে হয়তো কোন বিজন প্রদেশে সম্মিলিত। সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ খোরাক — ঘোড়ার জিনের উপর এক একটি কম্বল মাত্র সম্বল, আর লুটের মাল ভরিবার জন্য এক একটি থলি। রাত্রে কোথাও বিশ্রাম করিতে হইলে ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরিয়াই নিদ্রিত — দিবসে গাছতলায় কিম্বা কম্বলের আড়ালেই তাহার যথেষ্ট বিশ্রাম — রৌদ্রের উত্তাপে ভ্রূক্ষেপ নাই, কোমরে তরবার বাঁধা ও অশ্বের সামনে ভূনিখাত এক একটি বল্লম। এইসব সামান্য সরঞ্জাম লইয়া মহারাষ্ট্রী বীরেরা যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইতেন,

মোগলদের অচল দলবল কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিত না। অনেক বৎসর যুদ্ধ সংগ্রামের পর মোগল সম্রাট আপনার ক্যাম্পেই বন্দী হইয়া পড়িলেন, মহারাষ্ট্রীদের সেনাগণ মুমুর্ষু সম্রাটের চতুর্দিকে বীরদর্পে নৃত্য করিতে করিতে মোগলদের নাজেহাল পিশেহাল করিয়া তুলিল।

এইসব উড়’ উড়’ কথার পর এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করা যাক। ১৬৮৯-এ রাজকুমার আজম সোলাপুর হস্তগত হইলে তিনি বিজাপুরের উপর গিয়া পড়েন কিন্তু সে আক্রমণে বিলক্ষণ বাধা পড়িল। মোগলদের আগমনে বিজাপুরের লোকেরা বিবাদ কলহ দলাদলি ভুলিয়া ঐক্যবন্ধনে মিলিত হইল। বিজাপুর সৈন্যদের প্রতিঘাতে মোগলেরা বিপদগ্রস্ত হইয়া ভীমার উত্তরে হটিয়া গেল। বর্ষশেষে আজম পুনর্বার সৈন্যসহ প্রত্যাগত হইলেন। এবার বিজাপুর সেনারা আর এক কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা সীমান্তে মোগলদের প্রতিরোধ না করিয়া রাজধানী মধ্যেই বলসঞ্চিত রাখিয়া তাহাদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এইরূপ আচরণের সুফল আপনা হইতেই ফলিল। বিজাপুরের উত্তর অঞ্চলে ধান্য শস্য জলের অভাব — অতবড় মোগল সৈন্যের আহার যোগানো বিষম দায়। সোলাপুর হইতে তাহাদের সকল আহার সামগ্রী-সংগ্রহ করিতে হইত — এদিকে বিজাপুরের অশ্বারোহী দল অন্নবাহক লোকদের কাটিয়া ফেলে — মহা উৎপাত! অবশেষে আহমদনগর হইতে অনেক কষ্টে ধান্য আমদানী হওয়ায় মোগল সৈন্য রক্ষা পায়। ইত্যবসরে সম্রাট স্বয়ং রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন হাইদ্রাবাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন তাহা কোনমতে তালিতুলি দিয়া শেষ করিয়া সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইলেন। আসিয়া দেখেন তাঁহার পুত্র আজমের সৈন্য বিজাপুর একপ্রকার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে — সে সৈন্যের যে সমস্ত অভাব ছিল তাঁহার আগমনে তাহা দুর হইল। শহরের দক্ষিণে প্রাচীর ভেদযোগ্য কামানসজ্জা প্রস্তুত হইল ও তাহার বলপ্রয়োগে প্রাচীর স্থানে স্থানে শীঘ্রই ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন সম্মুখ যুদ্ধের প্রয়োজন নাই — ভিতরে অন্নকষ্টেই কার্যোদ্ধার হইবার সম্ভাবনা; “সবুরে মেওয়া ফলে” এই বাক্য স্মরণ করতঃ পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনোরথ অবিলম্বে সিদ্ধ হইল। যেমন অন্নাভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল বাধা দিবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে কমিয়া আসিল। ১৬৮৫, ১৫ অক্টোবরে নগরপালেরা হার মানিয়া সম্রাটের চরণে আত্মসমর্পণ করিল। ঔরঙ্গজীব তাঁহার আমীর উমরা প্রধান প্রধান সৈনিক সহচরে পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে বিজিত বিজাপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রজাবর্গের বিলাপধ্বনির মধ্যে আর্ক কেল্লার গগন মহলে উপনীত হইয়া প্রধান প্রধান সরদারদের নজরানা গ্রহণ করিলেন। অভাগা সেকন্দর বিজিত রাজার ন্যায় সম্মানিত হওয়া দূরে থাকুক, বন্দীকৃত বিদ্রোহীর ন্যায় রজত শৃঙ্খলে সম্রাটের সমক্ষে আনীত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে বসিবার আসন ও অভয় বচনে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার এক লক্ষ টাকা বার্ষিকী বাঁধিয়া দিলেন। ইহার

বিজাপুর বিজয়

কয়েক বৎসর পরে সেকন্দর লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার ইচ্ছামতে শহরের উত্তর-পূর্বে আপন গুরুর গোরের সন্নিকটে এক সামান্য গোরস্থানে তাঁহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জীবদ্দশার অনুরূপই তাঁহার চরমগতি। তাঁহার প্রবল-প্রতাপান্বিত পূর্বপুরুষদের সমুন্নত সমাধিমন্দির সকল আজও সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান আর আদিলশাহী বংশের শেষ রাজা হতভাগ্য সেকন্দরের মৃতদেহোপরি অন্ত্যেষ্টির চিহ্নস্বরূপ একটি প্রস্তরখণ্ডও দৃষ্ট হয় না।

এই সময় হইতে স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া বিজাপুরের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে অপনোদিত হইল, এই যে তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল আর ফিরিল না। ঔরঙ্গজীব তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিজাপুর সেনাদের আশ্রয়দান — আমীর ওমরাদের মানমর্যাদা রক্ষণ, ভূমিসম্পত্তি নগদ টাকা ইনামে প্রজারঞ্জন, বসতি বিস্তারের উত্তেজন ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বিত হইল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ভাঙা যেমন সহজ, গড়া তেমন সহজ নয়। স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া অবধি শহরের জীবন বিনষ্ট হইল, তাহার শ্রীসৌভাগ্য চলিয়া গেল। মানুষের অত্যাচারের উপর আবার প্রকৃতির উপদ্রব। ঔরঙ্গজীব থাকিতে থাকিতেই এমন এক ভয়ঙ্কর মহামারী উপস্থিত হইল যে তাহাতে লক্ষাধিক লোক মারা পড়ে ও অনেকে শহর পরিত্যাগ করিয়া পালায়। ঔরঙ্গজীবের মহিষীও এই মড়কের গ্রাসে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার গোরের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। মড়ক থামিয়া গেলে সম্রাটের আদেশে জনসংখ্যা গণনা করিয়া দেখা গেল যে লোকসংখ্যা সর্বশুদ্ধ ১০ লাখের কিছু কম;মাহমুদ আদিল শার রাজত্বকালে বিজাপুর ও তৎপ্রান্তবর্তী সাহাপুর মিলিয়া যে লোকসংখ্যা নির্ণীত হয় তদপেক্ষা প্রায় ১০ লক্ষ ১৬ হাজার লোক কমিয়া গিয়াছে। মোগল হইতে মহারাষ্ট্রীদের হস্তে পড়িয়া বিজাপুর দিন দিন আরো অবসাদহিমে ম্লান হইতে লাগিল। মোগলদের সময় তাহার শ্রীসৌভাগ্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল বর্গীদের অত্যাচারে তাহাও ক্রমে লোপ পাইল। পেশওয়ার অধিকার গিয়া সাতারার রাজাদের আমল আরম্ভ। সাতারার শেষ রাজা সাহাজী। ১৮৪৮-এ সাহাজীর নিপুত্রিক মরণান্তর ইংরাজেরা সাতারা আত্মসাৎ করেন সেই সঙ্গে বিজাপুরও ইংরাজ রাজ্যে মিলিত হইল।

এই বিখ্যাত প্রাচীন শহর এইক্ষণে নব্য ইংরাজ মহলে পরিণত হইয়াছে। জিলার রাজধানী হইয়া বিজাপুরের শ্রী ফিরিয়াছে, তাহার পাশ দিয়া লৌহপথ মুক্ত হওয়াতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের উত্তেজন হইয়াছে, তাহার জীর্ণ ভগ্ন গৃহাবলী কতক বাসোপযোগী কতক বা সরকারী কার্যালয়রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। মুসলমান রাজভবনসকল জজ কালেক্টর মাজিস্ট্রেট পোলিশাধ্যক্ষ প্রভৃতি গবর্নমেন্ট কর্মচারীদের বাসগৃহ, নবাব মুস্তাফা খাঁর পান্থশালা জেলখানায় পরিণত। গবর্নমেন্ট এঞ্জিনিয়রগণ গোর মসজিদ প্রভৃতি ধর্ম সম্বন্ধীয় ইমারতের উপর হস্তক্ষেপ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বোখারা মসজিদে পোষ্ট আফিস — ঔরঙ্গজীবের ভজন-গৃহে পুলিশ সিপাহীদের বাস— 'দুই বোন' গোরস্থানের এক বোন স্বয়ং

ইংরাজ রাজ্য

এঞ্জিনিয়র সাহেবের বাসস্থান। কিন্তু এই সকল উপায়ে কি এই শবপুরীতে প্রাণ সঞ্চার হইবে? বিজাপুর কি নবজীবন পাইয়া পুনর্বার পূর্ব-গৌরবে সমুত্থিত হইবে? সে আশা দুবাশা মাত্র। লোকেদের সে জীবন্ত ভাব কোথায়? সে স্বাধীন স্ফূর্তি কোথায়? এই পুরীর ভগ্নগৃহের উপর কারিগরি মৃতদেহে ফুলসজ্জা সদৃশ বিসঙ্গত বোধ হয়। লাভের মধ্যে পি, ডব্‌ল্যু ডির দৌরাত্ম্যে বিজাপুরের পুরাতনের মাধুর্য তিরোহিত হইয়াছে, কিছু দিন পরে বিজাপুর আর চেনা যাইবে না। কিন্তু আধুনিক কারিগরেরা স্বীয় কারুকার্যের যতই বাহার বাহির করুক না কেন, কল্পনা এসকল ছাড়িয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্নস্তূপের উপরেই অতীতের সহিত ক্রীড়ামোদে মত্ত হয়।*

* Bombay Gazetteer Vol 23, Bijapur.
Wheele"s history of India vol 4 Part I.

বোম্বাই শহর

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

বোম্বাই নাম কোথা হইতে হইল? এ নামের উৎপত্তি বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে অনেকের মত এই যে পোর্ত্তুগীজেরা বোম্বায়ের সুন্দর উপসাগর (Bonbay) দেখিয়া এই দ্বীপের নামকরণ করে। কেহ কেহ বলেন যে মুম্বা দেবীর মন্দির হইতে এই নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মন্দির অদ্যাপি নগরের মধ্যভাগে বিদ্যমান। ইহা এক পুরাতন মন্দির। প্রবাদ এই যে ৪০০, ৫০০ বৎসর পূর্বে এই মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা হয়। ইহা প্রথমে ধোবিতলাও (যেখানে ধোপারা কাপড় কাচে) নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল — শতাধিক বৎসর হইল স্থানান্তরিত হইয়াছে। দেবীর নাম পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়াছে। কুলীদের উপাস্য দেবতা 'মুঞ্জা' ব্রাহ্মণ হস্তে পড়িয়া 'মুম্বা' নাম ধারণ করিলেন। সে যাহা হউক, সকল জিনিসের 'কেন' বের করা সহজ নয় আর উহার আবিষ্কারও সকল সময়ে সন্তোষকর হয় না। ভারতের রাজধানীর নাম কলিকাতা কেন হইল তাহা কি তুমি বলিতে পার? সুন্দর বন্দর যদি বোম্বাই নামের অর্থ হয় তাহাই যথার্থ নাম বলা যাইতে পারে ও তাহা জানিয়াই আপাততঃ আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

নাম

বোম্বাই দ্বীপ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে অথবা তৎসমীপবর্তী কালে পোর্ত্তুগীজদের হস্তে পতিত হয়। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে নাবিকশ্রেষ্ঠ বাস্কো ডি গামা কালিকটে পদার্পণ করেন। যে ইউরোপীয় জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভাগ্যবলে উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে ভারতের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হইল তাহাদের প্রতাপ সেই অবধি ভারতসাগরে ক্রমিকই বিস্তারিত হইতে চলিল। সর্বপ্রথমে পোর্ত্তুগীজদের লক্ষ্য বোম্বায়ের দক্ষিণ মালাবার তীরবর্তী প্রদেশেই বদ্ধ ছিল; কালিকট, কানানোর, গোওয়া প্রভৃতি স্থানেই তাঁহারা উপনিবেশ পত্তন করেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের দুই চারি বৎসর পরে বোম্বাই পোর্ত্তুগীজদের হস্তগত হয়। কিন্তু তাহাদের সমস্পর্দ্ধী আর এক ইউরোপীয় জাতি বাণিজ্যচ্ছলে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইল। ষোড়শ শতাব্দীর অন্তে ইংরাজেরা এ দেশে প্রবেশ করে — আসিয়া অবধি তাহাদের লোভদৃষ্টি বোম্বায়ের উপরে নিপতিত হয়। দুই একবার বোম্বাই দখল করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারে নাই; অবশেষে দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ-যৌতুক স্বরূপে বোম্বাই ইংরাজের হস্তাধীন হইল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ও পোর্ত্তুগীজ রাজার মধ্যে যে বিবাহসন্ধি সম্বন্ধ হয় তাহা হইতেই বোম্বায়ে ব্রিটিশ অধিকারের সূত্রপাত, যদিও এই দ্বীপ ইংরাজদের হাতে আসিতে আরো ৪, ৫ বৎসর বিলম্ব লাগে। তখন বোম্বাই দ্বীপ এমন হতাদরের বস্তু ছিল যে ইংলণ্ডের রাজা ১০ পৌণ্ড বার্ষিক করের বিনিময়ে ইহা অকাতরে কোম্পানি বাহাদুরের করে সমর্পণ করিলেন।

ইতিহাস

বোম্বায়ের সেকাল আর একাল কত তফাত! আকাশপাতাল প্রভেদ। রাজা যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া এই দ্বীপকে হস্তান্তর করিলেন তাহা আশ্চর্য নহে। যখন ইংরাজেরা প্রথম বোম্বাই অধিকার করিল তখন তাহা কি অকিঞ্চিৎকর বস্তু! কি সম্পত্তি তাহাদের করতলন্যস্ত হইল? একটি পাকাবাড়ী (ভবিষ্যতে গবর্নমেন্ট হৌস) — তাহার চারিদিকে বাগান — দু চারিটি তোপ, নারিকেল বনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ঘর — কতকগুলি জেলের কুটীর ও প্রচুর পরিমাণে জীয়ন্ত ও পচা মাছ — এই যা ইংরাজদের ভোগে আসিয়াছিল। তথাকার জনসংখ্যা পলাতক ও তস্কর মিলিয়া বড় জোর দশ হাজার। এইক্ষণে জনসংখ্যা প্রায় তাহার ৭০ গুণ অধিক হইবে। আবহাওয়া মারাত্মক — তাহার কারণ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অভাব, যে বিজ্ঞান-প্রভাবে এখন শহরের আশ্চর্য রূপান্তর। অনেক কষ্টে ৩০০০০ টাকা বার্ষিক কর আদায় হইত। বোম্বায়ের ভূমি এমন সস্তা ছিল যে সমুদায় মালাবার হিলের ইজারার টাকায় এক্ষণে অর্ধ কাঠা ভূমিখণ্ড পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ইংরাজদের অধীনে আসিয়া শীঘ্রই তাহার শ্রী ফিরিল। দুর্গ ও গৃহনির্মাণ, বন্দর স্থাপন, বাণিজ্য ব্যবসায়ে উৎসাহবর্ধন এই সকল কার্যানুষ্ঠানে ইংরাজ রাজ্যের সুফল ফলিতে লাগিল। ইংরাজ রাজ্যব্যবস্থার এক প্রধান গুণ এই যে তাহা কাহারো ধর্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করে না। যাহার যে ধর্ম সে তাহা অকাতরে পালন করিতে পারে। মতভেদের জন্য কাহাকেও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। বিজিত প্রজা বলপূর্বক জেতৃধর্মে দীক্ষিত হয় না। সেকালে অঙ্গিয়র (Aungier) নামে একজন প্রতিভাশালী সুচতুর গবর্নর ছিলেন। তাঁহার সময়ে দিউ হইতে বণিকেরা বোম্বায়ে আসিয়া বাণিজ্য করিতে চাহে। তাহাদিগকে উৎসাহ দানার্থে গবর্নর সাহেব তাহাদের সঙ্গে যে কড়ার বন্ধন করেন তাহা হইতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মর্ম এই যে বণিকেরা স্বাধীন ভাবে তাহাদের শবদাহন ও ধর্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে। যে কোন ধর্মাবলম্বী হউক না কেন — তাহার জাতি ও অবস্থা যাহাই হউক, বলপূর্বক কাহাকেও খৃষ্টান করা যাইবে না। এই কড়ার পত্রের তারিখ ২২ মার্চ ১৬৭৭। বণিকেরা সেই অবধি এ পর্যন্ত 'ব্যাক্‌বের' তীরে অবাধে তাহাদের শবদাহন করিয়া আসিতেছে ও ইচ্ছানুরূপে নিজ নিজ ধর্ম অনুষ্ঠান করিতেছে।

সেকাল আর একাল

পোর্তুগীজদের শাসন অন্যরূপ। তাহাদের এক হাতে তলবার এক হাতে বাইবেল — হয় খৃষ্টান হও, নয় মর। তাহারা বলে, আমার রাজ্যে বাস করিতে চাও তো আমার ধর্ম গ্রহণ কর। ফলে কি হইল — ইংরাজের জয় — পোর্তুগীজদের পতন। ৩০০ বৎসর পূর্বে যে জাতি ধন মান বৈভবে সর্বাগ্রগণ্য ছিল — যাহার দোর্দণ্ড প্রতাপে ভারতের দক্ষিণ প্রদেশ কম্পমান তাহার নাম পর্যন্ত এক্ষণে শ্রুতিগোচর হয় না। তাহাদের রাজধানী গোওয়ার কি দশা হইয়াছে? তাহাদের দৌরাত্ম্যে কত লোকে দেশ ছাড়িয়া পালায় তার ঠিকানা নাই। আর ইংরাজ সুশাসনে এক্ষণে বোম্বায়ের অবস্থা দেখ। সাগর

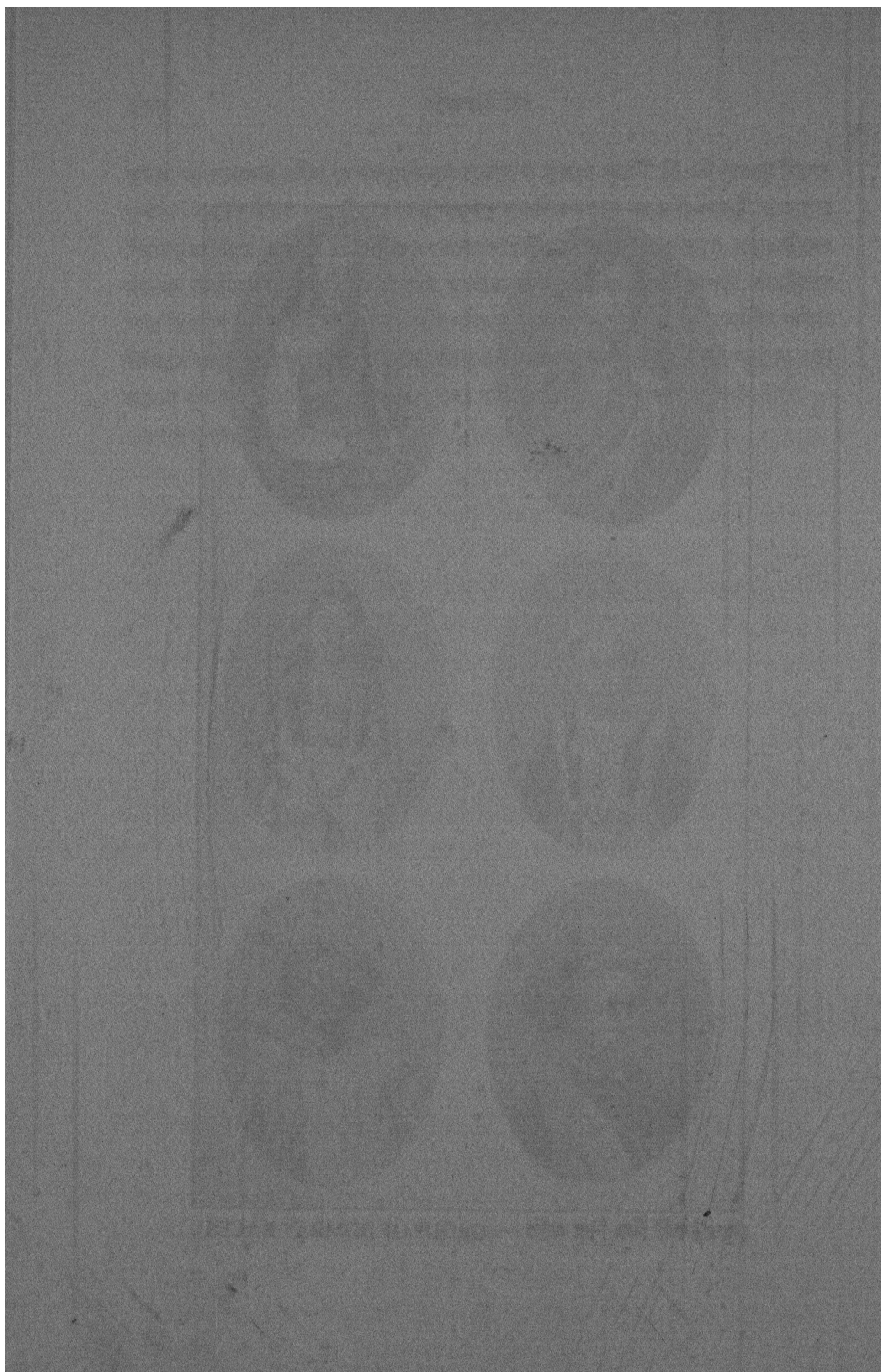
মানচিত্র

গর্ভ হইতে এই চিরবসন্ত সুন্দর পুরী সমুত্থিত হইল। বিশাল সুরম্য সৌধাবলীতে পরিপূর্ণ; শ্রমের জয়স্তম্ভ সুতা ও কাপড়ের কল ও অন্যান্য কারখানা চতুর্দিকে বিরাজমান;নানা জাতির আবাসস্থান এই বোম্বাইপুরী সমুদ্রের উপরে রত্নদ্বীপতুল্য শোভা পাইতেছে। একটা হস্তীদেহের পার্শ্বদেশ — মাথা হইতে সামনের পা পর্যন্ত মনে করিলে বোম্বায়ের আকার মোটামুটি কল্পনা করিতে পার। মনে কর শুঁড় ততটা নীচে ঝুলিয়া নাই, পা বক্রভাবে আর একটু নীচের দিকে গিয়াছে। শুঁড় ও পায়ের মধ্যস্থিত অর্ধচক্র Backbay উপসাগর ও মাথার বহির্ভাগে Breach candy শুঁড়ের প্রান্তভাগে মালাবার কোণ অথবা বিন্দু যেখানে গবর্নমেন্ট হৌস সংস্থিত। তাহার উপরের বালুকেশ্বর-রাস্তা ধরিয়া গেলে মালাবার হিলে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাহার উত্তরে খম্বালার পাহাড়। এই দুই পাহাড়ের উপর ভাল ভাল বাঙ্গলা আছে — ইংরাজ কর্মচারী ও অন্যান্য বড়লোকের বাসস্থান। মালাবার হিল বোম্বায়ের মধ্যে লোভনীয় রমণীয় জায়গা। গজমুণ্ডের উপর মহালক্ষ্মীর মন্দির। হাতীর পায়ের ভাগটা কোলাবা, যাহার সমীপ-সমুদ্রের উপর দীপস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত। কোলাবার উপরিভাগে ময়দান (Esplanade) যাহা বোম্বায়ের কর্মক্ষেত্র। এখানেই বণিক ও নাবিকদের কার্যালয়, হাইকোর্ট, ইউনিবার্সিটি স্তম্ভ ও ইমারত, সেক্রেতার আফিস, বড় বড় দোকান ও হোটেল প্রভৃতি সংস্থাপিত। আর একটু উপরে অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগে দিশিপাড়া, ভরপুর বসতির স্থান, শহরের হৃৎপিণ্ড। ধোবিতলা ও খেতবাড়ী, গিরগাম, কামাতীপুর ওপাড়ার এইসব নাম, সেখানে মার্কেট বাজার দোকান, শহরের গিলিজ ও ধূলি। এই পাড়ার উত্তর দিকে ভয়কলা, যে অঞ্চলের অলঙ্কার ভিক্টোরিয়া উদ্যান ও এলফিনিষ্টন কালেজ। উহার কাছাকাছি যে রাস্তা গিয়াছে তাহাই পারলের রাস্তা, পারল আর একটি গবর্নমেন্টের আড্ডা। মানচিত্রে এ সকল স্থান স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

জনতা

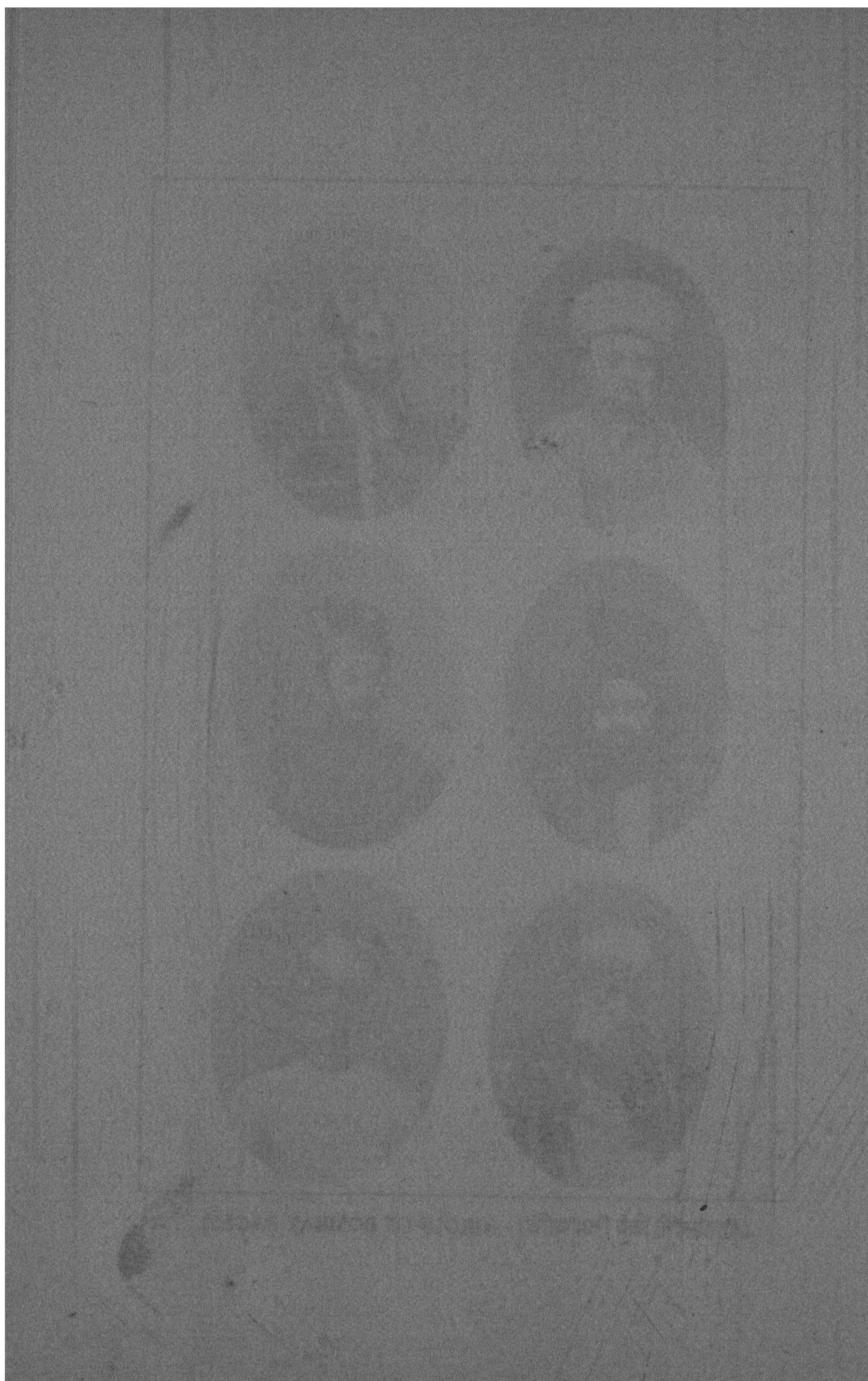
বোম্বায়ে কতপ্রকার জাতি একত্র হইয়াছে তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য। এমন জীবন্ত জ্বলন্ত ভাব এদেশের অন্য কোন নগরে লক্ষিত হয় না। ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা ইহাতেই মূর্তিমতী। লোকদের আচারব্যবহার আহার পরিচ্ছদ, বাণিজ্য ব্যবসার উৎকর্ষ, সার্বজনিক কার্যে উৎসাহ ও অনুরাগ এই সকল বিষয়ে ইংরাজ শাসনের সুফল প্রত্যক্ষ করা যায়। কতপ্রকার বিভিন্ন জাতি আছে। তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ভজনালয়ই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কেল্লা হইতে বাহির হইয়া কাল্‌কাদেবীর রাস্তা ধরিয়া পারল পর্যন্ত দুই এক ক্রোশ চলিয়া যাও — কত জাতির মন্দির দেখিতে পাইবে। চিত্রবিচিত্র হিন্দু মন্দির হইতে ঢং ঢং ঘণ্টাধ্বনি উঠিতেছে। হাবসী আরব ও মুসলমানদের মসজিদ, পারসীদের অগ্নিগৃহ, ইহুদীদের সিনাগোগ, ইংরাজ গিরজা এসব একে একে দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। ময়দানে দেখিবে মুসলমান সন্ধ্যা নামাজের জন্য কার্পেট বিছাইতেছে তাহার পাশে হয়তো একজন পারসী অস্তাচল চূড়াবলম্বী দিনমণির স্তুতিমন্ত্র পাঠ করিতেছে। আর এক দৃশ্য দেখা যায়, নানা জাতীয় ভদ্র কুলকামিনীগণ এখানে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

রুমাল-মণ্ডিতকেশা রঙ্গীন রেশমশাড়ী-যুত চারুবেশা সুরূপা পারসী স্ত্রী এই দৃশ্যের বিশেষ শোভা। নগরবাসীগণ বাঙ্গালীদের মত স্বল্পবস্ত্র শূন্যশির নহে। বহুরূপী পাগড়ী তাহাদের শিরোভূষণ, এক এক জাতির এক এক ধরনের পাগড়ী। গুজরাতীদের গজমুণ্ড, মহারাষ্ট্রীদের রথচক্র, সিন্ধীদের বিপর্যস্ত ইংরাজি হ্যাট, মুসলমানদের জরির মোগলাই পাগড়ী, পারসীদের লম্বা ত্রিকোণ টুপী। তুমি শুনিয়া থাকিবে পশ্চিমের লোকেরা বাঙ্গালীদের লণ্ডঘাশির বলিয়া উপহাস করে। কলিকাতা ও বোম্বায়ের ভাব এ বিষয়ে অনেক ভিন্ন। এই দুই শহরের বাহ্য প্রভেদ দুকথায় নির্দেশ করিতে হইলে বলা যাইতে পারে — কলিকাতা আটপৌরে — বোম্বাই পোশাকি শহর।





বোম্বাইবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি।—(GROUP OF BOMBAY RACES).





মহালক্ষ্মী। –(MAHALAKSHMI TEMPLE).

বোম্বাই শহর

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইতিহাস

যখন ইংরাজেরা বোম্বাই অধিকার করিয়া প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে তখন নিরাপদে রাজ্যভোগের সময় নহে — চতুর্দিকে বিভীষিকা, পদে পদে বিঘ্নবাধা, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চি ম জলেস্থলে চারিদিকেই শত্রু। বোম্বায়ের শৈশবকাল কত ঝড়তুফান, কত প্রকার বিপদের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে — সে সময়ে এই দ্বীপ অন্য এক প্রবল জাতির গ্রাসে কেন যে পতিত হয় নাই সে কেবল ইংরাজ ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে। ইংরাজের এমনি ভাগ্যবল যে এই বিপদরাশি অতিক্রম করিয়া — এই কঠোর অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই শহর ক্রমে পশ্চিম ভারতবর্ষের রাজধানী হইয়া ইংরাজ রাজমুকুটের অত্যুজ্জ্বল মণিরূপে শোভা পাইতে লাগিল — সকল শত্রু একে একে পরাস্ত হইল — সমুদ্র জলদস্যু হইতে মুক্ত হইয়া বাণিজ্যের পথ নিষ্কণ্টক হইল — পরস্পরবিরোধী যোদ্ধৃ দলের মৃতদেহের উপর দিয়া ইংরাজ আধিপত্য ভারতভূমিতে বদ্ধ মূল হইল। উত্তর হিমসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী কোথাকার মানুষ এদেশে সামান্য বণিক বেশে প্রবেশ করিয়া শতাব্দীর মধ্যে ভারতের অধীশ্বর হইয়া দাঁড়াইল।

ইংরাজ ভাগ্যলক্ষ্মী

তিন শত্রু

তখনকার কালে এ অঞ্চ লে ইংরাজদের প্রধান তিন শত্রু পোর্তুগীস, মোগল ও মহারাষ্ট্রী।

পোর্তুগীস

পোর্তুগীসদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিদেশীয়ের মধ্যে তাহারাই ইংরাজের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী — ইংরাজ-ফরাসীদের বিবাদক্ষেত্র স্বতন্ত্র। পোর্তুগীসেরা প্রথামত ইংরাজদের রীতিমত বোম্বাই দখল দিতেই চায় না। সন্ধি স্থাপন হইবার অনতিকাল পরে যখন ইংরাজ রাজ-পুরুষ পঞ্চ রণতরী ও পাঁচশত সেনা সমভিব্যাহারে বোম্বাই দ্বীপ অধিকার করিতে আসেন তখন পোর্তুগীস গবর্নর দ্বীপটুকু ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত, তাহার আনুষঙ্গিক সালসেট প্রভৃতি আর কয়েকটি স্থান সঁপিবার প্রস্তাবে তিনি কোন মতেই সম্মত হইলেন না। এই বিবাদে পোর্তুগীসদের প্রতিজ্ঞাই বজায় রহিল, ইংরাজ সৈন্য এদেশে সেই প্রথম পদার্পণ করে, পোর্তুগীসদের বিপক্ষে তাহাদের কোন বল খাটিল না। আর কোথাও দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া বহু কষ্টে কারওয়ারের সমীপস্থ আঞ্জেদ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়া সৈন্যাধ্যক্ষ সমেত অনেকেই কালকবলে পতিত হইল। বোম্বাই দ্বীপ মাত্র দখল পাইয়া ইংরাজগণ তখন সন্তুষ্ট। এইরূপে প্রথম হইতেই ভারত ক্ষেত্রে এই দুই ইউরোপীয় জাতির মধ্যে রেষারেষি — কে কাহার উপর প্রাধান্য লাভ করে স্থিরতা নাই। ঠানা — বান্দরা, সালসেট, কারাঞ্জা

প্রভৃতি বোম্বায়ের নিকটস্থ প্রদেশসকল তখন পোর্তুগীসদের অধীন সুতরাং তাহারা নানা প্রকারে বোম্বাইবাসীদিগের উৎপীড়নে সক্ষম ছিল।

এইরূপ কলহে কিছুকাল গত হইলে জিঞ্জিরার কাফ্রী নবাব পোর্তুগীস-শত্রু বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কবিলেন। নবাব মোগল সম্রাটের পোতাধ্যক্ষ। সেকালে স্থলে যেমন ইংরাজ বণিকের প্রতাপ — জলেও তেমনি ইংরাজ জলদস্যুর উপদ্রব। সেই সকল দস্যুদের শাসন করিবার উদ্দেশে ১৬৮৮ অব্দে কাফ্রী নবাব ঔরঙ্গজীব বাদশাহের আদেশক্রমে বোম্বাই দুর্গ আক্রমণ করেন। ইংবাজেরা তখন অতি দুর্বল, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে পারিয়া উঠেন না, কৌশলক্রমে সম্রাটের প্রসন্নতা লাভ কবিয়া তাঁহাব প্রত্যাদেশে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। বোম্বায়ের উপর দিয়া সেই এক ভয়ানক ধাক্কা গিযাছিল। নবাবের আক্রমণ নিষ্ফল দেখিয়া পোর্তুগীসরা ইংরাজদের উপর আরো জ্বলিয়া উঠিল;সাধ্যমত বৈরনির্যাতনে বিরত হইল না কিন্তু তাহাদের জোরজার মন্ত্রতন্ত্র সকলি ব্যর্থ হইল। পোর্তুগীস রাজ্য এদেশে আর অধিককাল টিকিতে পারে নাই। দিন দিন বর্ধনশীল মহারাষ্ট্রীয় প্রতাপের নিকট ফিরিঙ্গিদিগকে শীঘ্রই নতশির হইতে হইল। তাহাদের অধীনস্থ স্থানসকল একে একে মহারাষ্ট্রীদের হস্তগত হইল। পাণিপথ যুদ্ধের কথা অবশ্য শুনিয়া থাকিবে, সে যুদ্ধে আহমদ শা আবদালীর হস্তে মহারাষ্ট্রী সৈন্যদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন হইয়া মোগল বাজ্যের স্থানে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আশা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়;তার কয়েক বৎসব পূর্বে — ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে — মহারাষ্ট্রীদের মহোন্নতির কাল। তাহারা হিন্দুস্থানের আর আব সকল জাতিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে — দক্ষিণ কর্ণাটক হইতে উত্তরে আগ্রা দিল্লী পর্যন্ত তাহারা রাজ্য বিস্তার করিয়াছে — হোলকার, শিন্দে, গাইকওয়াড় ভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে — আশা হইতেছে, হিন্দু রাজা কর্তৃক ম্লেচ্ছগণ বহিষ্কৃত হইয়া স্বাধীনতা পতাকা ভারতে পুনরুড্ডীন হবে। এই সময়ে পোর্তুগীসদের উপর মহারাষ্ট্রীদের প্রধান আক্রোশ। পোর্তুগীসদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাহাদের অধিকারবর্তী সালসেট, বাসীন, ঠানা, কারাঞ্জা প্রভৃতি স্থান কাড়িয়া লইয়া মহারাষ্ট্রীগণ শীঘ্রই তাহাদের বিষদন্ত উৎপাটন করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্ধভাগ গত হইতে না হইতেই ইংরাজেরা তাহাদের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বীর উৎপাত হইতে বিনা ক্লেশে নিষ্কৃতি পাইল।

জিঞ্জিরারন কাফ্রী নবাব

ইংরাজদের আগমনকালে ভারতবর্ষের অবস্থার প্রতি একবার মনোনিবেশ কর;করিলে সহজে বুঝিতে পারিবে ইংরাজ রাজ্য এদেশে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। অতীতের আলোচনা বিনা বর্তমান যথাযথ বোধগম্য হয় না তাই কতকটা প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করা আবশ্যক। যতদূর পারা যায় সংক্ষেপে সমালোচনাই আমার উদ্দেশ্য কিন্তু ঘটনার গুরুত্ব অনুসারে প্রকৃত প্রস্তাব ছাড়িয়া যদি একটুকু দূরে গিয়া পড়ি তাহা হইলে কিছু মনে করিও না।

ভারতবর্ষের অবস্থা

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল সম্রাট ভারতের সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ়। দাক্ষিণাত্য তখনও মোগল যুগ স্কন্ধে বহন করে নাই, ক্রমে দিল্লীর সম্রাট দক্ষিণ ভারতবর্ষে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন দক্ষিণের সুবিস্তৃত প্রদেশ অধিকার করিয়া 'বামন' রাজবংশ সংস্থাপন করেন। দেড় শত বৎসরের কিছু পরে দক্ষিণের সেই মহাবল পরাক্রান্ত 'বামন' বংশ ধ্বংস হইয়া তাহার ভস্মাবশেষ হইতে বিজাপুর, আহমদনগর, গলকুণ্ডা প্রভৃতি পঞ্চ মুসলমান রাজ্য সমুত্থিত হইল। ১৫৬৫ অব্দে মুসলমান রাজারা দলবদ্ধ হইয়া বিজয়নগরের হিন্দু রাজাকে তালিকোট যুদ্ধে পরাভূত করিয়া দক্ষিণে মুসলমানদের একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। দক্ষিণ রাজকুলের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মোগল সম্রাটের ঈর্ষানল উদ্দীপ্ত হইল। আকবরের সময় হইতেই তাহাদের বশীকরণ চেষ্টা প্রবর্তিত হয় ও তাঁহার পৌত্র সাহাজিহানের রাজত্বকালে আহমদনগর মোগল রাজ্যভুক্ত হয়। আহমদনগর আক্রমণ সময়ে সুলতানা চাঁদবিবি যে অসাধারণ বীরত্ব, অটল উদ্যম ও জ্বলন্ত দেশানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নাম ও অঞ্চলে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মোগলেরা আহমদনগর দুইবার আক্রমণ করে। প্রথম বারের আক্রমণ চাঁদবিবির অনিবার্য যত্নে নিবারিত হইল। তিনি তাঁহার আত্মীয় বিজাপুর সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ও অন্যান্য বিচ্ছিন্ন দল একত্রিত করিয়া সর্বসংহারক মোগল বলের বিপক্ষে কটিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে যুবরাজ মুরাদ সৈন্যসামন্তে নগরদুর্গ বেষ্টন করিয়াছেন, স্থানে স্থানে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত, বারুদে সমুদায় দুর্গ দুর্গবাসীশুদ্ধ উড়াইয়া দিবার উপক্রম, কিন্তু চাঁদবিবি কিছুতেই বিচলিত হইবার নহেন। প্রত্যহ অশেষ সঙ্কটের মধ্যে কেল্লা পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার বলাধানের উপায় দেখিতেছেন। মোগলবল-খনিত দুই সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইয়া তাহার প্রতিবিধানের উপায় যোজনা করিলেন। তৃতীয় সুড়ঙ্গের বিরুদ্ধে কল চালাইবার পূর্বেই শত্রুগণ তাহা উড়াইয়া দেওয়াতে সেই সঙ্গে অনেক দুর্গপাল বিনষ্ট হইল — প্রাচীরে বৃহৎ ছিদ্র দেখা দিল। লোকেরা প্রাণভয়ে পলায়নোদ্যত। চাঁদবিবি কবচ ধারণপূর্বক মুখের উপর একটা ঘোমটা ফেলিয়া খোলা তলবার হস্তে সেই ক্ষতস্থানে গিয়া উৎসাহবাক্যে সকলকে ডকিয়া আনেন — তাঁহার দৃষ্টান্তে ভীরুও সাহস পাইল — গুলিগোলা তীর যাহা কিছু ছিল শত্রুদের উপর বর্ষণ হইতে লাগিল। অবশেষে ঘোরতর যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য পিছু হটিয়া গিয়া সেদিনকার মত নিরস্ত হইল। চাঁদবিবি সে রাত্রে সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত কাজ করিতেছেন, পরদিন প্রভাতে মোগলেরা দেখিতে পাইল প্রাচীরের ছিদ্র অনেকাংশে বুজিয়া গিয়াছে — তাহাদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ, নূতন সুড়ঙ্গ না করিলে আর প্রবেশের উপায় নাই, যুবরাজ ভাবিলেন গতিক বড় ভাল নয়। প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন বহ্রাড় (Berer) প্রান্ত দিল্লীশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে তিনি আর অধিক কিছু চান না। সুলতানা তাহাতে সম্মত হইলে যুবরাজ অল্পস্বল্প যথালাভে সন্তুষ্ট হইয়া সসৈন্যে ফিরিয়া গেলেন। চাঁদ সুলতানা সেবারকার মত নিস্তার পাইলেন কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তাহার দুই বৎসর পরে মোগলেরা ফিরিয়া আসিয়া

চাঁদবিবি

আবার নগরের উপর হল্লা করিল। এবার আর চাঁদবিবির বল খাটিল না। বাহিরের শত্রু দমন করা সহজ যদি ঘরে শান্তি ও ঐক্য থাকে, কিন্তু ঘরের শত্রুর সঙ্গে পারিয়া ওঠে কাহার সাধ্য? এবার ঘরেও বিচ্ছেদ — চাঁদবিবি দেখিলেন এবার আর রক্ষা নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে পলায়নের পরামর্শ দিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন অনুচরবর্গ ফেলিয়া ভীরুর ন্যায় পলায়ন করা — তা কি কখনও হয়? প্রাণ বাঁচাইয়া কি হইবে যদি মানরক্ষা না হইল? অবশেষে সুলতানা অপার্যমানে মোগলদের সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা দেখিতেছেন এমন সময় নিজ সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় সেই গোলযোগেই তিনি প্রাণ হারাইলেন। এই পাপের ফল সদ্যই ফলিল। অল্পদিনের মধ্যেই দুর্গভেদ করিয়া নগর অধিকার ও নাবালক রাজাকে বন্দী করিয়া মোগল সৈন্য জয়লাভ করিল।

দাক্ষিণাত্যে চাঁদবিবির অতুল কীর্তি অদ্যাপি জনহৃদয়ে মুদ্রিত রহিয়াছে। তাঁহার নগর সংরক্ষা-কাহিনী শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার নহে। যে সকল বীরাঙ্গনা সময়ে সময়ে উদিত হইয়া ভারতের ইতিহাস-পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে স্বনাম অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, চাঁদবিবি তাহাদের মধ্যে গণনীয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম চাঁদবিবির যে স্তুতিগান রচনা করেন তাহা এই স্থলে ভাষান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সুব-কাননে অপসরা
　　　　আছে নানা
মর-ভবনে রূপবতী
　　　　কত আছে
বিজাপুরের রাণী চাঁদ
　　　　সুলতানা,
রূপে সবাই হার মানে
　　　　তাঁর কাছে।।
সদা সাহস ধ্রুব তাঁর
　　　　ঘোর রণে,
গৃহে শান্তি দয়া যেন
　　　　শোভমানা।
আহা, করুণা কত তাঁর
　　　　দীন জনে,
বিজাপুরের রাণী চাঁদ
　　　　সুলতানা।।
যথা, ফুলের মাঝে চাঁপা
　　　　সেরা মানি,

তরু-মাঝারে সহকার
সবে জিতে।
তথা, রাণীর মাঝে রাণী
চাঁদরাণী,
কেবা পাবে গো তাঁর গুণ
বাখানিতে।।
যিনি জননী সম স্নেহে
স্বভবনে,
মোরে বিদেশে পালিলেন
সযতনে।
আমি দ্বিতীয় ইব্রাহিম
স্মরি সে কথা,
তাঁর চরণে সঁপিলাম
স্মরণ-গাথা।।

বোম্বায়ে যখন ইংরাজ-অধিকার স্থাপন হয় বিজাপুর ও গলকণ্ডা তখনও স্বাধীন। সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাহাদের বশীকরণ মন্ত্রণা করিয়া অনেক চেষ্টায় সেই রাজ্যদ্বয়কে দিল্লীসাৎ করেন। ১৫ই অক্টোবর ১৬১৫ অব্দে বিজাপুর, বর্ষেক পরে গলকণ্ডা মোগলরাজ্যভুক্ত হয়। এইরূপ রাজ্য বিস্তারই মোগল রাজের অধঃপাতের কারণ হইল। মুসলমানদের যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে মহারাষ্ট্রীরা মস্তক তুলিয়া উঠিবার সন্ধি পাইল। যদি দক্ষিণে মুসলমান রাজ্যসকল অক্ষত থাকিত তাহা হইলে হিন্দুরাজ্য পুনর্জীবিত হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ — ভারতের ইতিহাস হয়ত আর এক ধরনে সংগঠিত হইত। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্য আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইল। এদিকে মোগল সূর্য অস্তোমুখ, ওদিকে কোথা হইতে কাল মেঘ উঠিয়া অল্পকালমধ্যে দিগ্বিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

ঐ কালমেঘ শিবাজী ভোঁসলে। শিবাজী একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনবৃত্ত উপন্যাসের মত মনোহারী। একটু বেশী করিয়া বলিলে ক্ষতি নাই, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে মহারাষ্ট্র ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে। তাঁহাকে দেখিতে মধ্যমাকৃতি কিন্তু সুগঠন ও গৌরবর্ণ — লক্ষ্যভেদী জ্বলজ্বল চক্ষু; কলম ধরিতে জানেন না কিন্তু সকল প্রকার শস্ত্রচালনায় বিলক্ষণ মজবুত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদর্শী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়পূর্ণ, উপায়ের খনি — ধূর্ত শিরোমণি। তাঁহার প্রগাঢ় মাতৃভক্তি ছিল — জননীর চরণধূলি ও আশীর্বাদ না লইয়া কোনো মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হইতেন না।

শিবাজী ভোঁসলে

তাঁহার পিতা সাহজী বিজাপুর সুলতানের অধীনে জায়গীরদার ছিলেন। পুনায় তাঁহার জাহাগীর, তথায় দাদাজী কোণ্ড নামক আচার্যের হস্তে শিবাজীর শিক্ষার ভার সন্যস্ত হইল।

কিন্তু সেই দুর্দান্ত বালকের উপর দ্রোণাচার্যের শাসন কতদিন খাটে? মাওলী নামক চাষার দল তাঁহার সঙ্গী — লুঠপাট ডাকাতি শিকার এই সকল কাজেই তাঁহার বিশেষ উৎসাহ। খর্বকায় অথচ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মাওলীদের হস্তে অস্ত্র দিয়া শিবাজী তাহাদের মধ্য হইতে রামের বানর-সৈন্যবৎ সৈন্য প্রস্তুত করিলেন। পাহাড়দেশে তাঁহার জন্ম — পশ্চিমঘাট অঞ্চলে যে-সকল প্রকৃতির দুর্গ আছে তাহা একে একে হস্তগত করিতে লাগিলেন। পাহাড় দুর্গে তাঁহার বাস — লুটের মাল হইতে তাঁহার ভাণ্ডার সদাই পূর্ণ। যখন যেমন সুবিধা — কখনও বিজাপুরের পক্ষ হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে, কখনও মোগল সম্রাটের অধীনে বিজাপুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নিজ কাজ সাধিয়া লইতেন। অবশেষে যখন নিজের বল বুঝিলেন — যখন দেখিলেন "পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে" (ডোঙ্গরাস লাবিলে দিবা) — সকলি প্রস্তুত — তখন মুখোশ ফেলিয়া দিয়া নিজমূর্তি ধারণ করিলেন।

ক্রমে শিবাজীর দৌরাত্ম্য অসহ্য হইয়া উঠিল, বিজাপুর সুলতান আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না। শিবাজীকে দমন না করিলে সে সর্বদমন হইয়া উঠিবে এইরূপ চিহ্ন দেখিয়া সুলতান শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি আফজুল খাঁ কোমর বাঁধিয়া শিবাজীকে ধরিতে বাহির হইলেন।

আফজুল খাঁ

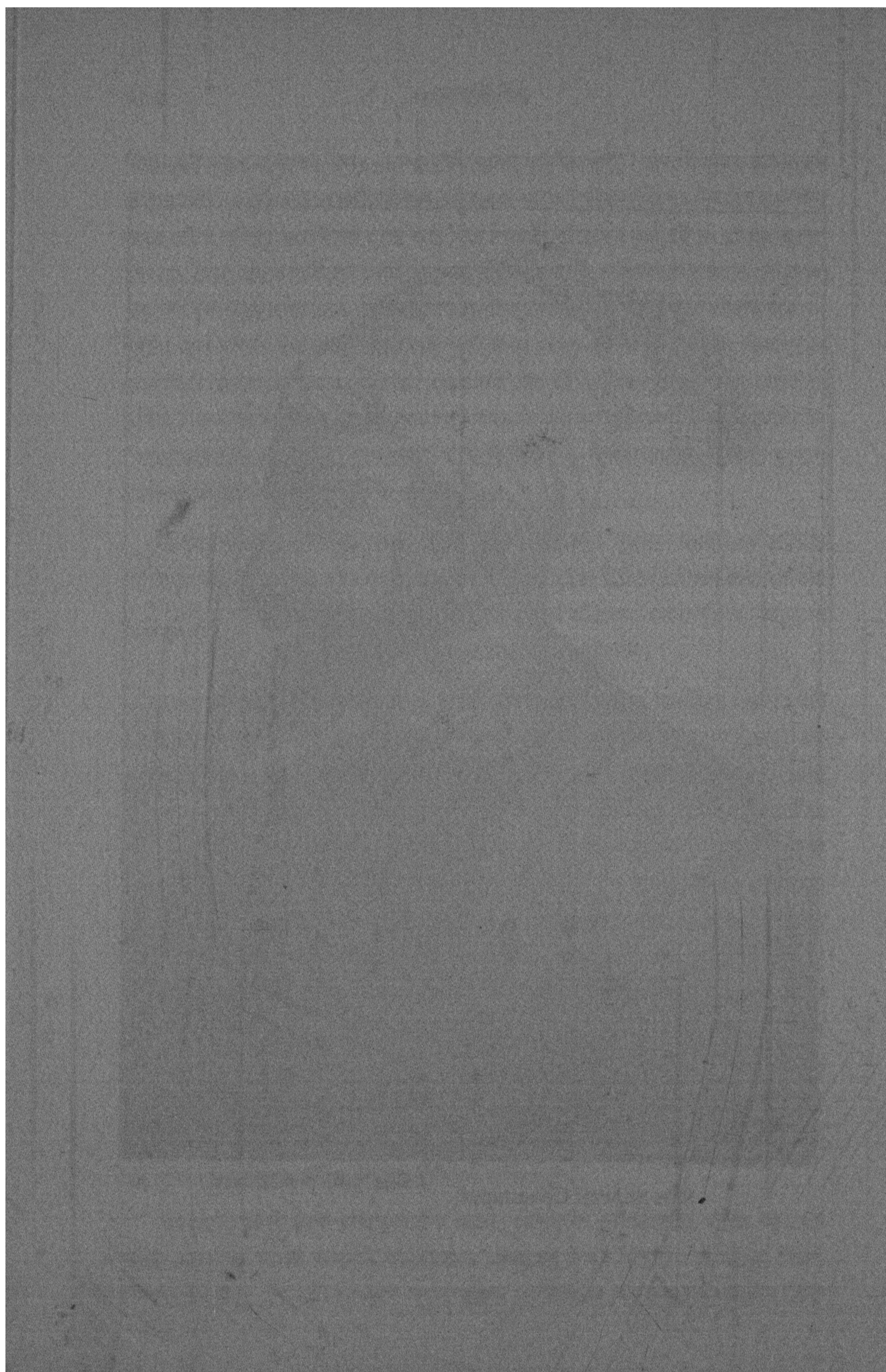
সেসময়ে শিবাজী প্রতাপগড়ের পাহাড়ে, মহাবালেশ্বর হইতে অনতিদূর। পশ্চিমঘাট শ্রেণীর মধ্যে অনেক সুশোভন পাহাড় দৃষ্ট হয় কিন্তু মহাবালেশ্বর সকলের সেরা। এই পর্বতের শিকর পঞ্চনদীর আকর স্থান। তথায় মহাবালেশ্বর নামে দেবমন্দির বিরাজিত, তাহা হইতেই এই পাহাড় স্বনাম গ্রহণ করিয়াছে। এই পাহাড় বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিহারভূমি — গ্রীষ্ম ঋতুতে অনেকে নিম্নদেশ হইতে উত্তাপ নিবারণের জন্য মহাবালেশ্বরের ক্রোড়ে গিয়া বাস করে। সুন্দর রাস্তা, বিপণী, বাঙ্গলা, উদ্যান, পাহাড়ের গায়ে ছড়াইয়া আছে, কিন্তু শিবাজীর সময় এসব কিছুই ছিল না। গাড়ী করিয়া পাহাড়ে চড়িবার সুবিধা ছিল না — তখন তাহা দুর্গম তীর্থস্থান কিন্তু প্রকৃতির শোভা সেইরূপই আছে। পাহাড়ের প্রান্তবর্তী ভিন্ন ভিন্ন কোণ হইতে প্রকৃতির যে কঠোর সুন্দর মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয় তাহা তখনো যেমন এখনো তেমন। কতক গাছপালাশূন্য কঠোর পর্বতশ্রেণী;— কোন কোন পাহাড় দুস্তর বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া গভীর পাতালে নামিয়া গিয়াছে। মহাবালেশ্বরের পশ্চিমে প্রতাপগড়ের পাহাড় বনরাজির মধ্য হইতে গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। সেই পাহাড়ের উপর দুর্গ নির্মিত হইয়া প্রকৃতির বলের উপর কৃত্রিম বল যোজিত হইয়াছে। শিবাজী এই দুর্গে ব্যাঘ্রের ন্যায় বসিয়া শিকার নিরীক্ষণ করিতেছেন।

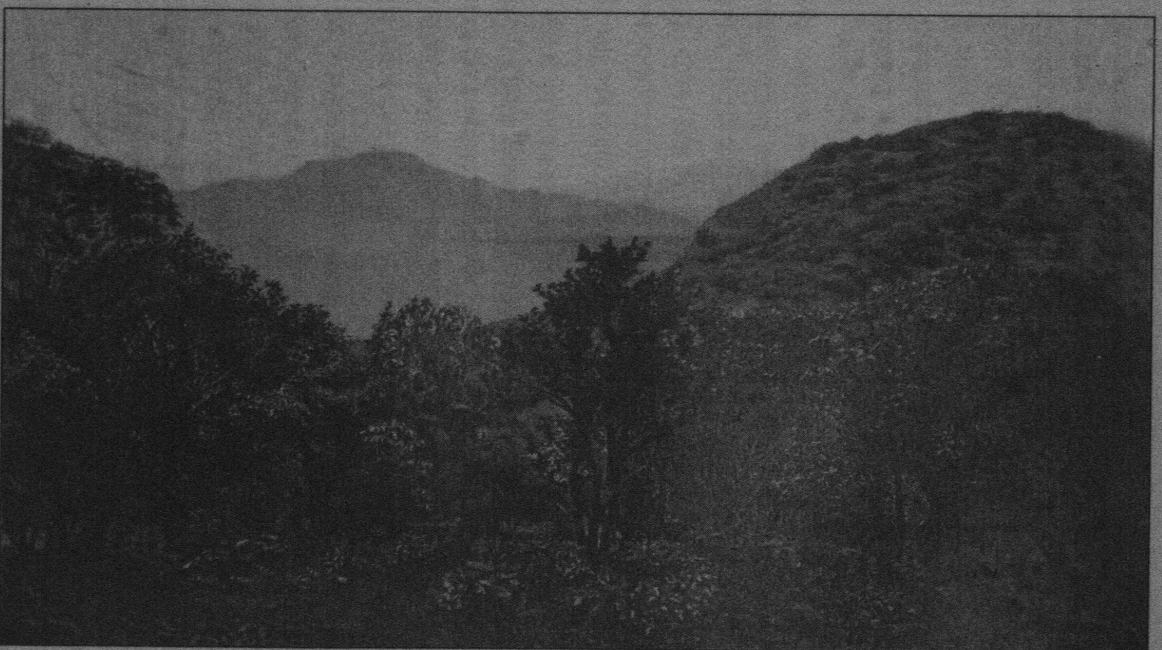
প্রতাপগড়

আফজুল খাঁ তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন। পথিমধ্যে তুলজাপুরের মন্দির আক্রমণ করিয়া হিন্দুদের যথেষ্ট অপমান করিয়াছেন। ম্লেচ্ছদের উপর হিন্দুদের জাতিবৈর দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শিবাজী চর-মুখে সকল সংবাদ পাইতেছেন। আফজুল খাঁ অনেক সৈন্য



Shri Shiwaji Chhatraputi. Chitra Shala Press Poona.





মহাবলেশ্বর ও প্রতাপগড়।—(MAHABLESHWAR AND PRATABGARH).

সামন্তে পরিবৃত, তাঁহার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই, ছলে ও কৌশলে তাঁহাকে মারিতে হইবে। শিবাজী নবাব সাহেবের নিকট দূত পাঠাইলেন ও ভয়ের ভান করিয়া এইরূপ দেখাইতে লাগিলেন যে তিনি নবাবের অধীনতা স্বীকারে এখনি প্রস্তুত, কেবল প্রাণভয়ে ধরা দিতে নারাজ। খাঁ সাহেব যদি প্রতাপগড়ে অধীনের সাক্ষাৎকারে সম্মত হন তাহা হইলে মুখে সকল কথা হইবে। অবশেষে তাহাই সাব্যস্ত হইল। নবাব কোন দুরভিসন্ধি মনে না আনিয়া শিবাজীর সহিত সহজভাবে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন — একজন মাত্র সঙ্গী, পরিচ্ছদের মধ্যে এক পাতলা মসলিনের কাপড়, আর একটি সোজা তলবার — সে শুধু অলঙ্কারের জন্য ব্যবহারের মানসে নয়। বেহারাগণ যথানির্দিষ্ট স্থানে পাল্কী নামাইল কিন্তু শিবাজী সেখানে নাই। দূর হইতে দুজন মানুষ দেখা যাইতেছে — ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে তাহাদের পদক্ষেপ। বাহিরে দেখিতে শিবাজী নিরস্ত্র কিন্তু ভিতরে তাহার ভবানী তলবার ও 'বাঘনখ' গুপ্তাস্ত্রে সুসজ্জিত। বাহিরে সামান্য শুভ্রবেশ কিন্তু ভিতরে লৌহবর্মে আচ্ছাদিত। শিবাজী ক্রমে অগ্রসর হইলেন — খাঁ সাহেব তাঁহার সঙ্গে দস্তুরমত কোলাকুলি করিতে গেলেন। কিন্তু শিবাজীর সে ভাল্লুকের আলিঙ্গন — তাঁহার হস্তে প্রচ্ছন্ন 'বাঘনখ' ছিল তাহার আঘাতে নবাবের উদর বিদীর্ণ করিলেন। বাঘনখে যাহা হইবার বাকি ছিল 'ভবানী' খড়্গে তাহা শেষ করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে পূর্ব সঙ্কেত অনুসারে ভেঁপু বাজিয়া উঠিল। কামানের ধ্বনিতে পাঁচবার দিগদিগন্ত ধ্বনিত হইল। নীচে মুসলমান সেনা অপ্রস্তুতভাবে ছিল, শিবাজীর মাওলীরা চারিদিক হইতে তাহাদের উপর পড়িল। প্রত্যূষে ১৫০০ অশ্বারোহী সেনা মহাদর্পে কূচ করিয়া পাহাড়ের নীচে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সেই দুর্দশার কাহিনী বলিবার জন্য যে ফিরিয়া যাইবে এমন অল্প লোকই অবশিষ্ট রহিল।

এই জয়লাভে শিবাজী সৌভাগ্যের সোপানে আর একধাপ উচ্চে উঠিলেন। তাঁহার যশোরব চতুর্দিকে প্রসারিত হইল। বিশ্বাসঘাতকতা যদিও এই জয়ের মূল কিন্তু শিবাজী তাহা পাইয়া নিদ্রিত রহিলেন না। তাঁহার সাধ যে পাহাড় দুর্গ হস্তগত করা — তাহা অবাধে মিটাইতে পারিলেন। এখনো কিন্তু সকল সঙ্কট দূর হয় নাই — বিজাপুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া আবার মোগলের কোপচক্রে পতিত হইলেন। এক ফাঁড়া গিয়া আর এক ঘোরতর ফাঁড়া উপস্থিত। এই বিষম সঙ্কট হইতে কি কৌশলে উদ্ধার পাইলেন তাহা বর্ণনা যোগ্য।

দক্ষিণের মোগল প্রতিনিধি সায়েস্তা খাঁ শিবাজীকে শাসন করিতে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে বাহির হইলেন। শিবাজীর সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিয়া নবাব পুণায় আসিয়া আড্ডা করিলে, শিবাজী তাঁহার সিংহগড় কোটরে প্রবেশ করিলেন। নবাব তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান — "তুমি মর্কট বানরের মত পাহাড়ের উপর বসে থাক — যুদ্ধের বেলায় কেল্লায় বদ্ধ থেকে এগোতে সাহস কর না, এবার আমি তোমাকে গ্রেপ্তার না

সায়েস্তা খাঁ

করে ছাড়ব না।" বাস্তবিক তাহাই হইল। নবাব যে বাড়ীতে ছিলেন তাহা এক সময়ে শিবাজীর বাসগৃহ ছিল, নাম লালমহল, তিনি তাহার অন্তরবাহির সকলি তন্নতন্ন করিয়া জানিতেন। সায়েস্তা খাঁ সেনা পরিবৃত — বাহির হইতে শত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য যাহা কিছু করা যাইতে পারে সকল উপায় যোজনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। শিবাজী একরাত্রে অন্ধকারে হঠাৎ তাঁহার দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সৈন্যদল স্থাপন করিয়া ২৫ জন মাওলী সঙ্গে এক বিবাহের বরযাত্রী দলে মিশিয়া নগরে প্রবেশ লাভ করেন। কেহ কিছু সন্দেহ করিবার পূর্বে পশ্চাতেব এক দ্বার দিয়া নবাবের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সায়েস্তা খাঁ এইরূপ আকস্মিক বিপদ দেখিয়া পলাইবার পথ পাইলেন না। শেষে আপনার শয়নগৃহের গবাক্ষ হইতে ঝাঁপ দিয়া নীচে পড়িয়া খড়্গাঘাতে দুইটি অঙ্গুলি মাত্র হারাইয়া কোন মতে পাব পাইলেন। এই উপপ্লবে নবাবের পুত্র ও অনুচরবর্গ নিহত হইল। শিবাজীব চকিতের ন্যায় উদয় — চকিতের ন্যায় অন্তর্ধান। তাঁহার অনুচরগণের জয়ধবনি ও মসালের আলোকের মধ্যে মোগলদের চক্ষুর শূল হইয়া মহাসমারোহে স্বীয় দুর্গে পুনঃ প্রবেশ কবিলেন। এই অদ্ভুত সাহসিক কার্যের আশাতীত ফললাভ হইল। মোগল সৈন্যগণ আপনাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাত সন্দেহ করিয়া ছড়ীভঙ্গী হইয়া পড়িল। শিবাজীর সাহস এমনি বাড়িয়া উঠিল যে কিছুকাল পরেই তিনি চতুঃসহস্র অশ্বারোহী সঙ্গে হঠাৎ সুরাটে উপস্থিত হইয়া ছয়দিন ধবিযা মনের সাধে নগর লুণ্ঠন করিয়া অগাধ ধনরত্নে তাঁহার রায়গড় কেল্লার ধনাগার পূর্ণ করিলেন। এই আক্রমণ কালে ইংবেজরা অতুল বিক্রম ও সাহসের সহিত আপনাদেব সুরাটের কুঠি রক্ষা করিয়াছিলেন, কাহার সাধ্য ব্রিটিশ সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করে! শিবাজী এই কাণ্ড করিয়া দিল্লীর সম্রাটকে পত্র লেখেন — "আমি আপনার মাতুল সায়েস্তাকে শাসন করিয়াছি — সুরতকে বে-সুরত করিয়া আসিয়াছি। হিন্দুস্থান হিন্দুদের দেশ আপনার তাহাতে কোন অধিকার নাই।" অমিত বীর্য দিল্লীশ্বরের প্রতি এইরূপ অপমান-পুচ্ছ লিপিবান সন্ধান করা — শিবাজীর মত মর্কটের মোগল শার্দুলের সহিত গায়ে পড়িয়া কলহে প্রবৃত্ত হওয়া সামান্য স্পর্ধা ও দুঃসাহসের কার্য নহে।

এই ঘটনার বৎসরেক পরেই দেখিতে পাই শিবাজী মোগল সম্রাটের কুহকে পড়িয়া আছেন। মোগল সেনাপতি জয়সিংহের সঙ্গে মিলিয়া তিনি বিজাপুর আক্রমণ করেন। এই উপলক্ষ্যে মহারাষ্ট্রীরা এমন বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল যে দিল্লী সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া শিবাজীকে স্বহস্তে দুই অভিনন্দনপত্র লিখিয়া সেই সঙ্গে তাঁহাকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। শিবাজী স্বীয় পুত্র শম্ভোজীকে সঙ্গে করিয়া দিল্লী যাত্রা করেন। গিয়া দেখিলেন — যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা কিছুই নয়, — যেরূপ মান-মর্যাদা পাইবার আশা ছিল,তাহা পাইলেন না। রাজদরবারে তৃতীয় শ্রেণীর সরদারদের সহিত একাসনে বসিতে হইল, বাদশাহ তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। শিবাজীর মনে এমনি আঘাত লাগিল যে তিনি সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বাসায় গিয়া দেখেন তাঁহার গৃহের

আশ্চর্য পলায়ন

চারিদিকে সিপাই সাস্ত্রীর পাহারা, পালাইবার পথ নাই। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন দিল্লী আসিয়া ভাল কাজ করেন নাই, পলাইবার পন্থা দেখিতে লাগিলেন। তিনি পীড়ার ছল করিয়া শয্যাগত রহিলেন। কয়েকজন বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসা করিতে আসিত, তাহাদের দিয়া বাহিরের মিত্রবর্গের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার সুযোগ হইল। তিনি আর একটা ফন্দী করিলেন। গরীব ফকির-কাঙালিদের মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা তাঁহার এক কাজ হইল — ঐ সকল সামগ্রী বড় বড় চুবড়ি করিয়া পাঠান হইত। এইরূপ কিছু দিন যায়, এক রাত্রে তিনি নিজে একটা চুবড়ির মধ্যে লুকাইয়া পুত্রবরকে আর একটায় পুরিয়া দুই বাহকের স্কন্ধে বাহির হইলেন — দ্বারপালেরা অভ্যাশবশতঃ ওদিকে বড় লক্ষ করিল না। তাঁহার শয্যায় একজন ভৃত্যকে রাখিয়া দিলেন, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার পলায়ন কেহ সন্দেহ করিতে পারে নাই। তাঁহার জন্য এক স্থানে অশ্ব প্রস্তুত ছিল, তাহাতে আরোহণ করিয়া পুত্রকে পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া সেই যে একটানা চলিলেন আর কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। মথুরায় আসিয়া মস্তক মুণ্ডন ও ভস্ম লেপন পূর্বক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। তথা হইতে আলাহাবাদ — আলাহাবাদ হইতে বারাণসী — বারাণসী হইতে গয়া তীর্থ — গয়া হইতে কটক, — কটক হইতে হাইদ্রাবাদ — এইরূপে ৮ মাসের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া রাজগড়ের কেল্লায় তাঁহার মাতা জীজাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। একদিন হঠাৎ দুইজন বৈরাগী জীজাবার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। জীজাবা তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলে একজন দস্তুর মত তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন — অন্যজন পাগড়ী খুলিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। মাথার চিহ্ন দর্শনে আপনার পুত্র বলিয়া চিনিতে পারিয়া জীজাবা তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন। অনেকদিন পরে পুত্রকে পাইয়া জীজাবার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে দিন কাঙালিদের অন্নদান — তোপধ্বনি — বাদ্যোদ্যমের ধুম লাগিয়া গেল — ছোটবড় সকল লোকেই আন্দোৎসবে মত্ত হইল।

এই প্রকারে অশেষ বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া শিবাজী অল্পে অল্পে তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। নর্মদা হইতে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতবর্ষ তাঁহার অধীন হইল। তিনি রাজা পদবী গ্রহণ করিয়া ৬ জুন ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে রায়গড়ে মহা ধুমধাম করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। সেই উপলক্ষে আপনাকে স্বর্ণস্তূপে ওজন করিয়া স্বীয় দেহভার স্বর্ণরাশি ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করত অতুল খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। শিবাজী রাজার রাজ্য লাভে যেমন চাতুর্য, রাজ্য সংগঠনেও তেমনি দক্ষতা, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত হইলাম।

বোম্বাই শহর

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইতিহাস অনুক্রম

শিবাজী প্রতিভাগুণে এই যে মহারাষ্ট্রী রাজ্যের সূত্রপত্তন হইল, তাহা অনতিকাল মধ্যেই সমুদায় ভারতে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু বলিতে কি, শিবাজীর বংশজ রাজগণের মধ্যে কেহই তাঁহার মত বীর ও যশস্বী হয় নাই। তাঁহার পুত্র শম্ভোজী নিকৃষ্ট আমোদাসক্ত নিতান্ত অকর্মণ্য ছিলেন। সঙ্গমেশ্বরে আমোদপ্রমোদে মত্ত আছেন, এমন সময় জনৈক মোগল সরদার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া ঔরঙ্গজীবের নিকট ধরিয়া আনে। শম্ভোজীর প্রাণ রক্ষার্থে বাদসাহকে অনেক অনুরোধ করাতে সম্রাট বলিয়া পাঠাইলেন, "তোর জীবনমরণ আমারি হাতে তা তুই জানিস্। যদি মুসলমান হতে রাজি হোস্, তাহলেই তোর প্রাণ রক্ষা, নতুবা জল্লাদের হাতে তোর মৃত্যু।" শম্ভোজী উত্তর দিলেন, "বাদসা যদি আপন কন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজি হন, তাহলে আমি মুসলমান হই।" এই উত্তরে ঔরঙ্গজীব ক্রোধান্ধ হইয়া শম্ভোজীর প্রাণদণ্ড আদেশ করিলেন।

শম্ভোজী

শম্ভোজীর পুত্র সাহু শৈশবকালে ঔরঙ্গজীবের হস্তে পতিত হইয়া অনেক বৎসর কারাবাসে কালাতিপাত করেন। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন কিন্তু মোগলদের মধ্যে সুদীর্ঘ কারাবাস প্রযুক্ত তাঁহাতে আর কোন পদার্থ ছিল না। রাজদণ্ড ধারণ সামর্থ্যাভাবে ক্রমে রাজ্যভার সচিব-প্রধান পেশওয়ার হস্তে সন্যস্ত হইল। প্রথম পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ। ১৭১৪-এ বালাজী প্রধানমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে নৃপতিকে অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। পেশওয়া পদ তাঁহার বংশানুগামী হইল। সাহু কেবল নামে ছত্রপতি — তাঁহার রাজ্যাধিকার গেল — স্বাধীনতা পর্যন্ত অপহৃত হইল। শেষে এমন হইল সাতারার রাজা সাতারায় বন্দী — পেশওয়াই সর্বময় কর্তা। নূতন পেশওয়ার অভিষেক কালে অভিষেক-বসন মহারাজের নিকট হইতে আনান হইত এই যা রাজমর্যাদার অবশিষ্ট রহিল। ১৭১৮-এ বালাজী পেশওয়া সইয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পোষকতায় স-সৈন্য দিল্লী যাত্রা করেন। তার বৎসর দুই পরে দাক্ষিণাত্য রাজস্বের চৌথ আদায়ের বাদসাহী পরওয়ানা লাভ করেন। তাঁহার প্রযত্নে পুণা ও সাতারার অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে মহারাষ্ট্র রাজপতাকা বিধিমত বদ্ধমূল হইল।

সাহু ১৭০৭

প্রথম পেশওয়া
বালাজী বিশ্বনাথ
১৭১৪

বালাজীর পুত্র বাজিরাও দ্বিতীয় পেশওয়া। ইনি একজন অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন তেজীয়ান্ পুরুষ ছিলেন। যোগ্য পিতার যোগ্যতর সন্তান। মহারাষ্ট্রা আধিপত্য উত্তর হিন্দুস্থানে সংস্থাপিত করা বাজীরাওয়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল। মোগল রাজ্যের ভগ্ন জীর্ণদশা তিনি বিশিষ্টরূপ

অবগত ছিলেন। তিনি কথায় কথায় সাহু রাজাকে বলেন, "এই আমাদের সময়। ভারত ভূমি হইতে বিদেশীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া অক্ষয় কীর্তি উপার্জনের এই অবসর। শুষ্ক তরুমূলে কুঠারাঘাত কর শাখাসকল আপনা হইতেই পড়িয়া যাইবে।" তাহার উৎসাহ বাক্যে সাহুর চিত্ত পিতামহোচিত জ্বলন্ত উৎসাহে ক্ষণকালের নিমিত্তে উত্তেজিত হইল। তিনি উত্তর করিলেন "তুমি পিতার যোগ্য পুত্র, তুমিই স্বহস্তে মহারাষ্ট্র জয়ধ্বজা হিমালয় বক্ষে নিঘাত করিবে।" বাজিরাওয়ের বলবীর্যে মহারাষ্ট্রী রাজ্য বিপুল বিস্তার লাভ করিল। ১৫ বৎসরের মধ্যে তিনি বাদসাহী মুলুক হইতে মালব ছিনিয়া লন ও বিন্ধ্যাচলের উত্তর পশ্চিম নর্মদা হইতে চম্বল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ১৭৩৯-এ পোর্তুগীস নিকট হইতে বাসীন অধিকার করেন। এই সকল দেখিয়া মহারাষ্ট্রী রাজ্যের উপর ইংরাজদের কটাক্ষ পড়ে। বাসীন বিজয়ানন্তর ইংরাজেরা সাহু রাজার নিকট দূত প্রেরণ করেন। দূতের প্রতি উপদেশ এই ঃ—

দ্বিতীয় পেশওয়া বাজিরাও
১৭২১-৪০

"রাজসভায় বাজিরাওয়ের শত্রু আছে কি না সন্ধান নিবে। পোর্তুগীস মুলুক জয়ে দিন দিন তাঁহার বলবৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহার গর্ব খর্ব করা সর্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ। তাঁহার বিরুদ্ধে লোকের ঈর্ষা জ্বালাইয়া দিবার সুযোগ পাইলে অমন সুবিধা যেন ছাড়া না হয়, কিন্তু সাবধান তিনি যেন আমাদের শত্রু হইয়া না দাঁড়ান তাহা হইলে আমাদের সমূহ ক্ষতি।"

১৭৩৯-এ পেশওয়ার সহিত সন্ধিবন্ধনে মহারাষ্ট্রে ইংরাজ বাণিজ্য প্রমুক্ত হইল। এই সন্ধির এক বৎসর পরে বাজিরাওয়ের মৃত্যু।

বাজিরাও রূপবান বীর্যবান অমায়িক সরলান্তঃকরণ ছিলেন। যুদ্ধযাত্রা কালে তিনি বীরোচিত কঠোর ব্রতপালন পূর্বক আড়ম্বরশূন্য সহজ ভাবে চলিতেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা গল্প আছে— তাঁহার সহিত নিজাম-উল্-মুল্কের প্রথম যুদ্ধারম্ভে নিজাম একজন সুবিখ্যাত চিত্রকরকে ডাকাইয়া আদেশ করেন "বাজিরাওকে গিয়াই যেভাবে দেখিবে সেইভাবে তাঁহার ছবি তুলিয়া আনিবে।" চিত্রকর দেখিলেন বাজিরাও বল্লম স্কন্ধে দুই হাতে জোয়ারীর দানা ভাঙিয়া চিবাইতে চিবাইতে অশ্বপৃষ্ঠে সামান্য সেনার মত চলিয়াছেন — এইভাবে তাঁহার চিত্র চিত্রিত হয়।

বাজিরাওয়ের তিন পুত্র — তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বালাজী তাঁহার উত্তরাধিকারী। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রঘুনাথ রাও (রাঘোবা) মহারাষ্ট্রে যে অপূর্ব নাট্যাভিনয় করিয়া গিয়াছেন তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখি যে এই রাঘোবা ইংরাজ মহলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ইংরাজদের ডাকিয়া ইনিই রাজ্যনাশের সূত্রপাত করেন — ইঁহার পুত্র দ্বিতীয় বাজিরাও পিতার কার্য শেষ করিয়া রাজ্যের সমাধি স্বহস্তে প্রস্তুত করেন। বালাজীর অপর নাম নানাসাহেব। নানার রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রবল মোগল রাজ্যে

তৃতীয় পেশওয়া
বালাজী বাজিরাও (নানাসাহেব)
১৭৪০-৬৯

প্রবেশ করিয়া তাহার হৃৎকম্প উৎপাদন করে। ১৭৪১-৪২-এ নাগপুর শাখীয় সেনাপতি ভোঁসলা বাঙ্গলায় মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত লুঠপাঠ করিয়া ফিরিয়া আসেন। আমাদের শিশু ঘুমপাড়ানী গান ও "মারাট্টা ডিচ" নামক নগর সংরক্ষণী খন্দকে বর্গীদের উৎপাতের স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান। ১৭৫১-এ নবাব আলিবর্দির নিকট হইতে তাঁহারা বাঙ্গলায় চৌথ ও উড়িষ্যা অধিকার লাভ করেন। নানার শাসনকালে ইংরাজেরা জলদস্যু আঙ্গে দমনে পেশওয়ার সহযোগিতা করেন। পূর্বে সমুদ্রের উপর জিঞ্জিরা নবাবের আধিপত্য ছিল। মোগল সাম্রাজ্য পতনের পর মহারাষ্ট্রী সরদার আঙ্গে তাহার স্থান অধিকার করেন। ১৬৯০ হইতে ১৮৪০ পর্যন্ত, কানোজী হইতে রাঘোজী পর্যন্ত, আঙ্গে বংশের আধিপত্যকাল। রাঘোজীর মরণান্তর তাঁহার বংশ লোপ পাইয়া ডালহৌসী রাজনীতি অনুসারে আঙ্গে-রাজ্য ইংরাজ হস্তগত হয়। আঙ্গে বংশের আদিপুরুষ কানোজী সামান্য লোক ছিলেন না। বোম্বায়ের কাছাকাছি যত জাহাজ আসিত, তাহারা তাঁহার লৌহহস্ত এড়াইতে পারিত না। ত্রাবাঙ্কুর হইতে বোম্বাই পর্যন্ত পশ্চিমকূলের প্রধান প্রধান নগর এই জলদস্যুর উপদ্রবে শশব্যস্ত। আঙ্গের হস্তে ইংরাজদেরও অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৭২৪ ও ১৭৫৪-র মধ্যে দুই ইংরাজ রণতরী আঙ্গে কর্তৃক ধৃত হয়। কলিকাতাবাসীগণ যেমন বর্গীদের উৎপাত ভয়ে শহরের চারদিকে গর্ত খনন করিয়া সুরক্ষিত হন, বম্বের বণিকগণও আঙ্গের আক্রমণ শঙ্কায় সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একবার ইংরাজ পোর্তুগীস মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু তাহার কোন ফল হইল না। ১৭৫৫ অব্দে কানোজীর পুত্র তুলাজীকে বশে আনিবার জন্য ইংরাজেরা পেশওয়ার সহিত যোগ দেন; পর বৎসর সুবর্ণদুর্গ ও বিজয়দুর্গ (ঘেরিয়া) তাঁহার প্রধান দুই দুর্গ বিজিত হয়। সুবর্ণদুর্গ হারাইয়া তুলাজী সাগর পরিরক্ষিত বিজয়দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আডমিরল ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইব মিলিয়া — ওয়াটসন জলে ক্লাইব স্থলে আক্রমণ করতঃ দুর্গ দখল করেন। অতঃপর ইংরাজ গবর্ণর বিজয়দুর্গ লাভ লালসে পেশওয়াকে বিস্তর অনুরোধ করেন কিন্তু তাহা যদিও পাইলেন না, তৎপরিবর্তে বোম্বায়ের দক্ষিণস্থ বাঙ্কোট ও অপর কতকগুলি গ্রাম উপার্জনে ক্ষতিপূরণ করিয়া লইলেন। অপিচ পেশওয়ার নিকট হইতে এইরূপ বচন পাইলেন যে ওলন্দাজেরা মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবেশ ও বাসের অনুমতি পাইবে না — তাহাদের বাণিজ্য পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিবেন। পোর্তুগীসদের দুর্দশার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পোর্তুগীসদের পতন ও মহারাষ্ট্রীদের সহিত উক্তরূপ সন্ধিস্থাপন বশতঃ অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় জাতির মধ্যে ইংরাজদের প্রভুত্ব বলবত্তর হইয়া উঠিল।

নানাসাহেবের শেষ দশা শোচনীয়। তিনি পানিপথের যুদ্ধে স্বজাতির অধঃপাত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আইলেন — ভারতবর্ষে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপনের আশা জলাঞ্জলি দিতে হইল। ইহার পর নানাসাহেব আর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই।



পার্ব্বতী।—(PARVATI TEMPLE, POONA).

এই মর্মান্তিক আঘাতে তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি আস্তে আস্তে পুণায় ফিরিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িলেন ও কয়েক মাসের মধ্যেই পার্বতী মন্দিরে দেহত্যাগ করিলেন।

নানার জ্যেষ্ঠপুত্র পানিপথের যুদ্ধে মারা পড়েন — তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মাধবরাও পেশওয়া পদে অধিরূঢ় হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর। তাঁহার পিতৃব্য রাঘোবা পেশওয়াকে হাতে রাখিয়া স্বয়ং কর্তা হইবার প্রয়াসী ছিলেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। মাধবরাও স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ পূর্বক অসামান্য চাতুর্যের সহিত রাজকার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রদের দিন দিন শ্রীসমৃদ্ধি দর্শনে ইংরাজেরা সশঙ্কিত, কিন্তু এই সময়ে তাঁহারা হাইদর আলির উপদ্রব নিবারণে সমুৎসুক। হাইদর দমনে মহারাষ্ট্রীদের সহিত সদ্ভাব বন্ধন প্রয়োজন সুতরাং তাঁহাদের মনোগত ভাব মনেই সংবৃত করিতে বাধ্য হইলেন;সদ্ভাবব্যঞ্জক দৌত্যে পেশওয়াকে কোন মতে থামাইয়া রাখিবার চেষ্টা। ইংরাজ দৌত্যের ৫ বৎসর পরে মাধবরাও লোকান্তর গমন করেন। তিনি সন্তানসন্ততি রাখিয়া যান নাই। তাঁহার স্ত্রী রমাবাঈ অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন, মৃত পতির অনুমৃতা হইয়া চিতানলে দেহত্যাগ করেন। মাধবরাও পেশওয়া ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তা বলিয়া প্রখ্যাত;বলবানের বিরুদ্ধে দুর্বলের ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের সহায় ছিলেন। এই ন্যায় সাহসী প্রজাবল্লভ দৃঢ়মতি নৃপতি বিয়োগে রাজ্যের যত হানি হয়, পানিপথের যুদ্ধেও তেমন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।

চতুর্থ পেশওয়া
বড় মাধবরাও ১৭৬১-৭২

১৭৭২-এ মাধবরাওয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণরাও অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সিংহাসন আরোহন করেন। তিনি রাঘোবা কাকার ষড়যন্ত্রে অকালে কালকবলে পতিত হন। রাঘোবাপত্নী আনন্দীবাঈ এই কাণ্ডের মূল কারণ বলিয়া লোকের বিশ্বাস। মাধবরাও পেশওয়া দুরন্ত রাঘোবাকে বশে রাখিবার জন্য কয়েদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, অবশেষে স্বীয় মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া তিনি রাঘোবাকে ডাকাইয়া ভাইটিকে তাঁহার হস্তে সঁপিয়া যান। কতককাল খুড়া ভাইপোর মধ্যে মৌখিক সদ্ভাব বজায় ছিল কিন্তু নারায়ণরাওয়ের মাতা গোপিকাবাঈ ও রাঘোবার স্ত্রী আনন্দীবাঈ এই দুজনের মধ্যে বনিবনাও ছিল না। মন্ত্রীবর্গের সঙ্গেও রাঘোবার মনান্তর এই সকল কারণে তিনি পুনর্বার প্রাসাদে বন্দীকৃত হইলেন। তদবধি তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের অনিষ্ট সাধনের উপায় দেখিতে লাগিলেন। সেনাদের ঘুস দিয়া বশ করা তাঁহার প্রথম চেষ্টা। হঠাৎ একদিন গোল উঠিল পেশওয়ার সৈন্যদল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। নারায়ণরাও তখন প্রাসাদে নিদ্রিত ছিলেন। বিদ্রোহীদলের নেতা সমরসিংহ। তুলাজী পওয়ার নামক রাঘোবার অনুচর সমরসিংহের সহযোগী। বিদ্রোহীগণ সম্মুখদ্বার ছাড়িয়া অন্য দ্বার দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ লাভ করত পেশওয়ার শয়নগৃহের দিকে ধাবিত হইল। নারায়ণরাও তাহাদের গোলমাল শ্রবণে ভীত হইয়া কাকার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন — সমরসিং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যুবক

পঞ্চম পেশওয়া নারায়ণ রাও
১৭৭২-৭৩

কাকার পায়ে কাঁদিয়া পড়িয়া কাতর স্বরে প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। রাঘোবা সমরসিংহকে ক্ষান্ত হও বলিয়া অনুরোধ করিলেন কিন্তু সে অনুরোধ শোনে কে? সমরসিং উত্তর করিল "এতদূর আসিয়া এখন কি আমি নিজেই মরিতে যাইব; ছাড়িয়া দেও নতুবা তুমিও মারা পড়িবে।" রাঘোবা ছাড়াইয়া ছাতে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। নারায়ণ রাও পলায়নোদ্যত কিন্তু পাষণ্ড তুলাজী তাঁহার পা টানিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল। এমন সময় চাপাজী নামক একজন বিশ্বাসী রাজভৃত্যের প্রবেশ। তার হাতে যদিও কোন অস্ত্রশস্ত্র নাই সে দৌড়িয়া গিয়া তাহার প্রভু ও অস্ত্রধারীদের মধ্যে ব্যবধান হইল। তাঁহাকে দেখিয়া নারায়ণ রাও তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন — চাকর মনিব দুজনেই নরাধম নিষ্ঠুর হন্তারকদ্বয় কর্তৃক নিহত হইল।

রাঘোবা এই হত্যাকাণ্ডে সংলিপ্ত কিনা তাহার কোন প্রমাণ ছিল না — রামশাস্ত্রীর উপর অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইল। রামশাস্ত্রী ন্যায়বাণ্ সত্যনিষ্ঠ স্পষ্টবাদী সুবিজ্ঞ বিচারপতি — পুণা দরবারে বশিষ্টস্বরূপ ছিলেন। ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও ভয় করিয়া চলিত। অনুসন্ধানে তিনি শেষে জানিতে পারিলেন রাঘোবা নারায়ণ রাওয়ের বধের আদেশ দেন নাই — তাঁহাকে ধরিবার অনুমতি দিয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার আজ্ঞাপত্রে "ধরিবে" এই কথা বদলাইয়া "মারিবে" এই কথা কে একজন লিখিয়া দিয়াছে। প্রসিদ্ধি এইরূপ যে রাঘোবার পত্নী পিশাচিনী আনন্দীবাঈ এই জালের কর্ত্রী। এই ঘটনার কতকদিন পরে রাঘোবা রামশাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর করিলেন "তোমার নিজের প্রাণ উৎসর্গ ভিন্ন ইহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তোমার জীবনে আর সুখ নাই — তোমার কিম্বা তোমার রাজ্যের কল্যাণ নাই। তুমি যতদিন কর্তা থাকিবে ততদিন আমি এ সরকারে চাকুরি করিব না — আর এ মুখো হইব না।" শাস্ত্রী তাঁহার বচন রক্ষা করিলেন। সেই অবধি তিনি রাজকার্য পরিত্যাগ পূর্বক পুণা ছাড়িয়া বিজন গ্রামে একান্তে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

রামশাস্ত্রী

রঘুনাথ রাও পেশওয়া পদে আরূঢ় হইলেন কিন্তু বিস্তর দিন টিকিতে পারেন নাই। তিনিও যেমন যুদ্ধযাত্রায় পুণার বাহির হইলেন, তাঁহার বিপক্ষদলও শির উত্তোলন করিল। মন্ত্রী-প্রধান খ্যাতনামা নানাফর্ণবীস সে দলের নেতা। রাঘোবার সহচর অনুচরগণ একে একে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিল। রাঘোবা বেগতিক দেখিয়া সিন্দে হোলকর ও ইংরাজদের শরণ ভিক্ষায় কৃতসংকল্প হইলেন। এই সময় হইতে পেশওয়া বংশের অবনতি। প্রথমে যখন বাজিরাও রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, তখন সেনাপতি রাঘোজী ভোঁসলা বহ্রাড় প্রান্তের জায়গীরদার ছিলেন। তিনিও পেশওয়ার দৃষ্টান্তে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। পেশওয়ার অধীনস্থ অপরাপর কর্মচারীরাও প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে তৎপর হইল। ক্রমে পঞ্চশাখা বিস্তৃত

ষষ্ঠ পেশওয়া
রঘুনাথ রাও (রাঘোবা)
১৭৭৩-৭৪

পেশওয়া বংশের অবনতি

হইল। পেশওয়া তাহার মধ্যবিন্দু, তাঁহার রাজধানী পুণা। ভোঁসলার রাজধানী নাগপুর। সিন্দে গোওয়ালিয়রের আধিপত্য পাইলেন। হোলকার ইন্দোরে, বরদায় গাইকওয়াড় স্ব স্ব আধিপত্য স্থাপন করিলেন। পেশওয়া চিতপাবন, ব্রাহ্মণ, অন্যান্য সরদারগণ শূদ্রজাতীয় মহারাট্টা। মহলাররাও হোলকার হীনবর্ণ সৈন্য ছিলেন;রানোজী সিন্দে পেশওয়ার পাদুকাধারী;পিলোজী গাইকওয়াড় রাখালরাজ। ইঁহারা সকলেই দীনহীন সামান্য শ্রমজীবীর জীবিকা হইতে স্বভুজবলে রাজসিংহাসন উপার্জন করেন, নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজবংশ পত্তন করিয়া যান। পেশওয়া প্রথমতঃ এই সকল বীরদিগকে দেশবিজয়ে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের উপর সৈন্য সংস্থানের ভার। তাঁহারা দূরে দূরে থাকিয়া কার্য করিতেন, পেশওয়া তাঁহাদের উপর কর্তৃত্ব খাটাইবার সুবিধা পাইতেন না। পেশওয়ার অজ্ঞাতসারে স্বেচ্ছানুসারে তাঁহারা সন্ধি বিগ্রহ করিতে লাগিলেন ও রাজ্য রক্ষার্থে সেনা নিয়োগ না করিয়া স্বার্থ সিদ্ধিতেই নিযুক্ত করিলেন। কালক্রমে তাঁহারা নিজে নিজেই সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন — পেশওয়ার অধিকার নাম মাত্র। সাতারার রাজা সম্বন্ধে যেমন পেশওয়া, পেশওয়া সম্বন্ধে তদ্রূপ তাঁহার ভৃত্যবর্গ।

পঞ্চশাখা

পুণা দরবার দুই দলে বিভক্ত — একদল রাঘোবার পক্ষ — অপর দল মৃত নারায়ণ রাওয়ের পত্নী গঙ্গাবাঈয়ের পক্ষ। গঙ্গাবাঈ তখন গর্ভবতী, সুরক্ষিত ভাবে পুরন্দর দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাঘোবা সৈন্যসামন্ত লইয়া স্বপক্ষ সমর্থনে যত্নশীল হইলেন;প্রথম প্রথম কতকটা কৃতকার্যও হইলেন। তিনি যুদ্ধে অরিদল জয় করিয়া বিপক্ষ সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার প্রতিকূল। পুণার সিংহাসন স্পর্শ করেন, ইতিমধ্যে তাঁহার মাথায় বজ্রপাত সদৃশ সংবাদ আসিল যে রাণীর পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে — ৪০ দিন গত হইলে শিশু রাজার রীতিমত রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। জ্যেঠা অপেক্ষাও বড় এই অর্থে "সওয়াই" মাধব রাও নামে শিশুর নামকরণ হইল। এই সঙ্কটে হোলকার সিন্দিয়ার সাহায্য লাভে নিরাশ্বাস হইয়া রাঘোবা ইংরাজদের শরণাপন্ন হইলেন। বম্বে গবর্নমেন্ট অর্থ ও ভূমিলাভ লালসায় তাঁহার পক্ষে অস্ত্রধারণে প্রতিশ্রুত হইলেন।

পুণায় দলাদলি

সপ্তম পেশওয়া সওয়াই মাধবরাও ১৭৭৪-১৭৯৫

১৭৭৫-এ রাঘোবা ও বম্বে গবর্নমেন্টের মধ্যে সন্ধিস্থাপন হয়, নাম সুরাট সন্ধি। সন্ধির তাৎপর্য এই, ইংরাজেরা রাঘোবাকে সসৈন্য পুণায় পৌঁছাইয়া দিয়া পেশওয়া-সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিবেন — রাঘোবা ইংরাজদের পুরস্কার স্বরূপ বাসীন সালসেট প্রভৃতি কতকগুলি লোভনীয় স্থান ছাড়িয়া দিবেন। ইংরাজ ও মহারাট্টাদের মধ্যে যুদ্ধের এই সূত্রপাত।

রাঘোবা ও বম্বে গবর্নমেন্ট

রাঘোবার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত সুপ্রীম গবর্নমেন্টের মনঃপূত হয় নাই। তাঁহারা সন্ধি প্রত্যাখ্যানের আদেশ জারী করিলেন। তাঁহাদের আদেশক্রমে পুণা দরবারের সহিত কথাবার্তা স্থির হইয়া পুরন্দরের সন্ধি সন্ধায়িত হইল।

সুপ্রীম গবর্নমেন্ট

পুরন্দরের সন্ধি মৌখিক ও ক্ষণস্থায়ী। রাঘোবাকে দিয়া কার্যোদ্ধার করা ইংরাজদের প্রকৃত অভিপ্রায়। এই সময় আবার সেন্ট লুবিন নামক একজন ফরাসিস্ পুণায় আসিয়া গোলযোগ আরম্ভ করেন। পুণায় একটা ফরাসিস্ কুঠী স্থাপন করা ও কুঠী রক্ষণে ফরাসিস্ সৈন্য নিয়োগ করা তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য। পেশওয়া তাঁহাকে মহা ধুমধাম করিয়া অভ্যর্থনা করেন। মন্ত্রীবর নানাফর্ণবীস তাঁহার পোষক। এইসব দেখিয়া ইংরাজেরাও পুণার দরবারে প্রবেশ লাভে সমুৎসুক হইলেন। মন্ত্রীবর্গের মধ্যে বিচ্ছেদ-সূত্রে তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির সুবিধাও হইল। রাঘোবার পক্ষপাতী সখাসামরাও বম্বে গবর্নমেন্টের সহিত কুমন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। বম্বে গবর্নমেন্ট সুপ্রীম গবর্নমেন্টের মত চাহিয়া পাঠাইলেন। সুপ্রীম গবর্নমেন্টের মতের ঐক্য নাই। দুজন কৌন্সলর একদিকে, তাঁহাদের মতে পুরন্দর সন্ধি ভঙ্গ করা "অবৈধ, অন্যায় ও অনিষ্টকারী," অপর দুজনার স্বতন্ত্র মত। যখন দুই পক্ষ সমান সমান তখন গবর্নর জেনারেল যে পক্ষে যোগ দেন সেই পক্ষই বলবত্তর। হেস্টিংস সাহেবের অনুকূল মতেই বম্বে গবর্নমেন্টের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল। ১৪ নবেম্বর ১৭৭৮-এ রাঘোবার সহিত নূতন সন্ধি। মহাবাট্টাদের সহিত ইংরাজদের এই প্রথম যুদ্ধ।

পুরন্দরের সন্ধি

সুপ্রীম গবর্নমেন্ট বম্বের সাহায্যে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহাদের আগমন অপেক্ষা না করিয়া বোম্বাই গবর্নমেন্ট যুদ্ধে কটিবদ্ধ হইলেন। বম্বেব সৈন্যাধ্যক্ষ কর্নল এজরটন। তাঁহার যে একাধিপত্য তাহা নহে, তাঁহাব উপর আবার এক যুদ্ধ কমিটির অধিকার। এই অল্প সৈন্য . ়ইয়া মহারাষ্ট্র গর্ভে প্রবেশ করা যত সহজ মনে হইয়াছিল, ফলে দেখা গেল তত সহজ নয়। ব্রিটিশ সৈন্য যত অগ্রসর হয়, মহারাট্টারা আশপাশ প্রদেশ অগ্নিসাৎ করত তত পিছু হটে। ইংরাজ সৈন্য তলেগাম গিয়া দেখে সকলি ভস্মরাশি — লোকজন গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। দুদিন পরে কমিটি হইতে সৈন্য প্রত্যাবর্তনের হুকুম আসে। যদিও কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির ইহাতে অমত ছিল, তথাপি এই আদেশ মত কার্য করিতে হইল। রাত্রে ভারি ভারি তোপ সকল ডোবার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। বেশীর ভাগ জিনিসপত্র অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিয়া ব্রিটিশ সৈন্য ফিরিল। কমিটি মনে করিয়াছিলেন সৈন্যেরা নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিবে, কেহ কিছু জানিতেও পারিবে না। সকাল হইতে না হইতেই শত্রুদলের গোলাবৃষ্টিতে ইংরাজ সৈন্যের স্বপ্নভঙ্গ হইল। সন্ধ্যার সময় সে সৈন্য অনেক কষ্টে বড়গ্রাম পৌঁছে। পরদিন প্রভাত হইতে তাহাদের উপর পুনর্বার গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল — অবশেষে ব্রিটিশ সৈন্য হার মানিয়া সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইল। ইংরাজদের এমন হার আর কখন হয় নাই। মহারাট্টারা যাহা চাহিলেন তাহা পাইলেন। ইংরাজেরা সালসেট্ প্রভৃতি তাঁহাদের কতকগুলি অধিকত প্রদেশ ফিরিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। সিন্দের ভোগে ভরুচ অর্পণ এবং তাঁহার অনুচরবর্গের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণে তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধিত হইল।

প্রথম মহারাট্টা যুদ্ধ ১৭৭৯-৮১

ইংরাজদের দর্প চূর্ণ। এই কলঙ্কপূর্ণ বড়গাম সন্ধি বোম্বাই গবর্নমেন্ট অনুমোদন করিলেন না। সুপ্রীম গবর্নমেন্ট অন্যতর প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন তাহা মহারাট্টীদের অগ্রাহ্য হইল। পুনর্বার যুদ্ধারম্ভ।

জেনেবল গডার্ড
১৭৮০-৮১

এই সঙ্কটে জেনেরল গডার্ড বম্বে সৈন্যের সাহায্যে আগমন করেন। তিনি তখন বন্দেলখণ্ডে ছিলেন। তথা হইতে বিশ দিনের মধ্যে একেবারে ৩০০ মাইল কূচ করিয়া সুরাটে আসিয়া পড়িলেন। প্রথমে গুজরাট, পরে কোঙ্কন তাঁহার রণক্ষেত্র। ১৭৮০ অব্দে তিনি মহারাট্টীদের উপর জয়লাভ করিয়া বাসীন অধিকার করেন।

হাইদর আলি

এই সময় হাইদর আলির কর্নাটিক আক্রমণ সংবাদ বম্বে পৌঁছে। হাইদর দমনে ইংরাজদের সমুদায় বল সমুদায় শক্তি প্রয়োগ করা চাই, মহারাট্টীদের সঙ্গে বিবাদ ভঞ্জন প্রয়োজন। সেনাপতির প্রতি মহারাট্টীদের সহিত সন্ধি বন্ধনের অনুমতি হইল। মনোমত কার্যোদ্ধার করিতে হইলে পেশওয়াকে ভয় দেখান আবশ্যক এই বিবেচনায় গডার্ড্ সৈন্যসামন্ত লইযা বরঘাটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আপনি ঘাটের নীচে অবস্থিতি করিয়া একদল সেনা উপরে খণ্ডালায় প্রেরণ করিলেন। মহারাট্টীরা তাঁহার দুর্বলতা বুঝিয়া বোম্বাই ও গডার্ড্ সৈন্যের মাঝখানে ঝুঁকিয়া পড়িল। পলায়ন শ্রেয় বিবেচনায় গডার্ড্ ফিরিয়া যাইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বরং অল্প সৈন্য লইয়া সম্মুখ যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা কিন্তু মহারাট্টীদের কাছে পিছন ফিরিলে আর রক্ষা নাই। গডার্ড্ তাহাই ঠেকিয়া শিখিলেন। এই প্রত্যাবর্তনে ব্রিটিশ সৈন্যের সমূহ ক্ষতি। দেশী ইউরোপীয় সর্বশুদ্ধ ৪৬১ জন সেনা হত — কামান ও অন্যান্য জিনিসপত্র শত্রু হস্তে পতিত হইল।

সালবাই সন্ধি
১৭৮২

এই দুই হারের পর সালবাই সন্ধি। এই সন্ধিমার্গে ইংরাজ মহারাট্টীদের মধ্যে দেশের আদান প্রদান হইল। ইংরাজেরা রাঘোবার পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন — তিনি অতঃপর পেন্সন-ভোগী হইয়া গোদাবরী তীরে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অন্য ইউরোপীয় জাতির সহিত মিত্রতা বন্ধন করিবেন না, পেশওয়া এইরূপ বচন দিলেন। এই সন্ধি করিয়া ইংরাজেরা হাইদরের বিপক্ষে অবাধে অস্ত্রচালনা করিবার সুযোগ পাইলেন।

মহাদাজী সিন্দে

সালবাই সন্ধি সাধনে মহারাট্টী পক্ষের প্রধান উদ্যোগী মহাদাজী সিন্দে। এই সন্ধি সূত্রে সিন্দিয়ার গুমর বাড়িয়া উঠিল। মহাদাজী (আসল নাম মহাদেব) প্রথমে সামান্য পাটেল ছিলেন, গাঁয়ের মোড়ল বৈ নয় — পেশওয়া সরকারের চাকর; এইক্ষণে তিনি স্বাধীন রাজা, মহারাট্টী সরদারের অধিনায়ক হইয়া দাঁড়াইলেন। উত্তরোত্তর তাঁহার পদবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য বিস্তার হইতে চলিল। এই মহাদাজী সিন্দে মহারাষ্ট্রে বিপুল

কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন — জাতীয় বীরের মধ্যে ইনি শিবাজীর নীচেই গণনীয়;ইহার কার্যকলাপ এই স্থলে কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করা অসঙ্গত হইবে না।

মহাদাজী সিন্দে উত্তর হিন্দুস্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করত পানিপথের কলঙ্ক মোচনে ব্রতী হইলেন। সময় অনুকূল। মোগল রাজ্য জীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন চূর্ণ, চতুর্দিকে অরাজকতা — যার বল তারই জয়, জোর যার মুল্লুক তার। উত্তর হিন্দুস্থান ঘন মেঘাচ্ছন্ন — সেই মেঘের মধ্য দিয়া ঘোর উপপল্লবের চিহ্ন সকল সূচিত হইতেছে; কত বাড়ী ঘর লণ্ডভণ্ড, পরিবার ছারখার, কত শস্যক্ষেত্র মরুভূমিতে পরিণত — কত নির্দোষী ব্যক্তির রক্তপাত হইতেছে। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও দিল্লী সিংহাসনের উপর লোকের অটল অনুরাগ। দিল্লীশ্বর বীর্যহীন ঐশ্বর্যহীন কিন্তু তখনো তাঁহার নাম-মহাত্ম্য ভারতভূমিতে প্রসারিত। দিল্লীশ্বরের নামে সকলেই মোহিত — তাঁহার সহযোগী হইয়া কার্য করিতে লোকে উৎসাহিত — তাঁহার প্রদত্ত মানার্জনে মহা মহা আমীরও আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। সিন্দিয়াও অবসর বুঝিয়া কার্যারম্ভ করিলেন। দিল্লীর বাদসা সা আলম — তাঁহার উজীর নজফ খাঁর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, এই ঘটনায় উজীর পদের জন্য মহা বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে। নজফেব উত্তরাধিকারী আফ্রাসিয়ার সিন্দিয়াকে ডাকিয়া পাঠান। মন্ত্রীর আমন্ত্রণে সিন্দে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে আগ্রায় গিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিছু পরেই আফ্রাসিয়ার শত্রু হস্তে নিহত হওয়ায় রাজ্যবিপ্লব দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিল। সকলেই সিন্দিয়ার দিকে তাকাইয়া, সিন্দের সাহায্যে নিজ নিজ কাজ সাধিবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। সিন্দে দিল্লী প্রয়াণ করিয়া পেশওয়ার তরে "বাদসাহী উজীর" পদবী আদায় করিলেন — স্বয়ং বাদসাহী সেনাপতি পদ গ্রহণ করিলেন। সৈন্য সংরক্ষণে আগ্রা দিল্লীর রাজস্ব নিয়োজিত হইল, এইরূপে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী দোআব প্রদেশ তাঁহার বশবর্তী হইল। বাদসা সৈন্য মাঝে মাঝে সঙের মত এদিক্ ওদিক্ ফিরিতে লাগিলেন — সিন্দিয়া, মথুরাধামে নিজ নিকেতন স্থাপন করিলেন। তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন তাহা নহে, ডিবইন নামক জনৈক ফরাসিসকে পাইয়া সুশিক্ষিত প্রবল সৈন্যদল গড়িয়া লইলেন — সে সৈন্য শীঘ্রই কাজে লাগিল। দিল্লীতে অশান্তির আর অন্ত নাই। বাদসাহের উপর রোহিলা দলপতি গোলাম কাদরের দৌরাত্ম্য সিন্ধিয়ার কর্ণগোচর হইল। এই গোলাম কাদর দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া যে ভয়ানক মারকাট অত্যাচার জারী করে তাহার তুলনা পাওয়া ভার। কতকদিন ধরিয়া নগর লুণ্ঠন, প্রাসাদ লুণ্ঠন;লুণ্ঠনে আশানুরূপ ধন লাভে নিরাশ হইয়া গুপ্তধন বাহির করিবার অভিপ্রায়ে বাদসাহের উপর, রাজপরিবারের উপর অকথ্য দারুণ উৎপীড়ন প্রবর্তিত হয়। এই সকল অত্যাচারে জরজর হইয়া বেচারা সা আলম মন্তস্তাপে বলিয়া উঠিলেন — "এ দৃশ্য দেখা অপেক্ষা আমার অন্ধ হওয়া ভাল ছিল" — এই কাতরোক্তি শ্রবণে নৃশংস কাদর তরবার দিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া সেই দণ্ডে তাঁহাকে অন্ধ করিয়া ছাড়ে। মড়ার উপর আবার খাঁড়ার ঘা না দিয়া সে সন্তুষ্ট নয়। সেই শোণিতাক্ত অন্ধ



৩

মহদাজী শিন্দে

(MAHADAJI SCINDIA).



৪

নানা ফনবীস

(NANA FURNAVESE).

Lith by Hurry Narayon Bose Calcutta

বাদসাকে পাষাণহৃদয় পাষণ্ড আবার উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল "এখন বাবা কি দেখিতেছ?" বাদসা উত্তর করিলেন "তোমার আমার মাঝখানে আমি বাপু কোরাণ দেখিতেছি।" সম্পর্ক উত্তর, কেন না কোরাণ ছুঁইয়া শপথের পর গোলামের শেষে এই আচরণ। এই দুরাত্মাকে শীঘ্রই তাহার পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হইল। সিন্দিয়ার সৈন্যাগমে সে দিল্লী ছাড়িয়া পালায় এবং কতক দিন পরে ধৃত হইয়া স্বীয় পাপানুরূপ কঠোর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মহাদাজী অন্ধ বৃদ্ধ বাদসাহকে মহা সমারোহে দিল্লীর সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করিয়া যথোচিত সান্ত্বনা সহকারে তাঁহার কষ্ট লাঘব করেন। এই অসহ্য দুঃখ ক্লেশের পর সা আলম যে গভীর শোকাচ্ছ্বাসময় কবিতা উদ্গার করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

বিষয় বিভব যাহা আছিল তা বালাই আমার।
কৈনু কত পাপ, পাইনু মনস্তাপ,
যেমন করম তার প্রতিফল যোগ্য
ক্ষমাগুণে এবে প্রভু তরিলে হে, আনিলে আরোগ্য।
দুধ দিয়ে পুষেছিনু সাপ,
সেই বিষে পাই শেষে কত শোক তাপ

পাঠান হানিয়া বাণ, রাজ্য মোর করে ছারখার;
তুমি বিনা আর, প্রভুহে আমার
আছে কেবা ত্রিভুনে করিতে উদ্ধার।
হয়ত তাইমুর আসি, কাটিবেন দুঃখ রাশি,
ঘুচিবে যন্ত্রণা জ্বালা লভিবে সহায়;
না হয় মহাদাজী, পুত্রসম আজি
প্রতিশোধ তুলি বীর বাঁচাবে আমায়;
* আসফ রাখিবে লাজ, অথবা ইংরাজ রাজ
করে ত্রাণ রহে, প্রাণ ধ'রে সে আশায়।

৺ মিহির রে, আজি তোরে ভাগ্য দোষে ঘিরিল দুর্দিনে
এ ঘোর তিমির রহিবে কি চির —
সুদিন দেখিবি, পুনঃ প্রকাশিবি তুই, বিভু কৃপাগুণে।

সিন্দিয়ার মথুরা প্রবাস কালে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট পুণা-দরবারে একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট বসাইবার চেষ্টায় মহারাজা সিন্দে সন্নিধানে দূত প্রেরণ করেন। ব্রিটিশ দূত ম্যাজিলেট সাহেব

---

* আসফ-উদ্দৌলা।

৺ মূল ভাষায় আফতাব — সূর্য — বাদশার অন্য নাম।

মথুরায় সিন্দিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মোগল সম্রাট সা আলম তখন সিন্দের ক্যাম্পে, তাঁহার সহিতও সাক্ষাৎ হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে কি অগাধ পরিবর্তন। ৪০ বৎসর পূর্বে মহারাষ্ট্রী বীরেরা তাহাদের কোটর হইতে বিনির্গত হইয়া ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তখন দিল্লীশ্বরের মহিমা-মিহিরে দিগ্বিদিক ঝলসিত — এই অল্পকাল মধ্যেই তাঁর সমস্ত মহিমা অস্তমিত। সেই দিল্লী সম্রাট এখন বর্গীদের অনুগ্রহ ভিখারী, সিন্দিয়ার ক্যাম্পে আবদার করিতে আসিয়াছেন। সে যাহা হউক সিন্দিয়ার প্রসাদে ব্রিটিশ দৌত্য সফল হইল। ম্যালেট সাহেব ব্রিটিশ কার্যকর্তা হইয়া পুণায় প্রবেশ লাভ করিলেন। ছুঁচ হইয়া প্রবেশ সঙ্গীন হইয়া বাহির হওয়া, ইংরাজদের এই আশ্চর্য নয়া কৌশল ভারত ইতিহাস পদে পদে প্রত্যক্ষ করা যায়।

ম্যালেট সাহেব পুণা দরবারে ব্রিটিশ দূতরূপে কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত কার্য করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন টিপু সুলতানের সঙ্গে দুর্দান্ত সমরে প্রবৃত্ত হন, তখন ম্যালেটের মন্ত্রণায় পেশওয়া ও নিজাম ইংরাজদের সহিত যোগ দিয়া চলেন। ফেব্রুয়ারী ১৭৯২-এ কর্নওয়ালিস শ্রীরঙ্গপট্টন আক্রমণ করিয়া টিপুর উপর জয়লাভ করেন। টিপু হার মানিয়া ১৯ মার্চ ইংরাজদের কথামত সন্ধি লিখিয়া দেন। ইংরাজ ভাগ্যে সুলতান রাজ্যের বহুতর প্রদেশ পতিত হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা যে সকল স্থান জয় করেন, তাহার তৃতীয়াংশ পেশওয়াকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট আরো অনেক প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা চান যে, নিজামের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া পেশওয়াও ইংরাজ সৈন্য পোষণে স্বীকৃত হন। ইংরাজেরা এইরূপ নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন কিন্তু সিন্দিয়ার চতুর পরামর্শে এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

পুণা দরবারে ব্রিটিশ দূত ১৭৮৫

উত্তর হিন্দুস্থানে কিয়ৎ পরিমাণে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনান্তর মহাদাজী সিন্দে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৭৯২ অব্দে তিনি পেশওয়ার হস্তে দিল্লীশ্বর প্রদত্ত নূতন পদমর্যাদা প্রদান উপলক্ষে পুণায় পদার্পণ করেন। এই অভিষেক ক্রিয়া মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। পুণায় এমন ধুমধাম আর কখনও হয় নাই। প্রথমে পেশওয়ার "বাদসাহী উজীর" পাদবী গ্রহণ। সিন্দিয়া অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি করেন নাই। উৎসবের জন্য সারি সারি চিত্র বিচিত্র তাম্বু পড়িয়াছে। প্রান্তবর্তী তাম্বুতে এক স্বর্ণ সিংহাসন প্রস্তুত। তৎসমীপে বাদসাহী সনদ, বসন ভূষণাদি উপহার সামগ্রী সকল বিরচিত। পেশওয়া সিংহাসনের সমক্ষে দাঁড়াইয়া তিনবার সেলাম করিয়া শতেক স্বর্ণমোহর নজরানা দিয়া বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। পরে বাদসাহী পরওয়ানা গঠিত হইল। ইহার শেষ ভাগে হিন্দুস্থানে গোহত্যা নিষেধের অনুজ্ঞা ছিল, পাঠক যখন সেই ভাগে আসিয়া উপনীত হইলেন তখন সভাসজ্জনের উল্লাসের আব সীমা রহিল না। তৎপরে আড়ালে গিয়া

সিন্দের পুণাগমন ১৭৯২

অভিষেক বসনভূষণ সাজসজ্জা করিয়া দরবারে পেশওযার পুনঃ বেশ, সভাস্থ সরদারদের অভিবাদন ও দস্তুরমত নজরদান। অনন্তর তিনি দিল্লীশ্বর প্রেরিত অশ্ব রথ গজ, ঢাল তলবার, বসন ভূষণ, চামর নিশান প্রভৃতি বিবিধ উপহার সামগ্রী গ্রহণ করিলেন। সভা ভঙ্গ করিয়া পেশওয়া যখন শহরে প্রবেশ করেন, তখন সমস্ত পথ লোকে লোকারণ্য — বাদ্যধ্বনি, তোপধ্বনি, পৌরজনের জয়ধ্বনি মিলিত হইয়া যে কি গগনভেদী গভীর নাদ সমুত্থিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। প্রাসাদে গিয়া উজীরের প্রতিনিধি পদে সিন্দের বরণ। এই উপলক্ষ্যে ও অন্যান্য প্রসঙ্গে সিন্দিয়ার বিনয় অভিনয় অতীব কৌতুকাবহ। পাত্রমিত্র সভাসৎ সমস্ত লোকে তাঁহার সম্মানার্থে যেমন ব্যগ্র, সিন্দে নিজ পদ-লাঘব বজায় রাখিতে তেমনি তৎপর। সমবেত আমীর ওমরাদের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন গ্রহণ করা — স্বভুজার্জিত উচ্চ পদবী সকল তুচ্ছ করিয়া আপনার পাটেল নাম লোক মধ্যে ঘোষণা করা — মোরচল (ময়ূর পুচ্ছের চাম) ধরিয়া পেশওয়ার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলা — পৈতৃক রীতি অনুসারে পেশওয়ার পার্শ্বে পাদুকা ধরিয়া দাঁড়ান, ইত্যাদি বিনয় ভানে তিনি লোকরঞ্জনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার ফল উল্টা হইল — অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ, এ ত ধরা কথা। সিন্দে যেমনই অভিনয় করুন না কেন, নানা ফর্ণবীসের ন্যায় দূরদর্শী চতুর লোকের তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি তলাইয়া বুঝিতে আর বাকি রহিল না এবং ফলেও প্রকাশ পাইল, পুণায় থাকিয়া প্রধানমন্ত্রী রূপে রাজকার্য নির্বাহ করেন, এই তাঁহার ভিতরকার মতলব।

নানা ও সিন্দের মধ্যে মহা রেষারেষি — পেশওয়া বেচারা ভাবিয়া পান না কোন্ দিক্ রক্ষা করেন — দুই জন তাঁহার দুই বাহু। নানার বিপক্ষতা সত্ত্বেও পুণা দরবারে সিন্দের আধিপত্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল। পেশওয়াকে তিনি শিকার, ব্যায়াম চর্চা, নানাপ্রকার প্রদর্শন, আমোদ প্রমোদে ভুলাইয়া তাঁহার মমতা আকর্ষণ করেন — নানা ফর্ণবীসের মহিমা ম্লান। মহাদাজীর প্রভুত্ব নানার অসহ্য হইয়া উঠিল — এমন কি তিনি রাজ্য কারবার ছাড়িয়া কাশীবাসের সঙ্কল্প করিলেন। পেশওয়া তাঁহাকে অভয় বচন দিয়া অনেক করিয়া সান্ত্বনা করেন। তাঁহাদের পরস্পর বৈমনস্য প্রকাশ্য লাঠালাঠিতে পরিণত হইবার উপক্রম, এমন সময় যমদূত আসিয়া নানার পক্ষ অবলম্বন করিল। সিন্দিয়া সহসা জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। নানার একমাত্র অপ্রতিহত প্রতিদ্বন্দী সরিয়া যাওয়াতে তাঁহার প্রভুত্বের পথ নিষ্কণ্টক হইল।

খর্ডায় নবাবী যুদ্ধ ১৭৯৩

মহাদাজীর মৃত্যুর অনতিকাল পরে পেশওয়া ও নিজামের মধ্যে চৌথ লইয়া যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম। নিজাম আলি ব্রিটিশ সিংহকে স্বপক্ষে টানিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইলেন না। তখনকার বড় লাটসাহেব সরজন শোর এ বিবাদে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। শীঘ্রই যুদ্ধারম্ভ হইল। মহারাষ্ট্রীয় মহা মহা বীরেরা পেশওয়ার পতাকাতলে এই শেষবারের বার

সম্মিলিত হইলেন। মহাদাজীর উত্তরাধিকারী দৌলতরাও সিন্দে তথা তুকাজী হোলকর পুণাতেই ছিলেন। নাগপুর রাজা ভোঁসলাও তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া জুটিলেন। গোবিন্দ রাও গাইকওয়াড় গুজরাট হইতে ফৌজ পাঠাইলেন। বাস্তে ও পটবর্দ্ধন, মালেগাম ও বিঞ্চুরপতি, পন্ত প্রতিনিধি, পন্ত সচিব, নিম্বালকর, পাটনকর, ঘাটগে, ডফলে, থোরাত, পওয়ার প্রভৃতি বড় বড় শূর সরদার জায়গীরদার স্ব স্ব দলবল লইয়া রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। অশ্ব পদাতিক সর্বসমেত প্রায় দেড় লক্ষ সেনা একত্রিত। পরশুরাম ভাউ সেনাপতি। অহমদনগর জিলার অন্তর্গত খর্ডায় যুদ্ধ সংঘটন হয়। এই যুদ্ধে বড় একটা রক্তপাতের প্রসঙ্গ আসে নাই। যেমন গর্জ্জন, তেমন বর্ষণ নয়। কোন পক্ষের বিশেষ রণ-চাতুরীও প্রকাশ পায় নাই। নিজামের অকারণ ভীরুতা ও ভয়ে পলায়নবশতঃ মহারাষ্ট্রীরা সুলভ মূল্যে জয় ক্রয়ে সমর্থ হইল। বিলাসী নবাব তাঁহার জনানা সমাগমে রণস্থলে সমাগত। বেগম-প্রধানা রণ বিভীষিকা দর্শনে মূর্চ্ছাপন্না, প্রাণনাথের শরণাপন্না;নবাব প্রিয়াকে সামলাইবেন, না যুদ্ধ করিবেন — কি করেন, ভাবিয়া পান না। শেষে পলায়নই সাব্যস্ত হইল। তাঁহার সেনানী বেচারা অপ্রস্তুত। মহারাষ্ট্রীগণ অবসর পাইয়া কার্যোদ্ধার করিয়া লইল। মহারাষ্ট্রীদের বীরত্ব প্রকাশ যেমনই হউক, তাহারা এই যুদ্ধে নিজাম সরকার হইতে দৌলতাবাদ প্রভৃতি ভূমিখণ্ড ও বিস্তর নগদ টাকা মিলিয়া বিলক্ষণ এক কামড় আদায় করিয়া লইল। নানার গৌরবের আর সীমা রহিল না। কোন বিদেশী রাজার বিনা অমন প্রবল শত্রুর পরাভব। ধন্য নানার নয় কৌশল। তাঁহার সৌভাগ্য-শশী স্বচ্ছ গগনে পূর্ণ কলায় প্রকাশিত। দৌলতরাও সিন্দিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন — তুকাজী হোলকর তাঁহার বাধ্য — রঘুজী ভোঁসলা ও অপরাপর ব্রাহ্মণ সরদারগণ তাঁহার অনুরক্ত। পেশওয়ার রাজ্যে অদৃষ্টপূর্ব গৌরব সঞ্চারের সকলি অনুকূল। এই সমস্ত শুভ লক্ষণ সত্ত্বেও কোথা হইতে অাচম্বিতে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া নানার আশা ভরসা বন্যায় ভাসাইয়া দিল;— তাঁহার জীবন স্রোত — ভারতের ইতিহাস স্রোত — চকিতের মধ্যে উলটাইয়া ফেলিল।

যে অনর্থ ঘটনার কথা সূচিত হইল, তাহা মাধবরাও পেশওয়ার আত্মহত্যা। তাঁহার বয়স যদিও বিংশতি বৎসর, তথাপি নানা তাঁহার সঙ্গে নাবালকের মত ব্যবহার করিতেন, তাঁহাকে স্বাধীনভাবে কার্য করিতে দিতেন না। এই অধীনতা-যন্ত্রণাই তাঁহার অকাল মৃত্যুর নিদানভূত। মহাদাজী সিন্দের প্রতি নানার কটু ব্যবহারে পেশওয়ার মনে যে অসন্তোষের বীজ রোপিত হয়, সিন্দের মৃত্যুর পর অন্য কারণে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। তাহার বৃত্তান্ত এই — নানার ষড়চক্রে রাঘোবার তিন পুত্র কয়েদ ছিলেন, তাহাদের মধ্যে বাজিরাও একজন। এই বাজিরাও শাস্ত্রালাপ, শস্ত্রনৈপুণ্য, রূপে গুণে বিখ্যাত, বাহিরের চাকচিক্যে লোকের মন ভুলান বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মাধবরাও সর্বদাই তাঁহার গুণানুবাদ শুনিতে পাইতেন। কিসে তাঁহার কারামুক্তি হয়, তাঁহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ আলাপপরিচয় হয়, পেশওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা। নানার মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি জানেন রাঘোবাই যত অনর্থের মূল — তাঁহার পুত্রদের দিয়া দেশের কল্যাণ

পেশওয়ার আত্মহত্যা

কখনই হইবার নহে। তাঁহার পুত্রদের প্রশ্রয় দানে রাজ্যের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তিনি এই ধুয়া ধরিয়া পেশওয়াকে কত উপদেশ দেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। পেশওয়াকে যতই বুঝাইবার চেষ্টা করেন, ভ্রাতার প্রতি অনুরাগ তাঁহার ততই আরো বৃদ্ধি হয়। বাজীরাও অবসর বুঝিয়া পেশওয়াকে চরের হাত দিয়া পত্র লিখিয়া পাঠান, এইরূপে গোপনে তাঁহাদের পত্র ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। এক পত্রে বাজীরাও লেখেন "আমরা দুজনেই বন্দী — তুমি পুণায়, আমি জুনরে; কিন্তু আমাদের মন স্বাধীন — ভালবাসার উপর পরের কোন অধিকার নাই। পরস্পরের প্রতি আমাদের অনুরাগ যেন অটল থাকে। আমরা যদি আমাদের পিতৃ পিতামহের কীর্তি রক্ষা করিয়া চলি, সময়ে আমরাও কৃতী হইব।" নানা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন — বাজীরাওয়ের বন্ধন দ্বিগুণিত করিলেন — মাধবরাওকে নানা প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মাধবরাও রাগ করিয়া ঘরে বন্ধ হইয়া রহিলেন। দশারার দিন দস্তুরমত দরবার হইল। পেশওয়া যদিও সে উৎসবে বাধ্য হইয়া যোগ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনের কষ্ট নিবারণ হইল না। তিনি জীবনের প্রতি আস্থাশূন্য উদাস হইয়া দশারা উৎসবের দুদিন পরে প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে পড়িয়া আত্মহত্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনায় পুণায় হুলুস্থুল বাধিয়া গেল। রাজসিংহাসনে কে বসিবে, এই এক বিষম সমস্যা। রাঘোবার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজিরাও তাহার ন্যায্য অধিকারী, কিন্তু মন্ত্রীবর্গের মধ্যে আর এক প্রস্তাব উঠিল। তাঁহাদের মন্ত্রণা এই যে, মৃত মাধবরাওয়ের পত্নী যশোদাবাঈ বাজিরাওয়ের কনিষ্ঠ চিমনাজীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং চিমনাজীকে পেশওয়া পদে অভিষিক্ত করা হয়। নানাও এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন — তাহা কার্যেও পরিণত হইল। এদিকে আবার দৌলতারাও সিন্দে বাজিরাওয়ের পক্ষ গ্রহণ করায় নানা বলবানের পক্ষ সমর্থন মানসে, ফিরিয়া সেই দিকেই যোগ দিলেন। এইরূপ অশেষ উৎপাতের হস্ত এড়াইয়া অবশেষে ৪ঠা ডিসম্বর ১৭৯৬-এ বাজিরাও পেশওয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। অতঃপর দৌলতরাও সিন্দে বলপূর্বক উজীর পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার কোপে পড়িয়া নানা ফর্ণবীস নগর দুর্গে বন্দীকৃত হন, বাজিরাও অনেক টাকা ঘুস দিয়া সিন্দের হস্ত হইতে তাঁহার মুক্তিসাধন করেন — ইত্যাদি অনেক ফাঁড়া কাটাইয়া নানা পরিশেষে প্রধান পদে নিযুক্ত হইলেন। বাজিরাও পেশওয়া — নানা ফর্ণবীস তাঁহার উজীর।

শেষ পেশওয়া বাজীরাও
১৭৯৬-১৮১৭

১৭৯৮-এর মে মাসে লর্ড মর্ণিংটন (ভাবী ওয়েলসলী) চতুর্থ গবর্নর জেনেরল ভারতে সমাগত হন। আসিয়াই তিনি ন্যায় সত্যের দোহাই দিয়া অমৃত মধুর বাক্যে পেশওয়াকে পত্র লেখেন, কিন্তু ইংরাজদের মধুর বচনে রাজাদের তখন আস্থা নাই। ওয়েলসলীর আগমনকালে ব্রিটিশ রাজ্য ঘোর সঙ্কটে পরিবৃত। টিপু, নিজাম, সিন্দে সকলেই ফরাসিস মন্ত্রণার বশবর্তী।

ফরাসিস রণপণ্ডিতেরা তাঁহাদের সৈন্য সংগঠনে নিযুক্ত। এই সকল রাজা মিলিত হইয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে বিষম বিভ্রাট। গবর্নর জেনেরল প্রথম হইতেই তাঁহার নিরাকরণে মনোনিবেশ করিলেন। ফরাসিসদের বিদায় দিয়া তৎপদে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ, ইংরাজ সৈন্য-বল নিযুক্ত করা, এই তাঁহার প্রথম চেষ্টা। নিজাম সহজে নতগ্রীব হইলেন। নানার পরামর্শে পেশওয়া সতর্ক ছিলেন, তিনি এখনো পর্যন্ত ফাঁদে পা বাড়াইতে সম্মত হইলেন না।

এই সময় টিপুর সহিত ইংরাজদের শেষ যুদ্ধ। রাজাদের ভিতরে ভিতরে টিপুর দিকে বিলক্ষণ টান, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু করিতে সাহস করিতেছেন না। পেশওয়া ও সিন্দের মধ্যে এ বিষয়ের কিংকর্তব্য পরামর্শ চলিতেছে — এমন সময় শ্রীরঙ্গপট্টনের পতন বার্তা সমুপাগত। বাজিরাও বাহ্যিক বড়ই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। তিনি যদিও এ যুদ্ধে বিশেষ কোন সহায়তা করেন নাই, তথাপি সৈন্য পোষণ সন্ধিযুগে বদ্ধ করিবার আশয়ে গবর্নরজেনেরল তাঁহাকে বিজিত প্রদেশের ভাগ দিতে সম্মতি প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু পেশওয়া কিছুতেই ধরা দিলেন না। প্রধান অন্তরায় ফর্ণবীসের দূরদর্শিতা। নানার মৃত্যু ঘটনায় ইংরাজদের চিরবাঞ্ছিত মনস্কাম সিদ্ধ হইল।

পুণা দরবারে নানা ফর্ণবীস একমাত্র পরিণামদর্শী বিচক্ষণ পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পেশওয়া রাজ্যের জীবন, বল গৌরব যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সকলি বিনষ্ট হইল। নানা দীর্ঘাকৃতি, কৃশাঙ্গ, লক্ষ্যভেদী-উজ্জ্বল-তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, শ্যামবর্ণ পুরুষ ছিলেন। ইংরাজদের প্রতাপ ও সত্যনিষ্ঠার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু অমন প্রবল শত্রুকে বক্ষে স্থান দিলে বিষম বিপাকের আশঙ্কা বিবেচনায় তিনি ইংরাজদিগকে সাধ্যমত দূরে রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগে প্রথম মাধবরাও প্রণীত রাজ্য-ব্যবস্থা সংরক্ষণে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, শেষাশেষি নানা কারণে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শহরে ঘাসীরাম কোতওয়ালের অত্যাচার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কোতওয়ালের দৌরাত্ম্যে লোকেরা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণবর্গ এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল যে, বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া পুরবাসীগণ স্বহস্তে প্রস্তর প্রহারে তাঁহার প্রাণদণ্ড করে। বাজিরাওয়ের আমলে নানা ফর্ণবীস রাজ্যের হিত কামনায় পেশওয়াকে স্বার্থ-নিরপেক্ষ সৎ পরামর্শ দানে সঙ্কুচিত ছিলেন না। কিন্তু রাজা যখন অব্যবস্থিত, ব্যসনাসক্ত, হীনমতি — তখন মন্ত্রী আর কত পারিয়া উঠিবেন?

নানা ফর্ণবীস
মৃত্যু ১৮০০

নানার মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রে ভয়ঙ্কর অরাজকতা প্রসূত হইল। পেশওয়ার শাসন নির্জীব অন্তঃসার-শূন্য, চতুর্দিকেই বিপ্লব, যে যেখানে পারে, সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্বাধীনতা সাধিয়া লইতে তৎপর। ১৮০১-এ আর এক নূতন বীর সমরক্ষেত্রে অভ্যুদিত হইলেন — যশবন্ত হোলকর।

যশোবন্ত হোলকর
১৮০১-২

সিন্দিয়া এতদিন হোলকরকে বশে রাখিয়াছিলেন, যশবন্তরাও সহসা স্বাধীন স্ফূর্তিতে সমুত্থানপূর্বক সিন্দের বিরুদ্ধে কটিবদ্ধ হইলেন। যশবন্তের রণকাহিনী বর্ণন করিবার পূর্বে এই স্থলে ক্ষণেকের জন্য তাঁহার পূর্ব-পুরুষদের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি।

হোলকর বংশ

হোলকর বংশ আসলে ধনগর গয়লাজাতীয় মহারাট্টা। পুণা সন্নিহিত নীরা নদী তীরবর্তী হোল গ্রামে তাঁহাদের আদিম নিবাস ও সেই গ্রাম হইতে তাঁহাদের কুলনামের উৎপত্তি। হোলকর বংশের মুখ-উজ্জ্বলকারী মহলাররাও ১৬০০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে খানদেশে তাঁহার মামার মেষপালকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে মাঠের মধ্যে নিদ্রিত আছেন, এমন সময় এক বৃহৎ অজগর সর্প তাহার মুখের উপর আতপত্র-রূপে ফণা ধরিয়া থাকে। এই শুভ লক্ষণ দৃষ্টে উৎসাহিত হইয়া তিনি অন্য চাকুরীর চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে একজন মহারাট্টী সরদারের নিকট ঘোড়সওয়ারের কর্ম পান। এই সময় হইতে তাঁহার ভাগ্য ফিরিল। ১৭২৪-এ বাজিরাও পেশওয়ার অধীনে ৫০০ অশ্বের অশ্বপতি, ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ ও বিস্তর ভূমিসম্পত্তি উপার্জন করেন। ১৭৩২-এ তিনি পেশওয়ার প্রধান সেনাপতিরূপে মালবের মোগল প্রতিনিধিকে যুদ্ধে পরাভব করেন। ১৭৫০-এ মালব বিজয়ানন্তর সিন্দে ও হোলকর তাহা আধাআধি ভাগ করিয়া লন, তাহাতে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা মুনাফার প্রদেশে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হয়। এইরূপে তাঁহার রাজ্য ও বলবৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং ইন্দোর তাঁহার রাজধানী হইয়া দাঁড়াইল। পাণিপথের যুদ্ধে যে অল্প কয়েকজন মহারাট্টী বীর ভালয় ভালয় দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, মহলাররাও তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি ঐ যুদ্ধে বড় একটা যোগ দেন নাই — তাহার কারণ এইরূপ রাষ্ট্র যে, এই যুদ্ধে তিনি যেরূপ পরামর্শ দেন মহারাট্টী সেনাপতি সদাশিব ভাউ "গয়লার কথা কে মানে?" এই বলিয়া সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। তাঁহার পরামর্শ এই — পাঠানদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাদের বিবিধ উপায়ে হয়রান করা — বল অপেক্ষা কৌশলে তাহাদের দমন করা — পলায়নচ্ছলে অরিদল আকর্ষণ করিয়া অবসর বুঝিয়া তাহাদের উপর হল্লা করা; "ত্বরায় অনর্থাশঙ্কা বিলম্বে কার্যসিদ্ধি" এই তাঁহার উপদেশ। এই সুপরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া সেনাপতি তাড়াতাড়ি রণে মাতিয়া গেলেন — শীঘ্রই তাহার বিষম ফলভোগও করিলেন। পণিপথের যুদ্ধের পর মহলাররাও মধ্য-হিন্দুস্থানে নিজ রাজ্যের ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলাবন্ধনে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করেন — তাঁহার তাহাতে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। কেননা মহলাররাও উদারচেতা, বিনয়ী, অথচ দৃঢ়মতি, অশেষ গুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। রণে যেরূপ সাহস ও বীরত্ব, রাজ্য-শাসনেও তাঁহার সেইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মহলাররাও
১৬৯৩-১৭৬৯

মহলাররাওয়ের পুত্র খণ্ডেরাও পিতার আগেই মরণ প্রাপ্ত হন, তাঁহার পৌত্র মালীরাও তাঁহার উত্তরাধিকারী। মালীরাও নির্বুদ্ধি ক্ষিপ্তপ্রায় ছিলেন, অধিককাল রাজ্য ভোগ করিতে

পারেন নাই। মালীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা খ্যাতনামা অহল্যাবাঈ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তুকাজীরাও তাঁহার সেনাপতি। উভয়ে মিলিয়ে অশেষ ক্ষমতা ও দক্ষতার সহিত ৩০ বৎসরকাল রাজকার্য নির্বাহ করেন। তুকাজীর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালে সাতপুরা শ্রেণীর দক্ষিণস্থ সমস্ত প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন — তাহার উত্তরস্থ প্রদেশ সমূহের তত্ত্বাবধান করা — করদ রাজ্য সকল হইতে কর গ্রহণ করা — এ সকল অহল্যাবাঈ করিতেন। যখন তুকাজী উত্তর হিন্দুস্থান পরিদর্শনার্থে গমন করিতেন, তখন মালব, নিমার প্রভৃতি প্রদেশের সমগ্র কার্যভার রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পিত — সমুদায় দাক্ষিণাত্যে তাঁহার শাসন বিস্তৃত। রাজকোষ তাঁহার হস্তাধীন — রাজ্যের আয়ব্যয় হিসাব নিয়ম পূর্বক রক্ষিত হইত। কোন গুরুতর রাজকার্য উপস্থিত হইলে তুকাজী রাজ্ঞীর পরামর্শ ভিন্ন কার্য করিতেন না এবং পররাজ্যে যে সকল কর্মকর্তা নিয়োগ কবিতে হইত, তাহা অহল্যাবাঈ স্বয়ং করিতেন। তাঁহার অনুপম নয় কৌশলে পররাজ্যের সহিত মিত্রতা গ্রন্থির কোন শৈথিল্য ঘটে নাই। এদিকে আবার স্বরাজ্যে প্রজাদের সুখশান্তি বর্দ্ধনেও তাঁহার অশেষ যত্ন। একদিকে অতিরিক্ত করভার হইতে রায়তদেব অব্যাহতিদান — অন্যদিকে জমিদাবদের বিবিধ স্বত্ব রক্ষণ, এই দুই দিক রক্ষা করিয়া চলিতেন। বাজ্ঞী যেরূপ প্রজাবৎসলা, সতত প্রজাহিত-নিরতা — প্রজারাও তাঁহাকে নীতিপ্রজ্ঞা-মূর্তিমতী জননী-সমান জ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। তিনি অর্থী প্রত্যর্থীদিগকে আদালত, পঞ্চায়ত অথবা মন্ত্রীবর্গেব বিচারে সঁপিয়াই নিরস্ত থাকিতেন না; অক্রোধ-কলুবিত সদা-হৃষ্টচিত্ত এই দয়াবতী রাজ্ঞী যথা নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ্য দরবারে ন্যায় বিতরণ করিতেন — যাহার যে কোন অবেদন, তাহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রতিবিধানে তৎপর ছিলেন — শক্তেব ভক্ত হইয়া দুর্বলেব প্রতি অন্যায় পীড়ন অনুমোদন করিতেন না — স্ত্রীজন-চিত্ততোষী তোষামোদেও তাঁহাকে ন্যায় মার্গ হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। এই রূপবতী, গুণবতী, ধর্মনিষ্ঠ রাজ্ঞী মহারাষ্ট্র দেশকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ১৭৯৫ অব্দে ষষ্ঠি বৎসর বয়সে সংসার যাত্রা হইতে অপসৃত হন। সেনাপতি তুকাজীকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কিন্তু কি করেন — সে বয়সে বড়, তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না — এই হেতু তাঁহাকে মহলার রাওয়েব পুত্র ও উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করিয়া যান। প্রথম মহারাষ্ট্রী সমরে তুকাজী হোলকর ও মহাদাজী সিন্দে উভয়ে মিলিয়া একমনে কার্য করেন। শেষাশেষি তাঁহাদের পরস্পর মনান্তর ও বৈরভাব সংঘটন হয়। মহাদাজীর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তুকাজী পরলোক গত হয়েন।

অহল্যাবাঈ
১৭৬৫-৯৫

তুকাজীর চারি পুত্র। কাশীরাও ও মহলাররাও দুই ঔরসজাত — যশবন্ত ও বিঠোজী দুই দাসীপুত্র। কাশীরাও মহলাররাও দুই ভাইয়ের রাজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি — জ্যেষ্ঠের সহায় দৌলতরাও সিন্দে — কনিষ্ঠের পক্ষে নানা ফর্ণবীস। একবার দুই ভাইয়ের মধ্যে মিলনের চেষ্টা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যে দিনে দুই ভ্রাতা তাহাদের পরস্পর বিরোধানল নির্বাপণোদ্দেশে সৌহার্দবন্ধন শপথ গ্রহণ করিলেন, তার পরদিনেই মহলাররাও সিন্দিয়ার

সৈন্য হস্তে নিহত হন। যশবন্তরাও মহলাররাওয়ের পক্ষ ছিলেন, তিনি এই গোলযোগে পলায়ন করিয়া নাগপুর রাজার শরণাপন্ন হইলেন। সেখানে শরণ-লাভ দূরে থাকুক, তাঁহার ভাগ্যে কারা-লাভ ঘটিল — দেড় বৎসর পরে বহু কষ্টে পলায়নে মুক্তি লাভ করেন। এই সময় হইতে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র খণ্ডোরাওয়ের নামে সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে মহারাট্টা, রাজপুত, পাঠান, ভিল, পিণ্ডারী প্রভৃতি ফৌজ একত্রিত করিয়া তিনি তাহাদের দলপতি হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে ইউরোপীয় নেতৃগণের সাহায্যে এই ফৌজ হইতে রণদক্ষ শিক্ষিত সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়া লইলেন। আমীর খাঁ নামক জনৈক মুসলমান সরদারকে সহায় পাইয়া তাঁহার বল পুষ্ট হইল; দুইজনে মিলিয়া সিন্দিয়ার রাজ্যে ঘোরতর লুটপাট অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই প্রবল রিপু দমন উদ্দেশে সিন্দিয়া পুণা হইতে স্বরাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মালবে সিন্দে হোলকরের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম, বিস্তর শোণিতপাত হয়। চপলা রণলক্ষ্মী কখন সিন্দিয়ার পক্ষে, কখনো বা হোলকরের পক্ষে, কখন কাহার প্রতি প্রসন্ন কিছুই স্থিরতা নাই। উহার এক যুদ্ধে সিন্দিয়ার রাজধানী উজ্জয়িনী হোলকরের হস্তগত হয়। ইন্দোরের নিকট অপর যুদ্ধে হোলকর আবার সিন্দিয়া কর্তৃক পরাভূত হইয়া মহা বিপদে পড়েন। পরিশেষে অশেষ বিপদ-জাল অতিক্রম করিযা যশবন্তরাও পুণা গগনে ধূমকেতুর ন্যায় সহসা সসৈন্য আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার পুণা আক্রমণের এক বিশেষ কারণ উপস্থিত হইল। তাঁহার ভ্রাতা বিঠোজী কোন এক বিদ্রোহাচরণে ধরা পড়িয়া দণ্ডনীয় হন। বাজিরাও তাঁহার প্রাণদণ্ড আদেশ করেন। প্রাণদণ্ড সাধারণ নয় — তাহার উপর যতদূর অপমান, যতদূর নিষ্ঠুর নির্যাতন সম্ভবে, তাহা আচরিত হইল, গজপদে শৃঙ্খল-বদ্ধ বিঠোজী রাজপথ দিয়া টানাহিঁছড়া হইয়া চলিয়াছেন, বাজিরাও প্রাসাদ-বাতায়ন হইতে সেই তামাসা দেখিতেছেন। তাঁর হঠাৎ কেন এরূপ খেয়াল হইল কে জানে? সিন্দের তুষ্টিসাধন যদি তাঁর অভিপ্রায় হয়, তাহা সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু এক দুরন্ত ভুজঙ্গকে ঘাঁটাইয়া উত্তেজিত করা হইল, তাহা তখন তিনি ভাবেন নাই। সিন্দিয়ার রাজ্য লুণ্ঠন স্থগিত রাখিয়া যশবন্তরাও পুণার দিকে ধাবমান হইলেন। তাঁহার গতিরোধ-সাধন মানসে পেশওয়া ও সিন্দে উত্তরে আলিবেল ঘাটে সৈন্য প্রেরণ করিলেন;তিনি আর একদিক ঘুরিয়া সৈন্যহস্ত এড়াইয়া পুণার দেড় ক্রোশ পূর্বে ২৩-এ অক্টোবরে আসিয়া তাম্বু গাড়িলেন। দুই দিন পরে দুই সৈন্যের সংঘটন। ঘোরতর সংগ্রামের পর যশবন্ত জয়ী হইলেন। সিন্দিয়া কামান ও অন্যান্য জিনিসপত্র ফেলিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। পুণার পথ উন্মুক্ত। পরদিন ব্রিটিশ রেজিডেন্ট কর্ণেল ক্লোজ সাহেব হোলকরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান — গিয়া দেখেন কর্দমাক্ত ক্ষতবিক্ষত শরীর অন্ধবীর* এক ক্ষুদ্র তাম্বুতে শয়ান — যেন শরশয্যাগত ভীষ্মদেব ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হোলকর কর্ণেল সাহেবকে পুণায় থাকিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন — তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিতে

হোলকরের পুণা আক্রমণ
১৮০২

* ইতিপূর্বে ঘটনাক্রমে বন্দুক ছুটিয়া যাওয়াতে তিনি এক চক্ষু হারাইয়াছিলেন।

উৎসক্য দেখাইলেন, কিন্তু তিনি সে অনুরোধ না মানিয়া কয়েক দিবসের মধ্যে পুণা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। হোলকর তখন স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির পূর্ণ অবকাশ পাইলেন। প্রথমে তিনি বাজিরাওয়ের ভ্রাতা অমৃতরাওকে মসনদে বসাইয়া দিন কতক ধৈর্য ধরিয়া থামিয়া থাকেন, ক্রমে নিজ মূর্তি ধারণ পূর্বক পৌরজন-ধন-রত্ন-শোষী নিদারুণ নগর-লুণ্ঠনে তাঁহার অর্থ-লালসা ও প্রতিশোধ-পিপাসা দুই একত্রে প্রশমিত করিলেন।

বাজিরাও হোলকরের বিজয়বার্তা শুনিয়া অবধি ভয়ে আকুল। তিনি বিঠোজীর প্রতি যে ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্তরে বিঁধিতেছিল। এখন হোলকরেব পালা যশবন্তবাও ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ তুলিতে উদ্যত। বাজিরাও প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। পুণা হইতে সিংহগড় — সিংহগড় হইতে রায়গড় — রায়গড় হইতে বল্লগিরি সমীপস্থ সুবর্ণ দুর্গ — পরিশেষে ৬ই ডিসেম্বরে ব্রিটিশ পোতে বাসীনে উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজ চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। মাসের শেষদিনে বাসীন সন্ধি। এই সন্ধি যোগে পেশওয়ার স্বাধীন রাজ্য বিলুপ্ত হইল সন্ধির মর্ম এই — ইংরাজেরা পেশওয়াকে পৈত্রিক সিংহাসনে বসাইযা দিবেন — পেশওয়া স্বীয় রাজধানীতে ব্রিটিশ সৈন্য পোষণ কবিবেন এবং তাঁহার ব্যয় নির্বাহার্থে ২৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়শীল ভূমি সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিবেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অনুমতি ভিন্ন সন্ধিবিগ্রহে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এইরূপে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া বাজিরাও পুণায় প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহাব মসনদ প্রাপ্তি ঘোষণার্থে ১৯ তোপধ্বনি ধ্বনিত হইল। প্রকৃতপক্ষে এ তাঁহার সম্মানার্থে নহে — ইহা ইংরাজদের রাজ্যলাভ-সূচক জয়ধ্বনি।

বাসীন সন্ধি —
৩১ ডিসেম্বব, ১৮০২

সিন্দে হোলকর ও আর মহারাষ্ট্রী সরদারগণ সকলেই স্তম্ভিত। ব্রিটিশ অনুগ্রহে পেশওয়ার সিংহাসন প্রাপ্তি সকলেরই মনঃশল্যের কারণ হইল। সিন্দিয়া, হোলকর প্রভৃতি বীরগণ তখনো ইংরাজ-লৌহ-হস্তের গুরুভার অনুভব করেন নাই, তাই তাঁহারা সাহস করিয়া যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধিলেন। সিন্দে হোলকর একে একে পরাস্ত হইলেন। তাঁহাদের দমন করিতে ইংরাজদের অধিক সময় লাগে নাই। জেনেরল ওয়েলেসলি দক্ষিণে আসাই ও আড়গ্রামে — জেনেরল লেক উত্তরে লসওয়ারী ও দিল্লীতে সমবেত মহারাষ্ট্রী দলবল ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ১৮০৪-এ ভরতপুর সন্নিহিত ডিগের রণক্ষেত্রে হোলকরের বিবদন্ত উৎপাটিত হইল। এই সকল যুদ্ধে ইংরাজদের অশেষ রাজ্য লাভ — ফরাসিদের প্রভুত্ব-নাশ ইংরাজ পদতলে দিল্লীশ্বরের অবলুণ্ঠন — দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রী যুদ্ধের এই পরিণাম। এখন তৃতীয় ও শেষ যুদ্ধের বিবরণ বলি শুন।

দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রী যুদ্ধ
১৮০৩-৪

বাজিরাও সিংহাসন ফিরিয়া পাইয়া যে বিশেষ কিছু লোভনীয় সামগ্রী লাভ করিলেন, তাহা নহে। তাঁহার রাজ্যের অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়। কায়দা নাই, কানুন নাই, কোন প্রকার শাসন নাই— লুণ্ঠনে উদরপূরণ কর, নতুবা শুকাইয়া মর, প্রজাদের এই অবস্থা। পুণার

আশপাশ পল্লীগ্রাম সকল দস্যু তস্করের আবাস— রাজপুরুষেরা তাহাদের লুঠের ভাগী প্রশ্রয়দাতা। পেশওয়ার নিজের রাজ্য শাসনের ক্ষমতা নাই। পুণা দরবারে অপর কোন যোগ্য শাসনকর্তার নামগন্ধ নাই। বাজিরাও অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ছিলেন। তাঁহার নিজের আমোদ প্রমোদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাই তাঁহার রাজত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য। নিলামে যে ব্যক্তি সকলের বেশী ডাকিবে, তাহার হস্তেই পেশওয়া তাঁহার পরগণা সকল সঁপিয়া দিতেন— এইরূপে এককোটি বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। এই সকল জমিদারদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী অধিকার— প্রজা নিষ্পীড়ন করিয়া অর্থ সঞ্চয়েই সে অধিকার খাটান তাহাদের কাজ। পুণার আদালত নাম মাত্র, যাহার পয়সা— তাহার জয়। এদিকে বাজিরাও আবার ধর্মানুষ্ঠানের এমন ভড়ং করিতেন যে, লোকের মাঝে সাধু বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ব্রাহ্মণ ভোজন — ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা ও ভূমিদান— পুণায় সহস্র সহস্র আম্র বৃক্ষ রোপণ, তীর্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি উপায়ে তিনি দুর্ব্যাসন-জনিত অপযশ মোচনে উদ্যুক্ত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, নারায়ণরাও পেশওয়া হত্যা যে তাঁহার পিতামাত্র তাব মহাপাতক, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অথবা প্রেত-শান্তি উদ্দেশে উক্ত রূপ দাম পুণ্য কার্য অনুষ্ঠিত হইত। সে যাহা হউক, এই সমস্ত সাধনে রাজ্য রক্ষা হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে ত্রিম্বকজী ডাঙ্গলিয়া নামক এক ব্যক্তি আবার তাঁহার মোসাহেব ও কুমন্ত্রী আসিয়া জুটিল। এ ব্যক্তি প্রথমে সামান্য চরের কাজে নিযুক্ত ছিল। ক্রমে তোষামোদ পটুত্বগুণে বাজিরাওয়ের প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া দাঁড়াইল। সে জাঁক করিয়া বলিত প্রভুর তুষ্টি সাধনে আমি গোহত্যা পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত। ত্রিম্বকজীর উপর পেশওয়ার অগাধ নির্ভর— অপার অনুগ্রহ। যেমন রাজা তার উপযুক্ত মন্ত্রী। তাহাকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। যাহাতে ঈর্ষার উদ্রেক হয়, তাহার এমন কোন গুণ নাই; বিপক্ষতাচরণে রুষ্ট হইয়া যে দংশন করে, এরূপ তাহার সামর্থ্যও নাই সুতরাং যেমনটি চাই, বাজিরাও তেমনি ভৃত্য পাইলেন। ১৮১৯ অব্দে ত্রিম্বকজী, পেশওয়া ও ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের মধ্যে কার্যকর্তারূপে নিয়োজিত হইলেন। এই সময়ে পেশওয়া ও গাইকওয়াড় সরকারের মধ্যে রাজস্ব সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত। বাসীন সন্ধি অনুসারে ঈদৃশ বিবাদ কল্পে ইংরাজদের মধ্যস্থ মানিবার কথা। বাজিরাও গাইকওয়াড়ের উপর চৌথ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার পুরাতন দাবী করিয়া পাঠান। গাইকওয়াড়ের তরফ হইতে গঙ্গাধর শাস্ত্রী এই বিবাদ ভঞ্জন কার্যে পুণায় আগমন করেন কিন্তু পেশওয়ার দরবারের উপর লোকের এমনি অবিশ্বাস যে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে তাঁহার প্রাণরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইল। শাস্ত্রীর আগমন পেশওয়ার মনঃপূত হয় নাই— তিনি শেষে নানান আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কৃতকার্য না হইয়া শাস্ত্রীর প্রতি স্বীয় অসন্তোষ নিদর্শক অভদ্রতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শাস্ত্রী আসিয়া দেখেন গতিক বড় ভাল নয়। পেশওয়ার যেরূপ রুষ্ট ভাব, তাহাতে নিজ কার্য সিদ্ধি দুর্ঘট বিবেচনায় স্থির করিলেন তাঁহার বরদায় ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ কল্প এবং তিনি উপস্থিত বিষয়ে ব্রিটিশ

ত্রিম্বকজী

গঙ্গাধর শাস্ত্রী ১৭১৫

গবর্নমেন্টের মধ্যস্থতা প্রার্থনা করিলেন। এই প্রস্তাবে বাজিরাওয়ের কার্য-প্রণালী ফিরিয়া গেল — তিনি আর এক মূর্তি ধারণ করিলেন। ইতিপূর্বে যেমন ব্রাহ্মণের প্রতি হতাদর, এখন তেমনি ভণ্ডতপস্বী ব্যাঘ্রের ন্যায় ভালমানুষি-ভান করিতে লাগিলেন। অশেষ আদর ও যত্ন দেখাইয়া, এমনকি শাস্ত্রীর সহিত কটুম্বিতা পর্যন্ত বন্ধন করিয়া বাজিরাও তাঁহার বশীকরণে সচেষ্ট হইলেন। সে যত্ন, সে আদর মৌখিক মাত্র, ভিতরে ভিতরে তাঁহার বধোপায় প্রবর্তিত হইল। বাজিরাওয়ের নিমন্ত্রণে শাস্ত্রী মহাশয় পণ্ডরপুর তীর্থে গমন করেন। ১৪ই জুলাই দুজনের একত্রে পানভোজন হয়। সন্ধ্যার সময় শাস্ত্রী বিঠোবা মন্দিরে পেশওয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। পেশওয়ার মধুরালাপে প্রীত হইয়া বিদায় লইয়া যেমন মন্দিরের বাহিব হইবেন অমনি জল্লাদের খড়্গাঘাতে ব্রাহ্মণের অপঘাত। কি ভয়ানক অমানুষিক কাণ্ড। এই অঘোর কৃত্যের মূল প্রবর্তক নরাধম ত্রিম্বকজী। পেশওয়া যে নিতান্ত নির্দোষী ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহাকে সত্বর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইল। বাজিবাওয়েব বাজ্যে শমন-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

সুবিচক্ষণ এল্‌ফিনিষ্টন সাহেব তখন পুণায় ব্রিটিশ কার্যকর্তা। ত্রিম্বকজী এই হত্যাকাণ্ডেব মূল প্রবর্তক সপ্রমাণ হওয়াতে এল্‌ফিনিষ্টন তাহাকে পেশওয়ার নিকট হইতে চাহিয়া পাঠান। বাজিরাও প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করেন, পরে যখন "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া তাঁহাকে ভয় দেখান হইল, তখন অগত্যা প্রিয়তম ত্রিম্বকজীকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ত্রিম্বকজী থানার দুর্গে রুদ্ধ থাকেন — তাঁহার উপর ইউরোপীয় সান্ত্রীদের চৌকী পাহারা। কতকদিন পরে তিনি ইউরোপীয় গার্ডদের চক্ষে ধূলি দিয়া পলায়ন পূর্বক পাহাড় পর্বতে অদৃশ্যভাবে ফিরিতে লাগিলেন। বাজিবাও তাঁহাকে গোপনে প্রশ্রয় দিতে ত্রুটি করেন নাই।

রেজিডেন্ট এল্‌ফিনিষ্টন

বাজিরাও এইক্ষণে ইংরাজদের তাড়াইবার নানান পন্থা দেখিতে লাগিলেন। সিন্দে, হোলকর, নাগপুর রাজা, পিণ্ডারী দল এই সকল লোকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র জারী হইল। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল এবং কুলি ভীল প্রভৃতি বন্যজাতিদের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ উদ্দেশে ত্রিম্বকজীকে অর্থ সাহায্য প্রেরণ করা হইল। এলফিনিষ্টন সাহেব চর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতেছেন। বাজিরাও এইরূপ আচরণে নিজের কত হানি করিতেছেন — রাজ্যকে কি ঘোর সঙ্কটে ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছেন, ইত্যাদি তাঁহাকে কত বুঝাইলেন। তাহাতে যখন কোন ফল হইল না তখন পেশওয়াকে স্পষ্ট বলা হইল "যদি ত্রিম্বকজীকে দেশ বহিষ্কৃত না কর, তাহা হইলে ইংরাজদের সঙ্গে নিশ্চয়ই যুদ্ধ বাধিবে। এই কড়ারের বন্ধকস্বরূপ দুর্গত্রয় আমাদের হস্তে না দিলে পুণা এখনি সৈন্য বেষ্টিত হইবে।" এদিকে বড়লাট সাহেবের হুকুম আসিল "এরূপ কঠোর সন্ধি বন্ধনে বাজিরাওকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধিয়া ফেলা হয় যে তাঁহার পার্শ্ব পরিবর্তনের শক্তি না থাকে।" এই আদেশক্রমে পুণার সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। তাঁহার

পুণার সন্ধি ১৮১৭

স্বাধীনতার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমূলে নির্মূল। বাজিরাও এই লৌহ শৃঙ্খল গলে পরিয়া পণ্ডরপুরে তীর্থ করিতে চলিলেন।

এই সময়ে (১৮১৬-১৮) পিণ্ডারী দস্যু দমনে সমস্ত ব্রিটিশ বল নিয়োজিত হয়। পিণ্ডারীগণ দেশের অরাজকতার সুযোগ পাইয়া দলে দলে দেশলুণ্ঠন, প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়া দেয়। হেষ্টিংস্ সাহেব লক্ষাধিক সেনা ৩০০ কামান লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় বাহির হইলেন। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারিদিক হইতে ব্রিটিশ সৈন্য এই দস্যুদল শিকারে নিষ্ক্রান্ত হইল। পিণ্ডারীগণ মধ্য হিন্দুস্থানের পাহাড়, পর্বত, অরণ্য দেশ দেশান্তরে তাড়িত ধাবিত হইল। তাহাদের দলপতি চিতু রাজপুতানা হইতে গুজরাট, গুজরাট হইতে মালওয়া এইরূপে পলাইয়া বেড়ায়। তাহার সহচরেরা তাহাকে পরিত্যাগ করিল — কতিপয় মাস সে মালওয়ায় একাকী বনে বনে ভ্রমণ করত পরিশেষে সাতপুরার চলে ব্যাঘ্রমুখে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব পায়। ক্রমে অন্যান্য দলপতিগণ একে একে কেহ ধৃত, কেহ হত হয় — তাহাদের দলবল ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় ও ইংরাজবলে এদেশ এই প্রবল দস্যুদলের উৎপাত হইতে মুক্তি লাভ করে।

পিণ্ডারী যুদ্ধ
১৮১৬-১৮

এল্‌ফিনিষ্টন সাহেব বাজিরাওকে পরামর্শ দেন — যদি ইংরাজদের প্রসন্নতা চাও তাহা হইলে এই পিণ্ডারী যুদ্ধে তাহাদের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ কর। বাজিরাও "মুখে মধু হৃদে ক্ষুর"। যখন সর জন ম্যালকম পুণায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন তাঁহাকে মিষ্ট ভাষায় এমনি জল বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি ভাবিলেন ইনি ত আমাদেরই দলের লোক। কিন্তু এল্‌ফিনিষ্টন সাহেব বাজিরাওকে বিলক্ষণ চিনিতেন, তিনি সহজে ভুলিবার পাত্র নন। বাজিরাও যে মতলবে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি বম্বে হইতে একদল ইউরোপীয় ফৌজ আনাইয়া পুণায় ক্রোশ দুই দূরে খিড়কী ক্ষেত্রে আড্ডা গাড়িলেন। ৫ই নবেম্বর যুদ্ধারম্ভ। ইংরাজদের সৈন্যবল সবশুদ্ধ ২৮০০ পদাতিক, তন্মধ্যে ৮০০ ইউরোপীয় সেনা। মহারাট্টীদের ১৮০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক ৮০০০। পুণা হইতে খিড়কীর পথ পর্যন্ত সেনায় সেনায় ছায়িত। পুরোৎপীড় প্রবাহিনীর ন্যায় অপূর্ব দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল। বাপু গোখলা, মহারাট্টী সেনাপতি। তিনি সৈন্যদলের মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণপূর্বক উৎসাহ বাক্যে সকলকে উত্তেজিত করিতেছেন — মধ্যে মধ্যে অশ্বগণের হ্রেষা রবে দিক্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিছু পরেই যুদ্ধ বাধিল। গোখলা একদল সিপাহীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ৬০০০ বাছা বাছা অশ্ব চালনা করিলেন — সওয়ারেরা মহারোখে হল্লা করিয়া চলিল — সেই সঙ্গে নয় মুখী কামান-ব্যাটরি হইতে গুলিগোলা বর্ষিত হইল। এই অশ্ব-চাল চালনে আশানুরূপ ফলোদয় হইল না, বরং উল্টোৎপত্তি হইল। যে চালে মহারাট্টী সেনাপতি কিস্তিমাৎ করিবার মতলব করিয়াছিলেন, তাহাতে নিজেই বাজী হারিলেন। দুই সৈন্যের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড

খিড়কীর যুদ্ধ
নবেম্বর ১৮১৭

গর্তের মতন ছিল, কতকজন সওয়ার প্রথম ঝোঁকে তাহার মধ্যে পড়িল, কতক বা গুলি খাইয়া ধরাশায়ী হইল — অবশিষ্ট সওয়ারেরা পিছু হটিয়া গেল। সওয়ারদের পরাভবে মহারাট্টীরা এমন দমিয়া গেল যে আর কেহই এগোইতে সাহস করিল না। সন্ধ্যার মধ্যে এই বিপুল সৈন্যের সশরীরে অন্তর্ধান। ইংরাজেরা রিপু-শূন্য সমরক্ষেত্র অধিকার করিয়া রহিল। এই রণে ইংরাজদের সামান্য ক্ষতি, মহারাট্টীদের ৫০০ লোক মারা পড়ে। এরূপ "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" কেহ কখন দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। পর্বতের প্রসব বেদনায় মূষিকের উৎপত্তি। পেশওয়া সেনামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া পার্বতী মন্দির হইতে খিড়কীর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। সূর্যোদয়ে তাঁহার সৈন্যদলের উৎসাহ কোলাহলে আকাশ পূর্ণ, সূর্যাস্তের মধ্যে যে সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না।

প্রভাতে গনিয়া সেনা হরষে বিহ্বল।
ভানু যবে অস্তাচলে কোথায় সে দল।

বাজিরাওয়ের গ্রহ মন্দ। ইংরাজদের প্রসাদে তিনি সিংহাসন লাভ করিলেন— ইংরাজদের মারিতে গিয়া নিজে মরিলেন। ১৫ই নবেম্বর ব্রিটিশ সৈন্যের পুণা অধিকার, তখন হইতে মহারাষ্ট্র রাজ্য ইংরাজদের করতল-ন্যস্ত হইল। নববর্ষারম্ভে পুণার অনতিদূর কোরেগামে আর এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে দুর্ধর্ষ ইংরাজবলের দ্বিতীয় বার পরিচয় পাইয়া বাজিরাও সেই যে স্বদেশ ছাড়িয়া উর্ধ্বশ্বাসে পালাইলেন, আর ফিরিলেন না। দেশ দেশান্তরে তাড়িত হইয়া অবশেষে তিনি সর জন ম্যালকমের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং অতঃপর উদার পেন্সন ভোগে কানপুর সন্নিহিত বিথুরে কাল পূরণ করিতে লাগিলেন। পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথের প্রপৌত্রের এই শেষ দশা। সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রধার দুরাচার নানা সাহেব এই বাজিরাওয়ের পোষ্যপুত্র। শত বর্ষায়ত পেশওয়া বংশ তাঁহাতেই বিলীন হইল।

ইংরাজ রাজ্য

এইরূপে অল্পে অল্পে ইংরাজেরা পশ্চিম ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইলেন। বোম্বাই তাহার রাজধানী। বোম্বাই যে কি অমূল্য রত্ন, তাহা তাঁহারা পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ভাবী গৌরব তাঁহাদের কল্পনাপটে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। যখন মোগল, মহারাট্টী, পোর্তুগীস লোকেরা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে রত থাকিয়া আপনাদের অধঃপাতের সোপান প্রস্তুত করিতেছিল, তখন হইতে ইংরাজেরা ঐ রত্ন অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। শেষে তাঁহাদেরই জিত — আর সকলের হার। ইংরাজদের এইরূপ প্রাধান্য লাভের কারণ কি? আলোচিত ঘটনাসূত্রই তাহা এক প্রকার নির্দেশ করিতেছে। দেখিবে গৃহবিচ্ছেদই আমাদের সর্বনাশের মূল। ইংরাজেরা আমাদের নিজের হাতিয়ার লইয়াই আমাদের উপর জয়যুক্ত হইলেন। আমাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য থাকিলে বিদেশী রাজা এদেশে তিলার্দ্ধ স্থান পাইতেন না — বিদেশীয় বল বিশ কোটি প্রজাপুঞ্জের এক ফুৎকারে উড়িয়া যাইত। ভারতে ইংরাজ আগমনের কিছু পরেই মোগল রাজ্য পতনোন্মুখ — তাহার

আনুষঙ্গিক অরাজকতা হইতে ইংরাজেরা স্বরাজ্য স্থাপনের সন্ধি পাইলেন। সে সন্ধি তাঁহারা ছাড়িবার পাত্র নন। এই বিপুল রাজবিপ্লবের মধ্যে তাঁহারা অবাধে রাজ্য পত্তন করিয়া লইলেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রিপুদল একে একে পরাস্ত হইল — কেহ বা অদূরদর্শিতাবশতঃ হাল ছাড়িয়া দিল, কেহ বা ইংরাজদলে বিদলিত হইয়া পরাভব স্বীকার করিল। দৈববলে, বাহুবলে, গভীর নয়কৌশলে ইংরাজদের সে রাজ্য ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া বিস্তার লাভ করিল; দেখিতে দেখিতে ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত অরি-বিরহিত, সুশাসন-পরিরক্ষিত, শান্তি-ফলপ্রদ একছত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সমুদিত হইল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমাদের লোকেদের পরস্পর জাতিবৈর — তদুপরি পরিপক্ক ইংরাজী রাজনীতি, এই উভয় সূত্রে ইংরাজদের ঐশ্বর্যলাভ। সে নীতির সার মর্ম এই — শত্রুদল বিচ্ছিন্ন করিয়া একের সাহায্যে অপরকে জয় কর, অনন্তর অবসর বুঝিয়া বন্ধুটিকেও পদতলে আনিয়া দলিত কর।

ইংরাজ রাজ্য স্থাপন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল, এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার নাই। ১৮১৯ অব্দে মহারাষ্ট্রী সমরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহাত্মা এলফিনিষ্টন সাহেব বোম্বাই গবর্নরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার সময় হইতে বোম্বায়ের সৌভাগ্যসূর্যের উদয়। পথঘাট, গৃহ নির্মাণ, শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, বিদ্যা শিক্ষার নব-প্রণালী উদ্ভাবন, আইন-সংস্করণ ইত্যাদি কার্যের অনুষ্ঠান হেতু তাঁহার শাসন বোম্বাইবাসীদিগের বিশেষ আদরণীয়। তিনিই নব্য বম্বের সূত্রপাত করিয়া যান — সর বার্টল ফ্রেয়রের আমলে বোম্বাই শহর উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে।

লর্ড এলফিনিষ্টন বোম্বাই গবর্নর ১৮১৯

বোম্বাই শহর

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সম্প্রদায়

বোম্বাই শহর এই দুই শত বৎসরের মধ্যে যে কি আশ্চর্য উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা তাহার পূর্বোত্তর জনসংখ্যার তুলনা হইতে স্পষ্ট অনুভূত হইবে। যখন বোম্বাই দ্বীপ প্রথমে ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয় তখন বসতির হিসাবে উহা এক সামান্য পল্লী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দশসহস্র লোকের আবাস স্থানকে আর শহরের মধ্যে গণ্য করা যায় না। কিন্তু এই জনসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে;১৭১৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইবাসীর সংখ্যা, ১৬০০০, শতাব্দী পরে তাহা দেড় লক্ষেরও অধিক। ১৮৭২ অব্দে যে লোকসংখ্যার তালিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে বোম্বায়ের প্রজাপুঞ্জ ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ও ১৮৮১-র তালিকায় ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার নির্ণীত হইয়াছে। অতএব দেখ ১০ বৎসরের মধ্যে বোম্বায়ের লোকসংখ্যা লক্ষাধিক বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই দশাব্দীর মধ্যে কলিকাতায় জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষিত হয় না। "লোকসংখ্যা অনুসারে বোম্বাই মাদ্রাজ ও কলিকাতা এই তিন শহরের পরস্পর দশ বৎসরের তুলনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, বোম্বাই বৃদ্ধিশীল — মাদ্রাজ হ্রাসোন্মুখ, কলিকাতা নিশ্চলা। বোম্বায়ের এই বিপুল প্রজাপুঞ্জ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিচিত্র বর্ণ বিচিত্র জাতির সংমিশ্রণে সংগঠিত। হিন্দুদের মধ্যে গুজরাতী বণিক ও মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ রীতি চরিত্রে কেমন ভিন্ন। মুসলমানদের মধ্যে দেশীয় মুসলমান একদিকে — অন্যদিকে পাঠান তুরস্ক আরব পারস্য প্রভৃতি বিদেশী মুসলমান। তদ্ভিন্ন ইহুদী পোর্তুগীস আরমানী পারস্য, এই সমস্ত জাতি এই বিচিত্র জনতার অন্তর্ভুক্ত।" বোম্বায়ে যে সকল জাতি সচরাচর দৃষ্ট হয় তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ বলিতে গেলে প্রস্তাব সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে — বাছিয়া সংক্ষেপে যথাসাধ্য বর্ণনা করা যাইতেছে।

জৈন সম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করা যাক। সমুদায় ভারতবর্ষে জৈনসংখ্যা বিশ লক্ষ* বলিয়া প্রসিদ্ধ — বোম্বাই দ্বীপে প্রায় ১৮০০০। জৈনদের প্রধান আড্ডা গুজরাত — তাহাদের মধ্যে অনেকে ব্যবসাদার ও শ্রীমন্ত। জৈনধর্ম হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে মিশ্রিত, বৌদ্ধধর্মের জ্ঞানকাণ্ড ও হিন্দুধর্মের পৌরাণিক ভাগ উহার সঙ্গে অনুস্যূত। বৌদ্ধদের মত জৈনেরা নিরীশ্বরবাদী অর্থাৎ জগতের আদিকারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার

জৈন

* এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। পালিতানার ঠাকুর কর্তৃক উত্যক্ত হইয়া জৈনেরা ঠাকুরের বিপক্ষে বোম্বাই গবর্নমেন্টে,যে আবেদন করে সেই উপলক্ষে ভারতবর্ষের জৈনসংখ্যা বিশলক্ষ বলিয়া কথিত হয় কিন্তু হন্টর সাহেব কৃত Gazetteer-এ তাহার চতুর্থাংশ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার সঙ্গে যদি বৌদ্ধ-সংখ্যা যোগ করা যায় সে স্বতন্ত্র কথা।

করে না। কিন্তু জৈনদের শাস্ত্রোক্ত মত যাহাই হউক, বাস্তবিক ধরিতে গেলে তাহারা ঘোর পৌত্তলিক;ঈশ্বরারাধনার পরিবর্তে জৈন ধর্মে বীর-পূজা স্থান পাইয়াছে। কর্মের প্রাধান্য বৌদ্ধ জৈন উভয় ধর্মেই দৃষ্ট হয়। উভয়েই আপন আপন কর্মানুসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও স্বর্গ নরক ভোগ বিশ্বাস করে। যে সকল সাধু পুরুষ স্বকীয় কর্মগুণে জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিবৃত্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই জিন — জিনের অনুচর জৈন। জিনের অপর নাম তীর্থঙ্কর। যুগে যুগে এইরূপ ২৪ জন তীর্থঙ্কর উদয় হইয়াছেন ও ভাবীযুগে ২৪ জন উদয় হইবেন। জৈন মন্দিরে এই সকল তীর্থঙ্করের পাষাণময় বিশাল প্রতিমূর্তি স্থাপিত। ইহাদের মধ্যে ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ জিনদ্বয়, পার্শ্বনাথ ও মহাবীর, জৈনদের বিশেষ পূজার্হ। বাঙ্গালাদেশে পার্শ্বনাথ, কাঠেওয়াড়ে গিরনার ও শত্রুঞ্জয় — উত্তর গুজরাতে আবুর পাহাড় ইত্যাদি জৈন তীর্থ ভারতবর্ষে বিক্ষিপ্ত। পালিতানার অধীনস্থ শত্রুঞ্জয় ইহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। এই সকল স্থানে বহুমূল্য সুন্দর জৈন মন্দির সকল প্রত্যক্ষ করা যায়। মন্দিরের মধ্যে আদিনাথ ও অন্যান্য তীর্থঙ্করের শান্তিপূর্ণ গম্ভীর পাষাণ মূর্তি রজত দীপালোকে আলোকিত হইয়া অনতিব্যক্ত অস্ফুট কান্তি ধারণ করে। ধূপধুনার গন্ধে বায়ু সুবাসিত;জৈন তপস্বিনীগণ সুবর্ণরঞ্জিত লোহিত বসন পরিধান পূর্বক সুচিক্কণ পাষাণের উপর দিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্বরে গান করিতে থাকে।

বৌদ্ধদের মত জৈনদের অহিংসাই পরম ধর্ম। কায়মনোবাক্যে সর্বজীবে দয়া প্রকাশ এ ধর্মের উপদেশ। প্রাণীর কষ্ট নিবারণ উদ্দেশে জৈনগণ প্রভূত কষ্ট, অর্থব্যয় ও ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তাহাদেরই যত্ন ও ব্যয়ে বোম্বায়ে পশুর হাসপাতাল (পিঞ্জরাপোল) স্থাপিত ও সুরক্ষিত। পাছে দীপানলে কীটপতঙ্গ বিনষ্ট হয় এই হেতু সূর্যাস্ত পরে জৈনদের আহার নিষেধ। অনেক জৈন সম্প্রদায়ী এই অহিংসা ধর্মের অতিমাত্র কঠোর নিয়মবলী অবলম্বন করিয়া চলে। বর্ষার চতুর্মাস কীট পতঙ্গের সমধিক প্রাদুর্ভাব এই কারণে কোন কোন জৈনগৃহে রাত্রে দীপালোকের কিরণমাত্রও দৃষ্ট হয় না। কোন কোন স্থানে ঐকালে কলুর ঘানি কুম্ভকারের চাক বন্ধ। কথিত আছে এই অতিমাত্র অহিংসা নিয়ম জৈনদের রাজ্যনাশের মূল। অনহিল বাড়ার শেষ রাজা কুমার পাল একজন গোঁড়া জৈন ছিলেন, বর্ষাকালে জীবহিংসা ভয়ে তিনি নিজ সৈন্যসামন্তের গতিবিধি নিবারিত করিয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়াছিলেন।

জৈনধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে দ্বিবিধ মত প্রচলিত। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে জৈনধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের শাখা মাত্র কিন্তু একথা অপর পণ্ডিতেরা অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুকাল পূর্ব হইতে এদেশে জৈনধর্ম চলিয়া আসিতেছে। একজন * মাননীয় লেখকের মত এই যে অশোক রাজা প্রথমে জৈন ছিলেন, রাজত্বের শেষভাগে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন;অশোক রাজার অনুশাসন-লিপি হইতে তিনি স্বীয় মত

* Thomas on Jainism or the Early faith of Asoka.

প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জৈনেরা নিজে তাঁহাদের তীর্থঙ্কর মহাবীরকে শাক্যসিংহের গুরু বলিয়া বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধমত ভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাদের অগ্রাহ্য। ইতিহাসে পাওয়া যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জৈনদের উন্নতি। সপ্তম শতাব্দীতে কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষ পূর্বাবলম্বিত বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ের পর যে জৈন সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয় — মহীশূর, আবু, বিজয়নগর প্রভৃতি অনেক স্থানের খোদিত লিপিতে তাহা সুস্পষ্ট প্রদর্শন করিয়া দিয়াছে। কামতী মাদুরা পাণ্ডরাজ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পতন হইয়া জৈন সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয়। পূর্বে গুজরাতে বৌদ্ধ রাজাদের অধিকার ছিল, খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে তথায় জৈন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সে যাহা হউক জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার আর সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ না থাকুক — উভয়কে পরস্পরের জাতিভাই বলিয়া মানিতেই হইবে। বীরপূজা ও অপর কতকগুলি বিশেষ বিধানে বোধ হয় যেন সার্বভৌমিক বৌদ্ধধর্ম জৈন সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। বোম্বায়ে হিন্দুগণ শৈব ও বৈষ্ণব সামান্যতঃ এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে পারে। কোন হিন্দু শৈব কি বৈষ্ণব তিলক দেখিলেই

হিন্দু

অক্লেশে জানিতে পারা যায়। বৈষ্ণবেরা নাসামূল হইতে কেশ পর্যন্ত বিষ্ণুর পদাঙ্কসূচক ঊর্ধ্বরেখা করেন আর শৈবেরা ললাটে বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্যন্ত বিভূতি দিয়া তিনটি তির্যক রেখা করিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত তিলককে ঊর্ধ্ব পুণ্ড্র ও শেষোক্ত তিলককে ত্রিপুণ্ড্র বলে।

শৈবদের গুরু জগৎগুরু শঙ্করাচার্য। শঙ্করাচার্য একজন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মহোৎসাহী ধর্মোপদেশক ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে জাতিগতই হউক ব্যক্তিগতই হউক,

শঙ্করাচার্য

ইতিহাস মাত্রই এরূপ অযত্নের বস্তু যে এমন লোকের প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত কালের সহিত বিলীন হইয়াছে। আনন্দগিরিকৃত শঙ্কর দিগ্বিজয় প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের চরিত বর্ণনা আছে বটে কিন্তু তাহা এত অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপারে জড়িত যে সত্যমিথ্যা পৃথক করা সহজ নহে। তাঁহার জীবনচরিত যতদূর জানা গিয়াছে তাহার সারাংশ এই। খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষ অথবা নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। কেরল (মালাবার) প্রান্তে ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম। অনধিক কালের মধ্যেই তিনি একটি তেজীয়ান্ ক্ষমতাপন্ন লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া ভারত-ভূমির অন্তর্গত নানা দেশ ভ্রমণ ও সে সময়ের প্রচলিত নানা মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করেন। তিনি কাঞ্চী, কর্ণাট, কাশী, কামরূপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ পূর্বক জীবনের শেষভাগে কাশ্মীররাজ্যে গমন করেন এবং তথায় প্রতিপক্ষদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া সরস্বতীপীঠে অধিষ্ঠিত হন। তথা হইতে বদরিকাশ্রমে চলিয়া যান ও অবশেষে হিমালয়স্থিত কেদারনাথে গিয়া ৩২ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় প্রাণত্যাগ করেন। বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচার ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচলন উদ্দেশে তিনি চারিস্থানে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। মহীশূরস্থ

শৃঙ্গগিরির মঠ তন্মধ্যে সর্বপ্রধান। শৃঙ্গগিরি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্মস্থান ও বিভাণ্ডক ঋষির তপোভূমি বলিয়া প্রখ্যাত; শৃঙ্গগিরি মঠাধিপতি শঙ্করাচার্যের অনুশাসন এ অঞ্চলে শৈবদের মধ্যে প্রচলিত। শৃঙ্গগিরি হইতে তিনি জাতি সম্বন্ধীয় বিহিত বিধান প্রচার করেন। সমাজ সংস্কারকর্তাগণ তাঁহার সহযোগিতা পাইবাব জন্য ব্যস্ত। তাঁহার মানমর্যাদা ঐশ্বর্যের সীমা নাই। যখন অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয় তখন শৃঙ্গগিরি হইতে শিষ্যবর্গের মধ্যে অবতরণ পূর্বক ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া যান।

শঙ্করাচার্য জীব ব্রহ্মে অভেদমূলক অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবর্তক। তিনি বেদান্ত দর্শন, উপনিষদ ভাষ্য, ভগবদগীতা ভাষ্য — ইত্যাদি আত্মজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রস্তুত করেন। যদিও অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহার প্রকৃত মত ও নির্গুণ উপাসনা প্রচার করা এই সমস্ত মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য কিন্তু দেখা যায় সাকার দেবতার উপাসনায় তাঁহার কিছুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না। এই সকল উচ্চ উপদেশ অজ্ঞান জনসাধারণের ধারণাতীত তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। যাহারা নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞানের অনধিকারী তাহাদের জন্য তিনি সুলভ মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই দেখি যে, সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার প্রতি গুরুভক্তি প্রকাশ করে। তাঁহার নাম ষণ্মতস্থাপক। লিখিত আছে শঙ্করাচার্যের শিষ্যেরা তদীয় আদেশানুসারে নানা দেশ ভ্রমণ ও তত্রস্থ পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া শিব বিষ্ণু প্রভৃতি সাকার দেবতার উপাসনা প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যবর্গের অনেকেই শিব পক্ষপাতী ও শিবোপাসক দৃষ্ট হয়। শৈবেরাই শঙ্করাচার্যকে আচার্যপদে বিশিষ্টরূপে বরণ করেন — এমনকি শঙ্করের অবতার বলিয়া তাঁহাকে দেবাসনে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বৈষ্ণবেরা দ্বৈতবাদী ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাহাদের আচার্যও বিভিন্ন। কিন্তু বোম্বাই ও গুজরাতে বল্লভাচার্যের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। বহুতর স্বর্ণ বণিক ও ব্যবসায়ী লোক বল্লভাচার্যের মতাবলম্বী। শিষ্যদের উপর গোঁসাইদের অত্যন্ত প্রভুত্ব দেখা যায়। বল্লভাচার্যের উত্তরাধিকারী আচার্যগণ সগর্বে 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছেন। খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর ন্যূনাধিক অশীতি বৎসরে বল্লভাচার্য চম্পারণ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার চরিত সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁহার ধীশক্তি এমন প্রবল যে কথিত আছে সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তিনি বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়া চতুর্মাসের মধ্যে চারিবেদ, ষড়দর্শন ও অষ্টাদশ পুরাণ কণ্ঠস্থ করেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের নূতন পন্থা প্রস্তুত করিয়া শীঘ্রই দেশ দেশান্তরে স্বমত প্রচারে বাহির হইলেন। ভক্তমালে লিখিত আছে, তিনি ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে বিজয় নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবের সভায় উপস্থিত হইয়া তথাকার স্মার্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন এবং তত্রত্য বৈষ্ণবগণের আচার্যপদে অভিষিক্ত হন। তথা হইতে উজ্জয়িনী নগরে গমন করিয়া শিপ্রাতটে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে অবস্থিতি করেন। তথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচলা ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া অতি মনোহর অপূর্বরূপে দর্শন দিয়া তাঁহাকে বালগোপালের সেবা প্রচার করিতে

বল্লভাচার্য

আদেশ করিলেন। এই উদ্দেশে তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্বক অবশেষে কাশীবাসে জীবন উৎসর্গ করেন। কাশীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বল্লভাচার্যের মৃত্যুঘটনা বিষয়ক আখ্যান এই; তিনি মর্ত্যলীলা সম্পন্ন করিয়া এক দিবস হনুমান ঘাটে গঙ্গাসলিলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবগাহন করিতে করিতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তাঁহার অবগাহন স্থান হইতে এক দীপ্যমান অগ্নিশিখা উত্থিত হইল এবং তিনি বহুতর দর্শক সমক্ষে স্বর্গারোহণ করত আকাশে লীন হইয়া গেলেন।

বল্লভাচার্যের ধর্ম বিলাসের ধর্ম — ঐশ্বর্যবান ও ভোগবান গৃহস্থেরা ঐ ধর্মে অনুরক্ত। অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেন ধর্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় কঠিন (দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি) বল্লভাচার্য নির্দিষ্ট মার্গ সেরূপ নহে — তাহাকে পুষ্টিমার্গ বলে। তিনি কহিয়া গিয়াছেন পরমেশ্বর উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই — অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও প্রয়োজন নাই — বনবাস স্বীকার পুরঃসর কঠোর তপস্যাতেও ফলোদয় নাই। উত্তম বসন পরিধান ও সুখাদ্য অন্নভোজনাদি সমস্ত বিষয়সুখ সম্ভোগপূর্বক তাঁহার সেবা কর। উচ্চাঙ্গ বৈষ্ণব ধর্মের মতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম রূপকচ্ছলে গৃহীত — তাহা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার প্রেমের আদর্শ। বল্লভাচার্যের ধর্মে এই প্রেম পার্থিব ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহার আধ্যাত্মিক স্বর্গীয় ভাব লোপ পাইয়াছে।

এই বিলাস ধর্ম হইতে নানাপ্রকার অনীতি অত্যাচার প্রসূত হইয়াছে। গোঁসাইজী মহারাজ স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবানের পার্থিব প্রতিনিধি; শিষ্যেরা তনমনধনে তাঁহার সেবায় রত থাকিবে এইরূপ বিধান আছে। এই সকল বৈষ্ণবমন্দিরে দেখিবে মহারাজই দেবতা — তিনিই পূজার পাত্র। তাঁহার পদধূলি সেবন ও চরণামৃতপান, তাঁহাকে নৈবেদ্য অর্পণ, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন, আরতি রাসদোলা প্রভৃতি দেবারাধন উপকরণে তাঁহার অর্চনা, এই সমস্ত অনুষ্ঠানে শিষ্যগণ আপনাদিগকে পুণ্যবন্ত কৃতকৃতার্থ মনে করেন। এ অপেক্ষাও সহস্রগুণে নিন্দনীয় জঘন্য পাপাচার যাহা উল্লেখ করিতেও হৃৎকম্প হয় তাহা এই যে বৈষ্ণব কুলবধূগণ মহারাজকে শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশেষ মানিয়া তাঁহার সেবায় আপন সতীত্ব পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে সঙ্কুচিত হন না।

কতক বৎসর হইল গুজরাতের প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক মৃত করসন দাস মূলজী বোম্বাই সুপ্রীমকোর্টে মহারাজ লাইবেল মকদ্দমায় বল্লভাচারী বৈষ্ণবদিগের নীতিবিরুদ্ধ আচারগুলি উদ্ঘাটিত করিয়া গুজরাত সমাজের বিস্তর উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, সেই অবধি মহারাজদিগের বিষম অত্যাচার কতকটা প্রশমিত দেখা যায়।*

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই সকল অনীতিগর্ভ বিশ্বাস ও ব্যবহার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিয়া গুজরাতে স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায় সমুত্থিত হয়। সহজানন্দ স্বামী এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা।

* অল্পদিন হইল ব্রজেশজী নামক একজন মহারাজ জেলে গিয়া তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে হুলুস্থুল বাধাইয়া ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

গুজরাতে তাঁহার প্রায় দুই লক্ষ অনুচর দৃষ্ট হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী আচার্যগণ বল্লভাচার্যদের দৃষ্টান্তে মহারাজ পদবী গ্রহণ করিয়াছেন। সহজানন্দস্বামী রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ছিলেন।[Φ] যে সময়ে রামমোহন রায় স্বদেশে আচারব্যবহার ধর্মাদি সংশোধন করিয়া উন্নত ব্রাহ্মধর্মের অঙ্কুর রোপণ করিতে কৃতসংকল্প হন, সহজানন্দ স্বামীও তখন গুজরাতে বৈষ্ণব ধর্মের অনীতি কলঙ্ক অপনোদন করিয়া বিশুদ্ধ নীতিমার্গ প্রদর্শন করিতে তৎপর থাকেন। সহজানন্দ অযোধ্যা প্রদেশের চপাই নামক গ্রামে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ ও ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমে গুজরাতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া গুজরাতে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার কি এক সরল সাধুভাব ও আকর্ষণী শক্তি ছিল কতিপয় বৎসরের মধ্যেই অনুরক্ত শিষ্যদলে তিনি পরিবেষ্টিত হইলেন।[π] তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়াতে অহমদাবাদের ব্রাহ্মণ ও কর্তৃপক্ষদের ঈর্ষানল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি অত্যাচারের ভয়ে পলায়নপূর্বক আহমদাবাদের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে জয়তলপুর গ্রামে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন ও তথায় এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়া পার্শ্ববর্তী ব্রাহ্মণদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। এইরূপ সমাগমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ীদের মধ্যে গোলযোগ আশঙ্কা করিয়া কর্তৃপুরুষেরা স্বামীকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু তাহার ফল উল্টা হইল। লোকের হৃদয় তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট ও তাঁহার আধিপত্য শতগুণ বৃদ্ধি হল। শীঘ্রই তিনি কারামুক্ত হইলেন ও ভক্তমণ্ডলী তাঁহার চতুর্দিকে আসিয়া জুটিল। অনন্তর বর্তাল নামক এক বিজনপল্লীতে তাঁহার শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে উপনীত হইয়া তথায় লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তথা হইতে ধর্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে বর্তাল গ্রামে স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ীদের দুইটি মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে রাধিকা ও বামপার্শ্বে স্বামীনারায়ণের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। দেখ কত অল্পকাল মধ্যে কেমন সহজে সহজানন্দস্বামী হিন্দু দেবমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলেন। ভারতবর্ষে নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি প্রকরণ স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইতে সুস্পষ্ট নিরীক্ষণ করা যায়। এই সম্প্রদায়ীদের দুই শ্রেণী — সাধু ও গৃহস্থ। সাধুরা অবিবাহিত, গেরুয়া বসনধারী, সন্ন্যাস ধর্মানুরক্ত, প্রচার কার্যে নিযুক্ত। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১০০০। এই সকল সাধুরা সমুদায় সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া ধর্মপ্রচারেই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই কার্যে তাঁহারা অশেষ কষ্ট অশেষ ত্যাগ স্বীকার পূর্বক পদব্রজে দূরে দূরে গমন করেন, সঙ্গে কেবল দণ্ড, কমণ্ডলু, ভিক্ষার ঝুলি ও তাঁহাদের এক একখানি ধর্মগ্রন্থ পথের সম্বল। তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তে চাসা কুলি প্রভৃতি নীচ জাতি মধ্যে এই ধর্মের প্রচার হইয়া মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। স্বামীনারায়ণ ধর্মগ্রন্থের নাম শিক্ষাপত্রী। এই গ্রন্থ সহজানন্দস্বামী কর্তৃক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত।

স্বামীনারায়ণ

Φ রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭৪ মৃত্যু ১৮৩৩।

π বিশপ হীবরের গ্রন্থে এই খৃষ্টীয় ও হিন্দু আচার্যের সাক্ষাৎকার সংঘটন বর্ণিত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিঠ্‌ঠল ভক্ত নামে একটি সম্প্রদায় আছে। গুজরাত কর্ণাটে এই সম্প্রদায়ী অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের উপাস্য দেবতার নাম বিঠ্‌ঠল বা বিঠোবা। ইহারা তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। দক্ষিণাপথে ভীমা নদীর দক্ষিণ তীরে পণ্ডরপুরে ঐ বিঠ্‌ঠল দেবের একটি মন্দির আছে। পণ্ডরপুর মহারাষ্ট্র দেশের এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। আষাঢ়ী ও কার্তিকী পূর্ণিমায় অসংখ্য অসংখ্য যাত্রী বিঠোবা দর্শনে সমাগত হয়।

বিঠ্‌ঠল ভক্ত অথবা বারকরী

এই স্থানে পুরাকালে হয়ত বৌদ্ধদের ধর্মক্ষেত্র ছিল। কথিত আছে যে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তির স্থান এক্ষণে বিঠোবাদেব অধিকার করিয়া সকল জাতির পূজার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সম্প্রদায়ীগণ জাতিভেদ প্রথা কিয়দংশে অবমাননা করেন — মহোৎসবের সময় জগন্নাথ ক্ষেত্রের ন্যায় পণ্ডরপুরস্থিত দেবমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বিঠ্‌ঠল ভক্তেরা পরস্পর পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না।

সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় কবি তুকারামের কবিতাবলী বিঠোবার স্তুতি-গীতি পূর্ণ। তুকাবাম ২৫০ বৎসর পূর্বে পুণার সন্নিকটস্থ দেহু গ্রামে বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। শিবাজীর রাজত্বকালে

তুকারাম

তিনি প্রাদুর্ভূত হন ও প্রায় ৫০০০ গাথা রচনা করেন। এই সুনীতি ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ "অভঙ্গ" কবিতাবলী মহারাষ্ট্র দেশে সর্বসাধারণে সমাদৃত। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই হইবে।

১. ভক্তি ভরে গান কব, শুদ্ধ কব মন,
হরি যদি পেতে চাও এই সে সাধন।
নম্র হও, থাক সদা সাধু পদচ্ছায়,
কান পাতিও না কভু পর-চরচায়।
তুকা বলে — কর ভাই পর উপকারে,
অল্প হোক্ বেশী হোক্, যা সাধ্য তোমার।

২. হে ঈশ্বর, এই কর তোমারে না ভুলি,
তব গুণগান যেন করি প্রাণ খুলি।
আর কিছু নাহি চাই, এই এক আশ,
ধনসম্পদের তরে না রাখি প্রয়াস।
নির্বাণ করিতে লাভ বাসনা যে নাই,
দুর্লভ জনম হ'তে মুক্তি নাহি চাই।
বেঁচে থেকে করি শুধু তব গুণগান,
সাধুসঙ্গ ভোগ করি এই চাহে প্রাণ।

বোম্বাই শহর

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাতি

বোম্বায়ে গুজরাত মহারাষ্ট্র কর্ণাট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে নানাজাতীয় হিন্দু একত্রিত। গুজরাতীদের অধিকাংশ বাণিজ্য ব্যবসায়ে রত। বাণিজ্য সম্বন্ধীয় ভাষা গুজরাতী। গুজরাতী বণিকদিগের যে সমস্ত জাতিবিভাগ আছে তাহা এস্থলে উল্লেখ করা অভিপ্রেত নহে। তাহাদের অর্জনস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল। সাইলক সদৃশ অর্থলোভ ও ক্রূরতা বণিক জাতির জাতীয় ধর্ম কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উদ্যম ও কর্মদক্ষতা প্রশংসার যোগ্য। পারস্য উপসাগর ও ভারত সাগরের উপকূলস্থ প্রদেশের সহিত বাণিজ্যসূত্র পুরাকাল হইতে এই সকল বণিকদের হস্তে নিহিত এবং একালেও পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ ও পূর্ব আরব্যের বাণিজ্য জাঞ্জিবার মস্কট প্রভৃতি স্থানে এই সকল বোম্বাই-বণিকদের এজেন্ট কর্তৃক নিষ্পন্ন হয়। ইউরোপীয়েরা প্রথমে যখন এদেশে পদার্পণ করে তখন বণিকদের সঙ্গেই তাহাদের প্রধান কারবার। তাঁহাদের একজন এক প্রবাদ লিখিয়া গিয়াছেন — "ইহুদী তিন এক চীন— তিন চিনে এক বেনে।" মধ্য হিন্দুস্থান হইতে বহু সংখ্যক মারওয়াড়ী এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে — বণিকদের সঙ্গে তাহাদের রীতি চরিত্রে অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। প্রত্যুত মারওয়াড়ী মধ্য ভারতের স্বর্ণবণিক। তাহারা একজাতীয় মাকড়সা — একবার তাহাদের ঋণজালে বদ্ধ হইলে আর রক্ষা নাই, ধনপ্রাণে বিনষ্ট হইতে হয়।

গুজরাতী বণিক

মহারাষ্ট্রীদের দলও সামান্য প্রবল নহে। তাহাদের ভাষা দক্ষিণে কৃষ্ণানদী হইতে উত্তরে তাপী পর্যন্ত বিস্তৃত। মহারাষ্ট্রীরা বাণিজ্য-ব্যবসায়ে সুদক্ষ নহে। তাহাদের মধ্যে বণিক ব্যবসায়ী দোকানদার অধিক নাই। ইংরাজ অধিকারের পূর্বে তাহাদের যে শৌর্য বীর্য রাজনীতি কুশলতা দৃষ্ট হইত এক্ষণে তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। মফঃস্বলে অনেকে মেষপালন ও কৃষিকার্যে রত — নাগরিকদের মধ্যে যাহারা ভদ্রলোক তাহারা কেরানিগিরি ও আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত — ছোটলোকেরা অনেকে সইস কোচমান। এদেশের পূর্ব বীরত্ব অস্তমিত হইয়াছে। শিবাজীর সে মাওলী সেনার বংশ এক্ষণে কোথায়? সমস্ত ভারতের ত্রাসদায়ক সাহসী বর্গীরা এক্ষণে কৃষকের হলধারণ করিয়া দীনহীন ভাবে যথাকথঞ্চিৎ দিনপাত করিতেছে। এ অবস্থা ব্রিটিশ শাসনের অব্যর্থ ফল। এই সুগভীর শান্তির মধ্যে সেই সমস্ত বীরপুরুষদের দাঁড়াইবার স্থান নাই — আইনের বলে তাহারা নিরস্ত্র; শান্তি ভঙ্গকারীদের গতি মাজিস্ট্রেটের কোর্ট অথবা জেলখানা। এইরূপ নির্বীজতা ইংরাজ রাজপুরুষদিগের প্রার্থনীয় বটে; ইহাতে প্রজা শাসন বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হয়। যতদিন ইংরাজ রাজ্য বিদ্যমান ততদিন কোন ভাবনা নাই কিন্তু যদি কখন এমন কাল উপস্থিত হয় যে

মহারাষ্ট্রী

ইংরাজেরা এদেশ ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত — যদি অন্তর কিম্বা বাহির হইতে এমন কোন বিপদ ঘটে তাহা হইলে আত্মরক্ষায় অসমর্থ এই কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জের যে কি দশা হইবে তাহা কল্পনা করিতেও ভয় হয়। যাঁহাদের হস্তে ভারতবর্ষের হিতাহিত সমস্ত নির্ভর তাঁহাদের কি দূরদৃষ্টি দিয়া এ বিষয়ে একটিবার দৃকপাত করা বিধেয় না? এখন হইতে ইহার প্রতিবিধানের উপায় চেষ্টা কি যুক্তিসঙ্গত নয়?

ব্রাহ্মণদের মধ্যে মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী, কনোজ, তৈলঙ্গী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির ব্রাহ্মণ দৃষ্টিগোচর হয়। মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের দেশস্থ কোকনস্থ কহ্লাড় এই তিন প্রকার শাখা। তাঁহাদের পরস্পর পানভোজন চলে কিন্তু আদানপ্রদান বড় একটা নাই। আমাদের দেশে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে মেলামেশা যেরূপ প্রার্থনীয় ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বন্ধনও তদ্রূপ এবং সংস্কারকর্তাদের লক্ষ্য ওদিকে দেখা যায়, নিদান কথায় তাঁহারা ঐক্য বন্ধনের আবশ্যকতা স্বীকার করেন। শুনিতে পাই, শঙ্করাচার্য ঐ বিষয়ে অনুকূল ব্যবস্থা দিয়াছেন। গুজরাতী ব্রাহ্মণদের মধ্যে নাগর ব্রাহ্মণ সর্বপ্রধান। সেনওয়ী নামে একজাতীয় ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে গৌড় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। যদিও তাঁহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণের দেখাদেখি শুদ্ধাচাবের ভান করিয়া থাকেন তথাপি তাঁহাদের জাতিতে আমিষ ভক্ষণ, বিশেষতঃ মৎস্যাহার নিষিদ্ধ নহে। সম্ভবতঃ তাঁহারা বাঙ্গালাদেশ হইতে এদেশে আসিয়া পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা সেনইকে আমিষভোজী আচারহীন বলিয়া অবজ্ঞা করে — তাহাদের চক্ষে সেনই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নয়। আমার একটি সেনই বন্ধু মফস্বলের কোন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, সে দিন তাঁহার সহিত আমার এ বিষয়ে কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "এ অঞ্চলে আমার স্বজাতীয় লোক কেহই নাই, এক প্রকার নির্বাসন যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। কখন কখন কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে নিমন্ত্রণ হয় কিন্তু দেখিলাম তাহাদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা সম্ভবে না। ব্রাহ্মণ মহিলারা আমার স্ত্রীকে দূরে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে যেন স্পর্শেও মহা দোষ। ভোজনের সময় আমাকে সমান পংক্তিতে বসিতে দেয় না — আমার স্বতন্ত্র আসন — স্বতন্ত্র বাসন হইতে পরিবেশন এই সকল দেখিয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না। নিমন্ত্রণে ডাকিয়া এইরূপ অপমান করা ইত্যাদি দুই এক কথা বন্ধুকে খুব শুনাইয়া দিলাম। সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বামন বাড়ীতে আর নিমন্ত্রণ খাওয়া নয়।" এই এক উদাহরণ হইতে এদেশে জাতিভেদের কঠোর নিয়ম বিলক্ষণ উপলব্ধি করা যায়।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্র জাতির বিবরণ ক্রমান্বয়ে বলিতে গেলে অনেক কথা বলা আবশ্যক তাহার স্থানও নাই সময়ও নাই। এ স্থলে দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ৎ জাতির উল্লেখ করিয়া এ ভাগ সমাপ্ত করা যাক্। লিঙ্গায়তেরা শিব উপাসক কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ বহির্ভূত, বৈদিক অনুষ্ঠান বিরহিত স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। তাহারা স্ত্রী পুরুষ সকলেই গলদেশে শিবলিঙ্গ ধারণ করে তাহা হইতে তাহাদের নাম লিঙ্গায়ৎ। শিব ও শিবের

লিঙ্গায়ৎ

পরিবারস্থ পার্বতী গণপতি তাহাদের উপাস্য দেবতা ও শিবের বাহন নন্দীর উপর তাহাদের প্রগাঢ় ভক্তি। তাহাদের আদিগুরুর নাম বৃষভ* (বসপ্পা বৃষভের অপভ্রংশ) লিঙ্গায়তেরা তাঁহাকে নন্দীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি বিজাপুর অঞ্চলে একটি শৈব ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন ও ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পিতামাতা অত্যন্ত শিবপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের শিভভক্তির পুরস্কার স্বরূপ শিববাহন নন্দী তাহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। বাসব (বৃষভ) নামে পুত্রের নামকরণ হইল। কথিত আছে যে উপনয়নের সময় বালক বাসর গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিয়া উপবীত ধারণ করিতে কোনমতেই স্বীকৃত হইলেন না — বলিলেন ঈশ্বর ভিন্ন আমার কোন গুরু নাই। এই অপরাধে পিতা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বাসব পলায়ন করিয়া বিজ্জল রাজার শরণাপন্ন হন। বিজ্জলের রাজধানী কল্যাণ। তথায় বাসবের এক মাতুল পুলিশাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহার বাটী গিয়া রহিলেন এবং তাঁহাকে মুরব্বি ধরিয়া সরকারী চাকুরী ও ধনসম্পত্তি লাভ করিলেন। পরে তাঁহার উপার্জিত বিত্ত দানধর্মে ব্যয় করিয়া লোকের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। যখন তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইল তখন জৈন স্মার্ত বৈষ্ণব ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁহার নূতন মত প্রচার আরম্ভ করিলেন। লিঙ্গোপাসনা-শৌচাশৌচ অবমাননা— বেদ ব্রাহ্মণ নিন্দা— স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার ইত্যাদি উপদেশ সেই মতের অঙ্গীভূত। ক্রমে তিনি জৈন ও অপর পন্থী লোকদের বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিলেন। তাহারা তাঁহার বিপক্ষে রাজার নিকট অভিযোগ করিল। রাজার কোপানলে পড়িয়া অবশেষে তাঁহাকে কল্যাণ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। কিন্তু তাঁহাকে নির্যাতন করিতে গিয়া রাজা স্বয়ং প্রাণ হারাইলেন। বাসবের অভিসম্পাতে কল্যাণ নগরের এমন দুর্দশা হইল যে রাত্রে কুক্কুটধ্বনি দিবসে শৃগাল নাদ, ঝটিকা গ্রহণ ভূমিকম্প প্রভৃতি উৎপাতের আর অবধি রহিল না। প্রজারা শোক সন্তাপে মুহ্যমান। পরিশেষে বাসবের শিষ্য কর্তৃক রাজা নিজ প্রাসাদেই নিহত হন। লিঙ্গায়ৎ গ্রন্থে এই বলে, জৈন লেখ্যে রাজ-হত্যার বিবরণ স্বতন্ত্র। সে যাহা হউক এই গল্প হইতে বাসবের প্রতাপ প্রভুত্বের প্রমাণ বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। বাসব কল্যাণ ছাড়িয়া কৃষ্ণা ও মলপ্রভার সঙ্গম-স্থল সঙ্গমেশ্বরে বাস করিতেছিলেন সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জীবনের কার্য শেষ হইলে মুক্তিলাভের জন্য শিবের আরাধনা করিলেন, শিবপার্বতী লিঙ্গ হইতে সশরীরে বাহির হইয়া তাঁহাকে লইয়া অন্তর্ধান হইলেন; আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি বর্ষণ হইল, আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

বৃষভ পুরাণ নামক একখানি পুরাণে বাসবের চরিত্র বর্ণনা আছে। এই পুরাণ লিঙ্গায়ৎদিগের ধর্মগ্রন্থ। এই পুরাণের মতে জাতিভেদ প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থভ্রমণ, ব্রাহ্মণভোজন ও উপবাস, শৌচাশৌচ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আবশ্যকতা, স্ত্রীলোকদের অপদস্থতা প্রভৃতি সাধারণ হিন্দুধর্মের

* এই নামের নানারূপ দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালায় লিখিতে গেলে বাসব লেখাই সহজ, অক্ষয়বাবুর সম্প্রদায় পুস্তকে তাহাই আছে কিন্তু মনে রাখা উচিত যে এ শব্দ 'বসু' মূলক নহে, "বৃষভ" নামের অপভ্রংশ মাত্র। কানাড়ী ভাষায় বৃষভকে "বসব" বলে।

বিধি ও উপদেশ ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যক্ত। কিন্তু ধর্মের উপদেশ যতই উচ্চ হউক না কেন, তাহা অনুষ্ঠানে পরিণত বলিয়া বোধ হয় না। ফলে এই সকল উপদেশের বিপরীত আচরণ দৃষ্ট হয়। হিন্দুদের মত সেই জাতিভেদ, সেই ক্রিয়াকাণ্ড, সেই তীর্থভ্রমণ— সেই স্ত্রীপুরুষের ভিন্নাধিকার লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। একমাত্র শিবের পূজার পরে অন্যান্য দেব দেবী ও সাধু ভক্তের পূজা স্থান পাইয়াছে।

লিঙ্গায়ৎ পুরোহিতের নাম জঙ্গম। জঙ্গমের মধ্যে গৃহস্থ ও বিরক্ত দুই শ্রেণী। গৃহস্থ জঙ্গম বিবাহ করে, বিরক্ত জঙ্গম অবিবাহিত। লিঙ্গায়ৎদের শবদাহন প্রথা নাই — গোর দেওয়া তাহাদের রীতি। মৃত্যু তাহাদের নিকট ভয়ের বস্তু নহে। মৃত্যুতে তাহাদের অশৌচ হয় না। প্রত্যুতঃ মৃত্যুর সোপান হইতে জীবাত্মা কৈলাস সদনে অধিরোহণ করে এই বিশ্বাস বশতঃ মৃত্যুতে তাহাদের অভিনন্দন। লিঙ্গায়ৎ মৃত্যুগৃহে অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করা যায়। একদিকে বিধবার ক্রন্দনধ্বনি— অন্যদিকে বাদ্য সমারোহে জঙ্গমদের ভোজ লাগিয়া গিয়াছে। মৃত্যুর পর দেহ পুষ্পচন্দন বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া বিমানে করিয়া সমাধিস্থলে সমানীত হয়। সম্মুখে বাদ্যের ঘটা, পশ্চাতে শবযাত্রী চলিয়াছে। পুরোহিতদিগের এমনি প্রভুত্ব যে গুরুর পাদোদক মৃতদেহের উপর সিঞ্চিত হয় ও শিবের প্রতি তাঁহার আজ্ঞাপত্র দেহোপরি সংলগ্ন হয়। সে পত্র প্রাপ্তি মাত্র মহাদেব জীবাত্মাকে নিজ নিকেতনে সাদরে ডাকিয়া লইবেন এই বিশ্বাস। সমাধিস্থলে পুরোহিতেরা উপস্থিত থাকিয়া আত্মার সদ্গতি সাধনের বিহিত উপায় যোজনা করিতে থাকেন।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিমস্থিত কর্ণাট প্রদেশে এই সম্প্রদায় ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া মহারাষ্ট্র গুজরাত ও অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

বোম্বাইবাসীর পঞ্চমাংশ মুসলমান। মুসলমানদের প্রধান দুই শ্রেণী— সুন্নী ও শিয়া। মহম্মদের উত্তরাধিকারী কালিফদের লইয়া এই দুই সম্প্রদায়ের মতভেদ। সুন্নী মুসলমানেরা আবুবকর, ওমার প্রভৃতি পরম্পরাগত ইমামগণের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন করে। সিয়া মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে, মহম্মদের জামাতা— তাঁহার প্রিয়তম দুহিতা ফতেমার স্বামী যে আলী তিনিই তাঁহার সিংহাসনাধিকারী যথার্থ ইমাম। আলির অভাগা পুত্রদ্বয় হাসেন হোসেন শত্রুহস্তে নিহত হয়, এই ঘটনা স্মরণ করিয়া মহরমের সময় মুসলমানেরা বক্ষাঘাত ও আর্তনাদ দ্বারা হৃদয়-বিদারক শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ উপলক্ষে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সুন্নীদিগের উল্লাস ও অভিনন্দন। তুর্ক ও আরবজাতি প্রধানতঃ সুন্নী মুসলমান, পারসিকেরা প্রায় সিয়া সম্প্রদায়ী। বোম্বায়ে সিয়া মুসলমানদের সংখ্যা সম্ভবতঃ অধিক।

মুসলমান

বোম্বাইবাসী মুসলমান অন্যতর প্রণালী অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে— দেশী ও বিদেশী মুসলমান। যাহাদের আসলে হিন্দুকুলে জন্ম ও যাহাদের পূর্বপুরুষেরা স্বেচ্ছাক্রমে

অথবা বলপূর্বক মুসলমান ধর্ম স্বীকার করিয়াছে তাহাদের দেশী মুসলমান বলা যাইতে পারে — তদ্ভিন্ন আর সকলে বিদেশী শব্দের বাচ্য। এই সমস্ত মুসলমান জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধ হইয়া এক্ষণে যদিও মিশ্র জাতিই অধিক দৃষ্ট হয় তথাপি তন্মধ্যে কতকগুলি সম্প্রদায় অবিমিশ্র থাকিয়া এখনো পর্যন্ত স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে। যথা কোঙ্কনী মুসলমান, দক্ষিণী মুসলমান, কচ্ছী, মেমন ইত্যাদি। বোহরা বলিয়া একজাতীয় মুসলমান যাহারা "হকর"দের মত দ্বারে দ্বারে জিনিস বেচিয়া বেড়ায় তাহাদের অধিকাংশ মূল গুজরাতী হিন্দুবংশীয়, একাদশ শতাব্দীতে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। তাহারা সিয়া সম্প্রদায়ী। তাহাদের প্রধান আবাস স্থান সুরাট ও সুরাটের মুল্লা সাহেব তাহাদের ধর্মযাজক। তাহাদের ভাষা গুজরাতী। বোরার অত্যন্ত কাজের লোক — এমন স্থান নাই যেখানে তাহাদের গতি নাই। এমন জিনিস নাই যা তাহাদের নিকট পাওয়া যায় না। দিল্লীর সোনা রূপার গহনা — কাশ্মীরের সাল — রামপুর চাদর — ঢাকাই মলমল — বোম্বাই কচ্ছ কাশ্মীরের শিল্প ও কারুকার্য, চীন ও ইউরোপের পশম ও রেশমের কাপড় আরো কত রকম জিনিস এই সকল ভ্রমণকারী বোরার বোচকার মধ্যে গচ্ছিত, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু ক্রেতাদিগকে একটি বিষয়ে সাবধান থাকিতে হয়। বোরার কোন জিনিসের নিয়মিত দরদাম নাই — খরিদদার বুঝিয়া দর ডাকিয়া বসে ও এতগুণ বেশী ডাকা হয় যে হাজার কমাইলেও তাহার বিলক্ষণ লাভ হাতে থাকে। ইংরাজ মহিলা বোরার প্রধান খদ্দের। বোম্বায়ে দেখিবে মেম সাহেবের দরজায় দোকান খুলিয়া বোরাজী ধন্না দিয়া বসিয়া আছেন।

খোজা নামক আর একটি সম্প্রদায় আছে তাহারাও হিন্দু মুসলমান। খোরাসান হইতে সমাগত পীর সদরুদ্দীন কর্তৃক তাহাদের পূর্বপুরুষগণ চারি শত বৎসর পূর্বে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়। যদিও খোজারা আপনাদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয় কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার ও ধর্মানুষ্ঠান হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মমিশ্রিত। কাজীরা তাহাদের উদ্বাহক্রিয়া নির্বাহ করিয়া দেয় বটে কিন্তু অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর হিন্দুমতানুসারে জাতক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট কোরাণের কিয়দংশ ও দশাবতারের উপাখ্যান উভয়ই পঠিত হয়। মৃত্যু ঘটিলে পর হিন্দু ও মুসলমান উভয় শাস্ত্রানুযায়ী অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। খোজারা হিন্দু ও মুসলমান উভয় তীর্থই পর্যটন করে ও হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দায়াধিকার প্রভৃতি ব্যবহার প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলে। মহম্মদের জামাতা আলীর প্রতি তাহাদের বিশেষ ভক্তি। আলী কল্কী অবতার হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এই তাহাদের বিশ্বাস। পারস্য রাজবংশীয় আগা খাঁ খোজাদের ধর্মগুরু ও আলীর প্রতিনিধি স্বরূপে পূজিত। আগাখানের পুত্র ও উত্তরাধিকারী আগাআলী সা খোজামণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া* সম্প্রতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

* — খৃঃ ১৮৮৬

মুসলমানদের বিবরণ বলিতে গিয়া তাহাদের ইদানীন্তন শোচনীয় দৈন্যদশার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সে দিন যাঁহারা সর্দার জাহাগীরদার সুবেদার সৈনাধ্যক্ষ ছিলেন এইক্ষণে তাঁহারা অধিকাংশ পেয়াদা ও খানসামার কাজে দীনহীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। যাঁহাদের সধর্মীগণ পুরাকালে কাব্য সাহিত্য বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ নাই; কোরাণের দুই পাতা উল্টাইয়াই আপনাদিগকে সর্বশাস্ত্র বিশারদ মনে করেন। অনেকে নিষ্কর্মা উদ্যোগশূন্য; অন্যেরা নির্ধন, অন্নচিন্তায় আকুল। যাঁহারা উহার মধ্যে শ্রীমন্ত তাঁহারা অর্থের সদ্ব্যবহার জানেন না — নিকৃষ্ট আমোদপ্রমোদে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া প্রায়ই ঋণ-জালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এই জাতির উদ্ধারের উপায় কি? তাহাদের দলপতিদিগকে মধ্যে মধ্যে গবর্নমেন্টের নিকট কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে দেখা যায় কিন্তু গবর্নমেন্ট যতদূর করিবার তাহা করিতেছেন। আমি বলি যে হে ভ্রাতৃগণ। তোমাদের নিজের হাতেই তোমাদের মুক্তি। তোমরা আপনাদিগকে আপনারা না সামলাইলে গবর্নমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা বৃথা। তোমরা সরকারী চাকরী লাভের জন্য উৎসুক কিন্তু বিদ্যা ও যোগ্যতা ব্যতীত সরকারী চাকরী আদায় করা যায় না। কুলমর্যাদা ও সুপারিশের বলে এখন কিছুই হয় না। অতএব তোমাদের পুত্রদিগকে বিদ্যাধ্যয়নে নিযুক্ত কর। যদি উচ্চ শ্রেণীর পদকাঙ্ক্ষা থাকে, যদি তোমাদের নষ্ট সম্পত্তির কিয়দংশ ফিরিয়া পাইবার বাসনা থাকে তবে উচ্চশিক্ষা উপার্জনে যত্নশীল হও — ব্রিটিশ রাজ্যে যে উন্নতির পথ হিন্দু-মুসলমান সকল জাতির জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে তাহা অবলম্বন কর — অভীষ্ট সিদ্ধির আর উপায়ান্তর নাই।

পারসী

কিন্তু বোম্বায়ে যে জাতির বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়, যাহার অধিষ্ঠানে বোম্বায়ের বোম্বায়ত্ব বলিলেও বলা যায় সে পারসী জাতি। এ জাতির সংখ্যা সামান্য, সমস্ত হিন্দুস্থানে মিলিয়া ১ লক্ষ হয় কিনা সন্দেহ কিন্তু ইঁহাদের অসামান্য উদ্যম অধ্যবসায় কার্যনিষ্ঠতা ও বদান্যতা গুণে ইঁহারা এদেশীয় জনপদের অগ্রগণ্য তাহার সন্দেহ নাই। পারসীরা যেরূপে এদেশে প্রবেশ লাভ করিল তাহার বৃত্তান্ত এই। সপ্তম শতাব্দীতে পারস্য দেশ মুসলমান জাতি কর্তৃক বিজিত ও তাহার শেষ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইলে পর অবশিষ্ট অগ্নি উপাসক ধর্মনাশভয়ে দেশত্যাগী হইয়া বন জঙ্গল পাহাড় পর্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইরূপে কতক বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়া তাঁহাদের একদল লোক ভারতবর্ষে কাঠেওয়াড় প্রান্তের দিউ নামক বন্দরে আসিয়া অবতীর্ণ হন। তথায় তাঁহারা ঊনবিংশতি বৎসর যাপন করিয়া জনৈক পারসী জ্যোতিষীর পরামর্শে সে স্থান হইতে গুজরাতে প্রস্থান করেন। এই যাত্রীদল সমুদ্রের উপর প্রবল ঝড়তুফানে আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে গুজরাটের অন্তর্গত সঞ্জান নামক স্থানে নির্বিঘ্নে উপনীত হইলেন। সেই প্রদেশ তখন যাদু রাণা নামে এক ক্ষত্রিয় রাজার শাসনাধীন ছিল। যখন পারসীরা যাদু রাণার শরণ করিলেন তখন রাজা তাঁহাদের রীতিনীতি ধর্মাদি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাঁহারা নিজ জাতি-বৃত্তান্ত ষোড়শ সংস্কৃত শ্লোকে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাজার কর্ণগোচর করেন। এই সকল শ্লোক হইতে পারসীদের

আচার ব্যবহার বিশ্বাস ও ধর্ম বিষয়ের কতক আভাস পাওয়া যায়। দেখিবে তাঁহারা "গৌরা ধীরাঃ সুবীরা বহুবল নিলয়াস্তে বয়ং পারসীকাঃ" বলিয়া কেমন গর্বের সহিত আপনাদের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। সূর্য্যং ধ্যায়ন্তি যে বৈ হুতবহম নিলং ভূমিমাকাশ মাদ্যং তোয়েশং পঞ্চতত্ত্বং ত্রিভুবন সদনং ন্যায়মন্ত্রে স্ত্রৈসন্ধ্যং শ্রীহোর্মজদং সুরেশং বহুগুণ গরিমানন্তমেকং কৃপালুং গৌরা ধীরাঃ সুবীরা বহুবলনিলয়াস্তে বয়ং পারসীকাঃ।

আমরা সূর্য, অগ্নি, অনিল, জল স্থল আকাশ পঞ্চভূত ও বহুগুণযুক্ত সুরেশ হোর্মজ্‌দকে ন্যায় মন্ত্র দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান করি। আমরা সেই গৌর ধীর সুবীর বহুবলনিলয় পারসীক।

৩। রম্যং স্বাঙ্গে সুবস্ত্রং কবচগুণময়ং কঞ্চুকং যে ধরন্তি যুক্তামূর্ণাং সুপুষ্টা মহিমুখসমিতাং বন্ধনং সর্ব্বকট্যাং মূধানং চিত্রবস্ত্রৈঃ পটযুগলতলৈ শ্ছাদয়ন্তীহ নিতং গৌরা ধীরাঃ সুবীরা বহুবলনিলয়াস্তে বয়ং পারসীকাঃ।

আমরা স্বদেহে কবচ গুণময় কঞ্চুক, কটিদেশে অহিমুখ রেশমের কটিবন্ধ মস্তকে পট যুগল চিত্রবস্ত্র ধারণ করি;আমরা সেই গৌর ধীর সুবীর বহুবলনিলয় পারসীক।

১৩। ঊর্ণারূপাং সুবর্ণাং সুললিত ফলদাং জাহ্নবী স্নানপণ্যাং মেষাণাং চৈব পুংসাং ঘণগুণরচিতাং হেমবর্ণাঞ্চ রম্যাং নাগাকারাং বিশালাং গুরুজনবচনৈ মেখলাং ধারয়ন্তি শাস্ত্রোক্তাং শ্রোণিদেশে হ্যরুতর জঘনে গৌরধীরাঃ সুবীরাঃ॥

আমরা গুরুজন বচনে শ্রোণি দেশে নাগাকার সুললিত ফলদা সুবর্ণা ঊর্ণা পুণ্য মেখলা ধারণ করি।

১০। বেশ্যাভিনৈর্ব সঙ্গং পিতৃসমশুচিতা শ্রাদ্ধকালে হগ্নিচিন্তা নোমাংসং যজ্ঞবাহ্যং স্বপিতি নহি ধরায়ামহো পুষ্পনারী বৈবাহ্যে লগ্নশুদ্ধি স্ত্বস্তচি নহি মতা ভর্ত্তৃহীনা পুরন্ধ্রী যেষামাচার এবং প্রতিদিন সুদিতো গৌরধীরাঃ সুবীরাঃ॥

বেশ্যাসঙ্গ বর্জ্জন, পিতৃসম শুচিতা, শ্রাদ্ধকালে অগ্নিচিন্তা, যজ্ঞমাংস ভোজন, ঋতুকালে নারীর ধরাশয্যা বর্জ্জন, বিবাহে লগ্নশুদ্ধি, ভর্ত্তৃহীনা পুরন্ধ্রা শুচিমতা এই আমাদের আচার।

১১। চত্বারিংশদ্দিনানি প্রচরতি ন বধূ পাককার্যে প্রসূতা মৌনাঢ্য স্বল্পনিদ্রা জপবিধিনিরতা স্নানসূর্য্যার্চনেষু ধ্যায়স্তে চৈব নিত্যং মরুদনলধরাতোয় চন্দ্রার্ক যজ্ঞং যেষাং বর্ণৈর্নি হীনঃ সততম ভয়তো গৌরধীরাঃ সুবীরাঃ॥

বধূ প্রসূত হইলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পাককার্য হইতে বিরত, মৌনাঢ্য, স্বল্পনিদ্র, স্নান সূর্যার্চনা জপবিধি নিরত, মরুৎ অনল ধরা তোয় চন্দ্রার্ক ধ্যান মগ্ন, সদা অহীনবর্ণ আমরা সেই গৌরধীর সুবীর।

১৬। শ্রীহোর্মজ দেজ্যমুখ্যঃ সকলবিজয়কৃৎ পুত্রপৌত্রেষু বৃদ্ধি দাতা শ্রী পাতু বোয়ং বহুধনফল কৃন্নশ্যতু ক্লেশপাপং তে সর্বে পারসীকাঃ সতত বিজয়ীনঃ শ্রীজয়েচ্চৈব নিত্যং গৌরা ধীরাঃ সুবীরা বহুবলনিলয়ান্তে বয়ং পারসীকাঃ ॥

সেই সকল বিজয়কৃৎ বহুধন ফলদ শ্রী হোর্মজ্‌দ্‌ তোমারদিগকে রক্ষা করুন ও তোমার পাপ তাপ নাশ করুন ইত্যাদি।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন ও তাঁহাদের বাসযোগ্য একখণ্ড ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু এইরূপ অনুমতি দিবার পূর্বে তাঁহাদের নিকট হইতে কতকগুলি কড়ার আদায় করিয়া লইলেন। যথা—

তাঁহারা স্বভাষা ছাড়িয়া দেশভাষা ব্যবহার করিবেন, শস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহাদের স্ত্রীগণ হিন্দু নারীদের বেশ ধারণ করিবে, রাত্রে বিবাহ লগ্ন পরিপালিত হইবে এইরূপ কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে তাঁহারা অগত্যা প্রতিশ্রুত হইলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁহাদের অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহাদের যত্ন পরিশ্রমে ও অঞ্চলের শ্রী ফিরিল। বনজঙ্গল পরিষ্কার হইয়া ফলপুষ্পশোভিত উদ্যান, পতিত ভূমি শস্যশালিনী উর্বরা ভূমিতে পরিণত হইল। এই ঘটনার তারিখ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহা মোটামুটি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সঞ্জানে কিছুকাল বাস করিয়া পারসীরা ক্রমে উত্তর গুজরাটের নওসাড়ী, ভরুচ, খম্বায়ৎ প্রভৃতি স্থানে ব্যবসাদার ও বাসন্দা রূপে ছড়াইয়া পড়িলেন।

ইহার ছয় শত বৎসর পরে আল্লাউদ্দিন বাদশাহের সেনাপতি আলপ্‌ খাঁ সঞ্জান আক্রমণ করেন। সে সময়ে পারসীদের বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রাণার আদেশক্রমে ১৪০০ কবচধারী অশ্বারোহী পারসী সেনা সজ্জীভূত হইল— আর্দ্দেসীয়র পারসী তাঁহাদের নেতা। তাঁহাদের বলবিক্রমে প্রথমে মুসলমান সৈন্য বিপর্যস্ত পারজিত ও তাড়িত হয়। কিন্তু আলপ্‌ খাঁ সহজে ছাড়িবার পাত্র নন, পর দিবসে ভগ্নসেনা একত্র করিয়া পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করেন। সেই যুদ্ধে হিন্দুদের পরাজয়। বীর আর্দ্দেসীয়র বাণাঘাতে হত হইলেন ও সঞ্জান মুসলমানদের হস্তে পতিত হইল। পারসীরা তাঁহাদের সাধের সঞ্জান হইতে নির্বাসিত হইয়া অন্যত্রে বাসস্থান অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইলেন। এইক্ষণে সঞ্জানে একটি মাত্র পারসীরও বসতি নাই — কেবল পারসী শবাগারের ভগ্নাবশেষ তাঁহাদের কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইহার পর শতাব্দী পর্যন্ত পারসী ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের পূতাগ্নি সঞ্জানের অগ্নি মন্দির হইতে নওসাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়।

১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদশাহের আদেশক্রমে পারসীরা নওসাড়ী হইতে তাঁহাদের কতকজন বিচক্ষণ ধর্মযাজক দিল্লীতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা সম্রাটের নিকট পারসী ধর্মের ব্যাখ্যান ও উপদেশ করেন। উদারমতি আকবর তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া পারসী

হুতাগ্নি রক্ষা করিবার অনুমতি করেন ও পারসী গুরুকে নওসাড়ীর নিকটস্থ ভূমিসম্পত্তি উপহার দেন। কথিত আছে যে সম্রাট পারসী ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

ইউরোপীয় জাতির আবির্ভাবের পর হইতেই পারসীদের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত বলিতে হইবে। তাঁহারা দালাল ও মধ্যস্থ হইয়া ইউরোপীয় কুটীওয়ালাদের অনেক কার্য করিতেন। ইংরাজদের সহিত প্রথম হইতেই তাঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বন্ধন হয়। সুরাটের বাণিজ্য হ্রাসোন্মুখ হইয়া যখন বোম্বাই শহর শির উত্তোলন করিতে আরম্ভ করে তখন পারসীরা বোম্বাইয়ে আসিয়া কেহ বাণিজ্য ব্যবসা, দোকানদার কন্ট্রাক্টদারের কাজ, কেহবা পোত নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত হইয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। ব্রিটিশদের রাজ্যবৃদ্ধি ও ব্রিটিশ বণিকদের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পারসীদের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়।

প্রাচীনকাল হইতেই পারসীদের ইংরাজ রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুরাটে যখন ইংরাজ বণিকগণ মোগল কর্তৃপুরুষদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হন তখন রোস্তম মানক নামক একজন পারসী ইংরাজদের প্রতিনিধি স্বরূপে ঔরঙ্গজীবের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বাদশাহের নিকট ইংরাজদের হইয়া দরবার করেন। তাহারও পূর্বে রোস্তমজী দোরাবজী কিরূপে বোম্বাই নগর রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার গল্প বলি শুন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে বোম্বায়ে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মড়ক উপস্থিত হয় তাহাতে অনেক ইউরোপীয় বাসন্দা ও দুর্গরক্ষিণী সেনা কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। এই সুযোগে জিঞ্জিবার হাবসী নবাব মহতী সেনা সমভিব্যাহারে বোম্বাই শহর আক্রমণ করেন, পূর্বেই এই ঘটনার উল্লেখ করা গিয়াছে। দ্বীপ ও কেল্লা নবাবের হস্তগত হয়। ইংরাজরা এই মড়কের উপদ্রবে এরূপ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে হাবসীদের সঙ্গে পারিয়া উঠেন নাই। এই ঘোরতর সঙ্কটে রোস্তমজী রোস্তম-সদৃশ বীরত্ব সহকারে অরিদল বিপক্ষে কটিবদ্ধ হইলেন। ধীবর জাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি আক্রমণকারীদের সহিত যুদ্ধ করেন ও তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। এই জয়লাভের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুরাট কুঠির অধ্যক্ষ বোম্বায়ে আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। একজন পারসীর সাহায্যে বোম্বাই পুরী এক ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল। কেমন অল্প কারণ হইতে গুরুতর কার্য উৎপন্ন হয় এ ঘটনা তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থল। পারসীরা অশেষ বিঘ্নবিপত্তির মধ্যে তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে ও তাঁহাদের বণিজ্যদক্ষতা দানশীলতা ও সার্বজনিক কার্যে উৎসাহবশতঃ তাঁহাদের যশোরব ভারতভূমিতে প্রসারিত হইতেছে।

পারসী ধর্ম

পারসী জাতি সাধারণতঃ অগ্নি উপাসক বলিয়া প্রখ্যাত কিন্তু ঐ সংজ্ঞা তাঁহাদের প্রকৃত সংজ্ঞা বলা যায় না। যে সকল পণ্ডিতেরা পারসী ধর্ম সবিশেষ অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে পারসীরা বাস্তবিক একেশ্বর উপাসক, অগ্নি সূর্যে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ দেখিয়া তাঁহারা ঐ দুই পদার্থে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করেন।

পারসীরা জরতোস্তের শিষ্য ও অনুচর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। জরতোস্তের জন্মকাল নির্ণয় করা সুকঠিন। ডঃ হৌগের মতে নিদান তাহা খৃষ্টাব্দের সহস্র বৎসর পূর্বে নির্দিষ্ট করা অসঙ্গত নহে। আবার এরূপ দেখা যায় যে জরতোস্ত নামধেয় ছয় জন মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন কালে উদয় হইয়াছেন — তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে পারসী ধর্ম প্রবর্তক বলিয়া নির্দেশ করা যায়? যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বলা যাইতে পারে যে এই জরতোস্ত খৃষ্টাব্দের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে পারস্য রাজা গুষ্টাস্পের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার সময়ে পারসী ধর্ম ঘোরতর পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি তাহা সংশোধনে ব্রতী হইয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তিনি যে সকল ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা প্রাচীন ইরানী ভাষায় লিখিত ও তাহার নাম অবস্তা। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে— অবশিষ্ট অল্প ভাগ পারসীদের নিকটে পাওয়া যায় ও তদন্তর্গত মন্ত্রাবলী তাঁহাদের মুখে শ্রবণ করা যায়।

জরতোস্ত

জরতোস্তের উপদেশ এই, ঈশ্বর একমাত্র সর্বশক্তিমান জগতের স্রষ্টা পাতা সর্বসুখদাতা। তিনি জ্ঞানস্বরূপ জ্যোতির জ্যোতি। তিনি পুণ্যের পুরস্কর্তা পাপের শাস্তা। তাঁহার নাম অহুরমজদ। আশ্চর্য এই যে সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক সমস্ত ভাষায় ঈশ্বরের নাম দিব্‌ধাতু (প্রকাশ) হইতে উৎপন্ন— জেন্দ ভাষায় তাহার উল্টা, দেব শব্দে অসুর বুঝায়। ঈশ্বর অর্থে অসুর শব্দের প্রযোগ। বেদ ও অবেস্তার মধ্যে ইন্দ্র মিত্র বৃত্রহা প্রভৃতি কতকগুলি নামের ঐক্য দেখা যায় — যে সকল নাম যে সমান অর্থে ব্যবহৃত তাহা নহে। বেদের দেবতা হয়ত অবস্তায় দানব হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইন্দ্র যিনি দেবাধিদেব, অবস্তায় তিনি দানবেশ্বর অহ্রিমানের নিচেই গণনীয়। আবার আশ্চর্য এই যে ইন্দ্রের অপর মূর্তি বৃত্রঘ্ন অবস্থায় দেবতার মধ্যে গণ্য। দেব সংখ্যাতেও দুইয়ের চমৎকার সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়। বেদের ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবের অনুরূপ অবস্তায় ৩৩ জন "রতু" প্রধান আছেন যাঁহারা জরতোস্ত প্রচারিত অসুর মজ্‌দের সত্য সংরক্ষণে নিযুক্ত। পারসীদের জমসেদ (যমক্ষেত) বেদের যমরাজা — উভয়েরই* পিতৃনাম বিবস্বৎ। বেদে যমরাজার যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা পুরাণের কঠোর বিচারকর্তা দণ্ডদাতা মহিষবাহন রুদ্রানন যমের সঙ্গে কিছুই মেলে না। বেদের যম মানবকুলের আদি পুরুষ, যিনি মর্ত্য হইতে স্বর্গের পথ আবিষ্কৃত করিয়াছেন যে পথ দিয়া তাঁহার বংশজেরা সকলেই গমন করে ও গিয়া তাঁর সেই সুখ রাজ্যে বাস করে। ইরানী গ্রন্থে আছে যমসেদ সত্যযুগের রাজা ছিলেন, প্রজারা তাঁহার রাজ্যে বিগত-রোগ-শোক পরম সুখে বাস করিত।

জগতে মঙ্গল অমঙ্গল দুই আদ্যশক্তি বিদ্যমান তাহারা অহুরমজ্‌দের অধীনে কার্য করিতেছে। মঙ্গল শক্তির নাম স্পেণ্টো মৈন্যুষ তাহাই জ্যোতি ও সৌন্দর্যের আকর, সমুদয় সুখকারী ও হিতকারী বস্তুর প্রসবিতা। আর অমঙ্গল শক্তি — আঙ্গো মৈন্যুষ সকল অমঙ্গলের

* Haug's essays on the Parsis.

— দুঃখক্লেশের জনয়িতা — পাপ চিন্তার প্রবর্তক। স্পেণ্টো মৈন্যুষ জীবনদাতা, আঙ্গো মৈন্যুষ জীবনসংহর্তা — আলোক একের, অন্ধকার অন্যের প্রতিকৃতি। এ উভয়ের শক্তি যদিও পরস্পর বিরোধী কিন্তু দিবারাত্রের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ও সৃষ্টি সংরক্ষণ কার্যে উভয়েই নিযুক্ত।

জরতোস্ত প্রকৃতির শক্তি অথবা পদার্থ বিশেষে দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিবার বিধান দেন নাই সুতরাং তাঁহার ধর্ম পৌত্তলিকতা দোষে দূষিত নহে। সূর্য সেই জ্যোতির্ময় ঈশ্বরের প্রতিরূপ — অগ্নি সেই পবিত্র স্বরূপের প্রকাশক ও স্মরণচিহ্ন বলিয়া অর্চনীয়। কিন্তু মূলে যাহা উন্নত ও পবিত্র তাহার স্রোত কাল সহকারে কলুষিত হইয়া যায় — পারসী ধর্মের অবস্থাও কতক ঐরূপ। জ্ঞানীদের ধর্ম এক, আর অজ্ঞান লোকেরা চিহ্নকে যথার্থ মনে করিয়া লইয়া সূর্যের স্তবে প্রবৃত্ত হয় — অগ্নিমন্দিরে অগ্নিকেই দেবতা রূপে পূজা করে।

জরতোস্তের গ্রন্থ সকল নীতিগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ — তাহার সার তিন কথায় ব্যক্ত হইতে পারে।

হুমাতা, হুখ্‌তা, হুবরষ্টা অর্থাৎ মনোবাক্‌-কার্যে পবিত্রতা রক্ষা করিবে।*

পারসী ভিন্ন ইহুদী পোর্তুগীস প্রভৃতি আর কতকগুলি জাতি বোম্বায়ে দৃষ্ট হয় তাহাদের বিবরণ লিখিবার আবশ্যক নাই। এ দেশের পোর্তুগীসদের মধ্যে বিদ্যা সম্পৎ সম্পন্ন নামাঙ্কিত লোক অল্পই। পোর্তুগীসদের রাজ্যের ভগ্নাবশেষ যে গোওয়া তাহা হইতে অনেক গোওয়ানীস বোম্বায়ে আসিয়া বাস করিতেছে — ইউরোপীয়দিগের রাঁধুনি ও বট্‌লর (খানসামা) এই দল হইতে সংগৃহীত।

* History of the Parsees By Dosabhai Framji

বোম্বাই শহর

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুরশ্রী

অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন বোম্বাই ভাল কি কলিকাতা ভাল শহর। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। কতক বিষয়ে কলিকাতা ভাল — অন্য বিষয়ে আবার বোম্বায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়।

আবহাওয়া

প্রথমতঃ আবহাওয়া। এ বিষয়ে বম্বের নিকট কলিকাতার হার মানিতে হয়। বঙ্গোপসাগরের প্রচণ্ড বাত্যা হইতে বোম্বাই সুরক্ষিত। এখানে এমন সকল প্রকৃতির উপদ্রব নাই যাহার বলে বাড়ী-ঘর চূর্ণ, গাছপালা লণ্ডভণ্ড ও কাকের মৃতদেহে মেদিনী আচ্ছন্ন হইয়া যায়। বোম্বায়ের ঘরবাড়ী সচরাচর যে লঘু উপকরণে নির্মিত এরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহার অর্দ্ধেক ভূমিসাৎ হয় সন্দেহ নাই। গ্রীষ্মকালে বোম্বাই অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমাদের ওখানে উত্তাপের পরাকাষ্ঠা কিন্তু বোম্বায়ে সমুদ্র-বায়ুর গুণে উত্তাপের অনেক উপশম হয়। নভেম্বর হইতে মার্চ পর্যন্ত শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাব। সে সময়ে উত্তর পূর্ব হইতে শীতল বায়ু বহিতে থাকে। তখন বোম্বাই প্রবাস অতীব সুখজনক। রাত্রি শীতল — দিবস অনতি-উষ্ণ ও প্রত্যহ দিবাবসানে সমুদ্র হইতে শীতল বায়ু আসিয়া মৃদু হিল্লোলে বহমান হয়। আকাশ স্বচ্ছ ও নিরভ্র, বৃষ্টির নামগন্ধও নাই। জুন মাসের প্রারম্ভে দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু বৃষ্টি সঙ্গে করিয়া আনে — জুন হইতে সেপ্টেম্বর ধরিয়া বর্ষার রাজত্বকাল। সম্বৎসর গড়ে ৮০ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে। এই প্রচুর বর্ষণ ও সাগর-সান্নিধ্যবশত বোম্বাই পুরী কখনই উষ্ণাতিশয্যে দগ্ধ হয় না। গ্রীষ্মের উত্তাপ কোন সময়েই অসহ্য বোধ হয় না, এমন কি গ্রীষ্ম ঋতুতে পাখার সাহায্য না হইলেও চলে। বর্ষার বারিধারা যদিও প্রচুর কিন্তু এরূপ অবিশ্রান্ত মুষলধারে বর্ষিত হয় না যে তাহার জ্বালায় গৃহ রুদ্ধ রাখিয়া তিতিবিরক্ত হইতে হয় — ইন্দ্রদেব মধ্যে মধ্যে অনুগ্রহ করিয়া ধনুঃসংযত করেন, চলা ফেরার বড় একটা ব্যাঘাত হয় না। সেপ্টেম্বরের শেষে ঝড় বৃষ্টি কমিয়া যায় — অক্টোবরে একেবারেই বর্ষার অবসান। আকাশ পুনরায় নির্মল ভাব ধারণ করে — ধরণী শুষ্ক — প্রকৃতির শোভন হরিত বেশ দেখিতে না দেখিতেই রূপান্তর হইয়া যায়। ক্রমে শীত ঋতুর আগমন। শীতকালই সকল ঋতুর সেরা — তখন লোকেরা অন্যান্য স্থান হইতে বোম্বাই আসিয়া আড্ডা করে। গবর্নর সাহেব ও গবর্নমেন্টের প্রধান কর্মচারীগণ নভেম্বর হইতে মার্চ পর্যন্ত বোম্বাই অধিকার করিয়া বসেন। এই সকল কর্তৃপুরুষেরা ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে বাছিয়া বাছিয়া স্থান পরিবর্তন করেন। গ্রীষ্মকালে মাথেরান কিম্বা মহাবলেশ্বর পাহাড় — বর্ষার সময় পুণা আর শীতকালে বোম্বাই এইরূপ যখন যেখানে সুখ স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা সেইখানে তাঁহারা দিব্য আরামে কালাতিপাত

করেন। নভেম্বর হইতে চার মাস বোম্বাই শহরে গবর্নমেণ্ট বিরাজিত। এ প্রেসিডেন্সির এক সুবিধা এই যে ভাল ভাল স্বাস্থ্যকর স্থান হাতের কাছেই অবস্থিত, রাজধানী হইতে দু-এক দিনের ব্যবধান মাত্র। পুণা বোম্বাই হইতে ৫, ৬ ঘণ্টার রেলের পথ, মহাবলেশ্বর পুণা হইতে এক রাত্রের মধ্যে পৌঁছান যায়। কলিকাতা হইতে সিমলার পাহাড়, যেমন দূর পাল্লা এখানে সেরূপ নয়। কর্তৃপুরুষদের দৃষ্টান্তে অন্যান্য লোকও পার্বত্যাশ্রমে গ্রীষ্মকাল ও পুণ্য-তীর্থে বর্ষার চতুর্মাস যাপন করেন। বম্বের নীচেই পুণা এ অঞ্চলের রাজধানী।

প্রকৃতি-শোভা

দ্বিতীয়তঃ, বম্বের প্রকৃতির শোভা — প্রশংসনীয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে দুই প্রধান উপকরণ পাহাড় ও সমুদ্র, তাহা বোম্বায়ে বিদ্যমান। একদিকে মালাবার শৈল, অন্যদিকে সমুদ্রতীরস্থিত বন্দর-নিকর। সমুদ্র তটবর্তী যে সকল স্থান কতক বৎসর পূর্বে ময়লার খনি দূষিত দুর্গন্ধ বায়ুর আবাস ছিল এক্ষণে তাহা পরিষ্কৃত প্রশস্ত সুন্দর ভ্রমণপথে পরিণত হইয়াছে। পদব্রজে ভ্রমণ ও অশ্বারোহণের সুবিধার সীমা নেই। কলিকাতার ধূলি দুর্গন্ধময় সঙ্কীর্ণ পথ-ঘাট ছাড়িয়া একবার এই সমুদ্রতীরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন কব — এ দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিবে। যদি বোম্বাই দ্বীপ ও বন্দরের নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিবার বাসনা থাকে তবে সমুদ্রধারের রাস্তা দিয়া মালাবার শৈলে আরোহণ কর — তথাকাব সর্বোচ্চ শিখর হইতে একবার চৌদিকে চাহিয়া দেখ। দেখিবে, সাগর দ্বীপ গিরি কানন, বন্দরের জাহাজ শ্রেণী, নগরের গৃহাবলী মিলিত শোভন দৃশ্য তোমার সম্মুখে প্রসারিত। যখন অস্তোমুখ দিনকর কিরণে এই দৃশ্য সমুজ্জ্বলিত হয় তখন তাহার শোভা অতি চমৎকার। পশ্চিমের আকাশ চিত্রবিচিত্র মেঘজালে রঞ্জিত — নীচে উপসাগরের শাখাদ্বয় কনকবিম্বে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে তাহার ক্রোড়ে মুম্বা-পুরী শয়ান — সাগর-বক্ষে দ্বীপপুঞ্জ ভাসমান; বন্দরে নোঙর-বদ্ধ নানা জাতীয় তরণী, কখন বা এক নৌকা পালভরে চলিয়াছে। স্থলে নারিকেল বৃক্ষরাজি মধ্যভাগে তরুরাজির অভ্যন্তরে বিরাজিত সুরাগরঞ্জিত হর্ম্যাবলী — দূর হইতে তাহার সকল দোষ ঢাকিয়া গিয়া একাকারে এক অপূর্ব শোভা প্রকাশিত। প্রান্তভাগে কোঙ্কনের পর্বতশ্রেণী, সর্বোপরি শুভ্র নীল আকাশ। এখন মনে কর দিনমণি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া গেলেন — সে দ্বীপ পর্বত জাহাজ শ্রেণী ছায়ায় বিলীন হইল। সে লোহিত পীত স্বর্ণ বর্ণের দৃশ্য আর নাই। কি আশ্চর্য পরিবর্তন। আর এক নূতন জগৎ, নূতন বাজ্য আবিষ্কৃত। নিশানাথ তাঁহার শুভ্র কিরণজাল বিস্তার করিয়া গগনমণ্ডলে উদ্রিত — জলস্থল ক্রমে রজত-রঞ্জনে রঞ্জিত হইল। এই সুস্নিগ্ধ বিমল জ্যোৎস্নাতে সমুদ্র-ভ্রমণে কি আরাম। আইস, বন্দরে গিয়া আমরা এক নৌকা করিয়া মাঝিদের গান শুনিতে শুনিতে খানিক দূর বেড়াইয়া আসি, তুমিও তান ছাড়িয়া দিবে—

ভাসিয়ে দে তরী তবে
সুনীল সাগর পরি,
বহিছে মৃদুল বায়,
নাচিছে মৃদুলহরী।

তৃতীয়তঃ বোম্বাই শহর কলিকাতার তুলনায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার বিশ্বাস এই যে বোম্বাই ম্যুনিসিপালিটি তোমাদের অপেক্ষা স্বাধীন, সারবান ও তেজস্বী।

ম্যুনিসিপ্যালিটি

বোম্বাই ম্যুনিসিপাল সভার সভ্য সবশুদ্ধ ৬৪ জন। তন্মধ্যে ১৬ জন গবর্নমেণ্ট নিযুক্ত করেন — ১৬ জন শান্তিরক্ষক জাষ্টিসগণ কর্তৃক নির্বাচিত ও অবশিষ্ট ৩২ জন করদাতা প্রজাবর্গ কর্তৃক নির্বাচিত। এই সাধারণ ম্যুনিসিপাল সভা হইতে এক বিশেষ পৌরসভা (Town Council) মনোনীত হয়। তাহার সভ্য ১২ জন — সভাপতি সমেত চারজন গবর্নমেণ্টের নিযুক্ত ও আটজন সাধারণ সভার হস্তে আর কতকগুলি বিশেষ সভার হস্তে সমর্পিত।

পৌরসভা ম্যুনিসিপাল সভার মন্ত্রী স্বরূপ। যে সকল কাজে অর্থব্যয় প্রয়োজন, ১২ জন বাছা বাছা লোক তাহার পর্যালোচনায় নিযুক্ত ও তাহার মধ্যে যে সকল প্রস্তাব তাঁহারা সারগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন তাহাই সাধাবণ সভার সমক্ষে উপস্থিত কবেন। আমার বোধ হয় এইরূপ কার্য নির্বাচনের অভাবেই কলিকাতা ম্যুনিসিপালিটির এমন দুর্দশা। Town Council -এর অনুরূপ খোসা ও জঞ্জাল বাছিয়া ফেলিবাব কল প্রস্তুত করিলে কি ভাল হয় না?

এই ম্যুনিসিপাল তরীর কাণ্ডারী হচ্ছেন ম্যুনিসিপাল কমিশনর। ইনি একজন উচ্চবেতনভুক্ গবর্নমেণ্টের কর্মচারী। ম্যুনিসিপাল বন্দোবস্তের সমস্ত ভার ইহার হস্তে। ইহাঁর কর্তৃত্ব অপার কিন্তু তাই বলিয়া একাধিপত্য নাই। একদিকে যেমন তাঁহার অধিকার অন্যদিকে তেমনি তাঁহার দায়িত্ব। তাঁহার অধিকার ও ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে পারে না কেননা তাঁহাকে সাধারণ ও বিশেষ সভার অধীনে সাবধানে কাজ করিতে হয়। প্রতি বৎসর কমিশনব পৌরসভার সমক্ষে আগামী বর্ষের ব্যয়ের এস্টিমেট উপস্থিত করেন। তাহা সমালোচিত হইয়া কমিশনরের সাহায্যে এক বাজেট প্রস্তুত হয়। পৌরসভার সভাপতি সেই বাজেট সাধারণ সভার অধিবেশনে আনয়ন করেন। সাধারণ সভা হয় তাহা মঞ্জুর করেন, আপত্তিজনক হইলে কোন ভাগ অগ্রাহ্য করেন অথবা পুনর্বিচার ও সংশোধনের জন্য পৌরসভার নিকট ফেরৎ পাঠান হয়। কয়েক বৎসর আয়ব্যয়ের হিসাব দৃষ্টে বম্বে মিউনিসিপালিটির আয় মোটামুটি ৪০ লক্ষ টাকা* বলা যাইতে পারে। ক

উল্লিখিত বিবরণ হইতে প্রতীত হইবে বোম্বাই ম্যুনিসিপালিটিতে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র উভয়েরই সদগুণ পুরবাসীদিগের দৃষ্টান্তস্থল তাহার সন্দেহ নাই। কথিত আছে যে লর্ড রিপন যখন প্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন তখন বোম্বাই ম্যুনিসিপালিটির সুব্যবস্থার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে ও তদ্দর্শনে তাঁহার মনে এদেশে স্বায়ত্তশাসন-প্রণালী প্রবর্তন-সংকল্প উদয় হয়।

এইক্ষণকার ম্যুনিসিপাল আইন পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়া এক নূতন আইন হইবার প্রস্তাব চলিতেছে — তাহাতে পৌরসভার সুশ্রাব্য ও ওজস্বী নামের পরিবর্তে standing committee নাম অনুমোদিত হইয়াছে শুনিতে পাই।

কলিকাতার ম্যুনিসিপাল কার্য-প্রণালীর ভিতরে অবশ্য কোন গোল থাকিবে something rotton in the state of Denmark নতুবা ছোট লাট সাহেব* তাহার কার্য সমালোচনার জন্য কমিশন বসাইতে ব্যগ্র হইতেন না।

কলিকাতার উৎকৃষ্ট ভাগ চৌরঙ্গী অঞ্চল — সে ত গেল ইংরাজ পাড়া। তোমাদের ওদিকে যেমন ইংরাজ পাড়া বাঙ্গালী পাড়া স্বতন্ত্র এখানে ঠিক সেরূপ নয়। মালাবার শৈল বল, সমুদ্রতীর বল, সর্বত্রই দেখিবে দেশী ও বিদেশী বাসগৃহ একত্রিত। সে যাহা হউক, এই দুই শহরের বিবাদভঞ্জন করিতে হইলে উভয়ের দিশি পাড়ার মধ্যে পরস্পর তুলনা করিয়া দেখা উচিত। দিশি পাড়া অর্থাৎ যেখানে সাধারণতঃ দেশীয়দিগের বাস — ইংরাজদের বসতি প্রায় নাই। এইরূপ তুলনা করিলে আমার মতে বম্বের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। কলিকাতা যদিও এক বৎসর মধ্যে শ্রী ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তর উন্নতি লাভ করিয়াছে তথাপি এ বিষয়ে তাহাকে বম্বের সমকক্ষ বলা যায় না। বোম্বায়ের দিশি পাড়ার ঘরবাড়ীগুলি রংচঙে — লাল নীল হরিত পীত — দেখিতে সুন্দর — রাস্তাঘাটগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জনতার মধ্যেও বিস্তর প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। পুরুষদের অপেক্ষাকৃত ভদ্র বেশ ও কুলনারীগণ রঙিন বসনভূষণে বাহির হইয়া নগরীর শোভা সম্পাদন করে। রাত্রে ঘরে দোকানে দীপালোক — রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো — স্থান বিশেষে তাড়িতালোকের বাহার প্রত্যক্ষ হয়। ঐ সম্মুখে বাদ্যের ঘটা, আলো, লোকের ভীড় — কি দেখা যায়? এক বিবাহের যাত্রী দল আসিতেছে সরিয়া দাঁড়াও। প্রথম, মশাল হস্তে কতকগুলি বালক তাহাদের পশ্চাৎ উজ্জ্বল বেশভূষায় ভূষিত একদল স্ত্রীলোক। অনন্তর জ্বলন্ত মশালপরিবৃত বালকবালিকা বরকন্যা, সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে অলঙ্কারভরে অবনত। বধূবরের চতুর্দিকে প্রাসাদ উদ্যানের চিত্রাবলী, দম্পতির ভবিষ্যৎ সুখসৌভাগ্যের কল্পিত প্রতিমা, লোক-স্কন্ধে সম্বাহিত।

বোম্বায়ের তবে কি সবই ভাল — কলিকাতার সকল বিষয়েই হার? আমি তা বলি না।

* ১৮৮২ আয়ব্যয়ের হিসাবে যে দুই সালের বাজেট এস্টিমেট প্রকাশিত হয় তাহা এই :

আয় — ১৮৮১ — ৩৯,১৯,২৫০ টাকা। ১৮৮২ — ৩৮,২২,২৫০।

ব্যয় — ১৮৮১ — ৩৪,৭৬,২২৫। ১৮৮২ — ৩৭,৩৫,৬৫০।

১৮৮৬-৮৭ আয়ব্যয়ের হিসাব।

আয় — ৪৫,৩২,৯৫০।

ব্যয় — ৪২,৯৫,৯৫০।

Φ গত বর্ষের আয় ৫০ লক্ষ টাকা।

* Sir Rivers Thomson.

বোম্বাই শহর

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাণিজ্য

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ইডেন পার্ক কিম্বা কোম্পানির বাগানের মত বাগান বোম্বায়ে নাই — আর গঙ্গার মত নদীও নাই। এখানকার প্রধান নগরোদ্যান যে ভিক্টোরিয়া উদ্যান তাহা যৎসামান্য। তাহার মধ্যে একটি যাদুঘর আছে তাহাও কোন কার্যের নয়। কলিকাতার ম্যুজিয়মের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। ভিক্টোরিয়া উদ্যানে হরিণ ব্যাঘ্র ভাল্লুক বানর প্রভৃতি কতকগুলি পশু ধরিয়া রাখা হইয়াছে কিন্তু সে পশুশালার নাম মাত্র। আলিপুরের পশুশালার মত স্থান বোম্বায়ে নাই। কিন্তু তেমনি আবার এখানকার জৈনেরা বলিতে পারে "কলিকাতায় একটিও পশুর হাসপাতাল নাই — কি লজ্জা। বম্বের দেখা দেখি এখন হঠাৎ আমাদের চৈতন্য হইল।" এই হাসপাতালকে "পিঞ্জরাপোল" বলে। রুগ্ণ কানা খোঁড়া অকর্মণ্য অশ্ব গো মেষ মহিষাদি জন্তুগণ যাহারা পীড়া বার্ধক্যবশত মানুষের কোন কাজে আসে না — ইংরাজেরা হইলে যাহাদিগকে গুলি করিয়া মারে সেই সকল জন্তু ইহার মধ্যে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হয়। ইহারা বিনা পরিশ্রমে আহার পান পাইয়া পেন্সনজীবীর ন্যায় দিব্য আরামে জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করে।

উদ্যান, যাদুঘর

বোম্বায়ের লোকেরা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা বাণিজ্য ব্যবসা কার্যে সুদক্ষ। বাঙ্গালার ধনসম্পত্তি ভূমিতে আবদ্ধ। বোম্বাই অঞ্চলে ভূমির তেমন মূল্য নাই কেননা এ প্রদেশে ভূমি সম্পর্কীয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত নাই। এখানে রাইয়তওয়ারী বন্দোবস্তে প্রজার নিজ পরিশ্রম বিনা অন্য কারণজাত জমির উন্নতি, জিনিসের দর বৃদ্ধি ইত্যাদি কতকগুলি কারণানুসারে ৩০ বৎসর অন্তর রাজস্ব-পরিবর্তনের নিয়ম আছে — সরকারী খাজানা দিয়া রাইয়তের হাতে সম্ভবত এত অল্প লাভ অবশিষ্ট থাকে যে ভূমি লাভের প্রতি লোকের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। বোম্বায়ে বাণিজ্যই ধনোপার্জনের প্রধান সোপান "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" একথা বোম্বাইবাসীরা ভাল বুঝে। সপ্তদশ শতাব্দীতে সুরাট পশ্চিম ভারতের প্রধান বাণিজ্যালয় ছিল। ইউরোপের সহিত এদেশীয় বাণিজ্য কারবার সুরাট বণিকদের হস্তে নিহিত ছিল। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের কুঠি, সুরাট নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরাট হইতে বাণিজ্যস্রোত ক্রমে বোম্বায়ে বিবর্তিত হইল। মোগল রাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে সুরাটের ভাগ্যলক্ষ্মী ম্লান ও মুম্বাপুরী উন্নতি সোপানে আরূঢ় হইল। এই শ্রীবৃদ্ধি লাভের অনেগুলি কারণ আছে। ইংলণ্ডের সান্নিধ্য — প্রশস্ত সুন্দর বন্দর — পোত নির্মাণ ও সংরক্ষণের সুবিধা ইত্যাদি কারণে বোম্বাই শীঘ্রই নদীতীরবর্তী সুরাট পুরীকে অতিক্রম করিয়া উঠিল। সেকালের আমদানী রপ্তানী এখানকার সহিত তুলনা করিলে বাণিজ্যের কি প্রভূত উৎকর্ষ উপলব্ধি হয়। ১৬৬৮-তে ইংলণ্ড হইতে

বাণিজ্য ব্যবসা

সুরাট

ছয় খানা জাহাজ এক লক্ষ ৩০০০০ পৌণ্ড মূল্যের বিবিধ দ্রব্য লইয়া সুরাটে উপস্থিত হয় — পর বৎসরের আমদানীর দাম ৭৫০০০ পৌণ্ড। ১৬৭২-এ ৪ জাহাজ ১৮০০০ পৌণ্ডের মাল ও মুদ্রা লইয়া আসে, ১৬৭৩-এ ১০০,০০০ পৌণ্ডের মাল ও পয়সা সমানীত হয়। তখন রপ্তানীর মধ্যে নীলের খুব আদর ছিল তদ্ভিন্ন এদেশ হইতে মরীচ, সোরা, হীরা, তুলা, রেশম ও সুতার কাপড় ও নানা প্রকার ঔষধীয় সামগ্রী ইংলণ্ডে রপ্তানী হইত। মূল্য সর্বশুদ্ধ বড় জোর বিশ লক্ষ টাকা হইবে। ১৭০৮ হইতে বিশ বৎসরের বাণিজ্যের হিসাব হইতে দেখা যায় এদেশে বার্ষিক আমদানীর মূল্য (সোনারূপা সমেত) ৬৩৪,৬৩৮ পৌণ্ড। রপ্তানী রেশম, হীরা, সোরা, মরীচ প্রভৃতি মিলিয়া ৭৫৮,০৪২। ইহার সহিত সম্প্রতিকার বাণিজ্য হিসাবের তুলনা করিয়া দেখ। Moore সাহেবকৃত গত বর্ষের * বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বাণিজ্য বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বোম্বায়ের সমুদায় সমুদ্রপথের বাণিজ্য ৮৪,১৩,১৪০০ টাকা, পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ৭৭ লক্ষ অধিক। বিদেশীয় আমদানী প্রায় ৩২ কোটি ২০ লক্ষ, রপ্তানী প্রায় ৩৪ কোটি, আমদানীর দুই তৃতীয়াংশেরও অধিক গ্রেট-ব্রিটেন হইতে আগত। অন্যান্য দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে ইংলণ্ডের অনিষ্ট-সাধন বিশেষ কিছু দৃষ্ট হয় না। ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশ হইতে এদেশের বাজারে অনেক জিনিস জমা হয় বটে কিন্তু তাহা ব্রিটিশ আমদানীর তুলনায় যৎসামান্য। চীনের আমদানী মন্দ নয় — ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৩৬ হাজার। তার এক কোটিরও অধিক স্বর্ণরৌপ্য ছাড়িয়া দিলে রেশম সুতার বস্ত্র, চা ও চিনি মিলিয়া প্রায় এক কোটি অবশিষ্ট থাকে।

রপ্তানী সর্বশুদ্ধ ৩৩,৯৮,২৫০০০ টাকা, ইহার প্রায় তৃতীয়াংশ ব্রিটেনের ভাগ্যে গিয়া পড়ে।

বোম্বাই তুলার ব্যবসার-জন্য প্রাচীন কাল হইতে প্রখ্যাত। এখানে ভারতের নানা স্থান হইতে তুলা আসিয়া বস্তাবন্দী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়। এক সময়ে বোম্বাই হইতে চীনদেশে অনেক তুলা রপ্তানী হইত। এখন তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ মহারাষ্ট্রী যুদ্ধের সময় তুলার ব্যবসা বন্ধ হওয়া, এ কারণে ও তুলার কারবারে অনেক জুয়াচুরি ধরা পড়িবার দরুন চীনেরা আপনাদের দেশে তুলার চাষ আরম্ভ করে। সেই অবধি বোম্বাই হইতে চীনে তুলা রপ্তানীর হ্রাস দেখা যায়। ১৮০৫ পর্যন্ত কোন কোন বর্ষে চীন দেশে ৩ কোটি পৌণ্ড ভার, ৬০ লক্ষাধিক টাকা মূল্য তুলার রপ্তানী হইত, এইক্ষণে বার্ষিক রপ্তানী ওজনে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ পৌণ্ড।

তুলা

১৮১৩ পর্যন্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল। অন্য কেহ বাণিজ্য ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হইতে গেলে কোম্পানির পরওয়ানা আবশ্যক হইত, বাণিজ্যের উপর এই শৃঙ্খল ভাঙিয়া যাইবার পর অবধি তাহার প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত। বোম্বায়ে তুলার ব্যবসার

---

* ১৮৮৪।৫৭

উত্তরোত্তর উন্নতিতেই মুক্ত বাণিজ্যের ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। আমেরিকার যুদ্ধের সময় ঐ ব্যবসা বিশেষরূপে উত্তেজিত হয়। ১৮৬১ হইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসর আমেরিকানদের খরা ও যুদ্ধের দরুন সে দেশ হইতে তুলার আমদানী বন্ধ হওয়াতে বম্বের সৌভাগ্য-সূর্য উদয় হইল, তুলার বাজার এমনি চড়িয়া উঠিল যে ঐ কয়েক বৎসরের মধ্যেই বম্বের লোকেরা নিদান ৭,৮ কোটি মুদ্রা উপার্জন করে। টাকা হইলে তাহা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয় — সকলে সুলভ উপায়ে ধনোপার্জনে মত্ত হইয়া উঠিল, কত ব্যাঙ্ক কত অর্থকরী অনর্থকরী কোম্পানী ভেকছত্রের ন্যায় জন্মধারণ করিল তাহার সংখ্যা নাই। অন্যান্য অর্থোপার্জনের ফন্দীর মধ্যে 'ব্যকবে' আবাদের এক প্রস্তাব মস্তক উত্তোলন করিল। ব্যাক্‌বে উপসাগরের তীরভূমি সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া তাহা বাসগৃহের উপযোগী ও অন্য আবশ্যকীয় কার্যে প্রযুক্ত করা ঐ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। লোকে ভাবিল বোম্বায়ে জমির মূল্য ত্রিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে — দ্বীপের মধ্যে বাসোপযোগী ভূমি দুর্লভ, এ সময়ে ভূমি লাভে না জানি কতই লাভ — প্রত্যেক কাঠা জমির মূল্য ততটা সোনার দর প্রতীয়মান হইল। একটি কোম্পানী উঠিয়া এই কার্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। — ব্যাকবের শেয়ার বিক্রী তাহার কাজ। শেয়ার কেনাবেচা এই এক রোগ জন্মিল। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই শেয়ার কিনিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল। যে দরিদ্র সে এক রাত্রির মধ্যে ধনী হইবে — যার সচ্ছল অবস্থা সে লক্ষপতি — যে লক্ষপতি সে ক্রোড়পতি হইবে — সকলেই সহজ উপায়ে টাকা করিতে তৎপর। বড় বড় ইংরাজ কর্মচারীরাও এই সংক্রামক রোগের হস্ত এড়াইতে পারেন নাই — টাকা করিয়া দেশে পাড়ি দিতে পারিলে হয় — না হয় কর্ম গেল তাহাতে ক্ষতি কি?

শেয়র মেনিয়া

এই রোগ শুধু যে ব্যাক্‌বে শেয়ারের ব্যাপারেই বদ্ধ তাহা নহে। ব্যাক্‌বের তীরের সমতুল্য মূল্যবান জমি অথবা তদপেক্ষা আরো কত অমূল্য ভূমি বোম্বায়ের স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে— মাজেগাম সিউরী প্রভৃতি তীরদেশও উৎকৃষ্ট বন্দরে পরিণত হইতে পারে। এইরূপে নানান ফন্দী বাহির হইল। যে কোন ফন্দী বাহির হয়, তাহার পোষকতা ও প্রচার উদ্দেশে আনুষঙ্গিক এক এক Financial সমাজ। তারপর যখন বোম্বায়ের ভূমি ভাণ্ডার শূন্য হইল — ভূ-কোম্পানির গ্রাসোপযুক্ত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই — তখন এক নূতন মড়ক আসিয়া উপস্থিত। পোর্ট ক্যানিঙের ব্যাপার তোমার মনে থাকিতে পারে। অর্থনাশের আর এক সুগম পথ আবিষ্কৃত হইল। অন্যান্য কোম্পানির উপর পোর্ট ক্যানিঙ কোম্পানি আসিয়া বোম্বাই বণিকদের ভাণ্ডারে যাহা কিছু বাকি ছিল যথাসর্বস্ব হরণ করিয়া লইল।

আমেরিকার যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। যেমন উত্থান তেমনি পতন। তুলার দাম যেমন চড়িয়াছিল তেমন উতরিয়া গেল। অনেক বড় বড় কুঠি ফেল হইল। সে যে হুলুস্থুল বাধিয়া গেল তাহা বর্ণনাতীত। সকলেই জানিতে পারিল এই সকল অশেষ কোম্পানির মূলধন কেবল কাগজ মাত্র — কেবল শেয়ার লইয়া ইহাদের মৌখিক কারবার।

বিপদের সময় দেখা গেল তাহাদের কিছুমাত্র সম্বল নাই — এই অর্জন-স্পৃহার প্রকাণ্ড ইমারত তাসের দুর্গের ন্যায় এক ধাক্কায় চুরমার হইয়া গেল। তখন লোকের চোখ ফুটিল। দেখিতে পাইল যে তাহারা যে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে তাহার কোন মূল্য নাই, যে মাটি সে মাটিই রহিল, সোনায় পরিণত হইল না। বাণিজ্য সম্বন্ধে লোকসান অন্যত্র ঘটিয়া থাকে কিন্তু ১৮৬৪-এ বম্বের যে দুর্দশা তাহার তুলনা পাওয়া ভার। শহর জাদা-নাম, লক্ষপতি, ক্রোড়পতি একে একে নিঃসম্বল হইয়া ধুলায় পড়িয়া গড়াগড়ি। এই শেয়ার সাগর মন্থনে যে সমস্তই লোকসান — একেবারেই লাভের উৎপত্তি হয় নাই তাহা বলা যায় না। মন্দ হইতে বিধাতা অনেক সময় মঙ্গলের জয় সাধিয়া লন। এই ধাক্কায় অনেক তীরদেশ উদ্ধার — অনেক বড় বড় ইমারত নির্মাণ — সুরম্য সুগম্য রাজমার্গ উন্মোচন প্রভৃতি কার্য অনুষ্ঠানে নব্য বম্বের পত্তন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তুলার কারখানা

বোম্বাই শুধু তুলার বাজার বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে, তাহার বিশেষ গৌরব এই যে তথায় তুলার কারখানা হইতে সুতা ও কাপড় প্রস্তুত হইয়া দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হইতেছে। এই সকল তুলা ও কাপড়ের কলে বোম্বাই শহর সমাকীর্ণ। তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। মিল কর্তাদের সমাজ (Mill owner association) কর্তৃক যে বার্ষিক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে সমুদায় ভারতবর্ষে সর্বশুদ্ধ ৮৭ তুলার কল আছে। তন্মধ্যে বম্বে প্রেসিডেন্সিতে ৬৮, * বম্বে ও আশপাশে ৪৯, ও মফস্বলে ১৯। এই সকল মিলে কাজ করিয়া সর্বশুদ্ধ প্রায় ৫১০০০ লোকের উদর পোষণ হয়। তন্মধ্যে বোম্বাই ও শহরের প্রান্তবর্তী মিল-সমূহে প্রায় ৪২০০০ লোক নিযুক্ত। এই সকল মিলের তত্ত্বাবধানের জন্য প্রত্যেক কারখানায় একজন ম্যানেজার ও তদ্ভিন্ন একজন Weaving master, একজন Spinning master, এঞ্জিনিয়র ও অন্যান্য সুনিপুণ কারিগর নিযুক্ত। অধিকাংশ মিলের ম্যানেজার ইংরাজ। ৩০০ টাকা ৫০০ টাকা পর্যন্ত তাহার বেতন। কোন কোন মিলে দেশী ম্যানেজারও নিযুক্ত দেখা যায়। দেশী লোকদিগকে নিযুক্ত করিলে কত অল্প ব্যয়ে কার্য নির্বাহ হয় তাহা অনেকেই অবগত আছেন ও সুবিধা বুঝিয়া মিলের কর্তৃগণ ক্রমে এ বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন। অনেক মিলে দেশী আপ্রেন্টিস রাখিয়া কাজ শেখাইবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এখানে যদিও শ্রমজীবীদের বেতন অল্প তথাপি জিনিস তৈয়ারির খরচ ইংলণ্ড অপেক্ষা অল্প নয় তাহার কারণ এখানকার লোকেরা তেমন ভাল করিয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতে অক্ষম। একটা মধ্যমাকৃতি মিল ১৫ লক্ষ টাকা মূলধনে স্থাপিত হইতে পারে — তাহাতে ৪০০০০ স্পিণ্ডল্ ৬০০ লুম ও গড়ে

এই তালিকা ১৮৮৫ অব্দের — ১৮৮৬-এ মিল সংখ্যা ৭০। ১৮৮৭-এ মিলসংখ্যা ৭৫।

প্রাত্যহিক মজুর নিযুক্ত।

১৮৮৬ — ৫৪,১৭৯।

১৮৮৭ — ৫৪,৭১৫।

১০০০ লোক (১০০ বালক ১০০ স্ত্রীলোক ও ৮০০ পুরুষ) খাটে। এইরূপ মিলে শ্রমজীবীদের বেতনে মোটামুটি ১৩০০০ টাকা মাসিক ব্যয় ও ইহা হইতে মাসে ১ লক্ষ সের ওজন কাপড় উৎপন্ন হইতে পারে। তাই বলিয়া মনে করিও না যে কাপড়ের বাষ্পীয় কলকারখানার সৃষ্টি হওয়াতে হাতের চরখার ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়াছে। এই প্রেসিডেন্সির প্রধান প্রধান গ্রামে তুলা হইতে সুতা ও কাপড় হাতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু সে সকলি প্রায় মোটা কাপড়, ঢাকাই মলমল কিম্বা শান্তিপুরে ধুতির মত সূক্ষ্ম কাজ নয়। তৈয়ার হইবার পর অথবা চরখা হইতে নামাইবার পূর্বেই সেই সকল কাপড়ের উপর রং চড়ান হয়। উত্তর গুজরাতে লাল রং সকলের পছন্দ — দক্ষিণ গুজরাত ও মহারাষ্ট্র দেশে লাল হলদের সঙ্গে নীল ও সবুজ বর্ণেরই সমাধিক প্রাদুর্ভাব। আর এক বিষয়ে মহারাষ্ট্রী ও গুজরাটীদের রুচিভেদ দৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্রীরা ছাপওয়ালা সুতার কাপড় প্রায়ই ব্যবহার করে না, গুজরাত ও কাটেওয়াড়বাসীদের তাহাই পছন্দসই। দেশীয় স্ত্রীলোকদের রং করা কাপড় ভিন্ন সাদা সুতার শাড়ী মনোনীত নহে।

চরখা

বোম্বায়ে শাড়ী-ছাপওয়ালা অনেক তাঁতির বসতি ও বোম্বেমিলের কাপড় এই সকল তাঁতির হস্তে রঙিন হইয়া দক্ষিণ কোঙ্কণ প্রভৃতি প্রদেশে প্রেরিত হয়। কিঙ্খাব ও জরির রেশমী কাপড় নিজ বোম্বায়ে অল্পই প্রস্তুত হয়। অহমদাবাদ ও সুরাট কিঙ্খাবের জন্য প্রখ্যাত। পুণা, নাসিক, যেওলা প্রভৃতি স্থানেও ভাল ভাল জরির কেনারীবিশিষ্ট ফুলকাটা শাড়ী প্রস্তুত হয়। বোম্বায়ের দোকানে যে সকল রেশমী শাড়ী দেখা যায় তাহার অধিকাংশই চিনাই রেশম ও পারসী স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য।

জরি কিঙ্খাব

এ অঞ্চলে উচ্চ শ্রেণীর মাটির জিনিস তৈয়ার হয় না। সচরাচর যে ঘটিবাটি-কলস দেখা যায় তাহাতে চিনাই বাসনের মত চাকচিক্য নাই। সিন্ধদেশে এই সকল দ্রব্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, কুম্ভকারের কারুকার্য সে দেশে যে কি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল সেখানকার প্রাচীন মসজিদ ও গোরগৃহে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মৃত্তিকার উপর চাকচিক্য করিবার কৌশল সিন্ধী কুম্ভকার হইতে বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে তথাপি এইক্ষণে কাজ তেমন সুন্দর হয় না — জিনিসও তত ভাল পাওয়া যায় না। বম্বে শিল্প বিদ্যালয়ে দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধনের যে চেষ্টা হইতেছে তাহা হইতে এই নষ্ট কলা আমাদের পুনরায়ত্ত হইবে এইরূপ আশা করা যায়।

মাটির কাজ

শিশম কাঠের উপর নক্সাকাটা গৃহদ্রব্য নির্মাণের জন্য বোম্বায়ের বিশেষ খ্যাতি। বোম্বাই কারিগরের নির্মিত কাঠের পরদা, টীপাই, ডেস্ক প্রভৃতি শিল্পনিপুণ সুন্দর দ্রব্য সকল প্রশংসার যোগ্য। অহমদাবাদ ও সুরাটে এইরূপ কাঠের সুচারু নক্সার কাজ দেখা যায়। চন্দন শিশম কাষ্ঠ এবং হাতির দাঁতের উপর কারুকার্য বোম্বাই ও সুরাটে প্রচলিত কিন্তু কর্ণাটকের কারিগরেরা চন্দন কাষ্ঠের উপর যেমন সুন্দর নক্সার কাজ করে তেমন কোথাও হয় না।

কাঠের কাজ

বোম্বায়ের কাপড়ের মিলের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আয় ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। আমার বোধ হয় এক্ষণে আর নূতন মিল খুলিবার আবশ্যক নাই, নূতন বাজার খুলিবার প্রয়োজন। চীন পারস্য জাঞ্জিবার প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্র পড়িয়া আছে যেখানে এ দেশের মিলের জিনিস প্রবিষ্ট হইলে বিস্তর উপকার দর্শে। নূতন মিল নির্মাণ করিবার পূর্বে এই সকল স্থানে নূতন বাজার খুলিবার বিহিত উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। বোম্বায়ে কাপড়ের মিলের যেমন ছড়াছড়ি সে পরিমাণে অন্যবিধ কলকারখানা দৃষ্ট হয় না। একটি ছোটখাট কাগজের মিল আছে তাহাতে সাধারণ হিসাবপত্র রাখিবার ও জিনিসপত্র বাঁধিবার উপযোগী মোটা কাগজ প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট কাগজের কারখানা এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, পুণায় এইরূপ একটা উচ্চদরের কারখানা খুলিবার প্রস্তাব হইতেছে।* বোম্বায়ে আরো দু একটি নূতন কারখানার সূত্রপাত দেখিয়া দেশহিতৈষীর মনে আহ্লাদ সঞ্চার হয়। এতদিন বিলাতী দেশলাই ভিন্ন আমাদের চলিত না — সম্প্রতি জনৈক কৃতবিদ্য ডাক্তারের যত্নে বোম্বায়ে একটি দিশি দেশলাই-এর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় স্বীডন বেলজিয়ম ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সমতুল্য দেশলাই প্রস্তুত হয়। দুইটি বাক্সের দাম এক পাই। জ্বালাইবার সামগ্রী সমস্তই দিশি জিনিস ও দেশলাই বাক্স পর্যন্ত সমুদায় নির্মাণ ব্যাপার বোম্বে কারখানায় প্রবর্তিত কেবল দেশলাইয়ের জ্বলন কাষ্ঠ বিদেশীয় আমদানী, তাহাও এদেশীয় বনজঙ্গল হইতে সংগৃহীত হইতে পারে এরূপ প্রত্যাশা করা যায়। কাজটা যদিও আসলে সামান্য তথাপি এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে লোকের চোখ ফুটিয়া অন্যদিকে সুফল প্রসূত হইবার সম্ভাবনা। দিশি দেশলাই যদি লাভের জিনিস হইয়া দাঁড়ায় ও তাহার দৃষ্টান্তে গ্লাস সাবান মোমবাতি প্রভৃতির দিশি কারখানা সকল উত্তেজিত হয় তাহা হইলে এক মহৎ লাভ সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের ছোটলোকেরা অধিকাংশই কৃষিকার্যে রত — মধ্যবিত্ত লোকদের সরকারী চাকরীই এক প্রকার জীবনের অবলম্বন হইয়া পড়িয়াছে। শ্রমের অভিনব দ্বার উন্মুক্ত হইয়া স্বাধীন ব্যবসাক্ষেত্র প্রসারিত হওয়া ভিন্ন এ দেশের কল্যাণের আর উপায়ান্তর নাই। ঐদিকে আমাদের সুশিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের লক্ষ যত্ন ও উৎসাহ যতই যায় ততই মঙ্গল।

* সম্প্রতি খুলিয়া কার্যারম্ভ হইয়াছে।

বোম্বাই শহর

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঘরবাড়ী

ইংরাজি গ্রন্থে কলিকাতা সচরাচর সৌধপুরী বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। কিন্তু এ নাম কলিকাতা যে কেন একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছে তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। এই দুই শহরের ইমারত শ্রেণীর পরস্পর তুলনা করিলে ত বোধ হয় না যে বোম্বাই কলিকাতার নিকটে পরাভব পায়। বোরি বন্দরের ষ্টেশনে নামিয়া একবার বম্বের ময়দান প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে কত প্রকাণ্ড সুন্দর হর্ম্ম্যরাজি নেত্রপথে পতিত হইবে তাহার সংখ্যা নাই। সেক্রেতার আফিস, হাইকোর্ট, ইউনিবার্সিটি হলের রাজাবাই স্তম্ভ ও পুস্তকালয়, টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট আফিস, আদালত ও কার্যালয় সমূহ, সাসূন শিল্পালয়, সর জমসদজি শিল্প বিদ্যালয়, এলফিনিষ্টন হাইস্কুল, সেন্ট জেবিয়র কলেজ, পারসী দাতব্য বিদ্যালয়, আলেকজান্দ্রা স্ত্রী বিদ্যালয় প্রভৃতি বিদ্যালয় নিচয়, গোকুলদাত হাসপাতাল, ইউরোপীয় হাসপাতাল প্রভৃতি চিকিৎসালয়; নাবিকাশ্রম, হোটেল, পান্থশালা, বিপণিশ্রেণী এই সকল দেখিয়া বোম্বাই কাহার মনে না সুরূপা সৌধপুরী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেখানে কেল্লা ও আফিসাঞ্চলের দিকে রাজমার্গ দ্বিধা হইয়া গিয়াছে তাহার মুখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শ্বেত পাষাণ প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। রাজ্ঞী সিংহাসনে সমাসীনা — সিংহাসন বিতান মণ্ডপিত — বিতানের মধ্য ভাগে ভারত নক্ষত্র, তদুপরি ইংলণ্ডের গোলাপ ও ভারতের নলিনী; রাণীর পরিচ্ছদ ও আর সব মিলিয়া প্রতিমূর্তিটি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিভাত হয়। সেক্রেতার আফিসের পশ্চাদ্ভাগে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের অশ্বারোহী তাম্রময় প্রতিমূর্তি। মহারাণীর প্রতিমূর্তি হইতে অপর প্রতিমূর্তি সমীপে চলিতে চলিতে পথে 'লাখ টাকার মূল' সুন্দর ফ্রিয়র উৎস দেখিতে পাইবে। এই উৎসের দক্ষিণে প্রসারিত একদিকে সাসূন শিল্পালয়, বম্বে ক্লব, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ট্রীচারের দোকান, বামে পি এণ্ড ও নাবিক কোম্পানির আফিস, বোর্নসেপর্ডের ফোটোগ্রাফিক চিত্রশালা, ওরিএন্টল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বড় বড ইমারত দৃষ্ট হইবে। এই সকল হর্ম্ম্যাবলী পর্যবেক্ষণ করিয়া চল বম্বের নগরশালা (Town Hall) দেখিতে যাই। ঐ সম্মুখে উচ্চ স্তম্ভরাজির মধ্য হইতে যে সুশোভিত অট্টালিকা লক্ষিত হইতেছে তাহাই নগরশালা। অন্তরে প্রবেশ করিয়া মধ্যে প্রকাণ্ড সভাগৃহ, বম্বে এসিয়াটিক সোসাইটির পাঠশালা ও পুস্তকালয়, দরবারশালা প্রভৃতি দোতালার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ দর্শন কর। প্রবেশ পথে সোপানের উপরে ও নিম্নদেশে কতকগুলি বিখ্যাত লোকের পাষাণ মূর্তি স্থাপিত — তন্মধ্যে এক পারসী ও এক হিন্দু প্রতিমূর্তি নেত্র আকর্ষণ করে। পারসী খ্যাতনামা ব্যারনেট সর জমসদজী জিজিভাই বাটলীওয়ালা। 'সর' ও 'বাটলীওয়ালা' তাঁহার এই পদবীদ্বয়ের মধ্যে তাঁহার জীবনের ইতিহাস অভিব্যক্ত। ইহারা বলিয়া দিতেছে কিরূপে তিনি সামান্য বোতল বিক্রীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত

সৌধপুরী

হইয়া স্বীয় ধৈর্য বীর্যে, বুদ্ধির প্রাখর্যে, ব্যবহার চাতুর্যে, নূতন সম্পত্তি উপার্জনপূর্বক অবশেষে ব্রিটিশ নাইট শ্রেণীভুক্ত হইয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্পাদন ও সমাজশিখরে আরোহণ করিলেন। হিন্দু প্রতিমূর্তি জগন্নাথ শঙ্করশেঠের। ইনি জাতিতে স্বর্ণকার কিন্তু জীবদ্দশায় হিন্দুজাতির প্রতিনিধি স্বরূপ গণ্য ছিলেন। সোপানের উপরিভাগে বম্বের ভূতপূর্ব কতিপয় গবর্নরবর্গের প্রতিমূর্তি অধিষ্ঠিত। তন্মধ্যে ভারতের ইতিহাস লেখক মহনীয় কীর্তি এলফিনিষ্টন্, ইহার মূর্তি সকলের শীর্ষস্থানীয় আসন অধিকার করিয়া আছে। ইনিই এ প্রদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবন করেন ও যে দুই বিদ্যালয় ইহার নাম ধারণ করিতেছে তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রেণীর অগ্রগণ্য। এল্‌ফিনিষ্টন হাইস্কুলের ছাত্রমণ্ডলী এক সহস্রেরও অধিক। যে বিদ্যালয়ের নাম 'হাইস্কুল' ও যাহার ছাত্রসংখ্যা সহস্রাধিক তাহার আয়তন ও শিক্ষাপ্রণালী সহজে বোধগম্য হইতে পারে। আরো একটি বোম্বায়ের বিশেষ ভূষণার্হ কথা বক্তব্য এই যে ইহার প্রধান আচার্য পদে ইংরাজ অধ্যাপক না হইয়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত একজন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত নিযুক্ত। তাঁহার নাম বামন আবাজী মোডক। এই ত গেল স্কুল — এল্‌ফিনিষ্টন কালেজও সামান্য গৌরবাস্পদ নহে। ইহা বম্বের আদর্শ বিদ্যালয়। সুবিখ্যাত কবিকুলতিলক লোকপ্রিয় Wordsworth সাহেব ইহার প্রধান অধ্যাপক।

এল্‌ফিনিষ্টন চক্র

নগরশালা হইতে বাহির হইয়া উদ্যানগর্ভ এলফিনিষ্টন চক্রের ইমারত শ্রেণী দেখিতে পাইবে। আচ্ছাদিত বারান্দার মধ্য দিয়া তাহাতে প্রবেশপূর্বক চক্র প্রদক্ষিণ করিয়া এস। এই সকল ইমারত শেয়র মেনিয়া কালের স্মরণ চিহ্ন। সেই সুখ সৌভাগ্যের মধ্যাহ্নকালে Sir Bartle Frere গবর্নরের আমলে এই সকলের প্রতিষ্ঠা হয়। এই স্থান তখন শূন্য ময়দান, মধ্যে কপোত বৃন্দের আবাসস্থল একটি পুরাতন ভগ্নমন্দির মিট্‌মিট্ করিত, এক্ষণে তাহার কি আশ্চর্য রূপান্তর।

এই সমস্ত সৌধাবলীর মধ্যে হাইকোর্ট আদালত সর্বাপেক্ষা বিশাল ও গৌরবশালী। ইউনিবার্সিটি গৃহ একটি শিল্পরত্ন — কি তাহার নির্মাণ কৌশল কি তাহার কার্যকারিতা অন্তর বাহ্য উভয়ই বাখ্যান যোগ্য। ইউনিবার্সিটি ঘটিকাস্তম্ভ গগন ভেদ করিয়া আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ইহা আট স্তরে বিভক্ত ও ২৬০ ফীট উচ্চ — দিল্লীর কুতুবমিনার অপেক্ষাও আট ফীট অধিক। আহ্লাদের বিষয় যে এই ইমারতে আমাদের একজন শিল্পনিপুণ দেশী কারিগরের হস্তচিহ্ন বিদ্যমান। রায়বাহাদুর মুকুন্দ রামচন্দ্র আসিষ্টণ্ট এঞ্জিনিয়র ইহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন ও গ্যালেরির উপরিভাগে যে সকল খোদিত মূর্তি ঐ স্থানের শোভা সম্পাদন করিতেছে তাহা তাঁহারই হস্তে সংগঠিত। এই সকল মূর্তি ব্রাহ্মণ, রাজপুত, মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী বণিক কচ্ছী, কাঠেওয়াড়ী, পারসী প্রভৃতি বোম্বাইবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি ব্যঞ্জক। এই স্তম্ভের ঘটিকাযন্ত্র হইতে সময়ে সময়ে তানলয় সমন্বিত শ্রবণমধুর ঘণ্টাধবনি বিনির্গত হয়। ইহার শিখরদেশ হইতে বন্দর ও শহরের সর্বাঙ্গীণ শোভা এক কটাক্ষে সন্দর্শন করা যায়। এই স্তম্ভ ও পুস্তকালয়ের জন্য শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ তাঁহার শেয়র ব্যবসা

সঞ্জাত অগাধ রত্নভাণ্ডার হইতে চতুর্লক্ষ মুদ্রা দান করেন। এই স্তম্ভের নামে তাঁহার মাতার নাম 'রাজাবাঈ' চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

এই সমস্ত বিশাল সুন্দর অট্টালিকামালা মুম্বাপুরীর গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে। ইহাদের বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে এই সকল ইমারত গবর্নমেণ্টেরই সর্বাঙ্গীণ দান নহে — পুরবাসীগণের বদান্যতা গুণে ইহাদের অনেকের জন্ম লাভ। এই ১৫ বৎসরের মধ্যে যে কোটি মুদ্রা গৃহাদি নির্মাণ কার্যে ব্যয় হইয়াছে তাহার প্রায় চতুর্থাংশ পৌরজনেরা নিজস্ব ধনকোষ হইতে দান করিয়াছেন।

বোম্বাই শহর কত শীঘ্র কি আশ্চর্য রূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহার প্রমাণ এই যে ১৮৬০ হইতে বিংশতি বৎসরের মধ্যে আবাদ, রাস্তা, সরকারী ইমারত লইয়া সর্বশুদ্ধ প্রায় ৬ ক্রোড় টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে ও তৎকাল মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষা কার্যে মিউনিসিপালিটি প্রায় চতুস্কোটি মুদ্রা ব্যয় করেন। ১৮৭২ হইতে ১৮৮৩ পর্যন্ত অন্যূন ৩৯২৩ নূতন ইমারত নির্মিত হয় ও তৎকাল মধ্যে প্রায় সাড়ে ছয় মাইল নূতন রাস্তা নির্মিত ও চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হয়। তদতিরিক্ত আবার দু মাইল রাস্তার নির্মাণ কার্য অদ্যাপি চলিতেছে। এই সকল কার্যে যে প্রভূত অর্থ ব্যয় হয় তাহাতে কোন অপব্যয় ঘটে নাই তাহা বলা যদিও অসঙ্গত কিন্তু বিশ্রী দুর্গন্ধ সঙ্কীর্ণ শহর স্বাস্থ্যকর সুন্দরপুরে পরিণত হইয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কলিকাতার Great Eastern-এর তুল্য এখানে কোন উৎকৃষ্ট হোটেল নাই তথাপি ভাল ভাল ইংরাজি দোকান অনেকগুলি আছে তন্মধ্যে ট্রীচারের দোকান নামাঙ্কিত। ট্রীচার বিশ্বসামগ্রীর ভাণ্ডার। এমন জিনিস নাই যা সেখানে পাওয়া যায় না। এই সকল দোকান দেখিলে আপশোষ হয় যে আমাদের লোকেরা দোকান সাজাইতে জানে না — বহিঃশ্রীর প্রতি তাহাদের আদবে লক্ষ নাই। ইংরাজি দোকানের বাহিরে সাজসজ্জা এক প্রধান আকর্ষণ। ট্রীচারের দোকানের সুসজ্জিত দ্রব্যজাত যখন তাড়িতা লোকে আলোকিত হয় তখন সে দৃশ্য কাহার না লোভনীয়? ভিতরে প্রবেশ করিয়া কয়জন লোক লোভ সম্বরণ করিতে সমর্থ হয় — অনেকেই দোকানদারের ফাঁদে পড়িয়া শীঘ্রই রিক্তহস্ত হন সন্দেহ নাই।

ট্রীচার

কেল্লা ও ময়দানের প্রবেশপথে ক্রীফোর্ড মার্কেট। যাহার নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে তিনি কয়েক বৎসর বম্বের মিউনিসিপাল কমিশনর ছিলেন তাঁহারই যত্ন ও পরিশ্রমে এই মার্কেট নির্মিত। ইহার বাহ্য শোভা বল, অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা শৃঙ্খলাই বল এদেশের আর কোন মার্কেট ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে কিনা সন্দেহ। যিনি এই হাটের রূপগুণ ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনি প্রাতঃকালে ৬, ৭ ঘণ্টা বেলায় দেখিলে ফল ফুল তরকারি প্রাচুর্যে বিস্মিত হইবেন। নভেম্বর হইতে মে মাস

ক্রীফোর্ড মার্কেট

পর্যন্ত ফলের আমদানী। উৎকৃষ্ট লাল কদলী, চাঁপাকলা, বাতাবী নেবু, তরমুজ, খরমুজ, নাগপুরী কমলানেবু, ঔরঙ্গবাদী ও কাবুলী আঙ্গুর, বঙ্গলোরের পীচ, মহাবলেশ্বরের স্ট্রবেরি, মস্কটের তাজা ও শুষ্ক খর্জ্জুর, নারিকেল, আনার (দাড়িম), আঞ্জির (Fig), আতা, পাপিয়া, পেয়ারা ইত্যাদি ফলভারে তথাকার ভাণ্ডার তখন পূর্ণ। কিন্তু ফলের রাজা আম্রের জন্য বম্বের বিশেষ খ্যাতি। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার আমদানী। আম্রের মধ্যে মজগামের আফুস সকলের সেরা। সমুদ্রতীরস্থিত রত্নাগিরি ও গোওয়াতেও ভাল ভাল আম জন্মে কিন্তু বোম্বাই আফুসের কাছে কেহই নয়। অনেক ইংরাজ এদেশীয় ফলের পক্ষপাতী নন — তাঁহারা বলেন এদেশীয় ফল অতিরিক্ত মিষ্ট — মধুরের সঙ্গে অন্য কোন তার মিশ্রিত নাই। তাঁহাদের মতে বিলাতী স্ট্রবেরির মত রুচিকর ফল এদেশে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না — তাঁহারা স্ট্রবেরি ও ক্ষীর মিলিত সুধার আস্বাদ ভুলিতে পারেন না। আমি এই সকল ইংরাজকে বোম্বাই আফুস চাখিয়া দেখিতে পরামর্শ দি। আর এক কথা এই — একটু ভাবিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে আমাদের দেশের ফলের দ্বারা গরীব লোকদের জীবিকা নির্বাহ হয় — আম্রের সময় আম খাইয়া অনেকে উদর পোষণ করে, কলাও পুষ্টিকর — নারিকেল ফলে ক্ষুৎপিপাসা উভয়েরই নিবৃত্তি হয় কিন্তু ইংলণ্ডের বেরি (ট্যাপারি) খাইয়া কতদিন জীবিত থাকা যায়? আমাদের দেশে সুস্বাদু অথচ পুষ্টিকর কত প্রকার ফল আছে তাহাতে যাঁহাদের রুচি না হয় তাহাদের রুচি বিকৃত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের সুগন্ধ পুষ্পের উপরেও অনেক ইংরাজের কটাক্ষ — জুঁই বেল বকুল চম্পকের সুতীব্র আঘ্রাণ ইংরাজ মহিলাদের অসহ্য, তাহাতে তাঁহাদের মাথা ধরে। এ বিষয় তর্কে মীমাংসা হইবার নয় — এইমাত্র বলা যাইতে পারে "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"। বোম্বাই মার্কেটে ফলফুলের অভাব নাই। পুণা ও মফস্বলের অন্যান্য স্থান হইতে তরিতরকারিরও প্রচুর আমদানী।

ক্রাফোর্ড মার্কেটের পর একবার বম্বের তুলার বাজার দেখিয়া আসা কর্তব্য। ইহা কেল্লা হইতে অর্ধমাইল দূর কোলাবা প্রান্তে দেড় মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। বম্বের বাণিজ্য ঘটা দর্শনাভিলাষী জনের এই বাজার অবশ্য দর্শনীয়। এই স্থান হইতে দশ লক্ষাধিক তুলার বস্তা ভিন্ন দেশে বার্ষিক রপ্তানি হয়। আমেরিকার New Orlans-এর নিচেই ইহা গণনীয়। দেওয়ালীর অবসান হইতে এই বাজারে তুলার আমদানী আরম্ভ ও মার্চ এপ্রিল মে, এই তিন মাস ব্যবসাদারের ভরপুর সমাগম দৃষ্ট হয়। টুপীওয়ালা ইংরাজ বণিক, জরির শাল মণ্ডিত গুজরাতী সরাফ প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক, নানা বর্ণের পরিচ্ছদ, ক্রয় বিক্রয়ের কোলাহল মিলিয়া তুলার বাজারে বম্বের বাণিজ্য-শ্রী মূর্তিমতী।

তুলার বাজার

দিশি পাড়ার মধ্য হইতে পারেল পর্যন্ত চলিয়া গেলে অনেকানেক উচ্চ রঙিন বাড়ীঘর পথিকের নয়নপথে পতিত হয় কিন্তু বর্ণনাযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। ভিক্টোরিয়া ম্যুজিয়ম ও উদ্যান এবং এলফিনিষ্টন কালেজ ভয়খেলার

দিশি পাড়া

প্রধান অলঙ্কার। প্যারেলে গবর্নমেন্ট হৌস অধিষ্ঠিত কিন্তু তাহা কলিকাতার মত জমকাল বিরাট অট্টালিকা নয়। পরিশেষে আমার মিনতি এই দর্শকগণ এই সকল ইমারত দেখিয়াই যেন সন্তুষ্ট না থাকেন — দিশি পাড়াটা তন্নতন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। এই গিরগাম কামাতীপাড়া খেতবাড়ী কান্ধেবাড়ী প্রভৃতি স্থানের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করিতেছে, তাহাদের কেনাবেচা ঘরকন্না সব এইখানে। ইহার মধ্যে অনেক কৌতূহলজনক নূতন জিনিস দেখিবার আছে— ম্যুনিসিপাল বন্দোবস্ত এই ভাগেই বিশেষ দ্রষ্টব্য। দোকান হাটের ক্রয়বিক্রয়, ট্র্যাম ঘোড়া ও গরুর গাড়ীর চলাচল ও অসংখ্য জাতীয় লোকজনের সমাগম, এই স্থানেই শহরের জীবন্ত চলন্ত ভাব প্রতিবিম্বিত।

বোম্বাই শহর

নবম পরিচ্ছেদ

মন্দির

মুম্বাতলা ও এর সম্মুখস্থ কাংস্যবাজার হইতে হিরগাম পর্যন্ত হিন্দু ও জৈন মন্দিরে সমাকীর্ণ। বোম্বায়ে যে সকল হিন্দু মন্দির দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে বালুকেশ্বর, মহালক্ষ্মী, মুম্বাদেবী, নাগদেবী ও শ্রী ব্যঙ্কটেশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। তাহাদের বয়ঃক্রম প্রায় ২০০ বৎসর। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী হিন্দু-বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উৎপত্তি। সে কালে এই অল্প সংখ্যক কতকগুলি দেবমন্দির হিন্দুদিগের পূজার্চনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। হিন্দু সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে নব নব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া নগরীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়। সুরাট হইতে ইংরাজ রাজধানী বোম্বায়ে উঠিয়া আসিবার পর অবধি ক্রমে বোম্বায়ের প্রজাপুঞ্জ বৃদ্ধি হইতে চলিল। ১৮৩৭ অব্দে মহা অগ্ন্যুৎপাতে সুরাট নগরী ভস্মসাৎ হওয়াতে অনেকানেক বাসচ্যুত নিঃস্ব হিন্দু সন্তান উপজীবিকা অর্জ্জনাশয়ে সপরিবার বোম্বাই আসিয়া বাস করে। অনেকে বাণিজ্য ব্যবসা সূত্রে বোম্বায়ে আকৃষ্ট হয়। পেশওয়া রাজ্য বিনষ্ট হইবার পর পুণা, সাতারা ও দক্ষিণের অন্যান্য প্রদেশ হইতে মহারাষ্ট্রাদলের আগমন; কচ্ছ, মারওয়াড় ও দেশীয় রাজ সংস্থানের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বণিক ও শ্রমজীবী লোকের সমাগম ইত্যাদি কারণে বোম্বায়ে হিন্দুসংখ্যা বহুগুণ বিস্তৃত হইয়া সেই সঙ্গে নানা সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবদেবীর মন্দির চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বৈষ্ণব ভাটিয়া ও বণিকদের ব্যয়ে জীবনলালের বল্লভাচার্য মন্দির। মারওয়াড়ীদের বালাজী ও জগন্নাথ মন্দির, স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের মন্দির, নানকপন্থী কবীরপন্থী রাধাবল্লভী রামানুজ প্রার্থনা-সমাজ প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ভজনালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া স্ব স্ব মতানুসারে প্রার্থনা ভজন পূজনাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

হিন্দু মন্দির

প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে বালুকেশ্বর অগ্রগণ্য। ইহা মালাবার শৈলের পশ্চিমে অবস্থিত। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র রাবণ-হৃত সীতান্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এই স্থানে এক রাত্রি যাপন করেন। তাঁহার শিব পূজার জন্য ভাই লক্ষ্মণ প্রত্যহ বরাণসী হইতে নূতন শিবলিঙ্গ আহরণ করিয়া আনিতেন। এই রাত্রে তিনি যথানির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে না পারাতে রাম অধৈর্য হইয়া বালুকা হইতে লিঙ্গ নির্মাণ পূর্বক পূজার্চনা সমাধা করেন। এই ঘটনা হইতে এই মন্দিরের নাম বালুকেশ্বর। এক্ষণে তাহার মধ্যে যে শিবলিঙ্গের পূজা হয় তাহা বারাণসী হইতে সমানীত লিঙ্গ। কথিত আছে যে পোর্তুগীসদের আগমনকালে রামচরিত লিঙ্গ ম্লেচ্ছ দর্শনে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। এই স্থানে একটা সুন্দর ঘাট বাঁধান পুষ্করিণী আছে তাহার নাম বাণতীর্থ। রামচন্দ্র তৃষ্ণাতুর হইয়া ভূমধ্যে

বালুকেশ্বর

বাণক্ষেপ করেন আর অমনি জলস্রোত উথলিয়া উঠে তাহা হইতেই এই জলাশয়ের জন্ম ও নামকরণ। এই পুষ্করিণীব চারিধারে বড় বড় ছায়া বৃক্ষ, অনেকগুলি মন্দির, ধর্মশালা ও ব্রাহ্মণ বাসগৃহ দৃষ্ট হয়। সমুদ্রতীরস্থিত পাহাড়ে একটা ছিদ্র আছে তাহার মধ্য দিয়া গলিয়া যাইতে পারিলে হিন্দুর পাপক্ষয় হয় ও জনশ্রুতি এই যে শিবাজী রাজা এই উপায়ে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি কৃশাঙ্গ ছিলেন, তাঁহাকে ইহার জন্য অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই।

মসজিদ

কোলাবা হইতে মাহিম পর্যন্ত মুসলমানদের সর্বশুদ্ধ প্রায় ৯০ মসজিদ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে আট মসজিদ বোরাদের, দুইটি খোজাদের, একটি মোগলদেব জন্য নির্দিষ্ট। অন্যান্য মুসলমান বসতির মধ্যে যেরূপ এখানেও সেইরূপ জুম্মা (শুক্রবার) মসজিদ সর্বপ্রধান। ইহা পুষ্করিণীর ধারে কাপড়বাজারের নিকট প্রতিষ্ঠিত। ইহা এক প্রাচীন মসজিদ ও ইহার বার্ষিক আয় প্রায় ৩০০০০ টাকা। শুক্রবার নামাজ ও বার্ষিক উৎসব ক্রিয়ার জন্য একজন প্রধান মল্লা, প্রাত্যহিক উপাসনার জন্য অন্য একজন ধর্মযাজক, একজন মুয়েজ্জিন অর্থাৎ নিনাদক, উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগকে উপাসনায় আহ্বান করা যাহার কাজ ও অন্যান্য কতকগুলি কর্মচারী এই মসজিদে নিযুক্ত। এই মসজিদে আরবী পারসী ও হিন্দুস্থানী শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় আছে। ধর্মশিক্ষা এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ও ইহার ব্যয় মৃত মহম্মদ আলি রোগের দাতব্য ফণ্ড হইতে নির্বাহিত হয়। এই প্রসিদ্ধ মুসলমান বণিক মসজিদে মেরামতের প্রায় এক লক্ষ টাকা দান করেন। এতভিন্ন সত্তর, জাকারিয়া, হাজি, ইস্মায়ল, মোগল, প্রভৃতি আর কতকগুলি নামাঙ্কিত মসজিদ আছে। তাছাড়া প্রত্যেক মুসলমান পাড়ার পৃথক পৃথক মসজিদ — তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতি মুসলমান গৃহস্বামীকে বার্ষিক এক টাকা করিয়া দান করিতে হয়। রমজান উৎসবে মুল্লার জন্য অর্থ বস্ত্র প্রভৃতি দান সংগৃহীত হইয়া থাকে।

পাবসী অগ্নিমন্দিব

পুরীর ভিন্ন ভিন্ন ভাগে পারসীদের অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠিত, তাহাব সংখ্যা সব মিলিয়া ৩৩। এতদতিরিক্ত ৯টা মন্দির কতকগুলি শ্রীমন্ত পারসী পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তি। তাহাতে সাধারণের যাইবার অধিকার নাই। এই সকল অগ্নিমন্দির তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী আতস বেহরাম, দ্বিতীয় শ্রেণী আতস আদারণ অথবা অঘিয়ারি, তৃতীয় আতস দাদগা। এই সকল মন্দিরের নির্মাণ কৌশল বিশেষ কিছুই নাই। মধ্য প্রকোষ্ঠে পূতাগ্নি প্রতিষ্ঠিত তাহার সংরক্ষণে একজন পুরোহিত নিযুক্ত, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি খোরাক যোগাইয়া নিরন্তর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখা তাঁহার কাজ।

অগ্নি প্রতিষ্ঠা

পারসী অগ্নিমন্দিরে অগ্নি প্রতিষ্ঠার যে নিয়ম তাহা কৌতুহলজনক। যে সকল স্থানে অগ্নির জন্ম তথা হইতে নানাজাতীয় অগ্নি সংগ্রহ করা হয়। বিদ্যুজ্জাত অগ্নি আহরণ বিশেষ ফলদায়ক। কথিত আছে হোর্মসজি ওয়াডিয়ার আতস বেহরামের জন্য বিদ্যুতাগ্নি কলিকাতা হইতে বহু কষ্টে সংগৃহীত হয়। কলিকাতার

অনতিদূরে বৃক্ষ বিশেষে বজ্রপাতের সংবাদ পাইয়া নওরোজী বাঙ্গালী নামক একজন পারসী তথায় সত্বর উপস্থিত হইয়া তাহা হইতে এক তড়িদ্দগ্ধ শাখা সংগ্রহ করেন। কাষ্ঠ-সংযোগে সেই অগ্নি অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত হয় — পরে তাহা স্থলমার্গে পারসী হস্তে বহু যত্নে বোম্বায়ে প্রেরিত ও আতস বেহরামে স্থাপিত হয়।

এই সকল নানাজাতীয় অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রক্ষিত হইলে পরে তাহা সংস্কৃত ও শোধিত হয়। অগ্নি সংস্কারের নিয়ম এই — অগ্নির উপর একটি দণ্ড বিশিষ্ট ছিদ্রযুক্ত চ্যাপটা

অগ্নি সংস্কাব

ধাতুময় পাত্র রক্ষিত হয়। এই পাত্রস্থিত সুগন্ধি চন্দন প্রভৃতি কাষ্ঠখণ্ড তলের অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হইয়া দাবানল উদ্ভূত হয়। এই দ্বিতীয় অগ্নি হইতে তৃতীয় — তৃতীয় হইতে চতুর্থ এইরূপে নবম সংস্কারে যে অগ্নি প্রসূত হয় তাহাই পূতাগ্নি। এই প্রকারে প্রত্যেক জাতীয় অগ্নি সংস্কৃত হইলে সেই সমস্ত অগ্নি একটা বৃহৎপাত্রে রাশীকৃত হইয়া যথানির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় ও সেই পূত হুতাশন আহুতি লাভে অহর্নিশি প্রজ্বলিত থাকে।

এই স্থলে পারসী শবস্তম্ভের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জীবন্ত পারসীর জন্য অগ্নিমন্দির

পাবসী শবস্তম্ভ

ও মৃতের জন্য শবস্তম্ভ এই দুইটি পারসীদের পরম প্রয়োজনীয় বস্তু। যেখানে পারসী বসতি সেখানেই এই দুই জিনিস দেখিতে পাইবে। মালাবার শৈলের উপর পারসীদের পঞ্চ শবস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত। সেই সকল স্তম্ভ প্রস্তরময় প্রাচীর বেষ্টিত কতিপয় বিঘা (প্রায় ৮০০০০ গজ) ভূমি অধিকার করিয়া আছে। প্রাচীরের অভ্যন্তরে এক একটি অগ্নিমন্দির অধিষ্ঠিত। পারসী শব শুভ্রবসনে আচ্ছাদিত হইয়া পাহাড়ের উপর সমানীত হয়। আত্মীয়স্বজন বন্ধু শুভ্রবেশ ধারণ করিয়া শবের পশ্চাৎ জোড়ে জোড়ে গমন করে — দুই জনের মধ্যে এক এক কর-ধৃত রুমাল ব্যবধান। পথিমধ্যে এক বিশ্রামগৃহে শব স্থাপিত হয় ও তথায় উপাসনাদি হইয়া স্তম্ভে সমানীত হয়। স্তম্ভ প্রস্তরময় ১৬, ১৭ হাত উচ্চ। প্রাচীরের একটি দ্বার দিয়া বাহকেরা প্রবেশ করিয়া দেহটিকে যথাস্থানে আনিয়া রক্ষা করে। স্তম্ভের উপর কোন ছাদ নাই — অন্তর্ভাগে প্রস্তরনির্মিত গোলাকার শ্মশানভূমি। সেই গোল চক্রের তিন স্তর ঢালা গড়ান ভাবে নামিয়া গিয়াছে। মধ্যে এক গভীর গর্ত। পুরুষের দেহ উপরিস্তরে — নারীদের মধ্যভাগে ও শিশুদেহ অধঃস্তরে স্থাপিত হয়। যথাস্থানে শবপ্রতিষ্ঠা কবিয়া বাহকেরা চলিয়া যায়। একপাল শকুনী প্রাচীরের উপর বসিয়া শিকার প্রতীক্ষা করিতে থাকে, দেহ নাবাইমাত্র তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে ও দুই ঘণ্টার মধ্যে মাংস নিঃশেষ ভক্ষণ করিয়া অস্থি মাত্র রাখিয়া যায়। কতকদিন পরে বাহকেরা ফিরিয়া আসে ও শুষ্ক অস্থিখণ্ড সংগ্রহ করিয়া মধ্যবর্তী কুওয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করে — তাহা বায়ুবৃষ্টির প্রভাবে ক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়। এই সকল শুষ্ক অস্থিখণ্ড ব্যতীত শ্মশানে শবের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। মৃতদেহের রসাদি নির্গমনের বিহিত উপায় কল্পিত হইয়াছে — বালুকা ও

কয়লার মধ্য দিয়া শোধিত হইয়া তাহা ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। পারসীগণ প্রাচীনকাল হইতে এইরূপ সমাধি ব্যবস্থা পালন করিয়া আসিতেছে। ইহার একগুণ এই যে শ্মশানক্ষেত্র দুর্গন্ধ দূষিত বায়ু হইতে সুরক্ষিত। অপরগুণ এই যে মনুষ্যে মনুষ্যে সাম্যভাব ইহাতে বজায় থাকে; ধনী দরিদ্র উচ্চনীচ সকলেরই অস্থি একস্থানে মিশিয়া যায়।

উথন্না

পারসী ধর্মগ্রন্থে আছে যে জীবাত্মা ৩ দিন পর্যন্ত মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করে না — চতুর্থ দিবসে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া লোকান্তর গমন করে। সেই দিন পারসীরা সামর্থ্য অনুসারে মৃতের কল্যাণ উদ্দেশে দানাদি কার্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই বিধির নাম 'উথন্না'।

হিন্দু ও পারসী যে মূলে একজাতি, ঘটনাক্রমে উভয় শাখা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা এই উভয় জাতির ভাষা ও ধর্ম, মত ও বিশ্বাস, আচারব্যবহারের তুলনা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সৌসাদৃশ্য হইতেও এ বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। প্রেতাত্মার কল্যাণ উদ্দেশে হিন্দুদের শ্রাদ্ধ তর্পণের নিয়ম পারসী রীতি হইতে ভিন্ন নহে। পারসী সম্বৎসরের শেষ দশাহ প্রেতাত্মার জন্য উৎসর্গীকৃত। এই দশ দিন গৃহের এক প্রকোষ্ঠ পরিষ্কৃত ও ফলফুলে সুসজ্জিত করিয়া প্রেতাত্মাদের প্রতি লক্ষ করিয়া প্রার্থনা বন্দনাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানকে প্রবর দিগান অথবা মুক্তাদ বলে। ঐ সময়ে প্রেতাত্মাগণ মর্ত্যধাম দর্শনার্থে আগমন করেন ও সন্তান সন্ততিদিগকে আশীর্বাদ করিয়া যান। যদি দেখেন আমরা তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হই নাই তাহা হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট।

মুক্তাদ

সারমেয়

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধীয় একটি অদ্ভুত রীতি পারসীদের মধ্যে প্রচলিত — সে কিনা কুকুর দিয়া শবের মুখাবলোকন করাইবার রীতি। কুকুরের দৃষ্টি শুভ দৃষ্টি। কুকুরে জীবাত্মাকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়া স্বর্গধামে লইয়া যায় ও আহরিমানের অমঙ্গল চেষ্টা নিরাকরণ করে, এই তাহাদের বিশ্বাস। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের কুকুর সমভিব্যাহারে স্বর্গারোহণের যে আখ্যান বর্ণিত আছে পারসীক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পদ্ধতির সহিত তাহার যোগ আছে এইরূপ কোন কোন পণ্ডিতের মত।

বোম্বাই শহর

দশম পরিচ্ছেদ

উৎসব

বোম্বায়ে হিন্দু মুসলমান পারসী খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কত প্রকার উৎসবের উৎস উঠে তাহার অন্ত নাই। মুসলমানদের প্রধান উৎসব মহরম। ইহা আলি ও ফতেমার পুত্রদ্বয় হসন হুসেনের শোচনীয় মৃত্যু স্মরণোদ্দীপক বার্ষিক উৎসব। দশ দিন ইহার বিস্তৃতি — দশম দিনে হুসেনের সমাধি মন্দির (তাবুৎ) সমুদ্রে বিসর্জিত হয়। সিয়া মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে আলিই মহম্মদের ন্যায্য সিংহাসনাধিকারী ইমাম। তাঁহার অভাগা পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু স্মরণ করিয়া মহরমের সময় তাহাদের আর্তনাদের সীমা থাকে না। সুন্নী মুসলমানেরাও মহরমে যোগ দেয় কিন্তু এ তাহাদের আনন্দোৎসব। এক দলের হাহাকারের মধ্যে অপর দলের মহোল্লাস। মহরমের সময় সিয়া সুন্নীদের ঘোর দলাদলির মধ্যে শান্তিরক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার। আবার কখন কখন এই সময়ে হিন্দুর পরব আসিয়া পড়িলে হিন্দু মুসলমানের জাতীয় বৈর প্রজ্বলিত হইয়া মহা দাঙ্গাহাঙ্গাম বাধিয়া যায়। বোম্বায়ে যে মহরমের সময় শান্তিভঙ্গ হয় না সে কেবল পুলিশের লোকদের অনিবারিত যত্ন ও দক্ষতা গুণে। বোম্বায়ে সিয়া মুসলমান বিস্তর সুতরাং এখানে যেমন মহরমের ধুম অন্যত্রে সেরূপ দেখা যায় না। শেষ দিনে হুসেন বধ নাটক অভিনীত হইয়া থাকে। হুসেন তাঁহার সেনামণ্ডলী পরিত্যক্ত ও অরিদলে বেষ্টিত হইয়া কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচরের সহিত কববালা সমরক্ষেত্রে সমাগত। তাঁহার প্রিয়তমা ভগিনী ফতেমা তাঁহাকে যুদ্ধযাত্রা হইতে নিবারণ করিতে কাতর স্বরে কত অনুনয় করিতেছেন কিন্তু হুসেন কিছুতেই নিবারিত হইবার নহেন। তিনি বলিলেন "ঈশ্বরই একমাত্র ভরসা। আমার পিতা মাতা ভ্রাতা যেখানে গিয়াছেন আমিও তথায় তাঁহাদের পশ্চাদগামী হইব ইহাতে দুঃখ কি?" তাঁহার বিশ্বাসী সঙ্গীগণ একে একে শত্রুহস্তে নিহত— সবশেষে হুসেনও তরবারি ও বর্ষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড সেনাপতি সম্মুখে আনীত হইলে সেনাপতি মুখের উপর এক বেত্রাঘাত করিল। ইহা দেখিয়া একজন বৃদ্ধ মুসলমান বলিয়া উঠিল "আহা! এই মুখে আমি কতবার মহম্মদের চুম্বন দেখিয়াছি!" যে নাটকের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা এই ঘটনা অনুসরণ করিয়া অভিনীত হয়। মহরম ভিন্ন মুসলমানদের কত পীরের মেলা ও উৎসব, হিন্দুদিগের কত পূজাপার্বণ আছে। বোম্বাই মেলারই রাজ্য।

উৎসব

মহরম

হিন্দুদের উৎসব অনেকটা আমাদেরই মত— তথাপি কোন কোন অংশে প্রভেদ উপলব্ধি করা যায়। বাঙ্গালার দুর্গোৎসব এদেশীয় হিন্দুদের জাতীয় উৎসব বলিয়া মনে হয় না। যদিও নবরাত্রি উপলক্ষ্যে কোন কোন হিন্দুগৃহে দুর্গাপূজা হয় ও গুজরাতী রমণীদিগের মধ্যে 'গরবা'

গানের ধুম লাগিয়া যায় তথাপি ইহা বোম্বাইবাসীদের জাতীয় উৎসবের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। দশমীর দিন (দশহরা) শারোদৎসবের প্রধান দিন। সে দিন মুম্বাদেবী ও ভুলেশ্বর মন্দিরে দেবী দর্শনের মহাভীড়— হিন্দুগৃহে আত্মীয়স্বজন বন্ধুর পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ, কোলাকুলি ও স্বর্ণচ্ছলে শমীপত্রের আদানপ্রদান হইয়া থাকে। কথিত আছে, পাণ্ডবেরা বিরাট রাজ্যে প্রবেশ কালে সেই দিন শমীবৃক্ষতলে অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া শমী পূজা করিয়াছিলেন। পাণ্ডবদের দৃষ্টান্তে এ অঞ্চলে বিজয়া দশমীতে শমী পূজার রীতি প্রচলিত। সিন্ধুদেশেও এই প্রথা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গ্রামের বাহিরে লোকেরা শমীবৃক্ষতলে মিলিত ও স্বর্ণজ্ঞানে আগ্রহের সহিত শমীপত্রের আদানপ্রদানে তৎপর হয়। মহারাষ্ট্রদেশে দশহরার বিশেষ মাহাত্ম্য। এই সময়ে বর্গীরা শস্ত্রার্চনা করিয়া মহা ধুমধামে যুদ্ধ যাত্রায় বাহির হইত। দশহরায় অশ্বসকল বিচিত্র ফুলহারে সজ্জিত হয় ও নীচ জাতীয় লোকেরা মেষ মহিষাদি বলিদানে মাতিয়া যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রকাশ্যে বলিদান হয় না কিন্তু দেবী রুধিরপ্রিয়, গোপনে কি কাণ্ড হয় কে বলিতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত কারওয়ারে আমার একটি পরিচিত ব্রাহ্মণের বাটীতে দুর্গোৎসব হইয়াছিল — উৎসবের পর সেই বাটীর এক ভৃত্য বালহত্যা অপরাধে সেসন সোপর্দ্দ হয়। বিচারস্থলে বালহত্যার কারণ এই বলা হয় যে গৃহিণী পুত্রসন্তান কামনা করিয়া ভবানীর নিকট মানত মানিয়াছিলেন, নববলিদানে দেবীর তুষ্টি সাধন মানসে ভৃত্যকে দিয়া এই কাণ্ড করান। আরতির সময় বালকটিকে দেবীর তুষ্টি সাধন মানসে ভৃত্যকে দিয়া এই কাণ্ড করান। আরতীর সময় বালকটিকে দেবীর সম্মুখে ধরা হইয়াছিল ও পরদিন প্রভাতে গৃহ প্রাঙ্গণে তাহার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। খুনের উদ্দেশ্য চুরি নহে কেননা বালকের অঙ্গের আভরণ অক্ষত ছিল— অপর কোন উদ্দেশ্যও প্রকাশ পায় নাই— বলি অনুমান নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

দশহরা

দশহরার পর দেওয়ালী। তাহাই পুরবাসীদের প্রধান উৎসব। এই উৎসবের বিশেষ গুণ এই যে ইহুদি ও খৃষ্টান ভিন্ন অপর সাধারণ সকল সম্প্রদায়ের লোকে ইহাতে যোগ দিয়া থাকে। হিন্দু মুসলমান পারসী সকলেই নিজ নিজ গৃহ দীপালোকে আলোকিত করিয়া দীপাবলীর উৎসবে মগ্ন হয়। ধন ত্রয়োদশী হইতে এই উৎসবের আরম্ভ ও অমাবস্যায় শেষ। বঙ্গদেশে কালী পূজার সময় এই। কিন্তু এখানে এ উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী, নৃমুণ্ডমালিনী শম্ভুবক্ষবিহারিণী লোলজিহ্বা কালী নহে। অমাবস্যার দিন বিক্রম সম্বৎসরের শেষ দিন, সেই দিনই উৎসবের প্রধান দিন। গৃহে গৃহে দীপমালায় মুম্বাপুরী সজ্জিত রঞ্জিত হইয়া ইন্দ্রপুরীর ন্যায় শোভন দৃশ্য ধারণ করে। সেদিন বণিকদের বহি-পূজনে মহা উৎসাহ। তাহারা তাহাদের পুরাতন হিসাবপত্র গুটাইয়া দান ধ্যান দেবার্চনা পূর্বক নবোৎসাহে নববর্ষের কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

দেওয়ালী

আর একটি উৎসব বোম্বাইবাসীদিগের বিশেষ সেব্য তাহা শ্রাবণী পুর্ণিমা (নারেল পুণাম)। এই সময় বর্ষা ঋতুর অবসান বলিয়া ধার্য। হিন্দুগণ ছোট বড় সকলে সাজসজ্জা

করিয়া নারিকেল ও পুষ্পহস্তে সমুদ্রতীরাভিমুখে বাহির হয়। ময়দান লোকেলোকারণ্য। এই সময় হইতে নাবিকদের জন্য (দিশি নাবিক; P and O Company নয়) সমুদ্রপথ উন্মুক্ত — শুভযাত্রা উদ্দেশে ফলফুল উপহার দিয়া সমুদ্রের সাধ্যসাধনা আরাধনা করিতে হয়। ব্যাক্‌বের তীরে লোকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে সাগরার্চ্চনায় সম্মিলিত হয় — পুরোহিত প্রস্তুত — চাউল দুধ নারিকেল প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার সকলি যে বরুণদেবের ভোগে আইসে তাহা নয়। নারিকেল নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র একদল কুলী তাহা সাঁতার দিয়া ধরিতে যায় ও কাড়াকাড়ি করিয়া যে পারে বরুণের ধন লুণ্ঠন করিয়া আনে। সমুদ্র তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন না — বরং অনেক সময় স্বয়ং উদার তরঙ্গহস্তে তাহা কাঙ্গালীদের বিতরণ করেন। এদিকে ময়দানে মেলা বসিযা যায়। মহাধুম। কোথাও খেলনা বিক্রী, কোথাও মিষ্টান্নের দোকান বসিয়াছে, কোথাও বা একদল পালওয়ানের মল্লযুদ্ধ চলিতেছে ও মধ্যে মধ্যে জেতার প্রতি দর্শকমণ্ডলীর সাবাসধ্বনি উত্থিত হইতেছে। কোথাও একদল নর্তকী নৃত্য করিতেছে। কাঙ্গালীরা ভিক্ষা আদায়ের জন্য কতপ্রকার ফন্দী করিয়া বেড়াইতেছে। ওদিকে একজন গণক ঠাকুর হাত দেখিয়া শুভাশুভ গনিয়া দিতেছেন; তাহার ভাবভঙ্গি দেখিলে বোধ হয় যেন সত্যই দৈবশক্তি তাঁহাতে মূর্তিমতী। অন্যত্রে নাগরদোলায় বালকেরা ঘুরপাক দিতেছে। নানাদিক হইতে লোকের যাতায়াত — সকলেই দু-দণ্ডের জন্য আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে তৎপর।

নারেল পুণম

এতদ্ভিন্ন দোলযাত্রা — গণেশ চতুর্থী, নাগপঞ্চমী, গোকুলাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি আর যে সকল হিন্দুৎসব আছে তাহা আর কত বলিব? দোলযাত্রার (হোলির) যে আবীর ক্রীড়া নৃত্য গীত তাহা সর্বত্রই সমান, বর্ণনার আবশ্যক করে না। মহলার রাও গাইকওয়াড় অত্যন্ত হোলিভক্ত ছিলেন। প্রবাদ এই যে তিনি একবার হাতির উপরে এক ক্ষুদ্র কামান রাখিয়া তাহা হইতে একদল নর্তকীর উপর আবীর বর্ষণ করিয়াছিলেন; সেই ভয়ঙ্কর পিচকারীর বলে এক বেচারীর প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত। এখন আর এরূপ অত্যাচার শ্রুত হওয়া যায় না। চড়ক পূজার আত্মনির্যাতন পর্যন্ত নিবারিত হইয়াছে। এখানকার ঠাকুর দেবতা প্রায় সকলেই কুৎসিত কদাকার, আমাদের বাবু-বেশধারী ময়ূর-বিহারী কার্তিকের মুখশ্রী দুর্লভ-দর্শন। দেখা যায় এদেশে ময়ূর সরস্বতীর বাহন। নাট্যাভিনয়ের প্রারম্ভে মধুরহাসিনী মিষ্টভাষিণী ময়ূরাসনা বীণাপাণি নৃত্য করিতে করিতে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন। রামকিঙ্কর হনুমান সাধারণের উপাস্য-দেবতা— মারুতি-মন্দির যেখানে সেখানে দৃষ্টিগোচর হয়। গণেশ চতুর্থীর উৎসবে এ প্রদেশে সামান্য কাণ্ড হয় না। আমি দেখিতে পাই এদেশে গণেশ ঠাকুরের বিশেষ সম্মান। গ্রামে গ্রামে গণপতির মন্দির ও গণেশ চতুর্থীর সময় গজানন-মূর্তিপূজা ও বিসর্জনের মহা ঘটা। গণেশের সম্মানার্থে স্বতন্ত্র উৎসব বঙ্গদেশে নাই। ভাতৃ দ্বিতীয়াকে এদেশে যম দ্বিতীয়া বলে। ভাইবোনের মেলামেশা ও সদ্ভাব বর্দ্ধন এ উৎসবের উদ্দেশ্য। ভ্রাতা ভগ্নী-গৃহে ভোজনার্থে গমন করে। ভগ্নী ভায়ের কপালে তিলক দিয়া তাঁহাকে বরণ করে— অনন্তর ধনরত্ন উপহার দানে ভগ্নীর যত্নের প্রতিদান ও পরিতোষ সাধন করিতে হয়।

বোম্বাই শহর

একাদশ পরিচ্ছেদ

এলিফান্টা

যিনি বোম্বায়ে বেড়াইতে আসিয়াছেন তিনি গজদ্বীপ (এলিফান্টা) না দেখিয়া যেন বাড়ী না ফেরেন। এলিফান্টার অপর নাম খারপুরী। এই দ্বীপে যে সকল গুহামন্দির আছে তাহা প্রস্তরময় পাহাড় খুদিয়া নির্মিত। চতুর্মন্দিরের মধ্যে একটিই প্রধান, তাহাই বিশেষ দ্রষ্টব্য। আপলো বন্দর হইতে স্টীমারে করিয়া এলিফান্টা দ্বীপ একঘণ্টায় যাওয়া যায়। বন্দর বোটে করিয়া গেলে আর একটু বেশী সময় লাগে। এই রকম একটা বোটে অনুকূল বায়ু-ভরে পাল তুলিয়া যাওয়াতে আরাম বটে কিন্তু বাতাস বন্ধ ও স্রোত প্রতিকূল হইলে বোটে যাওয়াআসা অনেক ঘণ্টার ধাক্কা। যাত্রীদের সুবিধার জন্য বড় বড় পাথর ফেলিয়া সমুদ্রতীর হইতে গুহামুখ পর্যন্ত এক সোপান পথ প্রস্তুত কিন্তু ভাটার সময় নৌকা কাছে ঘেঁসিতে পারে না— তীর হইতে অনেক দূরে রাখিতে হয়। নামিবার স্থানে পূর্বকালে একটি হস্তীর বিশাল পাষাণ প্রতিমূর্তি ছিল, তাহা হইতেই পোর্তুগীস লোকেরা এই দ্বীপের নামকরণ করিয়াছে। দ্বীপে এই প্রতিমূর্তির চিহ্নমাত্রও এইক্ষণে দৃষ্ট হয় না, তাহার ভগ্নাবশিষ্ট পিণ্ড ভিক্টোরিয়া উদ্যানে উঠাইয়া রাখা হইয়াছে। সেপান-পরম্পরা হইতে উপরে উঠিয়া গুহামন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে উপনীত হওয়া যায়। তথা হইতে কয়েক ধাপ উচ্চে উঠিলে সম্মুখে সুনীল সমুদ্র, সমুদ্রের ক্রোড়ে কশাই দ্বীপ ও দূরে অর্ণব পোতপূর্ণ বোম্বাই বন্দর পর্যন্ত অতি মনোহর সুন্দর দৃশ্য আবিষ্কৃত হয়। গুহার প্রবেশদ্বারটি বেশ বড় ও সারি সারি চারি থাক স্তম্ভের মধ্য দিয়া প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। এই সকল স্তম্ভ প্রকাণ্ড প্রস্তরময় ছাদ-ভার বহন করিতেছে। স্তম্ভের সংখ্যা ছোট বড় মিলিয়া দ্বাচত্বারিংশৎ। তাহার কয়েকটি ভগ্নদশাপন্ন। মন্দিরের প্রবেশ দ্বার হইতে শেষ পর্যন্ত প্রায় ১৩০ ফীট দীর্ঘ ও পূর্বদ্বার হইতে পশ্চিম দ্বার পর্যন্ত ৩৩টা প্রস্থ।

এলিফান্টা অথবা খারপুরী

এই মন্দির এইক্ষণে নিত্য নিয়মিত পূজার কার্যে ব্যবহৃত হয় না — যবনদের দৌরাত্ম্যে অনেক কাল পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাপি কোন কোন শৈব উৎসবে তথায় হিন্দুযাত্রী সমাগত দেখা যায় ও শিবরাত্রির সময় এক হিন্দুমেলা প্রবর্তিত হয়। এলিফান্টা যে শৈবমন্দির এই মেলার প্রচলনই তাহার প্রমাণ কিন্তু তাহার আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ মন্দিরের অভ্যন্তরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে যে সকল খোদিত মূর্তি বিদ্যমান তাহার অধিকাংশই শৈবমূর্তি। মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র এই সকল পাষাণ মূর্তি 'আধো আলো আধো ছায়া'র মধ্য হইতে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। চতুর্দ্বারবিশিষ্ট একটি প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই প্রকোষ্ঠের বাহিরের চারিদেকে দ্বারপালগণ পিশাচের উপর দিয়া দণ্ডায়মান। উত্তরদিক হইতে প্রবেশ

করিয়া সম্মুখে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ত্রিমূর্তি দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মার গম্ভীর প্রশান্ত মূর্তি বিষ্ণু ও মহাদেবের মধ্যে বিরাজিত। তাঁহার এক হস্তে সন্ন্যাসীর পানপাত্র। বক্ষে অলঙ্কারের শিল্পনৈপুণ্য। ব্রহ্মার বামে বিষ্ণু দক্ষিণ হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন; দক্ষিণে মহেশ্বর— তাঁহার হাস্যদৃষ্টি করস্থিত ফণী ফণার উপর নিপতিত। নরকপাল ও বিল্বপত্র তাঁহার শিরোভূষণ।

ত্রিমূর্তি

ত্রিমূর্তির দক্ষিণে অর্ধনারীশ্বর। বামার্দ্ধ গৌরী ও দক্ষিণার্দ্ধ মহাদেবের মূর্তি। মহাদেবের চারিহস্তের এক হস্ত নন্দী শৃঙ্গোপরি স্থাপিত। এই মূর্তির দক্ষিণে হংসবাহন চতুর্মুখ ব্রহ্মা ও বামে গরুড়বাহন বিষ্ণু। গরুড় এইক্ষণে ছিন্ন মস্তক। উপরিভাগে ও পশ্চাতে অন্যান্য দেব দেবর্ষিগণ বিরাজ করিতেছে। ইন্দ্রদেব ঐরাবত পৃষ্ঠে আসীন।

অর্ধনারীশ্বর

ত্রিমূর্তির বামে হরপার্বতীর বিশাল মূর্তিদ্বয়। হরশিব হইতে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী অভ্যুদিত। মহাদেব দণ্ডায়মান— তাঁহার বাহু চতুষ্টয়ের এক বাহু জনৈক পিশাচের উপর স্থাপিত, তাহার ভারে যেন সে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। শিবের দক্ষিণে তাঁহার অন্যান্য অনুচরগণ, তদুপরি ব্রহ্মা ও শিবের মাঝে ঐরাবত-বাহন ইন্দ্র। পার্বতী শিবের দিকে ঝুঁকিয়া এক পিশাচীর উপর বাম হস্তে ভর দিয়া আছেন, তদুপরি গরুড়াসীন বিষ্ণু। সর্বোপরি ছয়টি মূর্তি তাহার দুইটি নারী অন্যগুলি নরমূর্তি।

হরপার্বতী

ত্রিমূর্তির আরো একটু বামস্থিত পশ্চিম প্রকোষ্ঠে হরপার্বতীর বিবাহসভায় উপনীত হইবে। একজন পুরোহিত লজ্জাশীলা বধূকে আগু বাড়াইয়া দিতেছেন অপরদিকের প্রকোষ্ঠে গণেশ জন্মের অভিনয়।

হরপার্বতীর বিবাহ

হরপার্বতী কৈলাস পর্বতে একাসনে উপবিষ্ট — আকাশ হইতে তাঁহাদের উপর দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। পার্বতীর পশচাতে একটি বামা একটি শিশু কোলে করিয়া আছে।

গণেশ

দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে ফিরিয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠে দেখিবে রাবণ কৈলাস পর্বত সরাইয়া লঙ্কায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। কৈলাস অতিদূরে অবস্থিত বলিয়া রাবণের শিব-পূজার ব্যাঘাত হয় তাই তাহা উঠাইয়া নিজ পুরীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা। এদিকে কৈলাস পর্বত কম্পমান দেখিয়া পার্বতী ভয়ে জড়সড়। মহাদেব তাঁহার পদাঙ্গুলি দ্বারা রাবণের শিরোপরি পর্বত এমন জোরে চাপিয়া ধরিলেন যে তাহার তলে দশানন দশসহস্র বৎসর চাপা পড়িয়া থাকেন, অবশেষে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত আসিয়া তাঁহার উদ্ধার করেন।

কৈলাসতলে রাবণ

ইহা হইতে পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠে গমন করিলে দক্ষযজ্ঞ বৃত্তান্ত খোদিত দেখা যায়।

দক্ষযজ্ঞ

অষ্টভুজ কপালমাল রুদ্রমূর্তি বীরভদ্র দক্ষনিধনে নিযুক্ত— তাঁহার উপরিস্থিত একলিঙ্গের চতুর্দিকে উপবিষ্ট দেবগণ হত্যাকাণ্ড সভয়ে দর্শন করিতেছেন। এই লিঙ্গের উপর একটি আকার আছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে তাহা ওঁকার প্রতিপাদক চিহ্ন।

ভৈরব ও মহাযোগী

আরো কতক পা চলিয়া গেলে প্রবেশ দ্বারের কাছাকাছি মহাদেবের অষ্টভুজ ভৈরব মূর্তি ও যোগাসনস্থিত মহাযোগী এই মূর্তিদ্বয় দৃষ্ট হইবে।

এই সকল খোদিত মূর্তি কল্পনা-যানে আমাদিগকে দেবসভায় উপনীত করে। কোথাও দ্বারপালগণ যষ্ঠিহস্তে পিশাচ সঙ্গে দণ্ডায়মান— কোথাও হরপার্বতীর বিবাহোৎসব— কোথাও মহাদেব ভূতগণ সাথে তাণ্ডব নৃত্যে উন্মত্ত— কোথাও তিনি রুদ্রমূর্তি কপালভৃৎ— কোথাও বা ধ্যানমগ্ন মহাযোগী— কোন স্থানে দেখিবে কমলবাহন ব্রহ্মা— কোন স্থানে শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণু— কোথাও ঐরাবত পৃষ্ঠে ইন্দ্রদেব, গণেশ, কার্তিক, কামদেব— তিলকধারী জটায়ু, কৈলাস শিখরতলে রাবণ— কোথাও গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী মূর্তিমতী। দুঃখের বিষয় যে খোদিত মূর্তি সকল প্রায় সকলি বিকলাঙ্গ অথবা সম্পূর্ণরূপে অঙ্গহীন। কালের হস্তে এই মন্দির ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই— দুর্দান্ত মুসলমানদের অত্যাচারেও ইহার অনিষ্টসাধন হয় নাই— ইহার যে এই দুর্দশা পাশ্চাত্য যবন দানবের উৎপীড়নই তাহার কারণ। এই মন্দির পূর্ণ যৌবনে যে কি সুন্দর ছিল তাহার চিত্র কল্পনাতেই রহিয়া যায়।

এলিফাণ্টার জন্মকাল নির্ণয় করা সহজ নহে। ইহার প্রবেশ পথে যে শিলালেখ্য ছিল

জন্মকাল

তাহা পোর্তুগীস রাজাজ্ঞায় লিসবনে প্রেরিত হয়— সে সময়ে সে লেখা পাঠ করিয়া কেহই অর্থ করিতে পারে নাই। ইহা এই মন্দিরের প্রাচীনত্বের এক প্রমাণ। সকল দিক বিবেচনা করিয়া ইহার বয়ঃক্রম সহস্র বৎসর অবধারিত করা যাইতে পারে।

রাত্রিতে এই গুহামন্দির আলোকিত হইলে সুন্দর দেখায়। যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্

যুবরাজের আগমন

যখন বোম্বায়ে আগমন করেন তখন তাঁহার সম্মানার্থে এলিফাণ্টা দ্বীপে এক ভোজ দেওয়া হয়। সেই উপলক্ষ্যে গুহাভ্যন্তর দীপালোকে সুন্দর রূপে রঞ্জিত হইয়াছিল। মন্দ নয়। শৈবমন্দিরে ম্লেচ্ছ ভোজ— না জানি দেবদেবীগণ কিভাবে এই অঘোরকৃত্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

সিংহলে ভ্রমণ বৃত্তান্ত

১২ আশ্বিন, মঙ্গলবার ১৭৮১ শক।

দুই প্রহরের পাঁচিশ মিনিট পূর্বে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিলাম। ছাড়িতে না ছাড়িতেই ঘোর ঘটা করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমারদের সঙ্গে প্রিয়সুহৃৎ কেশববাবু আর কালীকমলবাবু; তাঁহারা বাষ্পীয় নৌকাতে চড়িয়া তাহার কুঠরির এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। সেখান হইতে উপরে কোন বাঙ্গালিকে দেখিবা মাত্র বাড়ীর লোক মনে করিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া তাঁহারা যে প্রকারে আমাদের সমভিব্যাহারী হইলেন, তাহাতে যে তাঁহারা সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিবেন, তাহার আর আশ্চর্য কি? আর দিন কতক পরেই কেশববাবুর যে সমস্ত গুরুতর ভার লইতে হইবে, তাঁহার অপটু শরীর কেবল উলটাডিঙির দুর্গন্ধ-পূর্ণ দূষিত বায়ু সেবন করিয়া সে সমস্ত ভার বহনে কখনই সমর্থ হইত না। ঈশ্বরের নিকটে প্রণত হইতেছি যে তিনি তাঁহাকে এখানে নির্বিঘ্নে আনিয়াছেন। অদ্যকার দিনের মধ্যে আর কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই; গঙ্গার যে রমণীয় সুদৃশ্যতা, তাহা অন্য কোন সময়ে যদিও নিতান্ত প্রমোদকর হইত, কিন্তু এক্ষণে সমুদ্রকে মনে করিয়া আর তাহাতে মন যায় না। গঙ্গার সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতে করিতে আমাদের সায়ংকাল গত হইল।

১৩ আশ্বিন, বুধবার।

প্রত্যুষে ৪ ঘণ্টার সময় উঠিয়া সাজসজ্জা করিতেই বেলা হইল। বেলা ৯ টার পর আমাদের বাষ্পীয় নৌকা নোঙ্গর উঠাইয়া চলিল। অদ্যকার গঙ্গা অতীব প্রশস্ত— সমুদ্রের কিছু কিছু ভাব পাওয়া যায়। গঙ্গা গোলাকৃতি হইয়া চতুর্দিকেই গগনকে স্পর্শ করিতেছে। এক এক দিকে তাহার তীর কেবল রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। আজও বৃষ্টি। বৃষ্টির সময় আকাশ আর গঙ্গা একাকার হইয়া যাইতেছে। আমরা রৌদ্রের মধ্যে থাকিয়া সম্মুখে দূরেতে বৃষ্টির পতন দর্শন করিতে করিতে অচিরাৎ রৌদ্রকে পশ্চাতে রাখিয়া বৃষ্টি-রাশির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ক্রমে সমুদ্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। কলম্বস যেমন সমুদ্র মধ্যে তটের নানা চিহ্ন দেখিয়া কোন এক নূতন দেশ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; আমরাও সেইরূপ আগ্রহের সহিত সমুদ্রকে প্রতীক্ষা করিতেছি। এক্ষণে যেন গঙ্গার সমুদ্র — ক্রমে তাহার সীমা-চিহ্ন বিলীন হইতেছে। এখন যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেইদিকে তরঙ্গময় জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না; কেবল আমাদের অগ্রপশ্চাৎ এক একখানা জাহাজ নয়নের সম্মুখে পড়িতেছে। ক্রমে জলের বর্ণ পরিবর্ত হইতেছে। ঘোলা বর্ণ, সবুজ বর্ণ, গাঢ় সবুজ, এই তিন প্রকার বর্ণ একে একে দেখা যাইতেছে। কতক দূরে নীল রেখা। আশ্চর্য। আশ্চর্য। গঙ্গার ঘোলা জল একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। এক্ষণে গাঢ় সবুজ, সে নীলবর্ণ আর দেখা যায় না। গঙ্গার

সুশীল ভাব আর নাই; সমুদ্রের তরঙ্গ উঠিতেছে, আমাদের বাষ্পীয় নৌকাকে অস্থির করিতেছে। আঃ সমুদ্রের কি উদার মূর্তি! আমি বিশেষ করিয়া দেখিলাম, সমুদ্র দেখিয়া অনন্তভাব কতদূর উদয় হয়। চক্ষু তরঙ্গের উপর তরঙ্গ হইতে বহুদূরে প্রসারিত হয় এবং ততদূরে গিয়া নিবৃত্ত হয়, যেখানে সমুদ্র আকাশ আর মেঘাবলীকে স্পর্শ করিয়াছে; যেখানে চক্ষু নিবৃত্ত হয়, মন তাহা হইতেও অগ্রগামী হইয়া আরো ধাবমান হয়; এইরূপে অনন্তভাবের উদ্বোধন হইতে থাকে।

সন্ধ্যার সময় সমুদ্র আরো গম্ভীর ও উদার ভাব ধারণ করিল। একে গাঢ় তিমির; তাহাতে নীল সমুদ্র — তাহার উপরে তাঁহার শুভ্র ফেন কি আশ্চর্যরূপে শোভা পাইতেছে। মেঘদূতে এক স্থানে গঙ্গার ফেনকে তাহার হাস্যরূপে বর্ণিত আছে, কিন্তু এই সময়ে সুনীল সমুদ্রের ফেনকেই তাহার অপূর্ব হাস্যের মত দেখা যাইতেছে। আমরা অগাধ সমুদ্রের গর্তে আসিয়াছি। এক্ষণে আকাশ আর সমুদ্র। বোধ হইতেছে যেন সমুদ্র ভিন্ন আর কিছুই সৃষ্টি হয় নাই।

১৪ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।

অদ্য প্রত্যূষে উঠিয়া সমুদ্রকে দেখিলাম একেবারে গাঢ় নীলবর্ণ। এমত নীলবর্ণ কল্পনাও করা যায় নাই। গাঢ় নীল। তাহার নিকটে নীল আকাশ ফিকা হইয়া যায়। বাষ্পীয় নৌকা সমুদ্রের গর্ত্ত বিদারণপূর্বক যেমন দ্রুত বেগে চলিতেছে, তেমনি তরঙ্গ উঠিয়া তাহার নীল জলকে সবুজ করিয়া দিতেছে, এবং তাহার সহিত শুভ্র ফেন মিশ্রিত হইয়া শোভা পাইতেছে। সূর্যকিরণে সমুদ্রের লহরী সকল চক্‌মক্ করিতেছে। সমুদ্রের উপরে এক একবার পক্ষযুক্ত মৎস্য-দল দলবদ্ধ হইয়া অল্প অল্প উড়িয়া যাইতেছে; হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন পক্ষীরা সমুদ্রের উপরে আহার অন্বেষণে উড়িয়া বেড়াইতেছে। যদিও সমুদ্রের এই শোভা দেখিয়া মনের উল্লাস হইতেছে, তথাপি নৌকার দোলাতে প্রাতঃকাল অবধিই আমার গা বমিবমি করিতেছে। ইহাকেই বলে সমুদ্রপীড়া। আর কিছুই ভাল লাগে না। এক্ষণে কোথায় বা শোভা। কোথায় বা সমুদ্র দর্শন। কোথায় বা আমোদ। এখন সকলই শুষ্ক — সকলই নীরস। সমস্ত দিনই অসুখে গেল, রাত্রিতে নৌকার কুঠরির মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিলাম।

১৫, ১৬, ১৭ আশ্বিন; শুক্র, শনি, রবিবার।

কিছুই ভাল লাগে না। সমুদ্রের সঙ্গে বড়ই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। সমুদ্রের নাম শুনিলে, সমুদ্রের উপরে দৃষ্টি করিলে, সমুদ্রের ভাব স্মরণ করিলেও বমি আইসে। আমার সকল অপেক্ষা দুরবস্থা; কিন্তু কালীকমল ভায়া যেমন তেমনি। শয্যা হইতে উঠিবার সময় শরীরকে আর কোন ক্রমে উঠাইতে পারা যায় না; সমুদ্র জলে স্নান করিয়া আরো অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়; আহারের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। বড় কষ্ট। বড় কষ্ট। আমাকে কেহ

জাহাজের উপর হইতে জলে ফেলিয়া দেয় সেও স্বীকার। সমুদ্রে আসিতে কাহাকেও আর পরামর্শ দিতে পারি না। কোন্ দিক্ দিয়া যে কি হইতেছে, কিছুই দেখিতে পাই না।

১৮ আশ্বিন, সোমবার

আমরা তো এত কষ্ট ভোগ করিতেছি, কিন্তু আমাদের জাহাজের আর বিশ্রাম নাই। এর আর রাত্রিদিন বিচার নাই, চলিতেছেই চলিতেছেই — 'ন দিবা ন রাত্রি ন বায়ু বৃষ্টি'। কত ভয়ানক ভয়ানক তরঙ্গ ইহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, কিন্তু ইহার কিছুতেই কিছু হয় না। কি আশ্চর্য। এমন অগাধ সমুদ্রের মধ্য দিয়া আমরা কেমন নির্বিঘ্নে নিঃশঙ্ক হইয়া যাইতেছি। এমন যে ভয়ানক সমুদ্র, এও আমাদের কলিকাতার পথের মত আয়ত্ত হইয়াছে। দেশকালের উপরেই বা মনুষ্যের কি আধিপত্য প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞানবলই বল। আমরা এক্ষণে পরিচালকদিগের হস্তে আমাদের ধনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। বিশ্বাসের এমনি আশ্চর্য গুণ। আমরা নিশ্চয়ই মনে করিতেছি যে ইহারা আমারদিগকে গম্যস্থানে পৌঁছিয়া দিবে। ইহাদের কেহই যদি না থাকে, আর আমরা সকলেই থাকি, এবং এই বাষ্পীয় নৌকার উপরেও যদি অধিকার হয়, তথাপি আমাদের কি দুর্দশা। আমরা ইহাকে কোন্ দিক দিয়া কোন্ সমুদ্রের গুপ্ত পাহাড়ের উপরে চূর্ণ করিয়া ফেলি বলা যায় না। কেবল এক বিশ্বাসের উপরে আমাদের এত নির্ভর। কাপ্তেন সাহেব এবং অন্যান্য লোকের সঙ্গে আমাদের ব্রাহ্মধর্মের কথা হইল। তাহারা মনে করে যে আমরা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান ধর্মের অভিমুখে এক পদ অগ্রসর হইয়াছি। তাহারা অবগত নহে যে তাহাদের দেশস্থ ব্যক্তির মধ্যে অনেকে আমাদের দিকেই আসিতেছে। গত তিন দিবস অপেক্ষা অদ্য অনেক সুস্থ হইয়াছি। আমরা এক্ষণে কেবল ডাঙ্গা! কেবল ডাঙ্গা! করিয়া ব্যস্ত হইতেছি। নীল আকাশ আর ঘননীল সমুদ্র সমান বর্ণ হইলে তাহাদের সীমাচিহ্ন দেখা যাইত না — উভয়ই মিলিয়া থাকিত। সমুদ্রেব শোভা সন্দর্শন করিতে অদ্য ইচ্ছা হইতেছে। সূর্যের অস্তগমন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। সমুদ্রের মধ্যেই যেন সূর্যের নিলয় — সমস্ত দিবস সে ঈশ্বরের কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এক্ষণে বিশ্রাম করিতে গেল। সমুদ্র স্বীয় গর্ভে তাহাকে স্থান দান করিলেন। সূর্য এক্ষণে স্বকীয় রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া এবং সমস্ত মহিমা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অল্প অল্প সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; সূর্য মেদিনীর নিকট হইতে বিদায় লইবামাত্র সমস্ত জগৎ ম্লান মূর্তি ধারণ করিল। এই সময় চন্দ্রমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখি যে তিনিও হাস্য করিতে করিতে উদয় হইতেছেন। কিছু পরেই তাঁহার সচিব স্বরূপ তারকাগণে পরিবেষ্টিত হইলেন। সমুদ্র রৌপ্য বর্ণে রঞ্জিত হইল। এক্ষণকার এই রঙ্গভূমির মধ্যে চন্দ্রেরই প্রাধান্য দেখা যাইতেছে।

হংসোযথা রাজতি পুষ্করস্থঃ সিংহো যথা রাজতি কন্দরস্থঃ।
বীরো যথা রাজতি সঙ্গরস্থোরাজ চন্দ্রোপি তথাহম্বর স্থঃ ॥

হংস যেরূপ পুষ্করস্থ হইয়া বিরাজ করে, সিংহ যেরূপ কন্দরস্থ হইয়া বিরাজ করে, বীর যেমন সঙ্গরস্থ হইয়া বিরাজ করে, চন্দ্রও সেইরূপ অম্বরস্থ হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন।

১৯ আশ্বিন, মঙ্গলবার।

এক সপ্তাহ অতীত হইল। অদ্য কূল দেখা যাইতেছে। আমাদের সম্মুখে বন, উপবন, পাহাড়, পর্বত, বালুতট যেন চিত্রিত রহিয়াছে; পাহাড়গুলি দূর হইতে মেঘমালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। দূরের পাহাড় দূরস্থিত মেঘের ন্যায় অস্পষ্ট;নিকটের গুলি ঘন মেঘের মত। দূরবীক্ষণ দিয়া বনরাজি আরো স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আজি হয়তো সিংহলে পদ নিক্ষেপ করা যাইবে। বিঘ্ন-বিনাশন বিল্বপাতা আমারদিগকে কত প্রকার বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ করিয়া আনিলেন। জাহাজ একটুকু বিপথগামী হইলে কৃত ভয়। সমুদ্রতলশায়ী এক পর্বতে ঠেকিলে জাহাজ চূর্ণ হইয়া যায়। এক এক ঝঞ্ঝাতে সমুদ্রই আমাদের মৃত্যুশয্যা হইতে পারে। আমরা বিপদকেই গুরুভার বিশিষ্ট মনে করি, কিন্তু নিমেষে নিমেষে আমরা কত রাশি রাশি বিপদ যে অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, তাহার জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হই না। কি আশ্চর্য। এখন প্রায় বেলা ৩ ঘণ্টা, এখনো পর্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে। সিংহলদ্বীপকে ভূচিত্রে দেখিলে 'ভারতবর্ষের হারের ধুক্‌ধুকির' মত বোধ হয়। কিন্তু আমরা সমস্ত দিবস ক্রমাগত চলিয়া তাহার এক পার্শ্ব দেশও শেষ করিতে পারিলাম না। সমুদ্রের মধ্য হইতে সিংহলের শোভা দেখিতে অতি সুরম্য হইয়াছে। সমুদ্র প্রান্তের অস্পষ্ট নীলবর্ণ — তাহার উপরে গৌরবর্ণ বালুতট — তাহার পশ্চাতে শ্যামবর্ণ বনরাজি, — পরে মেঘমালার ন্যায় প্রতীয়মান পর্বতশ্রেণী — এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বস্তু মিলিয়া চমৎকার শোভা ধারণ করিয়াছে — আমাদের সম্মুখে ঠিক যেন একখানি চিত্রপট রহিয়াছে। অদ্য ও 'গাল' পাওয়া গেল না। অদ্য সমুদ্রের উপরে আমাদের শেষ দিন। এ সমুদ্রের সঙ্গে যদিও বিষম বিবাদ গিয়াছে, তথাপি ইহাকে ছাড়িতে এক্ষণে তেমন ইচ্ছা করিতেছে না। কলিকাতায় ধূলি যেমন সুলভ, এখানে পরিশুদ্ধ বায়ুও সেই প্রকার। কলিকাতার সমুদয় ধনীর সমুদয় ধন একত্র করিলেও ইহার একটি হিল্লোল ও ক্রয় করা যায় না। সৃষ্টির সমুদয় শোভাই এখানে একত্রীভূত — মনুষ্যের কার্য অতি অল্প। কলিকাতাকে ভুলাইয়া রাখিবার বস্তুই অনেক। সেখানে আমরা চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, নক্ষত্র, প্রত্যহ এই রূপই দেখি, কিন্তু এখানেই তাহাদের আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ পায়। কতকগুলি কৃত্রিম শোভা দৃষ্টিকে আর আচ্ছন্ন করিতে পারে না। এই সকল স্থানকে যাহারা শূন্য মনে করে, তাহারা কোন চিত্রলেখার ন্যায় চন্দ্র সূর্যেরই শোভা দর্শন করে; কিন্তু যাহারা ইহাকে দেব-মন্দির করিয়া দেখে, তাহাদের নিকটে এ সকল নূতন শোভায় সুশোভিত হয়। অদ্য দুর্গোৎসবের অষ্টমী পূজা, কিন্তু ধূপধূনায় সুবাসিত, মেষমহিষের রক্ত-রঞ্জিত, নৃত্যগীতে আমোদিত, জনকোলাহলে পরিপূরিত দুর্গোৎসব এখানকার উৎসবের নিকটে কোথায় আছে? এখানকার উৎসব নূতন প্রকার।

গগনমে থাল রবিচন্দ্র দীপক
বনে তারকা মণ্ডল জনক মোতী
ধূপমলয়ানলো পবন চমরো করে
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি।
কৈসী আরতী হোয় ভবখণ্ডন তেরী আরতী।
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।

এখানে ঈশ্বরের আরতীতে গগনই থাল; রবি চন্দ্র প্রদীপ স্বরূপ তারকাগণ মণিমুক্তা, মলয়ানল হইতে ধূপ উত্থিত হইতেছে, পবন স্বহস্তে চামর ব্যজন করিতেছে, সকল বনরাজি পুষ্পিত হইয়া রহিয়াছে, অনাহত হইয়াও যেন ভেরীর নিনাদ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে।

২০ আশ্বিন, বুধবার।

সিংহলদ্বীপের গাল পুরী সম্মুখে। আহা! কি শোভা! সমুদ্রতীর পর্যন্ত সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ সকল উন্নত-মস্তক হইয়া আছে। আমাদিগের বাম পার্শ্বে সমুদ্রের তরঙ্গ-রাজি আকণ্ঠনিমগ্ন পর্বতের মস্তকে রোষ পূর্বক আঘাত করিয়া ফেনরাশি উদ্গার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক এক তৃণাচ্ছাদিত উচ্চভূমি শ্যামশোভা ধারণ করিয়াছে। সম্মুখে সূর্যকিরণে উদ্দীপ্ত এক একটি কুটীর বিনীতভাবে স্বীয় পরিচয় দিতেছে। রঙ্গভূমির আবরণ হঠাৎ মুক্ত করিলে যেরূপ বিস্মিত হইতে হয়, আমরা প্রাতঃকালে জাহাজের উপরে উঠিয়া একেবারেই এখানকার এই আশ্চর্য দর্শন দর্শন করিয়া সেইরূপ হইতেছি। আমাদের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরী মৎস্যের ন্যায় জলের উপরে ক্রীড়া করিতেছে। এক একটি নৌকা আমাদের ডোঙ্গার মত সরু, কিন্তু প্রায় দেড় হস্ত উচ্চ, তাহার মধ্যে দুইটি পদ কোন প্রকারে রাখা যায়। নৌকার উপর হইতে পরস্পর-অন্তরবর্তী দুইটি বাঁশ বক্রভাবে একদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে, আর একটি বড় কাষ্ঠ সেই দুই বাঁশের দুই প্রান্তে আবদ্ধ হইয়া ভাসিতেছে, তাহাতেই নৌকা উল্‌টিয়া পড়িতে পারে না। আজ সোনার লঙ্কায় পদক্ষেপ করা যাইবে, ইহাতে আর আমাদের আনন্দের সীমা নাই। কল্পনাপথে যে কত কি আসিতেছে, বলিতে পারি না। এক এক নৌকার উপরেই আমরা বিচিত্র ধর্মাবলম্বী লোক দেখিতেছি। কেহ এক টুপি মাথায় দিয়া রোমান্ কেথলিক্ সাজিয়া আছে। কেহ রঙিন বস্ত্র পরিয়া আপনাকে বৌদ্ধরূপে পরিচয় দিতেছে। আমরা কূলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছি। নূতন দেশ, নূতন লোক, নূতন শোভা; সকলই নূতন দেখিব, এইরূপ মনে হইতেছে। দুই প্রহরের পূর্বে আমরা 'নিউবিয়া' বাষ্পীয় পোত হইতে বিদায় লইলাম এবং তীরে যাইবার জন্য এক ডিঙ্গিতে চড়িলাম। গালে উঠিবামাত্র সকলে আমাদের উপরে তাকাইয়া উপরে তাকাইয়া রহিল। আমরা শীঘ্র শীঘ্র এক উত্তরণশালাতে চলিলাম। একি; গিয়া দেখি সকলই আশার বিপরীত। কলার গাছ, ভাঙ্গা প্রাচীর, খোলার ঘর; সকলই নয়ন তৃপ্তিকর। আবার কলিকাতার বদ্ধভাব। গৃহের প্রাচীর আকাশ বায়ু জ্যোতিঃ এ তিনকেই রুদ্ধ

করিতেছে। সমুদ্র নিকটবর্ত্তী বলিয়া বায়ু কেবল স্বাস্থ্যকর। ত্বগিন্দ্রিয় ব্যতীত আর কোন ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি নাই। সকল দ্রব্যের মূল্য কলিকাতার এইক্ষণকার দরের অষ্টগুণ — বারোগুণ। এখানকার সকল ভৃত্যেরাই বালক — বাস্তবিক সকলে বালক নহে, কিন্তু ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের ভৃত্যকেও 'বালক' শব্দে সম্বোধন করে। ইহাদের মাথায় খোপা বাঁধা আর তাহাতে এক একটা কাঁচকড়ার চিরুনি গোঁজা। স্ত্রীলোক আর শ্মশ্রু-বিহীন পুরুষকে বাছিয়া লওয়া বড় দায়। কোথায় বা সোনার লঙ্কা, কোথায় বা অশোক বন সকলই চমৎকার। কেশববাবু উত্তরণশালায় আসিয়াই আপন হস্তে রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫ ঘণ্টা যাবৎ অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইয়া এবং ধূম ভক্ষণ করিয়া জ্বর ও শিরঃপীড়াতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। আহারের মত কিছুই হইল না। রজনীতে কোন মতে পড়িয়া রহিলাম।

২১, ২২ আশ্বিন;বৃহস্পতিবার, শুক্রবার।

দিবসের মধ্যে সকলেরই এক এক মনোনীত সময় থাকে — সেই সেই সময়কে সকলে আগ্রহপূর্ব্বক প্রতীক্ষা করে। সমস্ত দিবসের মধ্যে কেহ ভোজনের সময়ের প্রতি চাহিয়া থাকে, কেহ বা রজনীর আমোদ প্রতীক্ষা করিয়া গুরুভারাক্রান্ত দিবসকে কোন প্রকারে কর্ত্তন করে। আমাদের সময় আর ঔষধ খাইবার সময় সমান। কলম্বোতে যাইব মনে ছিল, তাহাও দেখিতেছি হইল না। এই গাল দুর্গেই রুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে, আমাদের কেবল এই পান্থশালা হইতে অন্য পান্থশালাতে যাইবার কথা হইতেছে; তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ সুস্থ হওয়া যায়। এই পান্থশালায় আসিয়া এক দিবস ফ্রীমেসনদের বিষয় কিছু কিছু শুনিয়াছি। এই পান্থশালা-রক্ষক একজন ফ্রীমেসন। তিনি বলিলেন, এই সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ নাই। সকল ধর্ম্মের লোকই ইহার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। গোপনই ইহারদের ধর্ম বলিলেও হয়। আরো বলিলেন, ফ্রীমেসনেরা পৃথিবীর সকল স্থানেই বিকীর্ণ হইয়া আছে — তাহারা আপনাদের মধ্যে কতকগুলি সঙ্কেত দ্বারাই পরস্পরকে চিনিতে পারে। ফ্রীমেসনদিগের মধ্যে যে যত উচ্চ পদপ্রাপ্ত হয়, সে তাহাদের গুপ্ত বিষয়-সকল ততই জানিতে পারে। আশ্চর্য এই যে এখনো তাহাদের রক্ষিত কথা কিছুই প্রকাশ পায় নাই। 'ষট্‌কর্ণোভিদ্যতে মন্ত্রঃ' একথা ইহাদের মধ্যে এখনো প্রয়োগ করা যায় না।

২৩ আশ্বিন, শনিবার।

এবার সৃষ্টির দুই প্রকাণ্ড কাণ্ড দেখিবারই আশা ছিল — সমুদ্র আর পর্বত; কিন্তু পর্বতের কিছুই দেখা হইল না। এখানে ৮০০০ ফীট পর্যন্ত উচ্চ পর্বত আছে — হিমালয়ের সিমলা পর্বতের সমান; কিন্তু এখানকার পর্বতে তুষার নাই। এখানে এক সুবিধা এই যে কয়েক দিবসের মধ্যে সমস্ত দ্বীপটা ঘোরা যায়। এখান হইতে প্রত্যুষে ডাকের গাড়িতে উঠিয়া দশ ঘণ্টায় কলম্বো যাওয়া যায়; কলম্বো হইতে দশবার ঘণ্টায় কান্দীতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

কান্দীর নিকটেই সিংহলের দেখিবার বিষয় সকল বিদ্যমান আছে। তাহার অনতিদূরে উচ্চ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে শীতের প্রাদুর্ভাব এবং সেই সকল পর্বত প্রদেশের শোভা ভুবনবিখ্যাত। আদমশৃঙ্গ বলিয়া এক পর্বতের চূড়াতে একটি পদচিহ্ন রহিয়াছে, কেহ বলে সে হনুমানের পদচিহ্ন; কেহ বলে বুদ্ধদেবের। সিংহলের মধ্যস্থল কান্দী। মেড় য়াবাদী আর প্রকৃত হিন্দুস্থানীর মধ্যে যত প্রভেদ, সমুদ্রধারের লোক আর সেখানকার লোকেও তত প্রভেদ, কিন্তু এখনকার বালক পরিচারকগণকে দেখিয়া সিংহলবাসীদিগের প্রকৃত ভাব কিছুই বুঝা গেল না। সিংহলের সমগ্র চিত্র চিত্রিত করিতে হইলে এখানে আমাদের কত প্রকার করিয়া বেড়ান আবশ্যক। পুরাবৃত্ত-বেকার ন্যায় এখানকার পূর্ব পূর্ব বৃত্তান্তের অনুসন্ধান করা; কবির ন্যায় এদেশের শোভনতম স্থান সমুদয় পর্যবেক্ষণ করা; পর্যটকের ন্যায় এখানকার গ্রাম নগরের ভাব দেখা, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের ন্যায় নূতন বৃক্ষ পল্লবাদি ও নূতন পশু পক্ষী সকল নিরীক্ষণ করা; দুই এক প্রধান প্রধান লোকের সঙ্গে আলাপ করা; এখানকার আচারব্যবহার ও প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মের বিষয় শিক্ষা করা; এখানে আমাদেব সংক্ষেপের মধ্যে এত কার্য। কবি, পণ্ডিত, পর্যটক, পুরাবৃত্তবেত্তা — ইহারদের এক এক জনের মত হইয়া দেখিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা হয়। অদ্য এক নূতন পান্থশালায় আসিয়াছি। আহারের সামগ্রী এখানে অপেক্ষাকৃত উত্তম পাওয়া যায়, আর এখান হইতে সমুদ্রের মাহাত্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ঠিক সম্মুখে সমুদ্রের উপরে নদীর শোভা দেখা যাইতেছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি শৈলখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; তাহাতে কলকল শব্দ অবিশ্রান্ত শুনা যায়। আমাদের সম্মুখে একটা পাহাড়ের উপরে একটি নারিকেল গাছ একাকী রাজত্ব করিতেছে; সেখানে তাহার আর কেহই নাই। সন্ধ্যার পূর্বে এক উচ্চ আলোক-গৃহ হইতে সিংহল দ্বীপের শোভা দর্শন করিলাম। কত পাহাড় ও কত পর্বত-শ্রেণী! আমাদের আশা অতি দুরারোহিণী না হইলে এস্থান সর্বতোভাবেই প্রার্থনীয় হইত।

২৪ আশ্বিন, রবিবার।

দূর হইতে ক্লেশের মূর্তি অতি মনোহর। উপন্যাস বা পুরাবৃত্তে বিপদগ্রস্ত ও দুর্দশান্বিত মহাত্মাদিগের সঙ্গে আমারদের যেমন প্রণয় হয়, এমন আর কাহারো সঙ্গে হয় না। আমাদের এখানে যে সকল কষ্ট গিয়াছে, তাহা কাহারো নিকটে বর্ণনা করিলে তিনি হয়তো আমাদের সহযোগী হইতে ইচ্ছা করিবেন। আমাদের অবস্থা দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারেন — জাহাজ ভগ্ন হইয়া গিয়া আমাদের যেন কোন উপদ্বীপে ফেলিয়া দিয়াছে; আমরা কোন রূপে দিনপাত করিতেছি। আমাদের পান্থশালা-রক্ষকের নিকট হইতে বৌদ্ধধর্মের বিষয় কিছু কিছু শ্রবণ করিলাম। লোকেরা ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে। যে কোন পীড়া ঔষধে আরাম না হয়, তাহার চিকিৎসা ভয়ানক প্রকার। এই প্রকার রোগীকে তাহারা ভূতে পাইয়াছে মনে করে। ভূত নাচাইবার জন্য তাহারা ধূনা জ্বালিয়া বাদ্যোদ্যম আরম্ভ করে; আর রোগীকে দিবারাত্রি

অনাবৃত স্থানে রাখিয়া তাহার অবশিষ্ট জীবনকে শীঘ্রই শেষ করিয়া ফেলে। বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহের বিধি আছে, তাহারদিগের বিবাহ করিতে নিষেধ। এখানেও কিছু কিছু খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার হইয়াছে। খ্রীষ্ট ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন নানা সম্প্রদায়ের মত এখানে স্থান পাইয়াছে। মিশনারিদিগের আক্রমণ হইতে কোন দেশই বিমুক্ত নহে। উহারদের পরিশ্রমকে ধন্যবাদ। এই প্রকার প্রবর্তক যদি আমাদের ধর্মে এক একজন পাওয়া যায়, তবে সকল পৃথিবীতেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ধ্বনিত হইতে থাকে।

২৫ আশ্বিন, সোমবার।

বেলা দশটার পর এক ডালচিনির উদ্যান দেখিতে চলিলাম। গিয়া দেখিলাম সে স্থান বড় মন্দ নয়। সম্মুখে এক ক্ষুদ্র নদী বহিতেছে; তাহার নাম গিঞ্জিরা। উদ্যানে নানা জাতীয় বৃক্ষ রোপিত আছে। সকল প্রকার মসলারই গাছ দেখিলাম। ডালচিনির গাছের কিছুই ফেলা যায় না। তাহার মূলে কর্পূর-তৈল হয় — পত্রে লবঙ্গের তৈল প্রস্তুত হয় — জলে ডালচিনি হয়। কি আশ্চর্য। আমরা কোথায় ছিলাম, ইহার মধ্যে আমরা সাগর পার হইযা নদীর ধারে এক ডালচিনির উদ্যানে বসিয়া আছি। ফিরিয়া আসিবার সময় এক বৌদ্ধমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। বৌদ্ধদের মানব দেবতা বুদ্ধ প্রায় ১২ হস্ত উচ্চ আসন করিয়া ধ্যানে বসিয়া আছেন। তাঁহাব পার্শ্বে আর দুইটি প্রতিমূর্তি দণ্ডায়মান আছে। পুরোহিতের সঙ্গে আমাদের ভাঙাচুরা সংস্কৃত ভাষায় কথা আরম্ভ হইল। প্রতি কথার শেষেই 'এবং' বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতে লাগিলেন এবং 'নাস্তি' শব্দে স্বীয় অনভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উক্ত দুই প্রতিমূর্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল যে একের নাম কোনাগম বুদ্ধ, দ্বিতীয়ের নাম কাশ্যপ বুদ্ধ, মধ্যে বৃহৎ বুদ্ধ যিনি তিনি গৌতম বুদ্ধ। ইহাদের আবির্ভাব এক সঙ্গে নয়। কোনাগম আদিবুদ্ধ সর্বশেষে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব। জগৎ নিত্য কি সৃষ্ট এই প্রশ্নে পুরোহিত উত্তর করিলেন, 'সকলই অনিত্য' জগৎও আনিত্য, ঈশ্বরও অনিত্য, কেবল নির্বাণই নিত্য। নাথাকা, বিনাশ, নির্বাণই সর্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল। এক্ষণে কাহারো ধ্যানে অধিকার নাই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকিলে সে অধিকার জন্মে না। আমরা এক প্রাচীরে নরক চিত্রিত দেখিলাম। ভয়ানক। অগ্নি জ্বলিতেছে, আর চারি দৈত্য একটাকে ছিঁড়িয়া কাটিয়া খাইতেছে। এই প্রকার নরকের ভয় দেখাইয়া খ্রীষ্টান ধর্মও রাজত্ব করিতেছে। এই মন্দিরে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি অনেক অনেক দেবতারও মূর্তি রহিয়াছে, কিন্তু ইহাদের পূজার বিধি নাই; কেবল বুদ্ধদেবের পদতলেই পুষ্প বিকীর্ণ রহিয়াছে। রাম রাবণের যুদ্ধের কোন কথাই নাই;বিভীষণের মূর্তি চিত্রিত দেখিয়া রাম রাবণের কথা অনেক জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরোহিত তাহার কিছুই বলিতে পারিল না। বৌদ্ধ ধর্মে অহিংসা পরম ধর্ম কিনা? জিজ্ঞাসা করিলাম। পুরোহিত বলিলেন, 'আমরা স্বহস্তে বধ করিয়া কোন জীবকে ভক্ষণ করি না, কিন্তু অন্য কেহ বধ করিয়া দিলে সে পশুর মাংস আমরা ভোজন করি।' পলাইবার বড় সহজ উপায়। অন্যান্য বৌদ্ধদের হিংসা করিবার ধর্মতঃ বিধি কি

নিষেধ, ইহা বুঝাইতেও পারিলাম না, বুঝিতেও পারিলাম না; কেবল এইমাত্র উত্তর পাইলাম, অন্য কাহারো বৌদ্ধ ধর্মে নিষ্ঠা নাই। পুরোহিত বলিলেন, গুরু 'নির্বাণং গতঃ'। আমরা তাহাকে যে তাহার জীবিতবান গুরুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি ইহা অনেক করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। সে আমাদিগকে নিকটবর্তী পর্ণশালাতে এক কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিত পুরুষের নিকটে লইয়া গেল। আমরা এক খাটিয়ার উপরে বসিলাম। গুরুর সঙ্গে কোন কথাই হইল না। তিনি গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। আমরা শীঘ্র শীঘ্র বিদায় লইয়া আসিলাম। পুরোহিত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আইলেন। তাঁহার গুরুর মৌনভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে পুরোহিত বলিলেন, অয়ং মৌনী, কিন্তু তাহাদের আপনাদের মধ্যে বিলক্ষণ কথা চলিতেছিল। আমরা শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হইয়া আসিলাম।

২৬ আশ্বিন, মঙ্গলবার।

বেলা দুইটাব পর এক পাহাড় দেখিতে চলিলাম। দুধারে বনজঙ্গল, তাহার মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে। আমাদের দেশে নারিকেল গাছের ছায়াই হয় না, এখানে নারিকেলের নিবিড় জঙ্গল দেখা যায়। এই পাহাড়ের উপর হইতে চতুর্দিক দেখিতে বড় সুন্দর। বঙ্গদেশ ছাড়িয়া আসিয়াছি, এমন বোধ হয়। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় — এক এক পাহাড়ে এক একটি কুটীর দেখা দিতেছে — নীচে ক্ষেত্র-জলধারা, সকলই এমন ক্ষুদ্র দেখায় যেন কে একখানি ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে। এখানে অল্পক্ষণ থাকিয়া চলিয়া আইলাম। বাগান দেখিবার মূল্য স্বরূপ দুই শিলিঙ্গ দিতে হইল। এখানকার সকল স্থানেই পৌণ্ড্র শিলিঙ্গ পেন্‌স ভিন্ন আর কথাটি নাই। আসিবার সময় আর একটি বৌদ্ধ-মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। বৌদ্ধধর্ম জানিবার আমার বড়ই কৌতূহল। বৌদ্ধ ধর্ম বড় সহজ ধর্ম নহে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এ ধর্মের অবলম্বী। উক্ত মন্দির একটি নির্জন উচ্চ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, উঠিবার সময় কিঞ্চিৎ কষ্ট বোধ হয়। অদ্যকার মন্দির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন — মন্দির বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি দেখিতে অতি সুন্দর। এই মন্দিরের অঙ্গনে এক স্থানে দেখিলাম যে একটি পুরোহিত বালক বসিয়া পুঁথি পাঠ কবিতেছে; কতকগুলি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক শ্রোতার ন্যায় বসিয়া আছে। আমরা কতকক্ষণ পাঠ শ্রবণ করিলাম। তাহাতে 'পুত্র পৌত্র কলত্র', এই প্রকার এক একটা কথা বুঝিতে পারিলাম। পাঠ সাঙ্গ হইবামাত্র শ্রোতাগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া মৃদুস্বরে কি পাঠ করিতে লাগিল। মন্দিরের নিকটে একটি 'ভাগোবা' রহিয়াছে, দেখিতে কোন সমাধি মন্দিরের মত; শুনিলাম তাহাতে বুদ্ধের দন্ত স্থাপিত আছে। সেই স্থানে কতকগুলি স্ত্রীলোক আসিয়া ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছে। যাহা হউক এই মন্দিরকে মন্দির বলিয়া বোধ হয়। পূর্ববৎ এখানে বুদ্ধের তিন মূর্তি দেখিলাম না। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার মতনও কোন লোক পাইলাম না। শীঘ্র বাসগৃহে চলিয়া আইলাম। অদ্য পূর্ণিমা, 'রজনী কি সুখদায়িনী' হইয়াছে। এ রজনীকে দেখিলে বোধ হয়, যেন ইহা নিদ্রার জন্য হয় নাই।

২৭ আশ্বিন, বুধবার।

অদ্য প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিলাম —

যাত্যেকতোস্তশিখরং; পতিরোষ ধী নাং
আবিষ্কৃতারুণ পুরঃসর এক তো হর্কঃ।

ইহার শেষভাগেও কালিদাসের কবিত্ব শক্তি মনে উদিত হইল—

তেজোদ্বয়স্য যুগপৎব্য সনোদয়া ভ্যাং
লোকোনিয়ম্য তইবাত্ম দশান্তরেষু।

একদিক দিয়া চন্দ্রমা অস্তোম্মুখ হইতেছেন, অন্য দিকে অরুণকে সম্মুখে করিয়া সূর্যদেব উদয় হইতেছেন; ইহাদের মধ্যে একের ব্যসন, অন্যের উদয় ইহাতেই যেন সমুদায় লোকেরা আপন আপন অবস্থায় নিয়মিত হইতেছে চন্দ্রমার ব্যসন যথার্থই বটে — তাহার মুখশ্রী কি ম্লান ও বিপন্ন। তাহার আসন্ন বিপদ দেখিয়া তারকাগণ কে কোথায় চলিয়া যাইতেছে।

"এমন যে বন্ধু তারা, স্বচ্ছন্দে এখন তারা,
তারে ফেলে যায় একে একে।"

চন্দ্রমাকে যে মেঘের মধ্য দিয়া কোন অদৃশ্য হস্ত টানিয়া লইল কিছুই বলিতে পারি না। চন্দ্রমার দুর্দশা দেখিয়া কোথায় সকলে দুঃখ করিবে, না চতুর্দিক আরো প্রসন্ন হইয়া উঠিল। বিপদের সময় এইরূপই বটে। এ প্রদেশ যে আমাদের শরীরের পক্ষে কিরূপ বলিতে পারি না। শুনিলাম, বৎসরের মধ্যে ঋতুর বিশেষ পরিবর্তন নাই। শীতকালে বড় শীত হয় না — দিবসের মধ্যে মেঘ একবার দেখা দিতেই চায়।

আমার পিতামহাশয় এক্ষণে কিছু অসুস্থ আছেন। এখানে আসিয়া প্রায় দুই দিবস অনাহারে ছিলেন; এখনো তাঁহার আহার ভাল হইতেছে না। শরীর কাহার কেমন হয়, তাহার পরীক্ষা কলিকাতাতেই হইবে। এখানে কোন এক সম্ভ্রান্ত সিংহলীর সহিত আলাপ করিবার নিতান্ত অভিলাষ আছে। বৌদ্ধ ধর্মের বিষয় বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের মধ্যেই এই ধর্মের প্রাদুর্ভাব; ইহা অবশ্যই বিশেষরূপে শিক্ষণীয়। আমরা যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, এ বড় সামান্য স্থান নয়। সম্মুখে সমুদ্র নয়, ভারতবর্ষীয় মহাসমুদ্র। শোভাও অতি মনোহর। চন্দ্রমার প্রভাবে এক্ষণে রজনী জ্যোতিষ্মতী ও লাবণ্যময়ী হইয়াছে। চন্দ্রমা ও তারকাগণের প্রতি নেত্রপাত করিলে সে সকলকে দূরস্থিত অপরিচিত বস্তুর ন্যায় বোধ হয় না। আমাদের সঙ্গে যেন তাহারদের কি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। নক্ষত্র তারার উজ্জ্বল পত্রের মধ্যে যাহারা এ পৃথিবীর ঘটনাসূত্র পাঠ করে, তাহাদের নিতান্ত দোষ নাই। দূর হইতে জ্যোতির্গণের মাহাত্ম্য এরূপ দেখায় যে মনুষ্য তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারে না।

২৮ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার

প্রাতে সিংহলের স্থানের স্থানের বর্ণনা শুনিলাম। এক্ষণে এই প্রকার বর্ণনাতে আমাদের কৌতূহল-অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দেওয়াই সার হয়। কেবল সমুদ্রের গুণে আমরা এস্থানে টিকিয়া আছি; সূর্যের উত্তাপ যেরূপ প্রখর, সমুদ্র বায়ু ব্যতীত এখানে থাকা ভার হইত। সমুদ্রের সৎসংসর্গেই ইহার দোষ সকল ঢাকিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এস্থান আর ভাল লাগে না, এস্থানের নূতনত্ব চলিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় পূর্বোক্ত ডালচিনির উদ্যানে আইলাম। সুন্দর নির্জন স্থান। চতুর্দিক গাছপালায় পরিপূর্ণ— বোধ হয় কোন বনের মধ্যে বসিয়া আছি। এখানে বায়ু শীতল— স্বভাবের সকলই কিছু কিছু আছে, নদী বন সমুদ্র, সমুদ্রের নিনাদ সর্বদাই শুনা যায়। একজন সাহেব উদ্যান রক্ষক, তাহার নিকটে সিংহলীদের কথা কিছু কিছু শ্রবণ করিলাম। ছোটলোকদের মধ্যে সততা নাই। মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর যে একটি বিশ্বাস, যাহা না থাকিলে পৃথিবীতে এক পদও. চলা যায় না, তাহা এখানে অতি অল্প। সে দিন দেখিলাম একজন বালক ছড়ি বিক্রয় করিতে আসিয়া আমাদের ক্রীত ছড়ির মধ্যে কতকগুলি লইয়া পলায়ন করিল। প্রভু আপন ভৃত্যদিগকেও তেমন বিশ্বাস করেন না। যাহারা ধর্মের জন্য সততা অবলম্বন না করে, স্বার্থের জন্যও তাহাদের করা উচিত।

২৯ আশ্বিন, শুক্রবার

প্রত্যুষে উঠিয়া এক নৌকাতে আরোহণ করিয়া নদীতে চলিলাম। দুই ডোঙ্গা কঞ্চি দিয়া একত্রে বাঁধা, তাহার উপরে নারিকেল পত্রের একটি আচ্ছাদন, এই আমাদের নৌকা হইল। নদীর উপযুক্ত নৌকা বটে — নদী এমত গভীর যে এই নৌকাও এক এক বার চড়ায় আটকিয়া যাইতে লাগিল। নদীটি ঠিক খালের মত, এখানে ইহাকে গিঞ্জিরা নদী বলে, কিন্তু সকল স্থানে ইহার নাম সমান নহে; যে স্থান দিয়া গিয়াছে সেই স্থানের নাম ধারণ করিয়াছে। এমন তো ক্ষুদ্র নদী, কিন্তু ইহাতে বড় বড় কুম্ভীর আছে, এই ভয়ে ঘাটের সামনে স্নানের জন্য বেড়া দিয়া রাখিয়াছে। এই নদী কান্দীর পাহাড় হইতে বহমানা হইতেছে এবং প্রায় ৪০ ক্রোশ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই নদীতে যাইতে যাইতে এক এক স্থানে উত্তম শোভা দেখিলাম। এক এক স্থান দেখিতে সুন্দরবনের কোন কোন নদীর মত। কত নিবিড় বন, কত কত পাহাড়, কত ইক্ষুর ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে এই বক্রগামিনী নদীর মধ্য দিয়া চলিলাম। নদীর ধারে নারিকেল বৃক্ষের নিবিড় বনও দেখা যাইতেছে। এখানে নারিকেল বৃক্ষই অনেক; চাল আর নারিকেল ফল; ইহাতেই লোকদিগের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। সকল প্রকার রন্ধনের সামগ্রীতেই ইহারা নারিকেল ব্যবহার করে। নারিকেল হইতেই এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়।

গুনিমলঘ নামক এক স্থানে নামিয়া আহারাদি করিলাম। এক বৃদ্ধ লোক আমারদিগকে কতকগুলি ভাঙ্গা চৌকি আনিয়া দিয়া যথাসাধ্য আতিথ্য করিল। আহারান্তে পুনর্বার নৌকায় চড়িয়া বেলা একটার সময় আমাদের গম্যস্থান বাডিগামে পৌঁছিলাম। উঠিয়া এক বিদ্যালয় ও

তৎসংলগ্ন এক উপাসনালয় দেখিলাম। বিদ্যালয়ের কতকগুলি বালিকা বস্ত্রসিলাই শিখিতেছে। শুনিলাম, অহারা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী। মিশনারিদিগের পরিশ্রমকে ধন্যবাদ। কোন বাধাই তাহাদের নিকটে বাধা নহে। বাডিগাম হইতে অনেকানেক ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়। সূর্যের কিরণ পড়িয়া এক একটা পাহাড় উজ্জ্বল সবুজ বেশে সুশোভিত হইয়াছে;তাহার নিকটের পাহাড়গুলি কিরণাভাবে আর তেমন প্রকাশ পাইতেছে না, কিন্তু বিবর্ণ ও মলিন বেশে রহিয়াছে; আবার অচিরৎ কিরণের সংস্পর্শ পাইয়া তাহারা যেন জীবন পাইতেছে। বাডিগাম হইতে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আইলাম, আর বিশেষ কিছু দেখা হইল না। আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। রাত্রিতে সুখে নিদ্রা গেলাম;উদ্যানের বৃক্ষগণ আমাদিগকে প্রহরীর ন্যায় পরিপালন করিতে লাগিল।

৩০ আশ্বিন, শনিবার।

নির্বিঘ্নে রজনী যাপন করিয়া প্রত্যুষে উঠিলাম। এখানে আমাদের আর কে আছে? সেই অনন্তস্বরূপই এখানে আমাদের রক্ষক। এমন দূরদেশে আসিয়াও আহারের জন্য বিশেষ ভাবিতে হইতেছে না;এবং শরীর রক্ষার জন্য কোন বস্তুরই অভাব নাই।

কাহেরে মন চিতবে উদম যা আহর হরজীউ পরেয়া।
শৈল পথরমে জন্তু উপায়ে তাকে রিডাক আগে কর ধরেয়া।

কেন এত চিন্তাকুল হও, ঈশ্বর তোমর জন্য স্বয়ং অনুপান পরিবেশন করিতেছেন; কঠোর শৈলখণ্ডেও যে সকল জন্তু দেখা যায়, অগ্রে তাহাদের অন্নপানের সংস্থান করিয়া দিয়া তবে তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমরা এতদূরে এক নির্জন স্থানে কোথায় এক উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছি, ইহাতে মনে কত ভাবেরই উদয় হয়। যাহারা নগরের কোলাহলের মধ্যেই জীবন যাপন করে — যাহারা বিষয়চেষ্টা বা আমোদপ্রমোদেই সময়কে অতিবাহিত করে — যাহারা বাহিরের বিষয়ই লিপ্ত থাকিয়া আপনাকে ভুলিয়া থাকে — যাহারা দুইদণ্ড কাল গোলমালে না থাকিলে কি করিবে বলিয়া অস্থির হয়, তাহারা তাহাদের স্রষ্টাকে ভুলিয়া থাকুক; কিন্তু এই সকল নির্জন স্থানে যাহারা আপনাকে একাকী মনে করে, তাহারা অতি বিমূঢ়। আহারের সময় উদ্যান রক্ষক সাহেব এক জন্তু শিকার করিয়া আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তাহাকে ইগুয়ানা বলে, প্রায় দেড় হস্ত দীর্ঘ, দেখিতে বড় গিরগিটির মত। দুই প্রহরের সময় পিতামহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্মের কথা হইল। তিনি বলিলেন, এই ধর্ম-বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য বলিদান চাই। দুই তিন জনের রক্ত পাইলে তবে ইহা সারবান্ হইবে। আমরা যে দেশে আসিয়াছি, এখানকার রাক্ষস সমান লোকের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রচার কি প্রকারে হইল? এই ধর্মের প্রচার জন্য কত কত লোক জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্বক দেশবিদেশে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিয়া আয়ু শেষ করিয়াছে। প্রচারকদিগের আপন্যরদের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকিলে তাহাদের পরিশ্রম কখনই সফল হয় না। পিতামহাশয়

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে এক নীতি শুনাইলেন। "কোন সময় অসুরদিগের দমনের জন্য এক যজ্ঞারম্ভ স্থির হইল। প্রথমে চক্ষু যজ্ঞকরণে প্রবৃত্ত হইল। চক্ষু অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের উপকার সাধন করিল, কিন্তু সে আপন অধিকারে আপনি গর্বিত হইল;এই জন্য তাহার যজ্ঞ বিফল হইল। পরে বাক্য তাহাতে উদ্যত হইল;বাক্য সকলেরই তুষ্টি সাধন করিল, কিন্তু আমি একজন সুকথক বলিয়া বাক্যেরও অহঙ্কার হইল, এই হেতু তাহার যজ্ঞও সফল হইল না। এই প্রকারে অন্য সকলে হার মানিলে প্রাণ যজ্ঞারম্ভ করিল। প্রাণ সাধারণের উপকারী — প্রাণ সমস্ত শরীরের জন্য, কিন্তু আপনার জন্য নয়। প্রাণেরই যজ্ঞ সফল হইল।" ইহা হইতেই প্রচারকেরা উপদেশ গ্রহণ করুন। পিতার জীবন যেমন সকল পুত্রের জন্য সেই রূপ যিনি সমস্ত মনুষ্যের জন্য আপনার জীবন দান করিতে প্রস্তুত আছেন, তিনিই মহাত্মা। ত্যাগই ধর্মের প্রাণস্বরূপ। সকলেই স্বপদে থাকিবে — ধর্মও রক্ষা পাইবে, এ প্রকার করিয়া ধর্ম রক্ষা হয় না। মহাত্মা রামমোহন রায় যদি ত্যাগ-স্বীকার না করিতেন—জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত না হইতেন — বিষয় বৈভব হইতে বঞ্চিত না হইতেন — লোকের তিরস্কার সহ্য না করিতেন, তবে ব্রাহ্ম ধর্ম বঙ্গদেশে রোপিতই হইত না। বঙ্গদেশের কি সৌভাগ্য! দেশ বিশেষে এক এক সময়ে এক এক মহাত্মা উদয় হইয়া ব্রাহ্মধর্মানুযায়ী মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যথার্থ বটে;কিন্তু কোন জাতির মধ্যে ঈশ্বরের এমন বিশুদ্ধ উপাসনা প্রচার হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম যেমন উচ্চ, বঙ্গভূমি তেমন ইহার উপযুক্ত বোধ হয় না। এ ধর্ম-বৃক্ষ এখানে শুষ্ক হয়, কি ফলেফুলে সুশোভিত হয়, বলা যায় না। ঈশ্বরে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন, এই দুই সদ্ভাবই এ ধর্মের মূলাধার;ইউরোপ এবং এদেশের ভাব এ দুইই ইহাতে একত্রিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মে যেমন কর্মের অভাব, নির্বাণই মুক্তি, আমাদের ধর্মে সেরূপ নহে; ঈশ্বরের কর্ম এবং ঈশ্বর প্রীতিই আমাদের ধর্মের জীবন। উদ্যানে অনেকক্ষণ থাকিয়া আমরা বাসস্থানে ফিরিয়া আইলাম। সায়ংকাল এখানে কি রমণীয়। সমুদ্রের গভীর নিনাদ কি উল্লাসকর। সূর্যের অস্ত-গমন কি চমৎকার! সূর্য অস্ত যাইবামাত্র যে তাহার মহিমা চলিয়া যায় তাহা নহে। মৃত্যুর পরেও মহতের কীর্তি তাহার জীবন স্বরূপ হইয়া থাকে। আকাশ কি বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত হইতেছে। বায়ুর এক এক হিল্লোল কি শীতল ও তৃপ্তিজনক! সন্ধ্যার সময় তিন জন বোম্বাই দেশস্থ পারসীর সঙ্গে দেখা হইল। তাহারা কেমন ভদ্র ও আলাপ তৎপর! তাহারা আমাদিগকে সিংহলের প্রধান প্রধান নগর দেখিতেই উপদেশ দিতে লাগিল। তাহারা জনতা বড়ই ভালবাসে। আমরা বলিলাম কলিকাতা দেখিয়া দেখিয়া আর নগর দেখিতে ইচ্ছা হয় না;নগর ভিন্ন আর যাহা কিছু দেখা যায়, তাহাই দেখিবার প্রয়োজন। পারসীরা আপনাদের দেশ বোম্বাইর বড় প্রশংসা করিতে লাগিল — তাহারা সিংহলের উপর বড় বিরক্ত। এখানকার সকল বস্তুই অতি মহার্ঘ্য। কোন আগন্তুক ব্যক্তি আসিয়া শীঘ্র বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য অভিলাষী হয়। তাহারা আমারদিগকে একবার বোম্বাই দেখিবার জন্য বিস্তর লোভ দেখাইতে লাগিল। আমাদের কর্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহাদিগকে ভাল

করিয়া বুঝাইতে পারিলাম না। এখানে যাহার সঙ্গে দেখা হয়, আমারদের ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করে। এ ধর্ম এখন সকলের নিকটে এমন নূতন বোধ হয় যে তাহারা ভাল বুঝিতেই পারে না, কি প্রকারে, ইহার প্রচার হইতে পারে। বস্তুতঃ এই প্রকার ধর্ম্মের প্রচারের দৃষ্টান্ত এখনো পর্যন্ত কোথাও দেখা যায় নাই। রজনীতে আমাদের এক মহোৎসব হইল। পান্থশালারক্ষক আমাদিগকে কোলমান নামক এক সাহেবের নিকটে লইয়া গেলেন। সাহেব সর্ব প্রকারেই নিপুণ। সেক্সপিয়ার গ্রন্থ হইতে ভাল ভাল কবিতা পাঠ করিলেন। সকল কবিতাই ভাবে পরিপূর্ণ — পাঠক ও সর্বপ্রকারে মনোরঞ্জক। কালিদাসকে ভারতবর্ষীয় সেক্সপিয়ার বলে; কিন্তু বিচিত্রতাগুণে সেক্সপিয়ার অদ্বিতীয়। কোল্‌মান সাহেব এক একবার আমাদের চিত্তকে উল্লাসিত করিয়াছেন। পাঠের পরে কৌতুকাবহ গান, কথকতা, এই সকল আরম্ভ হইল। হাসিতে হাসিতে আমাদের নাড়ি ছিঁড়িয়া গেল। দুই প্রহরের সময় ফিরিয়া আসিতে আসিতে মনে করিলাম যে যেখানে রাক্ষসদের বসতি ছিল, কালেতে করিয়া সেখানে সেক্সপিয়ার পাঠ হইল। সভ্যতা একই স্থানে বদ্ধ থাকিবার নয় — কেহই তাহাকে সাধে না কিন্তু সে দেশবিদেশ অন্বেষণ করিয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করে।

১ কার্ত্তিক, রবিবার।

অদ্য বাটী হইতে সুসংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। কলিকাতাকে এখন ছায়ার ন্যায় মনে হয়, কিন্তু স্বপ্নেতে অধিককালই সেখানে থাকি। সিংহলীদের সঙ্গে আমাদের অনেক বিষয়ে মিল আছে। ভাবার অনেক ঐক্য দেখা যায়। তাহারা অল্প বয়সে বিবাহ করে এবং মৃতদেহকে দাহ করে, ইহা জানিলাম। যাহাবা মৃত্যুর পরে মনুষ্যের পুনর্জ্জনম বিশ্বাস করে, সেই সকল জাতির মধ্যে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা আছে। আর যাহারা দেহ লইয়া পুনরুত্থান বিশ্বাস করে, তাহারাই গোর দিয়া থাকে, যেমন ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমানেরা। আমরা সিংহলীদের ভূত নাচান, কি বিবাহ, কি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিছুই দেখিতে পাই নাই। সন্ধ্যার সময়টি দিবসের মধ্যে আমাদের ভাল যায়; অদ্য বৃষ্টির জন্য এ সময় উপভোগ করিতে পারিলাম না।

২ কার্ত্তিক, সোমবার।

বেলা দুই প্রহরের সময় কতকগুলি সিংহলবাসী ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মুদলিয়ার তাহাদের পদবী। তাহাদের মধ্যে এক জন মুদলিয়ার তথাকার বিচারালয়ের অনুবাদক; অন্য জন আমাদের গাঁয়ের মোড়লের মত— লোকজনের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ভঞ্জন করিয়া দেওয়া তাহার কার্য। তাহাদের সঙ্গে প্রায় ১ ঘণ্টা পর্যন্ত অনেক কথা হইল। তাহারা খৃষ্টান; কিন্তু আশ্চর্য এই যে তাহাদের পরিবারের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধ, অথচ তাহাতে তাহাদের সম্ভাবের কিছুই হানি হয় না। মুদলিয়াদের পোষাক অর্দ্ধেক খৃষ্টানী ও অর্দ্ধেক সিংহলী, তাহাদের মাথায়ও দুইটা চিরুনি লাগান দেখিলাম। চিরুনির প্রকার ও সংখ্যা ভেদেই তাহাদের

জাতিভেদ প্রকাশ পায়। ভদ্র জাতি দুইটি চিরুনি ব্যবহার করে, মধ্যম জাতি একটি, নীচ জাতিরা একটিও ব্যবহার করিতে পারে না। শুনিলাম, নীচ জাতীয় এক ব্যক্তি চিরুনি ধারণ করাতে কতক লোকে তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে। ইহারদিগের মধ্যে জাতিভেদ ধর্ম সম্বন্ধীয় নহে কিন্তু সামাজিক নিয়মে নিয়মিত। বিল্বল সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি— টমটমওয়ালা, ধোপা, নাপিত এই প্রকার অনেকানেক জাতি আছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে একসঙ্গে আচারব্যবহারও চলে না। এক্ষণে অনেক বালকবালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে, আর শুনিলাম জনসমাজে সভ্যতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। ধর্মের বিষয়েও আরও কিছু কিছু জানা গেল। বুদ্ধের জন্মদিনে ইহাদের প্রধান উৎসব হইয়া থাকে। বৌদ্ধেরা জগতের সৃষ্টি বিশ্বাস করে না এবং কোন সৃষ্টিকর্তাকেও স্বীকার করে না। কিন্তু যাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, জগৎ কে রচনা করিয়াছে, তখন ভগবান বুদ্ধের নামই শুনিয়াছি। বুদ্ধই ইহাদের মানবদেবতা;আরো সহস্র দেবতা আছে, কিন্তু বুদ্ধকেই সকলে পূজা করে। বৌদ্ধরা মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক, এ সকল বিশ্বাস করে। ইহারদিগের পুরোহিতেরা বিবাহ করে না, সুতরাং পুরোহিতের পদ বংশ-পরম্পরাগত নহে, কিন্তু যাহার ইচ্ছা সেই সেই আপন পুত্রকে সে পদে নিযুক্ত করিতে পারে; এই হেতু আমাদের দেশের মত এখানে পুরোহিতের দৌরাত্ম্য থাকিবার সম্ভাবনা নাই। মুদলিয়াদের কথাবার্তায় তেমন সন্তোষ জন্মিল না। এ দেশে ধর্মের ভাব যে অতি শিথিল তাহা বিলক্ষণ বোধ হইল। এই স্থানে ইংরাজদের অধিক সমাগম হেতু শুদ্ধ সিংহলীদের ভাব বিশেষরূপে বুঝা যায় না। এ স্থানকে তাহারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত করিয়াছে, সকল দ্রব্য এবং পরিশ্রমের মূল্য বিস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখানকার প্রধান খানসামার বেতন কলিকাতার এক জন কেরানীর সমান— ২৫ টাকা;পরিশ্রমের মূল্য প্রতিদিন চারি আনার নীচে নহে— আটআনাও সাধারণ। সন্ধ্যার সময় একবার বাজার দেখিয়া আইলাম। ফলমূলাদি বিস্তর দেখিলাম, কলা, শসা, নেবু, আনারস, ঝিঙে, বেগুন, আলু, নারিকেল ইত্যাদি অনেক প্রকার। নানা দেশীয় নানা জাতীয় লোক এখানে গোলমাল করিতেছে; দেশীয় ব্যক্তিদিগকে বাছিয়া লওয়া ভার।

যেমন ভারতবর্ষের পক্ষে কলিকাতা, সিংহলের পক্ষে তেমনি কলম্বো;আর ভারতবর্ষের যেমন সিমলা, এখানকার সেইরূপ কান্দি। যদি আমরা সিংহলীদের ভাব বুঝিতে চাই, তবে কলম্বোতে দিনকতক থাকিতেই হইতে পারে;আর যদি সিংহলের শোভা দেখিতে চাই, তবে কান্দির নিকটে ভ্রমণ করিলেই সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। এখানে জায়ফল, তাল, আম্র, কাঁঠাল, নেবু, নারিকেল, সুপারি, দাড়িম্ব, কাফি, জল, চিনি প্রভৃতির বৃক্ষ দেখা যায়। সিংহলীদের ভাষা আমাদের সঙ্গে অনেক মেলে। ইংরাজীতে যেমন ক্রিয়া অগ্রে, পরে কর্ম;সিংহলীতে আমাদের মত অগ্রে কর্ম, পরে ক্রিয়া। সিংহলী আর পালী ভাষা এক নহে। ধর্মপুস্তক সকল পালী ভাষায় বিরচিত, কিন্তু পালী ভাষার অনেক ধর্মপুস্তক সিংহলীতে অনুবাদিত হইয়াছে। সিংহলীদের অনেক কথাও আমাদের সঙ্গে সমান, যথা —

বাঙ্গালা	সিংহলী
চিনি	সিনি
মাতা	আম্বা
পিতা	তাতা
পুত্র	পুত
স্ত্রী	হস্ত্রি
চন্দ্র	হন্দাই
তারা	তারকাওয়া
যাও	পলেয়ন
মিষ্ট	রসাই
দুগ্ধ	খিরি

ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন — দেব আশীর্বাদে দেন্তে।
বিশ্বাসী প্রিয়বন্ধু — বিশ্বাসে আদরে তিরালোয়া।
তোমার নাম কি — উম্বে নামা মেককাডে।
মহাশয় কোথায় যাও — কো যানো, মহাত্মা।

আমরা এখানে কিছুদিন থাকিলেই সিংহলী ভাষা শিখিতে পারি। অদ্য প্রায় সমস্ত দিন বৃষ্টি গিয়াছে। এখানে যে কখন্ কোন্ ঋতু হয় ঠিক পাওয়া যায় না। এখানকার লোক মুখে শুনিলাম যে, যে সময় বৃষ্টি মনে করা যায়, সে সময় হয়তো কিছুই হয় না; কোন এক অলক্ষিত সময়ে হয়ত অধিক হয়।

৩ কার্ত্তিক, বুধবার।

প্রত্যুষে উঠিয়া সমুদ্রতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে সমুদ্র-বায়ু সেবন করিতে লাগিলাম। নবানুরাগের ন্যায় সমুদ্রের স্ফূর্তিযুক্ত অনিবার্য নিঃস্বন, আমার যাবজ্জীবন মনে থাকিবে। এই প্রকার কনবাহী শীতল বায়ু সেবনের জন্য রাজ্য ছাড়িয়া দেওয়া যায়। কি শোভা। এক পাহাড়ের পশ্চাতে সূর্যদেবের সুরাগ রঞ্জিত প্রাসাদ দেখা যাইতেছে। এস্থানে এ সময় আমার সকল কার্যের অবসান বোধ হইতেছে। আজ আমাদের নাপিতকে দেখিলাম, তাহার মাথায়ও দুই চিরুনি রহিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম, এখানকার নাপিতদিগের মধ্যে তিনিই নাপিত শ্রেষ্ঠ। জাতিভেদের বিষয় আরো বিশেষ করিয়া জানিলাম। কত জাতি তাহার সংখ্যা নাই।

বিল্লল — জমিদার, সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি।
ধীবর

হালিয়া	—	ডালচিনির ব্যবসায়ী।
কারওয়া	—	নাবিক।
মাথ্রি	—	নাপিত।
ধোপা		
দুরাওরা	—	শুঁড়ি, তাড়ি বিক্রেতা
চণ্ডাল	—	স্বর্ণকার।
বাজনদার		
যাগেরি	—	চিনি ব্যবসায়ী।
পাড়ুয়া	—	কুলি
পন্নারা	—	ঘাসুড়ে।
ওলিয়া	—	নীচ জাতি।
রোডিয়া	—	সকলের নীচ জাতি।

এত প্রকার জাতি! ইহাদের মধ্যে কিসে যে নীচত্ব আর কিসে মহত্ত্ব হইয়াছে, বলা যায় না। ইহাদের মধ্যে সকলে চিরুনি ধরিতে পারে না এবং সকলে পুরোহিতের পদেও নিযুক্ত হইতে পারে না। বাজনদার, চিনির ব্যবসায়ী, কুলি, ঘাসুড়ে, ওলিয়া, রোডিয়া সর্বাপেক্ষা অধম। ইহারা চিরুনিও পরিতে পারে না, পুরোহিতও হইতে পারে না। বিহ্মল*, হালিয়া, জালিয়া, ধোপা, নাপিত, নাবিক — ইহাদের উক্ত দুই মহৎ অধিকারই আছে। শুঁড়ি আর স্বর্ণকার পুরোহিত হইতে পারে, কিন্তু চিরুনি ব্যবহার করিতে পারে না। কোন নীচ জাতি পুরোহিত হইলে রাজারা তাহাকে প্রণাম করে না। সিংহলের রাজাদের স্থান কান্দি। এখানকার সকল জাতির মধ্যে জাতিভেদের বিদ্বেষভাব বিলক্ষণ আছে। রোডিয়া প্রভৃতি নীচ জাতীয় লোকেরা বিহ্মলের গৃহেও প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে ধর্মের ভাব বড় শিথিল। লোকেরা মনে করে যে মুদলিয়ারেরা যে খৃষ্টান হইয়াছে, সে ধর্মের জন্য নয়; কিন্তু সাহেবদের প্রিয় পাত্র হইবার জন্য। একথা অনেকের মুখে শুনিয়াছি। আমরা উষাকাল আর প্রদোষকাল এখানে যেমন ভোগ করিতেছি, এমন কখনই করি নাই। আমাদের বাসস্থানের নূতনত্ব গিয়াছে, এখানকার দ্রব্যের আস্বাদও ভাল লাগে না, কিন্তু সমুদ্রও পুরাতন হয় না — সূর্যের উদয়াস্তেরও প্রত্যহই নূতন শোভা পায় — বায়ু খাইয়া খাইয়া ও স্বাদ মিটে না। অদ্যকার সায়ংকাল যে কি হইয়াছে বলিতে পারি না। সূর্য অল্পে অল্পে সমুদ্রের মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে — যেন কোন ভয়ানক জন্তু এমন এক সুন্দর কুমারকে গ্রাস করিতেছে। এমন ক্লেশকর দৃশ্য দেখিয়া জগৎ ম্লানমূর্তি ধারণ করিল এবং কিছু পরে যেন বিষাদঘনে এককালে আবৃত হইয়া

* আরো শুনিলাম, বিহ্মলকে শূদ্র বলে — আমাদের শূদ্র জাতি কিনা ঠিক বলিতে পারি না।

গেল। সূর্য অস্ত হইল বলিয়া যে একেবারে চলিয়া গেল তাহা নহে, আবার সে নূতন মাহাত্ম্য ধারণ করিয়া উদয় হইবে। মনুষ্যের মৃত্যুও এই প্রকার, আবার সে নর জীবন প্রাপ্ত হইবে। সূর্যাস্ত পরে আকাশ কতই বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত হইল। সিন্দুর বর্ণ, স্বর্ণ বর্ণ, নীলবর্ণ, পাটল বর্ণ মেঘবলী স্থানে স্থানে বিকীর্ণ হইয়াছে। এমন শোভা কোথায় দেখা যায়? যদি কলিকাতার দুর্গন্ধময় গলি হইতে এক ব্যক্তিকে একেবারে এখানে আনা যায়, তবে যে তাহার মনে কি হয়, তাহা বলা যায় না। কি দেখিতেছে, কোথায় আসিয়াছে — সে এককালে বোধ হয় হতবুদ্ধি হইয়া যায়। এই প্রকার স্থান চিত্তকে প্রফুল্ল করে — মনকে উন্নত করে — আত্মাকে আপন মহত্ত্বে পূর্ণ করে।

৪ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার।

আমাদের বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে এদেশের অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। এখানে সেই প্রকার জলবায়ু — সেই প্রকার ফলপুষ্প — লোকদিগের ব্যবহারও অনেক সমান — ভীরু স্বভাবদিগের প্রধান অস্ত্র মিথ্যারও সেইরূপ প্রাদুর্ভাব। কেবল বৌদ্ধ ধর্মেব প্রচার জন্য যাহা কিছু বিভিন্নতা দেখা যাইতেছে। জাতিভেদের নিয়মেও অনেক প্রভেদ আছে। ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্যের প্রতিকূল হইয়াই প্রথমে বৌদ্ধধর্ম উদয় হইয়াছিল, ভারতবর্ষে স্থান না পাইয়া তাহা দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, অতএব সে ধর্মে আমাদের মত জাতিভেদ কখনই থাকা সম্ভব হয় না। এখানকার সকলের শ্রেষ্ঠজাতি যে বিল্বল সে শূদ্রজাতি ইহা সঙ্গতই বোধ হইতেছে, কেননা, ব্রাহ্মণের উপর শূদ্রজাতির বিদ্রোহই বৌদ্ধ ধর্মের মূল কারণ। আর এক আশ্চর্য এই, এখানে রাম-রাবণের কথার বিন্দুবিসর্গও শুনা যায় না। মুদলিয়ারদের কাছে শুনিলাম, উত্তরে ত্রিঙ্কমালীতে ইহার কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে;এমন কি তদ্বিষয়ক গ্রন্থ সকল তথায় বিদ্যমান আছে। ইহার উত্তরে সেতুবন্ধ রামেশ্বর; সেখানেই সে সকল কথা থাকিবারই সম্ভাবনা।

বলিতে কি, এক স্থানে থাকিয়া থাকিয়া আর পারা যায় না। আমরা এক্ষণে বাষ্পীয় নৌকাকেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। বিশেষতঃ আমার পিতামহাশয়ের সকল অপেক্ষা কষ্ট হইতেছে। আহারও এখানে তাঁহার ভাল হইতেছে না। এখানে রন্ধনের সকল সামগ্রীতে একই প্রকার আস্বাদ, নারিকেলের রস দিয়া সকলই বিস্বাদ করিয়া ফেলে। তরকারী অনেক প্রকার পাওয়া যায়— সজনের ডাঁটা, উচ্ছা, সীম, ঝিঙে, পুঁইশাক, বেগুন, কুমড়া, ইঁচড়; ফলও প্রচুর পাওয়া যায় পেঁপে, আনারস, নেবু, শসা, কলা, এ সকলই মুখরোচক। এই সকল ফল ও তরকারির নামেই আমাদের দেশ মনে পড়ে, কিন্তু সমুদ্র-বায়ু আর সমুদ্রের শব্দ ছাড়িয়া যাইতেই দুঃখ বোধ হয়। দুই প্রহরের সময় কোন রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যে কী ভীষণ নিনাদ উত্থিত হয়, তাহা কি বলিব।

৫ কার্ত্তিক, শুক্রবার।

এখানে অন্য সকল আহারের সামগ্রী বরং ভাল, কিন্তু ভাল দুগ্ধের বড়ই অভাব — দুগ্ধের কেবল সাদা বর্ণ থাকে, এইমাত্র। ভারতবর্ষে দুগ্ধের যেমন গৌরব এখানে তেমন কিছুই নাই। শুনিলাম, গোয়ালাদের জন্য এক পৃথক জাতিও নিরূপিত নাই। দুগ্ধের অভাব জন্য পিতামহাশয়ের বিশেষ কষ্ট হইতেছে;এখানকার রন্ধনের কোন সামগ্রীই তাঁহার ভাল লাগে না। এখনো একখানা বাষ্পীয় নৌকা দেখা যায় না। এই পান্থশালা সংক্রান্ত কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলে ২৬ এ, কেহ বলে ওমাসে আসিবে, তাহারা আমাদিগকে আর ছাড়িয়া দিতে চায় না। আমাদের নিকট হইতে প্রত্যহ তাহারা ২৪ টাকা প্রাপ্ত হয়। অদ্য বাজারে গিয়া এদেশের নৌকা, নারিকেল খোলের এক পাত্র, এই প্রকার কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলাম। এখানে আবলুস কাষ্ঠের কার্যই বিস্তর। বাক্স, ছড়ি, চৌকি, অনেক আবলুস কাষ্ঠে নির্মিত। ত্রিঙ্কমালি হইতে আবলুস কাষ্ঠের আমদানি হয়। আর কাঁচকড়া, হাতির দাঁত, সজারুর কাঁটার নানা দ্রব্য আনিয়া লোকেরা আমাদিগকে সর্বদাই বিরক্ত করে।

আজ এখানে এক ভয়ানক ব্যাপার দেখিলাম — ভূতের নাচ। কোন ব্যক্তি উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার শান্তির নিমিত্তে কতকজন মিলিয়া ভূতের নৃত্য আরম্ভ করে। এই প্রকার নৃত্য দেখিবার জন্য আমাদের বড়ই কৌতূহল জন্মিল;আমরা আমাদের নাপিতের সঙ্গে প্রাতে সকল কথা স্থির করিয়া সন্ধ্যার পর নাচ দেখিবার জন্য পান্থশালা হইতে বহির্গত হইলাম। আমরা সর্বশুদ্ধ আটজন। এক স্থানে দাঁড়াইয়া দুইটা গাড়ি ভাড়া করিয়া চলিলাম। প্রথম হইতেই ভূতীয় কাণ্ড। ঘোর অন্ধকার — কেহ কোথাও নাই — সরুরাস্তা — দুধারে বনজঙ্গল — এক এক স্থানে রাস্তার ধারেই খাল — ভূতে পাছে আমাদের গাড়ি শুদ্ধ শূন্যে উড়াইয়া লইয়া যায়, এই আমাদের ভয় হইতে লাগিল। দূর হইতে কতকগুলি মশালের আলো দেখিয়া আমাদের নাট্যশালা বুঝিতে পারিলাম। গাড়ি হইতে নামিবামাত্র তূরী ভেরী বাজিয়া উঠিল। আমাদের সাপুড়ের মত বংশীয় ধ্বনি আর ঢাকের শব্দ শুনিতে শুনিতে এক ক্ষুদ্র বাটীতে উপস্থিত হইলাম। এ সেই নাপিতের ভ্রাতাব বাটী;অনেক জন লোক জমিয়াছে, সম্মুখে কতকগুলি মশাল জ্বলিতেছে। আমাদের বসিবাব জন্য বারান্দায় আর উঠানে চৌকি পাতিয়া দিল। নাপিত আমাদের জন্য পান, সুপারি, চিনির পানা প্রভৃতি আনিয়া দিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিল*। আমরা সকলে বসিলে ভূতের নাচ আরম্ভ হইল। প্রথমে ঢাকের বাদ্য কি ভয়ানক। এমন কর্ণকুহর-ভেদী শব্দও কুত্রাপি শুনি নাই। গায়ে যত জোর আছে তত জোরে এক এক ঘা ঢাকের উপর পড়িতেছে, তাহার চামড়া ছিঁড়িয়া যায় না, এই আশ্চর্য! চমৎকার বাদ্য, কান জুড়াইয়া গেল। বাদ্য সাঙ্গ হইলে পর ভূতের নাচ আরম্ভ হইল। প্রথমে একজন ছিটের কাপড় পরিয়া হস্তীর ন্যায় দুই বৃহৎ কানওয়ালা টুপি মাথায় দিয়া, দুই হস্তে দুই মশাল ধরিয়া নাচিতে লাগিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া হেলিয়া দুলিয়া মশাল ঘুরাইয়া অনেক প্রকারে নৃত্য

* এখানে আতিথ্য ধর্মের প্রমাণ আরো কোন কোন স্থানে পাইয়াছি। তবুও ভাল।

করিতে লাগিল। পরে এক ছোট বালক আর এক সঙ সাজিয়া উপস্থিত। তাহার রঙ্গভঙ্গি দেখিয়া আমরা আর হাস্য রাখিতে পারিলাম না। তাহার দুই কাঁধ হইতে দুই গুচ্ছ নারিকেল পত্র ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বাদ্যের সঙ্গে তাল রাখিবার জন্য নাচিবার সময় তাহা ব্যবহার করে। পা অবধি মস্তক পর্যন্ত তাহার সর্ব শরীর আন্দোলিত হইতে লাগিল। বালকটি আপন কর্মে বড়ই দক্ষ ও নিপুণ। এই প্রকারে প্রায় দশ বারটা ভূত আমাদের সম্মুখে একে একে আসিয়া নৃত্য করিল। কাহারও মুখ কুম্ভকর্ণের মত — কাহারও নৃসিংহ অবতারের মত — কেহ বা কুক্কুটের ভূত সাজিয়া আসিয়া দেখিতে জটায়ুর মত হইয়াছে — কেহ মহাদেবের ন্যায় মস্তকে সর্প ধারণ করিয়াছে — কেহ মুখব্যাদান করিয়া ভয়ানক দন্তপাটী বাহির করিতেছে। একটি ভূত সকল অপেক্ষা ভয়ানক। তাহার বিশাল দন্ত সমুদয় বহির্গত — তাহার অর্দ্ধ শরীর ভল্লুক চর্মের মত এক বস্ত্রে আবৃত; সে কখনো বা লম্ফঝম্প দিতেছে, কখনো একটাকে ধরিতে যাইতেছে, কখনো মশালে ধুনা নিক্ষেপ করিয়া চতুর্দিকে প্রজ্বলিত করিতেছে, কখনো ও বা অগ্নি খাইতেছে — এটাই প্রকৃত ভূত। সর্বশেষে আবার বালকটি আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাকে দেখিয়া হাস্য ও আক্ষেপ দুইই উপস্থিত হয়; আক্ষেপ এই জন্য যে এই বালক যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সহিত ভূতের নৃত্য শিখিয়াছে, তাহা বিদ্যাশিক্ষাতে ব্যয় করিলে সে মনকে কত উন্নত করিতে পারিত, আত্ম-শোধনে সেইরূপ তৎপর হইলে মনুষ্য জীবনের কতই মহত্ত্ব লাভ করিত। কিন্তু এক্ষণে তাহার মন কি সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ রহিয়াছে। তাহার নৃত্য দেখিয়া লোকে একটুকু হাস্য করিলে সে আপনাকে কেমন কৃতার্থ বোধ করিতেছে। ভূতের ব্যাপার সমাপ্ত হইলে আর এক প্রকার বাদ্য আরম্ভ হইল। শুনিলাম, গবর্নর সাহেব আসিলে সেই বাদ্যে তাঁহার অভ্যর্থনা হইয়া থাকে। ঢোল, ঢাক, টমটম, বাঁশী একত্রে গোলেমালে বাজিতে থাকিল। এই প্রকার কর্কশ অশ্রাব্য গানবাজনা, ভূতপ্রেতে এইরূপ বিশ্বাস; এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এখানকার সামান্য লোকের অবস্থা বড় ভাল বোধ হয় না। রাত্রি ১১টার পর ভূতের নাচ সমাপ্ত হইল। যদিও আমরা ভূতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম তথাপি সন্ধ্যার সময় যে ফারেস্ট নামক এক সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে পারি নাই। সেই তত রাত্রিতে তিনি আমাদিগকে এক মুদলিয়ারের বাটীতে লইয়া গেলেন। মুদলিয়ারের সঙ্গেও দেখা হইল। ইনিও খৃষ্টান, ফারেস্ট সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন ইনি অর্দ্ধ খৃষ্টান অর্দ্ধ বৌদ্ধ। মুদলিয়ারের নিকট হইতে অনেক কলে কৌশলে বিদায় লইয়া আসিলাম।

৬ কার্ত্তিক, শনিবার।

পান্থগৃহ আমাদের পক্ষে কারাগৃহ হইয়াছে, তাহার রক্ষককে কারা-রক্ষক বোধ হইতেছে। একদৃষ্টে কলিকাতা যাইবার বাষ্পীয় নৌকার প্রতীক্ষা করিতেছি, কিন্তু এখনো তাহার নামগন্ধও নাই। গালের খোলার ঘর, পান্থশালার বিস্বাদ অন্ন, আর চতুর্দিকে চিরুনিওয়ালা মাথা সকলই বিরক্তিজনক হইয়াছে। সকল বিষয়েরই উপযুক্ত সময় আছে। আমাদের এখানে থাকিবার

সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ বাষ্পীয় নৌকা আসিলেও হইত। একটা কোন বিঘ্ন না হইয়া যায় না।

৭, ৮ কার্ত্তিক রবিবার, সোমবার।

আমার কিঞ্চিৎ জ্বরভাব হইয়াছে। বিদেশে রোগ হওয়া বিষম দায়। রবিবারে খৃষ্টানদিগের এক উপাসনালয় দেখিতে গেলাম। এখানে সামগান গুলিন বেশ লাগিল। ছোট ছোট বালকেরা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করিতেছে;ইহাদের মুখ হইতে এই সকল সঙ্গীত শুনিতে আরো ভাল লাগিল। সঙ্গীতের এক স্থানে এই ভাব শুনিলাম, 'হে পরমেশ্বর! আমার জীবন যেন এই প্রকারে গত হয়, যাহাতে আমি মৃত্যু-শয্যাকে শয্যার মত দেখিতে পারি!' সোমবারে এখানকার বিচারালয় দেখিলাম। লোকজনের ভিড়েতে কিছুই শুনিতে পাইলাম না। বিচারালয় হইতে আসিবার কতকক্ষণ পরে বিলক্ষণ জ্বর বোধ হইল।

৯, ১০ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, বুধবার।

অল্প জ্বর ভাব আর যায় না। এক সমুদ্র-পীড়া অতিক্রম করিয়া আবার ডাঙ্গার পীড়া ভোগ করিতেছি। সমুদ্র-পীড়া বরং ভাল, ক্লেশ অধিক বটে, কিন্তু তিন দিবসের পর আবার যেমন তেমনি। সমুদ্র বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কার্য করে নাই, কিন্তু এ ডাঙা সেইরূপ করিয়াছে। সমুদ্রের সমুদয় কষ্ট এখানে দূর করিব এই মনে ছিল, কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত হইল। আমরা এখানে রোগ-সুস্থতা জীবন-মৃত্যুর মধ্যেই লম্বমান রহিয়াছি;কখন কাহার আধিপত্য হয় কিছুই বলা যায় না। ঈশ্বরের এক নিকৃষ্ট কর্মচারীর মধ্যে গণ্য হইতে পারি, এই আমার ইচ্ছা;তাহাও কোন প্রকারে হইতে পারিতেছি না। মন যত শরীরকে ছাড়াইয়া চলিতে চায়, শরীর ততই তাহাকে আটঘাটে বদ্ধ করিয়া রাখে, আর কিছুদিন পরে যে শরীর ভস্মীভূত হইবে, তাহার জন্য যেন কারাবাসীর ন্যায় থাকিতে হইতেছে। বুধবার বেলা ১টার সময় এক বাষ্পীয় নৌকা দেখা যাইতেছে। খানিক পরে জানা গেল সে আমাদের নৌকা। এই সুসংবাদ পাইয়া ও কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম।

১১ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার।

আজ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছি। তথাপি জ্বর আছে। বাষ্পীয় নৌকাতে উঠিবার জন্য আমরা সকলে প্রস্তুত হইতেছি। আমি আর আমার পিতামহাশয় প্রায় বেলা ১১টার সময় এতদিনের বাসগৃহ ছাড়িয়া চলিলাম। কেশববাবু আর কালীকমলবাবু সেখানেই রহিলেন। আমরা সিংহলদ্বীপে প্রায় তিন সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিলাম। আমাদের বাসস্থানকে আমরা প্রায় বাড়ির মত করিয়া ফেলিয়াছি। বাষ্পীয় নৌকাতে উঠিয়া দেখি সাহেববিবি বিস্তর। এবার আমাদের কুঠরী বেশ প্রশস্ত, ইহাতে সাতটা মাচা আছে। এক একটি মাচার উপরে এক এক জনের বিছানা থাকে। কোন দুর্দান্ত মাতাল সাহেবের সঙ্গে এক কুঠরীতে থাকা বড় দায়।

আমাদের সম্মুখ দিয়া অটাওয়া নামক এক জাহাজ চীনদেশের রণক্ষেত্রে যাত্রা করিল। বিবিরা রুমাল ঘুরাইয়া সাহেবেরা চীৎকার ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। বেলা দুইটার পর কেশববাবু আসিয়া উপস্থিত, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কালীকমলবাবুকে দেখিলাম না। কেশববাবু তাঁহার জন্য পান্থ গৃহে দুই ঘন্টা অপেক্ষা করিয়া এবং তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে না পাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তিনি বেলা দুই প্রহরের সময় বাজার করিবার নাম করিয়া যে কোথায় গেলেন, কেশববাবু তাহার ঠিকানা পাইলেন না। আমরাও নৌকার উপরে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ৩টা, ৪টা, ৫টা বাজিয়া গেল, তথাপি তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না। শুনিলাম আর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বাষ্পপোত খুলিয়া যাইবে। কেশববাবু তাড়াতাড়ি করিয়া আমাদের পান্থশালারক্ষককে একখানা চিঠি পাঠাইয়া দিলেন। এই চিঠির উপর যাহা কিছু নির্ভর। আমাদের বাষ্পপোত শীঘ্রই সিংহল ছাড়িয়া চলিল। কালীকমলবাবু একা, বিদেশ, সঙ্গে কিছুই নাই, আপনার মত কেহই নাই — তিনি কি করিবেন, কি দুর্বিপাকে পড়িয়া আসিতে পারিলেন না, তাঁহার পরিবারেরাই বা কি ভাবিবে; এই সকল বিষয় মনে আসিতে লাগিল। যাহা হউক এক্ষণে আর কি করা যায়, অন্য কোন উপায় নাই। — আমরা সিংহল দ্বীপ ছাড়িয়া যাইতেছি, আর কখন দেখিতে পাইব কিনা, বলিতে পারি না।

১২ কার্ত্তিক, শুক্রবার।

সমুদ্র-পীড়াকে দূর হইতে দেখিয়া জ্বর কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আজ উষাকাল অবধি সায়ংকাল পর্যন্ত সমুদ্রকে উপভোগ করিলাম। সমুদ্রের এমন শান্তমূর্তি আর কখনো দেখি নাই, তরঙ্গ প্রায় নাই। যে সমুদ্র এক একবার স্বীয় বেগে পাহাড় পর্বতকে অস্থির করে, তাহা এমন শান্ত হইয়াছে যে এখন সামান্য নৌকা করিয়াও তাহার উপর দিয়া যাওয়া যায়। জলের উপর যেন কে শিল্পকার্য করিয়া রাখিয়াছে। বায়ু সমুদ্রের উপর হইতে আসিয়া আমারদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে এবং সমস্ত শরীরকে শীতল করিয়া দিতেছে। এখানে সমুদ্রই এক প্রকাণ্ড ব্যাপার — বিশ্বের সমুদয় কার্য যেন তাহারই উপর দিয়া হইতেছে, সূর্য তাহারই মধ্য হইতে উদয় হইতেছে এবং তাহারই গর্ভে প্রবেশ করিতেছে — জ্যোতিগণ যেন তাহারই সেবায় নিযুক্ত আছে। আমার সকল চিন্তা সমুদ্রই এক্ষণে হরণ করিতেছে। সমুদ্রকে দেখিলে ইহাকে অনন্তস্বরূপের নিকেতন মনে হয়। 'অনাদিমৎ ত্বং বিভুত্বেণ বর্ত্তসে যতোজাতানি ভুবনানি কিম্বা' ইহা অনন্তের কি অপূর্ব আদর্শ — কি অতুল্য প্রতিমা! এক্ষণে আকাশ আর সমুদ্র। ইহারা যেন শতমুখে স্তোত্রপাঠ করিতেছে। কিন্তু এই সুদূর-বিস্তৃত প্রশান্ত সমুদ্র, নক্ষত্র-তারা-গ্রহসঙ্কুল গগন-বিতান,— ইহাদের সৌন্দর্য ও রমণীয়তা যদি আরো সহস্রগুণ হইত, অথচ ভাবগ্রাহক মনের সৃষ্টি না হইত; তবে কোথায় বা ইহার শোভা, কোথায় বা ইহার সৌন্দর্য থাকিত! তাহা হইলে সমুদ্র জলরাশি মাত্র থাকিত— আকাশ কতকগুলি জড়পিণ্ডে পূর্ণ থাকিত।

১৩, ১৪ কার্ত্তিক, শনিবার, রবিবার।

আমরা যেন এক ক্ষুদ্র পুরীর উপরে ভাসিয়া যাইতেছি। পুরীর সজ্জা এখানে সকলই আছে। আমারদের বাষ্পপোত এবার লোকজনে পরিপূর্ণ— কত দেশের আকৃতি একত্র হইয়াছে। সাহেববিবি বিস্তর। সাহেবেরা বিবি আর খানা লইয়াই আছে। সকলেরই হাতে চিত্রবিচিত্র মলাটের এক একখানা গল্পের বহি— যাহাতে একটুকু ভাবিতে হয়, এমন পুস্তক প্রায় দেখিতে পাই না— আবার আমার সমুদ্র-পীড়া আরম্ভ হইয়াছে, এ সময় আর কিছুই ভাল লাগে না। এবার সে পীড়া পূর্বরাগের মত তত প্রবল নয়। কিন্তু একে জ্বরের দুর্বলতা এখনো যায় নাই, তাহার উপর সমুদ্র-পীড়া আমাকে আরো দুর্বল করিয়াছে। এখন সুস্থতা আমার পক্ষে মরীচিকার ন্যায় হইয়াছে— যখনি তাহাকে ধরিতে যাই, অমনি দূরে গমন করে। রবিবার এখানে ইহাদের উপাসনা দেখিলাম। প্রহ্লাদচরিত্রের মত একটি উপন্যাস পাঠ হইল। ডানিয়েল বড়ই ঈশ্বরভক্ত ছিলেন, তাঁহাকে কোন রাজা সিংহের গর্তের মধ্যে ফেলিয়া দিতে অনুমতি করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার সহায় হইয়া তাঁহাকে নির্বিঘ্নে সেখান হইতে উত্তীর্ণ করিলেন। প্রহ্লাদচরিত্রে আমারদের যেমন বিশ্বাস, এই গল্পে ইহাদের বোধ হয় সেই প্রকার বিশ্বাস থাকিবে। ইহাদের উপাসনা পদ্ধতিতে বাহিরের আড়ম্বরই অধিক, কিন্তু ভক্তিভাব অল্পই দেখিলাম।

১৬ কার্ত্তিক, সোমবার।

প্রাতে মান্দ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে মান্দ্রাজের বড়ই আশ্চর্য শোভা। সমুদ্র-তীরে অট্টালিকাশ্রেণী বিরাজ করিতেছে। আমাদের নৌকা গোলমালের আলয় হইয়াছে। ইহার কোন স্থানে বিপণি বসিয়াছে, কোন স্থানে বাজিকরেরা ইঁউরোপীয় দেবীদিগের নিকটে আপনাদের চাতুর্য প্রকাশ করিতেছে। কত মান্দ্রাজি নৌকা বাষ্পপোতের কাছে আসিয়া গোলমাল করিতেছে। সমুদ্র তরঙ্গে সেই সকল নৌকা যেরূপ আন্দোলিত হইতেছে, তাহাতে নামিতেই ভয় হয়। এই সকল নৌকায় কাষ্ঠ প্রেকের দ্বারা বদ্ধ নহে, কিন্তু বেত্র-রজ্জুতে বদ্ধ রহিয়াছে। এক একখানা ক্ষুদ্র তরী সমুদ্র কীটের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার উপরে জল উঠিতেছে, তবুও ডুবিয়া যায় না। বড় বড় দুই কাষ্ঠ বেত্রের রজ্জুতে একত্রে বাঁধা— সমুদ্র-তরঙ্গ তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। মান্দ্রাজকে এখান হইতে দেখিয়া বোধ হয় যে এমন পুরী কোথাও নাই। কিন্তু শুনিলাম, সেখানকার গলি সঙ্কীর্ণ, বসতি বিস্তর, আর লোকজনের অবস্থাও বড় ভাল নয়—আমাদের অট্টালিকাময় পুরী কলিকাতা অপেক্ষা ইহা অনেক অংশে নিকৃষ্ট। আমরা যে দিনে সমুদ্রের কোল হইতে গালপুরীর শোভা দেখিতেছিলাম, সে দিনের আর অদ্যকার ভাব কত ভিন্ন। সে দিনে এক এক নারিকেল বৃক্ষ যত ভাবে পূর্ণ ছিল, অদ্য সারি সারি অট্টালিকাও সে প্রকার নয়; সে দিন এক জন নাবিকের মুখ দেখিয়া মন যেরূপ হইয়াছিল, অদ্য শত শত মান্দ্রাজীকে দেখিয়াও সেরূপ হয় না। তখন ভাবীকাল সিংহলের উপরেই যেন নৃত্য করিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে আবার কলিকাতারই প্রতি প্রতিক্ষণে মন ধাবমান হইতেছে।

প্রায় ১টার সময় মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। আজ আমারদের কুঠরীতে দুইজন মান্দ্রাজী আসিয়া উপস্থিত। তাহারা আমাদের ঘরের লোক। কোন দুর্দান্ত সাহেব না আসিয়া যে তাহারা আসিয়াছে, এই আমরা বহু করিয়া মানিলাম।

১৬ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার।

সমুদ্র আবার অশান্ত হইয়াছে। আমাকেও আবার সমুদ্র-পীড়া আক্রমণ করিয়াছে। দিন আর যায় না। বাড়ি মনে পড়িলে অস্থির হইতে হয়। অভাবেই সকল বস্তুর যথার্থ গৌরব প্রকাশ পায়। সিংহলে বাড়ির সকল বিষয় এক একবার ছায়ার ন্যায় মনে হইত, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময়েই বাড়ির আকর্ষণ প্রবল হইতেছে। কলিকাতার ধূলি দুর্গন্ধ আর মনে আসিতেছে না;কিন্তু উহার ভাল বিষয় সকলই মনে হইতেছে। আমি বাড়ির সকলকে একে একে মনে করিলাম;যতই এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করা যায়, ততই যাইবার ইচ্ছা আরো প্রবল হয়।

১৭ কার্ত্তিক, বুধবার।

স্থির সমুদ্র! নীলবর্ণ গিয়া সবুজবর্ণ দেখা যাইতেছে। এক একটা পক্ষীও এক একবার দেখা দিতেছে। যাইবার সময় যেমন নীলজল দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছিলাম, এক্ষণে ঘোলা জলের জন্য সেইরূপ হইতেছি। আজ বঙ্গদেশের শান্তভাব সমুদ্রেতেই বিরাজ করিতেছে। সমুদ্র-পীড়া আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। বায়ু এক্ষণে সুস্থতার হিল্লোল বহন করিতেছে। আমি সকাল অবধি সন্ধ্যা পর্যন্ত মনের সাধে বায়ু খাইতেছি। এখানে বায়ুকে রোধ করিবারও কিছুই নাই, তাহাকে দূষিত করিবারও কোন বস্তু নাই— 'রাত্রিং দিবং গন্ধবহঃ প্রয়াতি।' এ বায়ুর বিশ্রাম নাই আর আমারদের সিন্ধুঘোটকেরও বিশ্রাম নাই। এ রাত্রিদিন অবিশ্রান্ত সমান চলিয়াছে;অন্য যে যাহা করুক, এ আর আপনার কর্ম ভুলে না। — নিশি শুভ্রময়ী জ্যোৎস্নাবতী হইয়া শোভা পাইতেছে। সাহেববিবিরা নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের যেমন গান তেমনি নৃত্য — আমার উহার কিছু ভাল বোধ হয় না।

১৮ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার।

সাহেবরা আমোদপ্রমোদে এক প্রকার করিয়া কালক্ষেপ করে। কর্মের সময় তাহারা যেমন মনকে গুরুভারে প্রপীড়িত করে, কর্ম না থাকিলে আমোদের দিকেই তেমনিই ধাবমান হয়। ইউরোপীয় ভদ্রলোক মাত্রেই নাচগানে দক্ষ— নাচিতে না জানিলে তাহারা ভদ্র নামের যোগ্যই হয় না। গল্পের পুস্তক আমোদের আর এক অঙ্গ। গ্রন্থের সঙ্গে আমোদ আমারদের তাসপাশা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে ভাল বলিতে হইবে। সভ্যতা বিস্তর বৃদ্ধি না পাইলে আর সাধারণে এমন পাঠ তৎপর হয় না। বিশ্রাম সময়ে সামান্য ভৃত্যের হস্তে এক একখানা পুস্তক দেখা যায়। এখানকার কর্মচারীরা আমাদের কর্মচারী হইতে যে কত উৎকৃষ্ট বলা যায় না। আমাদের ভৃত্যেরা নিদ্রা দিতে পারিলে আর কিছু চায় না। এখানকার ৭/৮ জনে শতাধিক

লোকের কর্ম করিতেছে, আরো তাহাদের হস্তে অন্যান্য কৃতকর্ম রহিয়াছে। যাহারা সকালে জুতো পরিষ্কার করিতেছে, তাহাদিগকে আবার দেখি রাত্রিতে বাদ্যকর হইয়া বিবিসাহেবদের নৃত্য সাধন করিতেছে! সমুদ্রে যাহা দেখিবার সকলই দেখা হইল। কেবল তাহাতে প্রবল ঝঞ্ঝা প্রভৃতি বিশদ দেখা হইল না। সমুদ্রের একই প্রকার ভাব আর কিছুতেই যায় না। আজ আমরা কলিকাতার অতি নিকটে আসিয়াছি। আমাদের বাষ্পপোত এক আড়কাট ধরিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইতেছে। ইহার সহায়তা ভিন্ন এই সঙ্কট স্থানে এক পদও চলিবার জো নাই। সকলেরই সঙ্গে পারা যায়, কিন্তু আত্মাপহারী চোরের সঙ্গে আর পারা যায় না। সাণ্ডহেড নামক স্থান হইতে চোরাবালির আরম্ভ— এমন সকল বড় জাহাজের বড়ই সাবধান হইতে হয়। আজ সন্ধ্যা অবধি সকলেই আড়কাটের জন্য চাহিয়া রহিয়াছে। দূর হইতে কোন আলোক দেখিবামাত্র সকলেই তাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে। রাত্রি ৯টার পর চিরপ্রার্থিত কর্ণধার পাইলাম, গঙ্গাসাগরের মুখে বাষ্পীয় নৌকা নোঙর করিয়া রহিল।

১৯ কার্ত্তিক, শুক্রবার।

প্রাতে জলের বর্ণ ভস্মের মত হইয়া আসিয়াছে। কতকক্ষণ পরে ছোট ছোট পান্‌সী নৌকা সকল দেখা যাইতেছে। কলিকাতার 'ওভরলন্ড মেল' লইয়া যাইবার জন্য আর এক ক্ষুদ্র বাষ্পপোত আসিয়া উপস্থিত। সে শীঘ্র আপন কৃত্য সমাপন করিয়া চলিয়া গেল। বেলা ৯টার পর খিজরী হইতে ডাকের নৌকা অনেক চিঠি বহন করিয়া আনিয়া দিল। তাহাতে গাল হইতে কালীকমলবাবুর পত্র পাইবার প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু কিছুই পাইলাম না। আমরা সকলেই তাঁহার জন্য চিন্তিত রহিয়াছি। আজ আমারদের সাবধানে জোয়ারভাঁটা দেখিয়া চলিতে হইতেছে। কয়খালিতে দুই ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিলাম। বেলা দুই প্রহরের পর জোয়ারের সময় আমাদের ইষ্টিমার ছাড়িয়া দিল। গঙ্গার দুই পারই দেখা যাইতেছে। গঙ্গা স্বীয় শুভ্র বসন পরিধান করিয়াছেন। একস্থানে আসিয়া দেখি, আমাদের কুঠরীর জানলা বন্ধ করিতেছে। শুনিলাম, এই স্থানে এই সকল গবাক্ষ হইতে জল উঠিয়া বড় এক জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে। বৈকালে কলাগোছ ছাড়াইয়া গেলাম। সূর্য গাছপালার অন্তরালে অস্ত গেলেন, সমুদ্রের মধ্যে নয়। চতুর্দিক হইতে দেশের গন্ধ আসিতেছে। সেই গঙ্গা, সেইরূপ দৃশ্য, সমুদ্র-বায়ু আর নাই, ভিজা শীতল বায়ু বহিতেছে — এখন এই বাষ্পপোত ছাড়িয়া এক নৌকায় উঠিলেই ঠিক হয়। সন্ধ্যার সময় কলিকাতা হইতে হাত্ত পাঁচ ছয় অন্তর আছিপুরে নোঙ্গর করিয়া রহিলাম।

২০ কার্ত্তিক, শনিবার।

অদ্য গঙ্গাস্নান করিয়া শরীর শীতল হইল। সমুদ্রজলে স্নানকে স্নানই বোধ হয় না। স্নানের জন্য আমরা আমাদের বাষ্পপোতের চক্র-দণ্ডের কাছে বসিলে সমস্ত সমুদ্রই আমাদের উপরে আসিয়া পড়ে। আজ যদিও ইহার বেগ মান্দ্য আর জলও অল্প অল্প উঠিতেছে তথাপি অন্য দিনের অপেক্ষা অদ্যকার স্নানে বড়ই আরাম। আজ আমাদের ব্রত উদ্‌যাপন হইল। প্রায়

৪০ দিনের ব্রত — কঠোর ব্রত বলিতে হইবে। সমুদ্রের উপরে ভোগী অপেক্ষা রোগীর ন্যায়ই অধিক দিন যাপন করিয়াছি। গালদুর্গে যতদিন ছিলাম, ততদিন কষ্টভোগ বিলক্ষণ হইয়াছে। ভোগীর পক্ষে পর্যটনের কোন আরামই নাই। যাহারা শরীর সেবাতেই অর্দ্ধজীবন যাপন করে, বেড়ান তাহাদের জন্য নয়। যাহারা এই মনে করিয়া বাহির হয় যে ভাল খাওয়া ভাল থাকা, সকলই সুবিধা মত হইবে, তাহারা যেন গৃহ হইতে বাহির না হয়। পর্যটনের, লক্ষ্য ও ফল অন্যরূপ। আমার শারীরিক যে সকল কষ্ট গিয়াছে, এক সমুদ্র দর্শনেই সে সকল কষ্টের অবসান। সমুদ্রের মহান গম্ভীর উদার মূর্তি দেখিয়া মন উন্নত হয় এবং আত্মা সেই ভূমার প্রতি উড্ডীন হয়। ইষ্টক ধূলি ও জনতা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সৃষ্টির সঙ্গে আলাপ করা মহৎ সুখের কারণ। এই ক্ষুদ্র ভ্রমণে অনেক প্রকার লোকের সঙ্গেও দেখা হইয়াছে। মনুষ্যকেই শিক্ষা করা মনুষ্যের যথার্থ শিক্ষা। আমরা দুই পান্থশালা আর দুই বাষ্পপোতে থাকিয়া যেন চারিটি ক্ষুদ্র পুরী বেড়াইয়া আসিয়াছি। গালপুরীতে প্রায় তিন সপ্তাহ থাকিয়া সিংহলীদের ভাব অনেক জানিতে পারিয়াছি। আমাদের সঙ্গে তাহাদের অনেক বিষয়ে এমন ঐক্য দেখিয়াছি যে তাহারদিগকে ভিন্ন জাতীয় বলিয়াই মনে হয় না। বৌদ্ধধর্মের বিয়য়ে এত অল্প দিনে যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহাতে সেখানে সে ধর্মের হীনাবস্থাই বোধ হয়। এই প্রকার দেশ ভ্রমণে যাহা কিছু ক্ষুদ্র এবং পরিমিত এবং সঙ্কীর্ণ তাহা গিয়া উন্নত এবং বিস্তৃত বিষয়েই মন যায়। মনুষ্যের প্রতি সদ্ভাব এবং সৌহার্দ্য বিস্তৃত হয়। সকলকেই এক পিতার পুত্র— ভ্রাতা সমান জানিয়া তাহারদিগের মন্দ পরিত্যাগ করিয়া ভাল বাছিয়া লইতেই ইচ্ছা হয়। এক্ষণে বাড়ী হইতে কিছুকালের জন্য দূরে থাকিয়া তাহাকে আরো প্রিয়তর বোধ হইতেছে। সকলেরই সঙ্গে নূতন সৌহার্দ্যের সহিত দেখা হইবে। আবার নূতন অনুরাগের সহিত ঈশ্বরের কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে। মন এতকাল বিশ্রাম করিয়া নূতন উৎসাহ ও একাগ্রতার সহিত কর্ম আরম্ভ করিবে। শরীরের বিষয় ঠিক জানি না, কিন্তু বোধ হয়, সেও মনোযোগী ভৃত্যের ন্যায় আমার কার্য করিতে থাকিবে।

পরিশিষ্ট

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ

ইংরাজেরা এদেশ জয় করিয়া শতাব্দীর অধিককাল আমাদের উপর রাজত্ব করিতেছে কিন্তু এদেশীয়দিগের সহিত এখনও তাহাদের সদ্ভাবের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। ইহা যেমন আক্ষেপের বিষয় তেমনি অনিবার্য ঘটনা বলিতে হইবে আমাদের দেশের যে কোন ব্যক্তি ব্রিটিশ-সিংহকে তাহার নিজ গহ্বরে দর্শন করিয়াছে সেই তাহার মহান্ উদার ভাব দেখিয়া বিমোহিত হয় কিন্তু সেই সিংহ যখন বিদেশে আসিয়া বিচরণ করে তখন তাঁহার তর্জ্জন-গর্জ্জনকারী বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া লোক-সকল শশব্যস্ত হয়। যে ইংরাজ সেই ইংলণ্ডে, সেই ইংরাজ এই ভারতে — তবে তাহার অবস্থান্তর হইবার কারণ কি? শুধু আমরা নই — কিন্তু তাহাদের আপনাদের লোকেরাও এই পরিবর্তন দেখিয়া অনেক সময় বিস্ময়াপন্ন হয়। এদেশে একজন ইংরাজ যে সকল ঘটনার মধ্যে নিপতিত হয় তাহা এরূপ বিসদৃশ — যে ইহার মধ্যে পড়িয়া কতক বৎসরের মধ্যেই তাহার প্রকৃত মহৎভাব অন্তর্হিত হয়, অথবা তাহাদিগের সমাজ-প্রণালীর এরূপ শাসন যে তাহাতে সে বাধ্য হইয়া সভ্যতার আবরণে তাহার প্রকৃত নীচ ভাব স্বদেশে গোপন করিয়া রাখে, বা প্রকাশ করিবার অবসর পায় না — কিন্তু যখন সে বিদেশে গিয়া স্বীয় সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে — আংলো-ইণ্ডিয়ান নামে এক নূতন জীব হইয়া দাঁড়ায় এবং "এই বিড়াল বনে গেলেই বন-বিড়াল হয়" এই প্রবাদটির সত্যতা প্রকারান্তরে সপ্রমাণ করে।

যে কারণেই হউক, ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের স্বভাব এক প্রকার — ভারতীয় ইংরাজের ভাব অন্য প্রকার বলিয়া আমাদের চক্ষে প্রতীয়মান হয়। বিলাতে গিয়া ইংরাজদের সঙ্গে সমান ভাবে মিশিলে মেশা যায়। তাহাদের ভোজনালয়ে বসিয়া একত্রে আহারাদি কর — ক্রীড়াকাননে তাহাদের সহিত একত্র আমোদ আহ্লাদ কর — ইংরাজ-পরিবার প্রবিষ্ট হইয়া তাহার গৃহিণীগণের সহিত মন খুলিয়া আলাপ কর, সকলি সম্ভব। কত আদরের সহিত তাহারা তোমাকে গ্রহণ করিবে — সখা বলিয়া তোমার প্রতি হস্ত প্রসারিত করিবে — অভ্যাগত বলিয়া আতিথ্য-সৎকারের ত্রুটি করিবে না। যিনি কোন ইংরাজ-পরিবার মধ্যে বাস করিয়া প্রাতঃকালে গৃহিণীর সহাস্য বদনে সুপ্রভাত অভিবাদন ও রাত্রে শয়নের পূর্বে সৌরাত্র অভিবাদনে অভিনন্দিত হইয়াছেন তিনি তাহা কখন বিস্মৃত হইতে পারেন না। ইংরাজ স্ত্রী হইতে বিদেশীয়গণ যে সেবাশুশ্রূষা পান তাহাতে তাঁহাদের ইংলণ্ড-বাস প্রবাস বলিয়াই বোধ হয় না। ভারতবর্ষীয় মাত্রই সে দেশে সম্মানের সহিত গৃহীত হয় — ভারতবর্ষীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি তথায় যুবরাজ বলিয়া সমাদৃত হন।

এ এক ছবি — এদেশে দেখ আর এক চিত্র। সেই ইংরাজদের সহিত এদেশে আলাপ করিতে যাও দেখিবে তাহাদের আর সে ভাব নাই। তাহাদের গৃহদ্বার বন্ধ। হাস্যালাপের

পরিবর্তে ভ্রুকুটি। তাহারা আপনাদের দলবল লইয়া যে ব্যূহ বন্ধন করে সাধ্য কি যে, এদেশীয় কোন ব্যক্তি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাদের রাত্রি আমাদের দিন — আমাদের দিন তাহাদের রাত্রি। তাহাদের আমোদ আহ্লাদ স্বতন্ত্র — আমোদ প্রমোদের স্থান স্বতন্ত্র। তাহাদের ক্লাবে আমাদের প্রবেশের অধিকার নাই। ইংলণ্ডে গিয়া আমাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি তাহাদের ধনাঢ্য কুলীনদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করেন এখানে হয়ত তাঁহারা সামান্য ইংরাজ-সমাজ হইতেও পরিচ্যুত। তাহাদের গার্হস্থ্য-জীবনের সহিত এদেশীয় দিগের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা ইংরাজদের যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহা কেবল কর্মক্ষেত্রে। ইংরাজ বিচারাসনে—আমরা উকীল হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই, ইংরাজ প্রভুপদে—আমরা দাস হইয়া তাঁহার সেবা করি, ইংরাজ শাসনকর্তা — আমরা জোড় হস্তে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হই। মুসলমানদের রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমান পার্থক্য ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু ক্রমে সে ভাব অনেক শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। মুসলমানদের আচার ব্যবহার হিন্দুদের আচার ব্যবহারে অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল। মুসলমান রাজা হিন্দু মন্ত্রীর পরামর্শ লইতে সঙ্কুচিত হইতেন না, হিন্দু বীরকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। যেমন তাঁহাদের পরস্পর মধ্যে দ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল তেমনি সখ্য বন্ধনেরও নানা উপকরণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইংরাজ ও এদেশীয়দের সম্বন্ধ অন্য প্রকার— তাহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব বোধ হয় না যে কোন কালে বিদূরিত হইবে।

সে দিন আমার দুইটি মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর মধ্যে এ বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল। একজন বলিলেন, "ইংরেজরা আমাদের দেশ সুশাসন করিতেছেন তাহা কি বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন? দেখ তাঁহারা না থাকিলে আমাদের কি দুর্দশাই হইত। আমরা পরস্পর পর-উপর খড়্গাঘাত করিয়া দেশকে রক্তে প্লাবিত করিতাম— যাহার বল তাহারই রাজ্য— অধর্মেরই জয়। রাজবিদ্রোহ, অরাজকতা— প্রজাপীড়ন— ঠগি ডাকাতি এই সকল সংঘাতিক অমঙ্গল হইতে ভারতের অধঃপতে যাইবার উপক্রম হইয়াছিল— ইংরাজ-তরবার ভারতভূমিকে এ সকল বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ইংরাজদের আগমনে এদেশে সুশৃঙ্খল রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে— দস্যু তস্করের ভয়— বর্গীদিগের অত্যাচার— পিণ্ডারীগণের আক্রমণ-ভয় বিদূরিত হইয়াছে। ধনপ্রাণ সুরক্ষিত— পরিশ্রম স্বেচ্ছাধীন ও বন্ধনশূন্য, সুতরাং প্রত্যেকে আপন আপন শ্রমের ফল, নির্বিঘ্নে উপভোগ করিতেছে। বাণিজ্য-ব্যবসা বিস্তারে দেশের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কত জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছে— কত মরুভূমি তুল্য স্থান আবাদ হইয়াছে। লৌহ-পথ ও বাষ্পপোতের দ্বারা চলাচলের সুগম হইয়াছে। প্রবাসস্থ বন্ধুগণের নিকট হইতে পত্রাদি পাইবার কেমন সুযোগ— আকাশের তড়িৎ পর্যন্ত এ কার্যে নিযুক্ত। আবার দেখ আমাদিগকে বিদ্যাদানে আমাদের রাজপুরুষের কেমন নিঃস্বার্থ যত্ন। আমাদের চক্ষু ফুটাইলে পাছে তাঁহাদের ভবিষ্যতে কোন হানি হয় ইহার প্রতি লক্ষ না করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য কত শত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

ধর্মের উপর সমাজের রীতিনীতির উপর তাঁহারা হস্তক্ষেপে বিরত। বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তির উপর কোন শৃঙ্খল নাই। এ রাজ্যে বাস করিয়া মন খুলিয়া আপনাদের সুখদুঃখ প্রকাশ করিতে পারিতেছি। সর্বসাধারণের হিতজনক রাজনিয়ম-প্রভাবে প্রত্যেকে আপন মনের স্ফূর্তিতে স্বচ্ছন্দে ইচ্ছামত কার্য করিতে ও জগতের হিত সাধনে নিযুক্ত হইতে পারিতেছি। আর কি চাও? এত উপকার প্রাপ্ত হইয়াও ইংরাজ-রাজ্যের বিপক্ষে লেখনী চালনা করিতে ক্ষান্ত নহ? আর ইহাও যে করিতে পার সে কেবল ইংরাজ রাজ্যের অনুগ্রহে, তাঁহারা মনে করিলে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ-বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। অতএব এই সকল উপকার স্মরণ করিয়া আমাদের রাজপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

আমার অপর বন্ধু উত্তর করিলেন— "এই সকল যুক্তি আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। বিদেশীয় রাজ্যের প্রতি রাজ-ভক্তি উদয় হওয়া সহজ নহে। তবে যদি তাঁহারা স্বদেশীয় রাজার ন্যায় পিতৃ-ভাবে শাসন করেন, তবেই তাহা সম্ভব, নচেৎ নয়। দেখ এই বিদেশীয়দিগের দ্বারা ভারতের যথাসর্বস্ব অপহৃত হইতেছে কি না। বিলাতে এক গবর্নমেন্ট— এদেশে এক গবর্নমেন্ট — ও দিকে মন্ত্রী দল-পরিবেষ্টিত সেক্রেটরি অফ্ স্টেট্, এদিকে রাজপ্রতিনিধি গবর্নর-জেনারেল, গবর্নর লেফটনেন্ট্, গবর্নর, কমিসনর প্রভৃতি অধিপতিগণ আমাদের দেশ হইতে কত কোটি কোটি টাকা লুটিয়া লইতেছেন। বিদেশীয় সৈন্য-রক্ষার জন্য কত ব্যয় হইতেছে। রাজপুরুষদের ধর্মযাজকগণ 'হীদেন' প্রজা-নিষ্পীড়িত ধনকোষ হইতে অবাধে অর্থ সংগ্রহ করিতে কিছুই মনে করেন না। কত দিক দিয়া ভারতের রক্ত শোষণ হইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। পিণ্ডারীদের উপদ্রব নাই সত্য বটে কিন্তু প্রজাগণের দারিদ্র্য-নিবন্ধন কষ্ট তেমনি প্রবল। কত প্রকার রাজস্বের সৃষ্টি হইতেছে তাহার সীমা নাই। আমাদের যে ভূরি ভূরি আইন বর্ষণ হইতেছে তাহাতে আমাদের বাস্তবিক উপকার কি অপকার তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সর্বত্রই শুনা যায় যে, পূর্বে আমাদের পরস্পর ব্যবহারে যে সত্য ও সরলতা ছিল তাহা একালে আর নাই। পূর্বে আমাদের এক কথার যে মূল্য ছিল, এখনকার শত দলিল দস্তাবেজের সে মূল্য নাই। যে প্রদেশে ইংরাজি আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে — ইংরাজি আইন প্রচলিত হইয়াছে সেখানেই কপটতা— কুটিলতা— জাল— মিথ্যাশপথ প্রশ্রয় পাইতেছে। চোর ডাকাতের ভয় নাই সত্য কিন্তু আমরা নিরস্ত্র ও আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া ক্রমেই বলবীর্যহীন নির্জীব হইয়া পড়িতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতাপে আমাদের জাতীয় গৌরব হ্রাস হইতেছে। বিদেশীয় বাণিজ্য ব্যবসা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রমে আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ের লোপাপত্তি হইতেছে— কত কত দেশীয় শ্রমোপজীবীর অন্ন মারা যাইতেছে। এ সকল সত্ত্বেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজ শাসনে আমাদের দেশের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে— কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে সে শাসন ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রীতির উপর নহে। আমাদের সঙ্গে ইংরাজদের মমতা নাই। পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে ভাবের কেমন অমিল। রাজা যখন বিদেশী— জেতৃ-বিজিতের

মধ্যে যখন এত বিষয়ে অনৈক্য তখন আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ কেবল স্বার্থ-সম্বন্ধ বলিয়াই প্রতীতি হয়। আমরা বলি ইংরাজেরা আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন তাহা হয় দায় পড়িয়া নতুবা স্বার্থসাধন উদ্দেশে। তাঁহাদের রাজ্য — রাজ্যের সুশৃঙ্খলা আবশ্যক। তাঁহারা সভ্যজাতি — সভ্যতার অনুরোধে আমাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইতেছে। এদেশীয় লোকে শিক্ষিত না হইলে রাজকার্য চলিবে কি প্রকারে? তথাপি দেখা যাইতেছে তাঁহারা সহজে আমাদিগকে সমান অধিকার প্রদানে সম্মত নহেন। আমাদিগকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সহজে তাঁহারা স্বীকৃত হন না। সিভিল সার্বিস সর্বসাধারণের জন্য মুক্ত সে কেবল নামমাত্র। সিবিল সার্বিসে প্রবেশের নিয়মাবলী এরূপ কালকৌশলে সংরচিত যে এদেশীয়দের জন্য তাহার প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সৈনিকদলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পথ আমাদের সম্বন্ধে একেবারেই রুদ্ধ। এই সকল দেখিয়া আমাদের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্যও মনে করেন যে ইংরাজেরা মুখে যাহাই বলুন, তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে আমরা প্রভুদাসের সম্বন্ধ যেন কখন বিস্মৃত না হই, তাঁহাদের ইচ্ছা যে আমরা অনাবৃত পদে, গললগ্নীকৃত বস্ত্রে, সেলাম করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হই। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে ভয় অপেক্ষা প্রীতির আকর্ষণী শক্তি অধিক। শস্ত্রের বলে ভারতের কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জকে বশে রাখা সহজ নহে। দেশীয় বিদেশীদের মধ্যে যাহাতে প্রীতি ও একতা স্থাপিত হয় তাহাই স্থায়ী মঙ্গলের সোপান। আমরা চাই যে ইংরাজেরা আমাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করুন, এদেশীয়দিগকে আপনাদের সঙ্গে সমান অধিকার প্রদান করুন, কৃষ্ণ শ্বেত বর্ণের মধ্যে প্রভেদ যতদূর সাধ্য বিলুপ্ত করুন, এদেশীয়দের উপর কঠোর বিচ্ছিন্ন ভাব না রাখিয়া তাহাদের সহিত সখ্য ও সমতা বন্ধন করুন, আমরা আর অধিক কিছু প্রার্থনা করি না। তাঁহারা যদি সৎভাবে আমাদের দিকে একপদ অগ্রসর হন, আমরা শতপদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত।"

তৎপরে তিনি আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ত ভাই ইংরাজদের সঙ্গে অনেক মিশিয়াছ, তোমার মনে তাঁহাদের গুণাগুণ কিরূপ দাঁড়াইয়াছে?" আমি উত্তর করিলাম, "মানুষ অপূর্ণ জীব— দোষগুণ সকল মানুষেরই আছে, ইংরাজদের চরিত্রও এনিয়মের বহির্ভূত নহে, কিন্তু আমার মনে হয় যে, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের এখনকার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। আমি অনেক সময় মনে করিয়া দেখি এদেশীয় ইংরাজদের মধ্যে আমার কেহ বন্ধু আছে কি না? তাহাদের সঙ্গে আমি একত্র পানভোজন করিয়াছি, ক্রীড়ালয়ে একত্রে ক্রীড়া করিয়াছি, কর্মকাজ প্রসঙ্গে অনেক সময় মিলিত হইয়াছি, তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আলাপপরিচয় আমার সর্বদাই হইয়া থাকে। কিন্তু কৈ একজনকে এমন দেখি না যাহাকে আপনার বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি। একজন ভদ্র ইংরাজ আমার সম্মুখে হয়ত আমার স্বজাতির নিন্দা করিতে বিরত হইতে পারেন কিন্তু আমার পশ্চাতে কি করেন তাহা জানাই আছে। দেখা হইলে 'ভাল আছেন' বলিয়া অভিবাদন অথবা সময়ে

সময়ে ভোজনের নিমন্ত্রণ অথবা ভদ্র-রীতি অনুসারে কথোপকথন— ইহা অপেক্ষা অধিক অনুরাগ সঞ্চারের কোন সম্ভাবনা দেখি না। তবে অবশ্য বলিব যে কর্তব্য-জ্ঞান ইংরাজ প্রকৃতির এক অসাধারণ গুণ। কর্তব্যের অনুরোধে ইংরাজেরা সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত, সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে তৎপর।" আমার বন্ধু বলিলেন, "ইংরাজেরা আমাদের সঙ্গে ভাবে মিলিয়া চলিবে ইহা সম্ভবপর নহে। আমাদের আশা অতদূর উঠিতে সাহস করে না। তাহারা যে এদেশীয়দিগকে আপনাদের জাতভায়ের সঙ্গে সমান চক্ষে দেখিবে অথবা সমান অধিকার প্রদান করিবে এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। আমরা আর অধিক কিছু চাই না, আমরা তাহাদের একটুকু ভদ্র ব্যবহারেই সন্তুষ্ট। নিতান্ত, 'নিগার' বলিয়া আমারদিগকে ঘৃণা না করেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু ততটুকু দাক্ষিণ্যভাবও দুর্লভ। দুঃখের কথা কি কহিব, সে দিন আমার কন্যার বিবাহোপলক্ষে কলেক্টর সাহেবের নিকট রাস্তা দিয়া বাদ্য বাজাইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আবশ্যকমত পরওয়ানা দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু আমি সমস্ত আয়োজন করিয়া সময়-কালে দেখি যে, সাহেবের অনুতাপ উপস্থিত। তিনি পুলিস দূত কর্তৃক বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার মাডামের শরীর ভাল নাই, টম্‌টম্ বাদ্য তাঁহার বাটীর নিকট দিয়া বাজাইয়া যাইবে ইহা তাঁহার সহ্য হইবে না, অতএব পরওয়ানা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। বাদ্যের অভাবে বিবাহের উৎসব ভঙ্গ হইল ও আমার গৃহের স্ত্রীগণের হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিল তাহা বুঝিতেই পার। এক মিনিটের জন্য এই বাদ্য তাঁহার মাডামের শ্রুতিকর্কশ বোধ হইবে এই আশঙ্কায় সাহেব আমার সমুদয় কুল-কামিনীকে বিষাদে মগ্ন করিতে কিঞ্চিতমাত্রও কুণ্ঠিত হইলেন না। এইরূপ স্বার্থপরতা দেখিয়া ইংরাজদের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা হয়। তাঁহারা আমাদের রীতিনীতি এত অল্প জানেন ও সেই অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন সময়ে সময়ে এমত অদ্ভুত নিয়ম জারী করেন যে আমাদের বৃথা মনক্ষোভ জন্মানো ভিন্ন আর কিছুই তাহার উদ্দেশ্য বোধ হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ— এক পাদুকা লইয়া মধ্যে মধ্যে কত গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাঁহারা ভদ্রসমাজে গেলে টুপি খুলিয়া যান, আমরা মস্তক আবৃত রাখি কিন্তু তাঁহারা মনে করেন যে বড়লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে অনাবৃত পদে যাওয়া আমাদের ভদ্ররীতি। এই সকল ভাবিয়াচিন্তিয়া এইক্ষণে তাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন যে ইংরাজ মহলে বুট পরিয়া যাইবার বাধা নাই কিন্তু দেশীয় পাদুকা ব্যবহার নিষিদ্ধ। জান ত পারসীরা কেমন রাজভক্ত, তাহাদের আপনাদের রাজভক্তির কতই গৌরব করে। সে দিন পুণার গবর্নরের এক দরবারে একজন সম্ভ্রান্ত পারসী পুরোহিত উপস্থিত হন। গিয়া দেখেন প্রবেশের অনুমতি নাই— অপরাধের মধ্যে তিনি দেশীয় পাদুকা পরিয়া গিয়াছিলেন। দ্বারপাল কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাইবেট সেক্রেটারির নিকট বলিয়া পাঠান। তাহার উত্তর— দেশী জুতা পরিয়া যাইতে গবর্নর সাহেবের হুকুম নাই।। অনেক কাকুতিমিনতিতে কিছুই ফলোদয় হইল না। একে পারসী, তাহাতে পারসী পুরোহিত, তিনি এ অপমান গ্রাহ্য না করিয়া রাজদ্বারে যাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দমনীয়

রাজভক্তি কিছুতেই পরাজিত হইবার নহে, কি করেন, অবশেষে তাহার এক বন্ধুর নিকট হইতে এক জোড়া ইংরাজী বুট ধার করিয়া গবর্নর সাহেবকে সেলাম করিয়া আসেন। আমরা ত ইংরাজদের পদানত প্রজা কিন্তু তাঁহারা এদেশীয় রাজা-রাজড়ার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। যোধপুরের রাজাকে রাজদরবার হইতে কিরূপে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল তাহা তোমার মনে থাকিতে পারে। সে দিন এক মহারাষ্ট্র পত্রে আর একটি বিবরণ পাঠ করিলাম, তাহা এই;— সম্প্রতি বোম্বায়ের গবর্নর সাহেব কোহলাপুর পরিদর্শন করিতে যান ও তদুপলক্ষে কোহলাপুর মহারাজার প্রাসাদে এক দরবার হয়। মহারাজা ও দরবারে নিমন্ত্রিত সৈনিক ও অন্যান্য ভদ্রলোক আসন গ্রহণ করিলে দক্ষিণ মহারাষ্ট্র সম্পর্কীয় জনৈক ইংরাজ সৈনিক-পুরুষ দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহারাজা আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে বিনীত ভাবে সেলাম করেন। মহারাজাকে উঠিতে দেখিয়া স্বয়ং গবর্নর সাহেব ও সভাস্থ সকলে উঠিয়া দাঁড়ান ও মহারাজ সৈনিক-কর্মচারীকে বসাইয়া নিজে আসন গ্রহণ করিলে তবে তাঁহারা স্ব স্ব আসনে পুনর্বার উপবিষ্ট হন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সভাস্থ সকলে ও নিজে গবর্নর সাহেব পর্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। গবর্নর সাহেব এই বিস্ময়জনক ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মহারাজ উত্তর করিলেন যে, তিনি তাঁহার ইংরাজ গুরুদিগের নিকট হইতে এই উপদেশ পাইয়াছেন যে যখনি কোন ইংরাজ দেখিবে অমনি আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করিবে। ইংরাজদের এইরূপ ব্যবহারে আমরা চটিয়া যাই। বাস্তবিক ত আমরা চিরদিন পরাধীন পরাজিত জাতি, কিন্তু মৃতের উপর খড়্গাঘাতের প্রয়োজন কি? এতটুকু বাহ্য ভদ্রতায় উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। বাস্তবিক তরবারির বলে আমাদের দেশ জিত হইয়াছে কিন্তু তাহা সর্বদা আমাদের চক্ষের সামনে ধরিয়া রাখিবার আবশ্যক কি? বল অপেক্ষা প্রীতিতে রাজ্যের ভিত্তি নির্মাণ করা অধিক শ্রেয়স্কর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শস্ত্র অপেক্ষা শাস্ত্রের বল অধিক— সভ্যজাতিকে একথা বলা বাহুল্য। নূতন নূতন পদবী বৃষ্টিতে, রাজসভার বৃথা আড়ম্বরে, শস্ত্রের বলে, অথবা রাজনীতির কৌশলে যাহা না হয়, ইংরাজেরা দেশীয়দের প্রতি একটুকু আন্তরিক সদ্ভাব ও মমতা দেখাইয়া তাহা করিতে পারেন। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগের কষ্ট নিবারণে সাহায্যদান, অথবা কোন দেশহিতকর কার্যে উৎসাহ প্রদান কিম্বা দেশীয় কোন মহাত্মার বিয়োগে শোক প্রকাশ দ্বারা, ভারতের হৃদয়কে ইংরাজ রাজ্যের প্রতি তদপেক্ষা সহস্রগুণে আকৃষ্ট করিতে পারেন। কঠোর লৌহ-শৃঙ্খল ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু প্রেমের মোহন শৃঙ্খল ভঙ্গ হইবার নহে। ইংরাজেরা যদি আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে চান ত আমাদের সঙ্গে সমান ভাবে— আপনার মত ব্যবহার করুন, কৃষ্ণবর্ণের জন্য এক নিয়ম, শ্বেতবর্ণের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম, এ ভাব পরিত্যাগ করুন। আমরা সকলেই সেই এক সাম্রাজ্ঞীর প্রজা, অতএব আমরা সকলে সদ্ভাবে মিলিয়া কার্য করিলে রাজ্যের যথার্থ গৌরব রক্ষা হয়।"

ইংরাজভক্ত গোবিন্দরাও বলিলেন— "বিদেশীয় রাজা বলিয়া যাই বল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজদের আগমনে আমাদের দেশ সুপ্তাবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ব্রিটিশ-ভারতবর্ষ ও দেশীয় রাজ্য—এ উভয়ের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেশীয় রাজ্যে রাজকার্যের কিরূপ বিশৃঙ্খলা, রাজার কিরূপ বিশৃঙ্খলা, রাজার কিরূপ অত্যাচার, প্রজাগণের কি দুর্দশা! ইংরাজরাজ্য কি তাহা অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট নহে? আমরা যদি আপনাদের রাজ্য আপনারা চালাইতে পারিতাম, তাহা হইলে ত কথাই নাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে ঐক্য কোথায়? জাতীয় বন্ধন কোথায়, আমরা আত্মসংরক্ষণে অক্ষম বলিয়াই ত ইংরাজেরা এ দেশ জয় করিয়াছে, নতুবা তাহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত না। আমাদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের ক্ষমতা নাই বলিয়াই বিদেশীয় রাজার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। তোমার ভাবের ভাবুকগণ বিদেশীয় রাজ্যের প্রতি দোষারোপে তৎপর, কিন্তু তাহার বিনিময়ে কি পাইবে? স্বাধীন রাজ্য? জাতীয় গৌরব? না অরাজকতা, অন্যায় অত্যাচার, পরস্পর বিদ্বেষ, পরস্পর বিবাদ বিচ্ছেদ, ব্রিটিশ তরবারি এই সকল হইতে আমাদিগেকে রক্ষা করিতেছে— সুতরাং বিদেশীয় রাজ্য রক্ষা নিবন্ধন যে অধিক অর্থব্যয় ও আর আর কতক বিষয়ে ক্ষতি তাহা অবশ্য আমাদের দায়ে পড়িয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। আমাদের সঙ্গে ইংরাজদের ভাবে মেলে না,— আমাদের পরস্পর মমতা নাই, কি করা যায়, তাহার কোন উপায়ান্তর নাই। যত দূর পারা যায় মন্দের মধ্য হইতে ভালটুকু বাছিয়া লইতে হইবে। যে পাশ্চাত্য জ্ঞানসূর্য উদয় হইয়াছে, তাহার আলোক যথাসাধ্য বিকীর্ণ কর। পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে যে স্বাধীনতার ভাব যে উন্নতির ভাব লাভ করা যায়, তাহা শিক্ষা করিয়া স্বজাতির উৎকর্ষ সাধনে নিয়োগ কর। সভ্যজাতিকে সভ্যতার অস্ত্রে বশ করিয়া যতদূর সাধ্য দেশের কল্যাণ সাধন কর। গতানুশোচনায় কি ফল? যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা বৃথা। বর্তমান সময়ের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া দেশহিতকর কার্যে ব্রতী হও। স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করায় লাভ কি? ভারতের ভাগ্য নিন্দা করিয়া বৃথা আক্ষেপের প্রয়োজন কি?"

দেশানুরাগী দাদাজী ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া অধীর স্বরে উত্তর করিলেন— "আমাদের আর আছে কি? যাহা ছিল সকলই গিয়াছে। এক সময় ভারত স্বাধীন ছিল ও স্বতেজে পৃথিবীকে আলোকিত করিয়াছিল— এখন সে পরাধীন। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকলি গিয়াছে। তাহার সন্তানগণের আক্ষেপ ভিন্ন আর কি গতি? সে পথটুকুও কি বন্ধ করিতে চাও? বালকের বল ক্রন্দন— আমাদেরও তাই। আমরা ত নিরস্ত্র "নিঃসত্ত্বপরাণ" হইয়াছি। তুমি চাও যে, আমরা আপনাদের অবস্থা ভুলিয়া থাকি, কিন্তু তাহা পারি কি? তুমি বলিতেছ আমাদের জাতীয় বন্ধন নাই, জাতীয় ঐক্য নাই, সেটি কিসে হয় তাহা দেখিতে হইবে। ধনাঢ্য ব্যক্তির মোসাহেব হইয়া থাকিলে খাওয়াপরার কোন ভাবনা থাকে না সত্য বটে, কিন্তু সেই কি সুখের অবস্থা? স্বাধীন ভাবে শাকান্ন আহার করিয়া দিনপাত করা ভাল,

পরাধীন হইয়া রাজপ্রসাদ উপভোগ করাও কষ্টকর, একি তুমি অস্বীকার করিতে পার? আমাদের দেশের প্রতি যদি প্রকৃত স্থায়ী উন্নতিসাধন করিতে চাও ত তাহা আমাদের স্বতেজে নিজ বলে, আপনাদের মধ্যে হইতেই করিতে হইবে। পরের উপর নির্ভর করিয়া তাহা সাধিত হইবে না। বিদেশীয় রাজা যতই প্রজাবৎসল হউন না কেন সে রাজ্যের এক প্রধান দোষ এই যে, তাহাতে বাস করিয়া আমাদের আত্মনির্ভর, স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন ক্রমেই শিথিল হইতে থাকে, জাতীয় ভাব ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া যায়। পরের অনুগ্রহের উপর সকল নির্ভর, আমরা আপনার জন্য কিছুই করিতে পারি না। গবর্নমেণ্ট যাহা করিয়া দিবেন, তাহাতেই আমাদের নিস্তার। যদি দেশের কোন অমঙ্গল নিবারণ করিতে চাহি, কোন সামাজিক উৎকর্ষ সাধন করিতে ইচ্ছা করি, তাহার জন্য গবর্নমেন্টের দ্বারে গিয়া বলি— ভিক্ষাং দেহি। ইহা অপেক্ষা কোন জাতির অধিক হীনাবস্থা আর কি হইতে পারে? ইংরাজদের রাজত্ব এতকাল রহিয়াছে, তাহার বিষ-ফল আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি। আমরা সভ্যতার নামমাত্র গ্রহণ করিয়া বাহ্য আচার ব্যবহার পরিবর্তনের প্রতিই উন্মুখ রহিয়াছি। আহারপান বিষয়ে যথেচ্ছাচারই আমাদের সভ্যতার পরাকাষ্ঠা। পশ্চিমবাসীদের সহিত সংশ্রব হইয়া আমরা তাহাদের কতকগুলি বাহ্য আড়ম্বরেই মুগ্ধ থাকি। তাহাদের বাহ্য সভ্যতাই আমাদের দেহ-মনকে আকর্ষণ করিতেছে। এক সভ্য জাতি অন্য এক দুর্বল জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, আমাদের দেশে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই আকর্ষণ বলে এ দেশের যে সকল আধ্যাত্মিক উন্নত ভাব, তৎসমুদায় ক্রমে অস্তমিত হইতেছে। আমাদের জাতীয়তা ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। পরাধীনতার অন্ধকারে আমরা এরূপ আবৃত আছি যে, কি ভাল কি মন্দ তাহা আমরা ইংরাজের চক্ষু দিয়াই দর্শন করি। আমরা মানমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরাজদের উপরেই তাকাইয়া থাকি। আমাদের দেশের কি উপযোগী ও প্রকৃত কল্যাণকর সে বিষয়ে আমরা বাস্তবিক অন্ধ। ইহা অপেক্ষা অধিক দুরবস্থা আর কি হইতে পারে? বিদেশীয় রাজার স্বার্থ এই যে, প্রজাগণ নিঃসত্ত্ব ও দুর্বল হইয়া তাহার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে শিখুক, প্রজারাও যদি সেই দিকেই ধাবিত হয়, তাহারা যদি সেই স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ করিতে না চায়, তবে তাহাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই। ইংরাজেদের নিকট হইতে আমরা যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হও, আমি 'না' বলিব না। কিন্তু ভাই, তাই বলিয়া তোমরা স্বজাতির প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হইও না। রোগী যদি রোগের যাতনা অনুভব করিতে না পারিয়া আপনাকে সুস্থ মনে করিয়া কার্য করে, ত নিশ্চয় জেনো তাহার আসন্ন কাল উপস্থিত। জাতির পক্ষেও এই নিয়ম। তুমি ভাই যাই বল, আমি ত কখনই মনে করিতে পারি না যে, ইংরাজ রাজ্যে আমাদের সুখের পরাকাষ্ঠা। গণ্ডের উপর আবার বিস্ফোটক। একে পররাজ্য, তাহাতে আবার ইংরাজদের উদ্ধত স্বভাব, তাহাদের ও আমাদের মধ্যে ভাবের অমিল, তাহাদের জাতীয় স্বার্থপরতা, অনুদারতা, অহঙ্কার দেখিয়া দেখিয়া আমাদের বিদ্বেষানল সততই প্রজ্বলিত থাকে। ইহা যেন মনে থাকে যে, আমাদের

যে রূপ অবস্থা তাহাতে রাজার স্বার্থ এবং প্রজার স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। সুতরাং রাজ-ভক্তির মূলেই কুঠারাঘাত। দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইলে মাঞ্চেষ্টার হইতে হাহাকার উঠে। আমাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা প্রসার হইলে রাজপুরুষদের ভয় হয় পাছে আমরা তাহাদের সমকক্ষ হইতে সাহসী হই, পাছে তাহাদের অধিকৃত উচ্চ কর্ম্মস্থানগুলি অধিকার করিয়া লই। ইংরাজ রাজ্য হইতে আমাদের ইষ্টানিষ্টের তুলনা করিলে বেশীর ভাগ কি দাঁড়ায়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। এই সম্বন্ধে মহাত্মা স্যর টমস্ মনরোর নিম্নলিখিত হৃদয়ভেদী কথাগুলি আমাদের প্রণিধানযোগ্য—

ব্রিটিশ রাজ্য হইতে এদেশীয় লোকদিগের লাভালাভ তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে লাভের ভাগ যত অধিক হওয়া উচিত তাহা হয় নাই। বাহিরের যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা অভ্যন্তরীণ বিপ্লবাদি হইতে তাহারা সুরক্ষিত সন্দেহ নাই। তাহাদের ধনপ্রাণ পূর্বাপেক্ষা অধিক সংরক্ষিত, কর্তৃপুরুষদের দ্বারা তাহাদের বিনাপরাধে দণ্ড অথবা অর্থোপহরণের সম্ভাবনা নাই, আর তাহাদের করভারও অপেক্ষাকৃত লঘু। কিন্তু আর একদিকে দেখ, তাহাদের জন্য যে সকল আইন হইতেছে, তাহার রচনাতে তাহাদের কোন হস্ত নাই ও কনিষ্ঠ পদের কর্মচারীদের যতদূর সম্ভবে তদ্ভিন্ন সেই সকল আইন জারী করিবারও তাহাদের অধিকার নাই। সিবিল অথবা সৈনিক বিভাগের উচ্চ পদবীতে আরোহণে তাহারা অসমর্থ। যাহারা দেশের প্রাচীন কর্তা ও নেতা, তাহারা হীন পরাধীন জাতিরূপে, দাস ও অনুচররূপে সর্বত্র পরিগণিত।

দেশীয়দিগকে ন্যায়াবহ রাজনিয়ম ও লঘু করের সুফল প্রদানেই যথেষ্ট হইল তাহা নহে। তাহাদের জাতীয় স্বভাব উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু বিদেশীয় রাজার রাজ্যে তাহাদের অবনতির এত রাশি রাশি কারণ রহিয়াছে যে অধঃপতন হইতে তাহাদিগকে তুলিয়া রাখা দুষ্কর। এক প্রাচীন উক্তি আছে, 'He who loses liberty loses half his, virtue', যে ব্যক্তি স্বাধীনতা হারাইয়াছে সে অর্দ্ধেক ধর্ম হারাইয়াছে, ইহা যেমন প্রতিজনের পক্ষে তেমনি জাতির পক্ষেও খাটে। যে ব্যক্তির কিছুই সম্পত্তি নাই, সে যেমন কৃপাপাত্র, যে জাতির সমুদয় সম্পত্তি পররাজ্যের অধীন সে তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ক্রীতদাস যেমন স্বাধীন জীবের অধিকার হইতে বিচ্যুত, পরাধীন জাতি সেইরূপ জাতীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত। সে অধিকার কি, না আপনাদের জন্য করস্থাপন, আপনাদের জন্য আইনবন্ধন, স্বরাজ্যের রাজকার্য পরিচালন; ব্রিটিশ ভারতবর্ষ এই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত। পর-রাজ্য সুখময় হইলেও স্বজাতীয় রাজার একাধিপত্য ততোধিক প্রার্থনীয়। যদি অধীনতাই স্বীকার করিতে হয়, ত বিদেশী অপেক্ষা দেশীয় রাজার অধিপত্য স্বীকার করা বিজিত জাতির অধিক গৌরবের বিষয়। রাজ্য প্রজাতন্ত্রই হউক আর সাম্রাজ্যই হউক, তাহাদের বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার প্রজাগণ সর্বদাই তৎপর থাকে। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে জাতীয় ভাব উত্তেজিত হয়, এবং এইরূপ সঙ্কটস্থলে প্রজাগণ উভয়বিধ রাজ্য রক্ষাতেই

প্রাণপণে যত্নশীল হয়। বিদেশীয় রাজার রাজার অধীনতা স্বীকার করিলে যেমন জাতীয় ভাবের ও জাতীয় গৌরবের নাশ হয় দেশীয় রাজার যদৃচ্ছ শাসনে তেমন হয় না। যখন জাতীয় ভাব বিনষ্ট হইল, তখন সমাজগত ব্যক্তিগত জীবনে যাহা কিছু মহৎ যাহা কিছু প্রশংসনীয়, সকলই সমূলে শুষ্ক হয় এবং জাতীয় ভাবের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বভাবেরও অধঃপাত হয়।"

আমার বন্ধুদ্বয় শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমি আর অধিক কিছু বলিব না। ভারতবর্ষীয় ইংরাজদের আচার ব্যবহার সমালোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি, এক্ষণে তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

আংলো-ইণ্ডিয়ানের প্রকৃত ভাব যদি দেখিতে চাও, ত মফস্বলের কোন এক নামাঙ্কিত নগরে তাহাদিগকে দর্শন কর। সেখানে হয়ত একদিকে ইউরোপীয় অথবা দেশীয় দুই এক সেনাদল প্রতিষ্ঠিত ও তৎসম্বন্ধে কয়েকজন সৈনিক পুরুষ অবস্থিত আছে, অপর দিকে জজ কালেক্টর প্রভৃতি সিবিলিয়ানদল রাজত্ব করিয়াছেন, একদিকে লালকোট, অন্যদিকে কালকোট। সেনাদলের মধ্যে লেফ্‌টেনেন্ট কাপ্তেন, মেজর, লেফটেনেন্ট কর্নেল, কর্নেল ও সর্বোচ্চ শিখরে সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল সাহেব বিরাজিত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত। অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সস্ত্রীক হইয়া রাজ্যভোগ করেন। মিলিটরিদিগের মধ্যে সকলে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করেন না "মেস" নামক তাঁহাদের সাধারণ ভোজনালয় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইবে। যেখানে সৈনিক দলের আবাস সেখানে এক কিম্বা একাধিক মেস্ প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা বিবাহিত তাঁহারা প্রায় নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করেন, তদ্ভিন্ন আর আর সকলে প্রায় প্রতিদিন মেসেই আহারাদি করিয়া থাকেন। ইহা সাধারণের মিলিবার স্থান। মধ্যে মধ্যে বাহিরের লোকদের নিমন্ত্রণ হয়। সেই নিমন্ত্রণ রাতে অপেক্ষাকৃত অধিক সমারোহে ভোজনাদি কার্য সম্পন্ন হয়। মেস যেমন মিলিটারিদের জন্য, ক্লাব তেমনি সর্ব-সাধারণ ইংরাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পুণা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে ইংরাজদিগের সাধারণ-সম্মিলন স্থান এক একটি ক্লাব দৃষ্ট হয়। মিলিটরি, সিবিলিয়ন ও ইংরাজদের মধ্যে আর আর বাছাগোছা লোক তাহার অঙ্গীভূত। এই সকল ক্লাবে "নেটিব"দের প্রবেশের অধিকার নাই। ইংলণ্ডে গিয়া তুমি হয়ত ভিক্‌টোরিয়া সাম্রাজ্ঞীর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করিয়া আসিবে, কিন্তু এখানকার এক সামান্য ক্লাবে তোমার প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ। এই সকল ক্লাবে বাসের নিয়ম, গৃহসজ্জা, আহারাদির পারিপাট্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ভৃত্যদের কার্যদক্ষতা দেখিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতে হয়। আমরা বিলাতে যে এই সকল চাকচিক্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই তাহা আশ্চর্য নহে। এদেশে আমাদের চক্ষে এ সকল সচরাচর পতিত হয় না বলিয়া আমরা এক প্রকার সুস্থির থাকি, ইংলণ্ডে গিয়া ইংরাজ-মহলে প্রবেশ করিয়া আমাদের মস্তক এরূপ ঘূর্ণিত হইয়া যায় যে, আপনারা আপনাকে স্থির রাখিতে পারি না। স্বদেশের প্রতি মমতা চলিয়া যায়; দেশীয়দিগের উপর অসভ্য বর্বর বলিয়া ঘৃণা জন্মে। যাহা ইংরেজী

তাহাই সেব্য, যাহা দেশীয় তাহাই ত্যাজ্য, হায়। ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষু ফুটে, আমরা দেখিতে পাই যে, এ জাদুর রাজ্য আমাদের নহে, আমরা যে ইংরাজদের পদধূলি লইতে যাই, তাহাদের পদাঘাত পাইয়া আমাদের অবশেষে চেতনা হয়।

এখানকার অধিকাংশ ইংরাজরা কাজকর্মে সমস্ত দিবস ব্যস্ত থাকে। তাহাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ আলাপপরিচয়ের বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। যখন কোন ব্যক্তি কোন এক নূতন স্টেশনে বাস করিতে আসে, তাঁহার উচিত যে, তিনি প্রথমে বাসিন্দাদিগের বাটীতে গিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিশেষতঃ বিবাহিত লোকদের বাটী গিয়া মহিলাগণের সহিত পরিচিত হওয়া তাঁহার প্রধান কার্য। তিনি নিজে যদি অবিবাহিত হন, ত কোন ভদ্র স্ত্রী তাহার বাড়ী আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। তিনি যদি কোন পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করেন, ত তাঁহার নিকট হইতে প্রতি সাক্ষাৎকার প্রত্যাশা করেন, যদি কোন পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তার হয় পুরুষের নিকট হইতে প্রতি সাক্ষাৎকার, নয় গৃহিণীর নিকট হইতে ভোজনের নিমন্ত্রণ লাভ করেন। যদি বিবাহিত পুরুষ কোন এক স্টেশনে আসিয়া বাস করেন, স্টেশনবাসীদিগের কর্তব্য যে, তাঁহার স্ত্রীর সহিত প্রথমে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। এ নিয়মের ত্রুটি হইলে ইহাদের আলাপপরিচয়ের সম্ভাবনা নাই। দস্তুরের বাহিরে ইংরাজেরা এক পা চলেন না। যদি কোন সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর, অমুক লোকের সহিত আপনার পরিচয় আছে? হয়ত তাহার উত্তর করিবেন, সে ত আমার স্ত্রীর সঙ্গে এখনো দেখা করিতে আসে নাই। এই সকল নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ করিবার সময় আপনার নামের এক কিম্বা একাধিক কার্ড পাঠাইয়া দিতে হয়। মেমসাহেবের যদি দেখা করবার ইচ্ছা না থাকে ত বলিয়া পাঠান, মেমসাহেব ঘরে নাই। তোমার যদি কাহারো সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা না থাকে, অথচ নিয়মানুগ করা চাই, ত গৃহস্বামী অথবা গৃহিণী ঘরে না থাকেন এমন সময় বুঝিয়া যাইতে হয় ও তোমার নামের কার্ড রাখিয়া আসিলেই যথেষ্ট। এই সকল সাক্ষাৎকার সম্বন্ধর নিয়মাবলী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সহজ নহে। কত প্রকার সাক্ষাৎকার ও তৎসম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে বলা যায় না। আগন্তুকের প্রথম সাক্ষাৎকার, ভোজন-নিমন্ত্রণ-বিনিময় সাক্ষাৎকার, বন্ধুতার সাক্ষাৎকার, শোক-সংজ্ঞাপক সাক্ষাৎকার, অভিনন্দন সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। কোন কোন সময় তুমি নিজে না গিয়া তোমার নামের কার্ড পাঠাইয়া দিলেও সাক্ষাৎকার সমাধা হইতে পারে। সাহেবেরা এইরূপ ভৃত্য-হস্তে কার্ড পাঠাইয়া কখন কখন দেশীয়দের সাক্ষাৎকারের প্রতিদান করিয়া থাকেন।

আহারের নিমন্ত্রণে ইংরাজদিগের সামাজিকতার বিশেষ পরিচয়। ভাল খাওয়া ও খাওয়ান ইংরাজ-জীবনের মধ্যবিন্দু। তাঁহাদের আমোদপ্রমোদ, দেখাসাক্ষাৎ, হাস্যপরিহাস, আলাপ পরিচয়ের স্থান ভোজনালয়। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আহারপানের নিয়ম নাই, তাঁহাদের মধ্যে ও সেইরূপ, তবে জাতিভেদের নিয়মমাত্র ভিন্ন। জাতিভেদ-প্রথা যে তাঁহাদের

মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, তাহা তাঁহাদের পরস্পর পান-ভোজনের নিয়মে বিলক্ষণ প্রকাশ পায়, সামাজিক মানমর্যাদায় সমান সমান ভিন্ন তাঁহারা একত্রে পানআহার করেন না। আমাদের মধ্যে অনেকে ইংরাজী খানাপিনা আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু এমন মনে করিবেন না যে, আপনাদের সঙ্গে ইংরাজেরা একাসনে বসিয়া আহার করিতে সহজে সম্মত হইবেন। এমন কি, অনেক বড় হোটেলে দেশীয়দের প্রবেশের অধিকার নাই। আমার একজন পারসী বন্ধু বলিলেন যে, তিনি আপনার কয়েকটি বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া অমুক হোটেলে আহারের আয়োজন করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে, তাঁহাদের জন্য নির্বাত বিশ্রী গুদামের মত এক কোণের ঘরে আহার প্রস্তুত। তিনি হোটেল-কর্তাকে ডাকাইয়া সাধারণ-ভোজনালয়ে তাঁহাদের স্থান দিতে অনুরোধ করিলেও তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। অবশেষে তিনি প্রস্তুত খাদ্য সামগ্রী ফেলিয়া বুভুক্ষিত বন্ধুবান্ধব সহ অন্যত্র চলিয়া যান। সে যা হোক, এখন ইংরাজদের ভোজনালয়ে প্রবেশ করা যাক। ভোজনের নিমন্ত্রণে স্ত্রী-পুরুষ বেশভূষা করিয়া একত্রিত হন। মিলিটরিদের মধ্যে কাহারো লাল, কাহারো অন্য রূপ জরির কাপড়, সিবিলিয়ানদের লাঙ্গুল-বিশিষ্ট কাল বনাতের কোট, বিবিদের নানা প্রকার চিত্রবিচিত্র সাজ, ১৩ জন এক টেবিলে একত্র হওয়া অলক্ষণ বলিয়া ইংরাজদের এক সংস্কার আছে, তদ্ভিন্ন ঘর ও টেবিলের পরিমাণ বুঝিয়া নিমন্ত্রিতের সংখ্যা নিরূপিত হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইলে ভৃত্য আসিয়া বলে খানা প্রস্তুত। পরক্ষণেই এক একজন সাহেব এক একজন বিবির হাতে হাত দিয়া খানার টেবিলে লইয়া আপনার পার্শ্ববর্তী আসনে উপবেশন করাইয়া নিজে উপবিষ্ট হন। বসিবার সময় স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসিতে না পারেন এই নিয়মটি রক্ষা করিয়া বসিতে হয়। কোন সাহেব কোন বিবিকে টেবিলে লইয়া যাইবেন তাহার নিয়ম আছে। অভ্যাগতের মধ্যে যিনি সকল অপেক্ষা বড় বিবি, তাঁহাকে গৃহস্বামী লইয়া যান — আর যিনি সকল অপেক্ষা বড় সাহেব তিনি গৃহিণীকে লইয়া যান। এইরূপে স্ত্রী-পুরুষের মানমর্যাদা অনুসারে এক এক জন বিবি এক একজন সাহেবের হস্তে সমর্পিত হন। স্ত্রীলোকের মান তাঁহার স্বামীর পদের উপর অনেকটা নির্ভর। এই রূপ মর্যাদা রক্ষার ত্রুটি হইলে মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়, আর স্ত্রী-পুরুষের যথাযোগ্য বিলিবন্দেজের ব্যতিক্রম না হয় তাহার প্রতি কর্তা ও গৃহিণীর বিশেষ দৃষ্টি থাকে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে যথাস্থানে উপবেশন করাইতে একটু বিবেচনা আবশ্যক। যদি অভ্যাগতের মধ্যে কোন এক বিদ্বান কি সদ্বক্তা উপস্থিত থাকেন, তবে যেখানে বসিয়া তিনি সকলের সঙ্গে কথা কহিতে ও আলাপ করিতে পারেন — এমন মধ্যস্থানে তাঁহাকে উপবেশন করাইতে হয়। দুইজন সমব্যবসায়ীকে পাশাপাশি বসান যুক্তিসংগত নহে, কেন না তাঁহারা হয়ত আপনার কাজকর্ম-সংক্রান্ত কথোপকথন করিয়াই কালহরণ করিবেন, তাহাতে অন্য কাহারো মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। আহারের সময় কিরূপে কাঁটাচামচা ধরিয়া আহার করিতে হয়, পরিবেশনের নিয়ম কি, কোন সময় কোন জিনিস খাইতে হয়, কোন সামগ্রীর সহিত কোন মদ্য পান করা বিধেয়, কিরূপ শব্দ পরিহার্য, কিরূপ

ব্যবহার ভদ্র ও অভদ্র বলিয়া পরিগণিত এসকল বিষয় বলিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়ে, সুতরাং এ সকল বিষয় প্রবেশ করিলাম না। আহারান্তে স্ত্রীগণ আহারের টেবিল হইতে উঠিয়া সমীপবর্তী উপবেশন গৃহে আসন গ্রহণ করেন। বিবিরা উঠিয়া গেলে সাহেবগণ অবসর পাইয়া মনের সাধে পান ও পরস্পর আলাপাদি করিতে পারেন। কিন্তু ইহা বলিতে হইবে যে ভদ্র-সমাজে পানাতিশয্য এক্ষণে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। বিবিদের টেবিল হইতে আগে উঠিয়া যাইবার নিয়ম কেবল ইংরাজ জাতির মধ্যে প্রচলিত — অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত নাই। তাঁহারা স্ত্রীসহবাস হইতে বঞ্চিত হইয়া টেবিলে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করা নিতান্ত অসভ্যতার কার্য জ্ঞান করেন। ওদিকে বিবিরা পুরুষদের সহবাস হইতে পরিচ্যুত হইয়া কিরূপে আলাপাদি করেন, তাহা জানিতে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সে সকল গুপ্তকথা কি প্রকারে প্রকাশিত হইবে? সে স্ত্রী-সভাতে কত কাপড়, কত গয়নার কথা, কত বিবাহের পরামর্শ, কত লোকের চরিত্র সমালোচনা, কত পরাধিকার চর্চা উত্থাপিত হয় কে বলিতে পারে? এই বিষয়ে এক গ্রন্থ রচিত হইলে কত না জানি পুরুষদের শিক্ষোপযোগী বিষয় তাহাতে উপলব্ধি করা যায়।

পরছিদ্রান্বেষণ ইংরাজদের এক জাতীয় ধর্ম, তাহার দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিলে অনেক পাওয়া যাইতে পারে। বড় বড় স্টেশনে সন্ধ্যার সময় সকলের যে মিলিবার স্থান তাহার নাম Scandal Point (নিন্দালয়)। দিবসের কাজকর্ম হইতে অবসৃত হইয়া আংলো-ইণ্ডিয়ান স্ত্রী-পুরুষ এই স্থানে সম্মিলিত হইয়া আলাপাদি করেন। সাহেবরা কেহ অশ্বপৃষ্ঠে কেহ পদব্রজে গাড়ীতে উপবিষ্ট এক একজন বিবির সহিত মধুরালাপে মগ্ন। মধ্যে মধ্যে ব্যাণ্ড বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতেছে। "ঈশ্বর' রাণীকে ক্ষমা করুন" এই তান উঠিলে জানা গেল যে, গৃহে যাইবার সময় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পরস্পর মিলিবার স্থান ক্রীড়ালয়। ইংরাজদের অধিকাংশ ক্রীড়া ব্যায়াম সমন্বিত, আর যাহার সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমের যোগ নাই, উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য সে সকল ক্রীড়াতে রাজী বাখা হয়। হয় শারীরিক পরিশ্রম, নয় মানসিক উত্তেজনা এ দুয়ের এক না থাকিলে ক্রীড়া মনস্থ হয় না। Cricket (গুলিডাণ্ডা) প্রভৃতি প্রথমের দৃষ্টান্ত, ঘোড়াদৌড়, তাস দ্বিতীয়ের উদাহরণ। ইংরাজদের জাতীয় খেলার মধ্যে প্রধান কৃকেট। তাহাদের দৃষ্টান্তে এক্ষণে পারসীরা এই খেলায় এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে যে, তাহাদের সঙ্গে খেলিয়া ইংরাজদেরও অধোবদন হইতে হয়, ও এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, এক দল পারসী ক্রীড়ক ইংলণ্ডে জনবুলের সঙ্গে বাজী রাখিয়া খেলিতে যাইবে। কৃকেট আমাদের গুলি-ডাণ্ডারই প্রকারান্তর খেলা। ইহা হইতে কোমলতর আর এক প্রকার ক্রীড়ার নাম ক্রোকে, ইহার বিশেষ গুণ এই যে, বিবিরাও ইহাতে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমের তত উপযোগী নয় বলিয়া ক্রমে ইহার গৌরব হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ব্যাডমিন্টন নামক খেলা এক্ষণে ক্রোকের স্থান অধিকার করিয়াছে। পক্ষযুক্ত খেচরগুলি, ডাণ্ডা দ্বারা আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিপক্ষের ডাণ্ডা দ্বারা তাহা আহত হয়— এইরূপে ঘাতপ্রতিঘাতে গোলা

এদিক ওদিক্ চলাচল করিতে থাকে, যে পক্ষের লোক ধরিতে না পারে তাহাদের হয় হাত উঠিয়া যায়, কিম্বা প্রতিপক্ষকে এক পয়েন্ট দিতে হয়। এইরূপ এক এক সংখ্যা লাভ করিয়া যে দল নির্দিষ্ট সংখ্যায় আগে পৌঁছিতে পারে তাহাদের জিত। ইহাতে হারজিত যে পক্ষেরই হউক শারীরিক পরিশ্রম উভয় দলেরই সমান। আর এক রকম খেলা আছে, তাহার নাম Skating rink। শীতকালে যখন কোন জলাশয়ের জল জমিয়া কঠিন হয় — তখন সেই বরফের উপর দিয়া চলাচল করার নাম স্কেটিং। শীতপ্রধান দেশে ইহা এক মহা আমোদ, কিন্তু এই উষ্ণ দেশে জল তরলভাব সহজে পরিত্যাগ করে না সুতরাং এখানে স্কেটিং কি রূপে সম্ভব? এই সমস্যা ভেদ করিয়া এই সকল দেশের জন্য স্থলস্কেটিং নামে এক নূতন ক্রীড়ার সৃষ্টি হইয়াছে। এক খণ্ড ভূমি পরিষ্কৃত ও পদার্থ বিশেষের সংযোগে বরফতুল্য মসৃণ চিক্কণ করিয়া এক প্রকার চক্রবিশিষ্ট পাদুকা পরিয়া তাহার উপর দিয়া সহজে চালিতে ফিরিতে পারা যায়। ইহাতে শরীরের ভার রক্ষা করিয়া চলা অনেক অভ্যাসের কর্ম। অনভ্যস্তদিগকে অনেক সময় ধরণীতে লুণ্ঠিত হইয়া ভগ্নদেহতরী হইতে দেখা যায়। যাঁহারা ইহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা যখন সহজভাবে হেলিয়া দুলিয়া নানা প্রকার চিত্র কাটিতে কাটিতে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ান, তখন মনে হয় যেন তাঁহারা আকাশ-পথে বিচরণ করিতেছেন, দুঃখ হয় মানুষের কেনই বা পক্ষ হইল না— হইলে কি আরামে উড়িয়া বেড়ান যাইত। এখন যেন ধরণীর সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে প্রতিপদ অগ্রসর হইতে হয়। এই সকল ক্রীড়াস্থলে নিয়মিত সময়ে বিবিসাহেব একত্রিত হন। এই সকল ব্যায়াম-চর্চার দৃষ্টান্ত যদি আমরা ইংরাজদের নিকট হইতে গ্রহণ করি ত বিস্তর উপকার হয় সন্দেহ নাই। আমরা মনে করি যে, বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ — বাল্যকালই ক্রীড়ার কাল, যুবক ক্রীড়ায় যোগ দিতে সঙ্কুচিত হন। ইংরাজদের এভাব নাই। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই খেলাধুলায় শারীরিক শ্রম-সাধন ও মনের আয়াস নিবৃত্তি করেন। আমাদের এরূপ ক্রীড়া অতি বিরল। শীতকালে অর্দ্ধ ক্রোশ পদচালনা— বাবুদের ব্যায়ামের এক শেষ। বাবু নামের সঙ্গে সঙ্গে গদিতে হেলান দিয়া পানতামাক, গল্পসল্প, আমোদ করা, এই ভাবই মনে উদয় হয়। ইংরাজদের মধ্যে ব্যায়াম-শিক্ষা শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ। অশ্বারোহণ, অস্ত্র-চালনা, ঘুসিমারা, সাঁতার, নাচ, পদচারণা এই সকল না শিখিলে ইংরাজ-ভদ্রসমাজের উপযোগী শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ইংরাজেরা যেখানেই একত্রিত হউক না কেন, তাহাদের বহিঃদ্বার-ক্রীড়ায় বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হয়। আংলো-ইণ্ডিয়ানদের ক্রীড়ালয়ের নাম জিমখানা। এই জিমখানার কার্য বৎসরের মধ্যে একবার সমারোহে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। এ উৎসব সপ্তাহ খানিক চলে। ইহাই তাহাদের জাতীয় উৎসব। এ-সময়ে তাহাদের উৎসাহের আর সীমা থাকে না। বাহিরের নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রিত লোকজনের সমাগম হয় ও অতিথিসৎকার খানাপিনার ধুম লাগিয়া যায়। এই উপলক্ষ্যে ঘোড়দৌড়, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, নৃত্যগীত-অভিনয়, নানা প্রকার ক্রীড়ালাপের আনন্দধ্বনি উঠিতে থাকে। নৃত্যশালায় ইহাদের যে আমোদ তাহার বর্ণনা কি করিব। নাচগৃহ ইন্দ্রভবনের ন্যায় আলোকিত

ও সজ্জিত হয়— বিবিরা উৎকৃষ্ট মনোহর বেশে স্বর্গের পরি ও অপ্সরাব ন্যায় সাজিয়া আসেন ও নিজ নিজ সহচরের সহিত নৃত্য ও প্রেমালাপে মগ্ন থাকিয়া সমস্ত রজনী যাপন করেন। মধ্যে একবার পানভোজনে সকলের শ্রান্তি দূর হইলে নবীন উৎসাহ সহকারে নৃত্য আরম্ভ হয় ও উষার সঙ্গে সঙ্গে মজলিস ভঙ্গ হয়। বর্ষার সময় যখন স্টেশন পূর্ণ থাকে, তখন আংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই সকল আমোদের স্রোত বহিতে থাকে— বর্ষান্তে সিবিলিয়ানদের দল বাহিরে চলিয়া গেলে স্টেশন পূর্ব্ববৎ শান্তভাব ধারণ করে।

শরীরের জন্য জিমখানা — মনের জন্য এক এক পুস্তকালয় ও প্রতি রবিবার ঈশ্বরাধনার জন্য এক ভজনালয়। কার্যালয়, ভজনালয়, ভোজনালয়, পুস্তকালয় ও জিমখানা— এই পঞ্চতীর্থে আংলো-ইণ্ডিয়ানগণ তাহাদের প্রবাস যাপন করে।

ইংরাজেরা শীতপ্রধান দেশের লোক, অথচ এত উষ্ণদেশে তাঁহাদের প্রবাস, কিন্তু ভারতে তাঁহাদের বাসোপযোগী স্থান নাই এমত নহে। এদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে জলবায়ু বিভিন্ন, কোথাও বায়ু অতি উষ্ণ, কোথাও বা সুরম্য, সুশীতল, স্বাস্থ্যকর। বোম্বাই অঞ্চলে দেখ। নিজ বোম্বাই শহর সমুদ্রের ধারে, কোন সময়েই গ্রীষ্মের আতিশয্য হয় না। মালাবার হিল প্রভৃতি সাগর তটস্থ স্থানে অবস্থিতি করিলে গ্রীষ্ম কাহাকে বলে প্রায়ই জানা যায় না। যদি কোন ব্যক্তি শীতকালে বোম্বাই, বর্ষা ঋতুতে পুণা ও গ্রীষ্মকালে কোন পর্বত প্রদেশে বাস করিতে পারেন তাঁহাকে গরমির উপদ্রব কখনই সহ্য করিতে হয় না। ইংরাজদের মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গতি ও সুবিধা আছে তাঁহারা বোম্বাই অঞ্চলে এইরূপে সুখেজীবন ক্ষেপ করেন। আরাম (Comfort) কাহাকে বলে, তাহা যেমন ইংরাজ বুঝে, আমাদের লোকেরা তাহার কিছুই অবগত নহে। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল থাকা,— এর কৌশল শিখিবার যদি আবশ্যক হয়, ত তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা কর। মালাবার হিলে তাহাদের বিবিধ সামগ্রী সজ্জিত বৃক্ষলতায় শোভমান বায়ু-সঞ্চার যোগ্য গৃহাবলী দর্শন করিলে কোনা তাহাদের বাস নৈপুণ্যের প্রশংসা করিবে। আংলো-ইণ্ডিয়ানগণ এদেশে যে উপার্জ্জন করে, তাহার অধিক ভাগই তাহাদের নিজ নিজ আহার পান শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদনেই ব্যয় হয়। আমরা এরূপ করাকে অপব্যয় মনে করি। তাহারা আপনার শরীর পোষণে যে অর্থ ব্যয় করে, তাহাতে আমাদের কত দুঃস্থ পরিবারের ভরণপোষণ হয়। অবসর পাইলে ইংরাজেরা পর্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন না। আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট পার্বত্য প্রদেশ ইংরাজদের বাসগৃহে পরিপূর্ণ। অবকাশ পাইলে তাঁহারা তথায় গিয়া বিশ্রাম করেন। হিমালয়, নীলগিরি, দারজিলিং প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী আংলো-ইণ্ডিয়ানদের আমোদধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত দেখা যায়, তাঁহাদের অভাবে এ সকল স্থান হয়ত দুর্গম বিজন বন হইয়া থাকিত। বোম্বাইয়ের এইরূপ দুই প্রধান সুগম সুরম্য পর্বত-প্রদেশের নাম— মাথেরান ও মহাবলেশ্বর। মহাবলেশ্বর সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪০০০ ফীট উচ্চ ও শোভা-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। মহাবলেশ্বর হতে প্রতাপগড় নামক পাহাড়

দৃষ্ট হয়, সেখানে মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজী নবাব আফজল খাঁকে প্রতারণা পূর্বক ব্যাঘনখ দ্বারা হত্যা করিয়াছিলেন। শিবাজীর সিংহগড় প্রভৃতি অন্যান্য দুর্গম দুর্গ এক্ষণে সুরম্য বাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। এই সকল পর্বতধাম ইংরাজদের প্রিয় আবাসস্থান। ইহাদের জলবায়ু ফলফুল তাহাদের স্বদেশ স্মরণ করাইয়া দেয়। যে সকল সাহেব কার্যের অনুরোধে নিজে এ সকল স্থানে আসিতে না পারেন, তাঁহারা অন্তত তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে পাঠাইয়া দেন। কেহ কেহ আপনার জন্য এক এক গৃহ কিনিয়া রাখেন। এই সকল স্থানে ইংরাজদের সমাগমে এদেশের বিশেষ লাভ এই যে, তাঁহাদের প্রসাদে অনেক দেশীয় শ্রমজীবীর অন্ন লাভ হয়। যে কয় মাস তাঁহারা পর্বতে বাস করেন, সে কয়মাস মুটে, মজুর ও অন্যান্য শ্রমজীবী গরীব লোক যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে ও সম্বৎসরের মত উপজীবিকা করিয়া লইয়া তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিতে থাকে, সন্দেহ নাই।

কোন জাতির আচারব্যবহারের বিষয় লিখিতে হইলে তাহাদের উদ্বাহ-প্রণালী সর্বাগ্রে বর্ণন করা আবশ্যক। আংলো-ইণ্ডিয়ানদের অধিকাংশই অবিবাহিত। এ দেশে অবিবাহিত কন্যা আসিলে তাঁহাকে অধিক কাল অনূঢ়া থাকিতে হয় না। যে সকল স্ত্রীলোকের ভাগ্যে স্বদেশী বর না জোটে, তাঁহারা এদেশে বিবাহার্থে আগমন করেন, ও শীঘ্রই তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। আংলো-ইণ্ডিয়ানদের বিবাহক্রিয়া তাহাদের মূল সমাজের নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হয়, এ দেশে ভিন্ন আকার ধারণ করে নাই। ইংরাজদের মধ্যে পিতামাতা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন না। তাঁহাদের বিবাহ সংঘটনে কোন ঘটক বা মধ্যস্থের আবশ্যক হয় না। স্ত্রীরত্ন উপার্জন করিতে যুবকদিগের স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বন প্রয়োজন। যুবতীগণের রূপগুণই বিবাহের দৌত্য কার্য সম্পাদন করে। পিতামাতার মতে বিবাহ, আর স্বযত্ন-সম্ভূত বিবাহ ইহার মধ্যে কোন প্রথাটি জন-সমাজে অধিক হিতকর তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিতে পারে। ইংরাজদিগের উদ্বাহ-ক্রিয়ার তিন অঙ্ক— প্রথম সাধনা, দ্বিতীয় প্রস্তাব ও সম্মতি, তৃতীয় বিবাহ। আপনি দেখিয়াশুনিয়া বিবাহ করিতে গেলে পুরুষের সাধ্যসাধনার প্রয়োজন ইহা বলা বাহুল্য। যুবকের যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি জন্মে ত তাহার অভিলষিত যুবতীর চিত্তদুর্গ ভেদ করা তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। কিসে তাঁহার মনোরঞ্জন ও প্রণয় আকর্ষণ করিতে পারেন, কায়মনোবাক্যে তাহারই যত্ন করিতে থাকেন। এইরূপ সাধ্য-সাধনার নাম কোর্টশিপ্। যদি যুবতী নিতান্ত চঞ্চলা, বিলাসিনী ও প্রতারণা-পরায়ণা না হন, ত তাঁহার প্রেমাসক্ত যুবক অবশ্যই বুঝিতে পারেন, তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইবার কতদূর সম্ভাবনা। পরে তিনি অবসর বুঝিয়া প্রিয়ার নিকট আত্মনিবেদন করেন। পুরুষের নিকট স্ত্রীলোকের স্বীয় মনের ভাব প্রকাশ করিবার রীতি নাই। বিবাহের প্রস্তাব করা পুরুষের কার্য। পুরুষ বরপ্রার্থী — নারী বরদায়িনী। বিবাহের প্রস্তাব করায় একটু কৌশল ও চাতুর্য চাই। পুরুষ যদি সদ্বক্তা হন, যদি মনের কথা ভাল করিয়া বলিতে পারেন, তিনি যদি রূপবান হন, ও হাবভাব রূপলাবণ্যে জয়লাভের আশা থাকে, ত তিনি নিজে যুবতীর নিকটে গিয়া মুখেই প্রস্তাব করেন। হয়ত

বলেন— "সুন্দরী! তুমি কি আমার হইবে? তোমার সুখের ভাব কি আমার হস্তে সমর্পণকরিবে? তোমা ভিন্ন আমি আর কাহাকেও জানি না, আমার সমুদয় আশা ভরসা তোমার এক কথার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাকে নিরাশা করিও না। বল তুমি আমার।" প্রিয়ার লজ্জাবনত রক্তিম মুখমণ্ডলে অনুকূল উত্তর পাঠ করিয়া যুবক আকাশের চন্দ্র হস্তে পান, তাঁহার জীবন এক নূতন রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে। কিন্তু সকল সময়ে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, প্রেমরাজ্যেও এই নিয়ম।

যুবক আপনার প্রণয় ব্যক্ত করিবার মানসে প্রত্যুষে প্রিয়ার দ্বারে উপস্থিত। সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। কল্পনায় কত কি চিত্র করিতেছেন, তিনি আশা ভয়ে আন্দোলিত হইয়া প্রেয়সীর সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। কামিনীর কথার ধরনে বোধ হইল যেন তিনি কিছু বিরক্ত। যুবক ঃ কেন ভাই তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? কেন বল দেখি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করছ? স্ত্রী ঃ না, আর কিছু নয়। তা সময় নেই অসময় নেই, এই কি দেখা করিবার সময়? সকালের দিকটা একটু ঘুম এসেছিল, এমন সময় ডাক পড়িল, আমি তাড়াতাড়ি করে উঠে কাপড় পরে নীচে আসছি, কাজেকাজেই চটতে হয়। যুবক ঃ চটই আর যাই কর, আমার উপর ঔদাস্য করো না সুন্দরী! আমি তোমার প্রেমের ভিখারী, তোমার এতটুকু ভালোবাসার উপর আমার সমুদয় সুখ নির্ভর করছে।

এই বলিয়া যুবক রমণীর হস্ত ধারণ করিতে গেলেন। যুবতী তাঁহার হস্ত প্রক্ষেপ করিয়া একটু দূরে গিয়া বসিলেন ও তাঁহার প্রতি উগ্রভাবে দৃষ্টি করত বলিলেন — "আর যাই কর — ভালবাসার কথা বলে আমাকে বিরক্ত করো না।"

যুবক চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন— জগৎসংসার তাঁহার নিকট শ্মশানতুল্য প্রতিভাত হইল।

"তবে কি এই তোমার শেষ কথা — ইহার আর কোন অন্যথা হইবে না?"

রমণী ঃ "যদি ভালবাসা বল তবে তাই। তোমার প্রতি আমার কোন বিরক্তি কি মন্দ ভাব নাই।"

যুবক নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। স্বদেশের প্রতি তাঁহার অনাস্থা জন্মিল — নিয়মিত কাজকর্ম ছাড়িয়া দিলেন ও বিদেশে গিয়া নবজীবন আরম্ভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

পুরুষ যদি লজ্জাশীল হন— অসম্মতি প্রকাশে নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আপনাকে আপনি সামলাইতে পারিবেন না— তাঁহার যদি এইরূপ ভয় থাকে তবে লেখনীর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। যুবতী তাঁহার প্রণয়ীর প্রস্তাবে সম্মতি কি অসম্মতি যাহা হয় প্রকাশ করেন। সম্মতি পাইলে যুবক কামিনীর পিতামাতার সম্মতি প্রার্থনা করেন। পিতামাতার অনুমতি হইলে তিনি তাঁহার প্রেয়সীকে আপনার প্রেমনিদর্শন নানা প্রকার উপহার প্রেরণ করেন। বহুমূল্য উপহার গ্রহণে যদি কোন আপত্তি থাকে— ত পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে তিনি প্রিয়ার প্রতি

স্বীয় অনুরাগ প্রকাশ করিতে পারেন। প্রণয়ীর নিকট হইতে পুষ্প-উপহার গ্রহণে কোন বাধা নাই। অবিবাহিতা কুলকামিনীদিগের পরপুরুষের নিকট হইতে পুষ্পোপহার গ্রহণ করা বিহিত নহে। বিবাহের দিন স্থির করা কামিনীর অধিকার।

বিবাহের পূর্বে এ বিবাহে কাহারো কোন আপত্তি আছে কিনা জানিবার জন্য অনেক সময় এক ঘোষণা-পত্র প্রকাশিত হয় — তাহা উপর্যুপরি তিন রবিবার চার্চে পঠিত হইয়া থাকে —

"অমুক অমুকের বিবাহ্ সম্বন্ধীয় ঘোষণা-পত্র প্রকাশ করিতেছি। যদি তোমাদের কাহারো এই উভয়ের বিবাহ্ বিষয়ে কোন আপত্তি থাকে, তাহা ব্যক্ত করিবে। প্রথমবারের (দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বারের) বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে।"

বিবাহ্-কালে কন্যার সহিত দুই জন হইতে বার জন সখী উপস্থিত থাকেন। কন্যার ভগিনীগণ অথবা বরের নিকট সম্পর্কীয় কয়েকটী স্ত্রী সখী-পদে নিযুক্ত হন। সখীগণ ও কন্যার পরিবারস্থ লোকেরা যাত্রীদলের প্রথম-কন্যা ও তাঁহার পিতামাতা যাত্রীদলের শেষ— এইরূপে যাত্রীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলেন। বর ও সখীগণ ভজনালয়ে প্রথম গিয়া কন্যার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। কন্যা তাঁহার পিতার হাত ধরিয়া বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হন। কন্যা বরের বামপার্শ্বে দাঁড়ান ও বামহস্তের দস্ত না খুলিয়া লন — বর তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দস্তানা মোচন করেন। পরে পুরোহিত বেদী হইতে বলেন*—

"প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমরা ঈশ্বরের সমক্ষে, এই উপাসক-মণ্ডলীর সমক্ষে এই পুরুষ ও স্ত্রীকে পবিত্র উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ করিবার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। উদ্বাহ-সংস্কার বহুমানাস্পদ। মনুষ্যের নির্দোষাবস্থায় ইহার সূত্রপাত। ঈশা ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, ইহা তাহার সংজ্ঞাপক। অতএব ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে অনবধানতা, অবিবেচনা ও যদৃচ্ছাপূর্বক প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে। প্রজ্ঞাহীন পশুর ন্যায় মনুষ্যের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। বুদ্ধি পূর্বক, বিবেচনা পূর্বক, ভক্তির সহিত, নম্র ভাবে, ঈশ্বরের উপর ভর রাখিয়া, কি উদ্দেশ্যে উদ্বাহ-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা স্মরণ রাখিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য।

প্রথমতঃ বিবাহের উদ্দেশে সন্তানোৎপত্তি, ঈশ্বর-নির্দিষ্ট ধর্মপথে রাখিয়া সন্তানগণের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান।

দ্বিতীয়তঃ বিবাহের উদ্দেশ্যে যাহাতে মানব সমাজে ব্যভিচার দোষ প্রবেশ না করে। যাহারা ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম, তাহারা দার-পরিগ্রহ্ করিয়া খৃষ্ট-সমাজে আপনাদিগকে পবিত্র রাখিতে সমর্থ হয়।

* English Marriage Service '92

তৃতীয়তঃ বিবাহের উদ্দেশ্য সুখ, দুঃখ সম্পৎ বিপদে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সহবাস লাভ, পরস্পর সাহায্যদান ও সন্তোষ সাধন। এই পবিত্র দাম্পত্যব্রতে ব্রতী হইবার মানসে এই দুইজন উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাদের বিবাহে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে, ত এইবেলা প্রকাশ করুন নতুবা ভবিষ্যতে যেন ইহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা না বলেন।"

যদি কাহারো কোন আপত্তি দর্শাইবার না থাকে, ত পুরোহিত বরকে সম্ভাষণ করিয়া বলিবেন —

"তুমি কি এই স্ত্রীর সহিত ঈশ্বর-প্রণীত পবিত্র উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া ইঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে? তুমি কি ইঁহাকে ভালবাসিবে, যত্ন করিবে, ইঁহাকে সুখী করিতে তৎপর থাকিবে, রোগে আরোগ্যে ইঁহাকে রক্ষা করিবে ও আর সকল পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন উহার প্রতি অনুরক্ত থাকিবে?"

বর উত্তর করিবেন, "হাঁ থাকিব।"

পরে কন্যাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিবেন—

"তুমি কি এই পুরুষের সহিত ঈশ্বর-প্রণীত পবিত্র উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া ইঁহাকে ভালবাসিবে, রোগে আরোগ্যে ইঁহাকে রক্ষা করিবে ও আর সকল পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন ইঁহারই প্রতি অনুরক্ত থাকিবে?"

কন্যা উত্তর করিবেন, "হাঁ থাকিব।"

পরে পুরোহিত বলিবেন —

"এই পুরুষকে এই কন্যাদান কে করিতেছেন?"

তৎপরে পুরোহিত কন্যাকে তাঁহার পিতার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া বরের দক্ষিণ হস্তে কন্যার বাম হস্ত যোগ করিয়া বরকে এইরূপ বলিতে বলিবেন —

"আমি তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেছি, ভালই হউক মন্দই হউক — সম্পদে বিপদে, রোগে আরোগ্যে, অদ্য হইতে আমি তোমারই থাকিব ও যতদিন বাঁচিয়া থাকি তোমাকে ভালবাসিব ও যত্ন করিব, ইহাতে আমার সত্যবচন দিতেছি।"

পরে তাঁহাদের হস্ত খুলিয়া লইবেন ও কন্যা তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বরের বাম হস্ত ধারণ করিয়া পুরোহিতের পরে পরে বলিবেন —

"আমি তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতেছি। ভালই হউক, মন্দই হউক, সম্পদে বিপদে, রোগে আরোগ্যে, অদ্য হইতে আমি তোমারই থাকিব ও যতদিন বাঁচিয়া থাকি তোমাকে ভালবাসিয়া যত্ন ও সেবা করিব, দুহাতে আমার সত্যবচন দিতেছি।"

তদনন্তর বর কন্যার বাম হস্তের চতুর্থ অঙ্গুলিতে এক অঙ্গুরীয় পরিধান করাইয়া সেই অঙ্গুরীয় স্পর্শ করত পুরোহিতের কথা মত বলিবেন—

"এই অঙ্গুরীয়ের সহিত তোমাকে বিবাহ করিতেছি, আমার দেহের সহিত তোমার অর্চনা করিতেছি, আমার ধনসম্পত্তি তোমাকে সমর্পণ করিতেছি।"

পরে দম্পতি জানু পাতিয়া বসিলে পুরোহিত আশীর্বাদ ও প্রার্থনা করিবেন ও প্রার্থনার পর দম্পতির হস্তে হস্ত মিলাইয়া বলিবেন—

"ঈশ্বর যাঁহাদের সংযুক্ত করিয়াছেন, কোন মনুষ্য যেন তাঁহাদের বিযুক্ত না করেন।"

অনন্তর পুরোহিত সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, —

"অমুক অমুক ঈশ্বরের সমক্ষে ও এই সমাজের সমক্ষে পবিত্র উদ্বাহে বদ্ধ হইয়া পরস্পরকে সত্যবচন দিয়াছেন ও অঙ্গুরীয় দান ও প্রতিগ্রহ দ্বারা ও হস্তে হস্ত যোগ করিয়া তদ্বিষয়ে আপনাদের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে আমার বক্তব্য এই ইঁহারা স্বামী-স্ত্রী রূপে একত্রে সহবাস করুন।"

তৎপর প্রার্থনা সঙ্গীত উপাসনা ও আশীর্বাদে অনুষ্ঠান সমাপ্ত।

অনুষ্ঠানের পর দম্পতিকে রেজিস্টরে নাম স্বাক্ষর করিতে হয়। তদানন্তর বর ও কন্যা এক গাড়ীতে বসিয়া কন্যার বাটী গমন করেন। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া গৃহে প্রবেশ করেন। সেখানে সকলে মিলিত হইলে মধ্যাহ্ন-ভোজন মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। আহারান্তে বর-কন্যার স্বাস্থ্য ও কল্যাণ উদ্দেশে বক্তৃতা ও পানাদি সমাপন হইলে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন। পিতামাতা কন্যা-ভার হইতে মুক্ত হইলেন। দম্পতি তাঁহাদের মধুচন্দ্র যাপন করিতে এক্ষণে বাহির হইলেন। ইংরাজদের অদ্ভুত প্রথানুসারে তাঁহাদের পশ্চাতে পুরাতন পাদুকা নিক্ষিপ্ত হইল। বিবাহের পালা সাঙ্গ হইল।

পাঠকের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বরকন্যার স্বাস্থ্য উদ্দেশে বক্তৃতা— ইহার অর্থ কি? কোন বিশেষ কার্যোপলক্ষে ভোজনের নিমন্ত্রণ হইলে ভোজনান্তে ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিশেষের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ উদ্দেশে সুরাপান ও বক্তৃতা করিবার রীতি ইংরাজদের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রথম গণ্ডূষ রাণীর স্বাস্থ্য উদ্দেশে প্রাণ করিতে হয়। সভাপতি বলিয়া উঠেন "মহাশয়েরা পাত্র পূর্ণ করুন। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া যাঁহার রাজ্যে সূর্য কখন অস্তমিত হয় না, অন্যায় অত্যাচার স্থান পায় না, যাঁহার সুশাসনে শত্রুদলের গর্ব খর্ব ও প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, যিনি আপনার পবিত্র চরিত্র ও অমায়িক প্রজাবাৎসল্যে সকলেরই প্রীতি ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার প্রতি ইংরাজদিগের রাজভক্তি উদ্দীপন করিবার জন্য অধিক বাক্যব্যয় আবশ্যক করে না। সকলে জয় জয় শব্দে রাণীর স্বাস্থ্য উদ্দেশে পান করুন।" রাণীর পর যুবরাজ ও তাঁহার মহিষী, তৎপরে ক্রমান্বয়ে সৈন্যদল, নাবিকদল,

পার্লামেন্ট সভার সভ্যগণ, রাজমন্ত্রী, আচার্য পুরোহিত, ন্যায়াধীশ ইত্যাদির, অবশেষে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই বচন অনুসারে "মহিলাগণের" স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব করা হয়। এই বিষয়ের প্রস্তাবক যেমন উৎসাহের সহিত বক্তৃতা করেন, শ্রোতৃগণও তেমনি উৎসাহের সহিত তাহা অনুমোদন করত পান করেন। এই ভাবে বক্তৃতা হয়, যথা— "সভাপতি ও মহোদয়গণ, আমার উপর যে ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা কষ্টের নহে, আনন্দের ভার। তাহা এই যে, মহলিাগণের স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব করা, ইহা অপেক্ষা সুখকর, উৎসাহকর প্রস্তাব আর কি হইতে পারে? কিন্তু কোথায় সেই অতুল গুণনিধান অপ্রতিম-সৌন্দর্যখনি কামিনী-কুল, আর কোথায় আমার এই দুর্বল নিস্তেজ বাক্য, কিরূপে তাঁহাদের বর্ণন করিব? যে সকল সদগুণে মানবপ্রকৃতি উন্নত ও অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহা স্ত্রীজাতিতেই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। রমণীর কমনীয় জ্যোতি বিহীন হইলে পুরুষ-সমাজ কি নীরস, কি কঠোর হইয়া পড়ে। নারীগণই পুরুষদের সুখ-সৌভাগ্যের একমাত্র সেতু। 'স্ত্রয়ঃ শ্রীয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন,' স্ত্রী ও শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। শৈশবকালে মাতার যে অকৃত্রিম স্নেহে ও যত্নে আমরা লালিতপালিত হই, ভগিনীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম, যে প্রেম ও ভালবাসা কালে ক্ষয় হয় ন, দূরে হ্রাস হয় না, সহস্র কলঙ্কেও যাহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না, তাহা কাহার না স্মরণ হইবে? যখন আমরা অনাহারে অনিদ্রার দুঃসহ যাতনা ভোগ করিয়া রোগশয্যায় শয়ন হই, তখন স্ত্রীলোকের সুকোমল স্পর্শ ভিন্ন কে আমাদের সেই বিষম তাপের উপশম করিতে পারে? সে সময়ে কাহার পদবিক্ষেপ এমন নিঃশব্দ? কাহার বাক্য এমন সান্ত্বনাবহ? কাহার হাস্য এমন মধুর? কাহার অশ্রুজল এমন দুঃখ-নাশন? কাহার প্রার্থনা এমন ফলদায়ী? স্ত্রী ভিন্ন কে আমাদের জীবনপথের নিত্য সঙ্গী, সম-দুঃখ-সুখ অচলা সখী? আমরা যেন আমোদে মত্ত হইয়া তাঁহাদের স্নেহ প্রেম ভুলিয়া না যাই। আইস দেখি তোমরা যে যোষিৎকুলের নিকট চির কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ রহিয়াছ, তাহার কিরূপ প্রতিশোধ দাও।"

এই সকল উপলক্ষে স্ত্রীরা প্রায় উপস্থিত থাকেন না, কিন্তু তাহাদের প্রতিনিধি ললনা-ভক্ত পুরুষ তাঁহার হইয়া প্রস্তাবককে সাধুবাদ করেন।

আংলো-ইণ্ডিয়ানদের আচারব্যবহার সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার আবশ্যক করে না। যাহা বলা গেল তাহা অনেকেরই জানা কথা, আর অধিক বলিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়ে। তবে এখনো আর একটি কথা বক্তব্য আছে, তাহা বলিয়াই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

ইংরাজদের আচারব্যবহারে ভালমন্দ মিশ্রিত আছে। তাহা কতক আমাদের জাতীয় ভাবের ও দেশের উপযোগী, কতক অনুপযোগী। এ স্থলে বক্তব্য এই যে ভালর সঙ্গে যেন আমরা মন্দটি গ্রহণ না করি। যদি অনুকরণ করাই আবশ্যক হয় তবে দেখিয়াশুনিয়া বিবেচনা

খাটাইয়া যেন অনুকরণ করি। এমন মনে করিও না যে, ইংবাজী রীতিনীতি অবলম্বন করিলে ইংরাজ-সমাজে সমাদৃত হইবে। বরং তাহাতে তোমার একুল ওকুল দুকুল যাইবার সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়িল। আমার বিলাত ফেরত এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু দেশীয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার এক ইংরাজ নাচ-মজলিসে নিমন্ত্রণ হয়। তিনি কি কাপড় পরিয়া যাইবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। পরে এই সকল মজলিসে ইংরাজেরা যে লাঙ্গুল বিশিষ্ট কোর্ট ব্যবহার করে, তাহার অনুরূপে কোট পরিয়া যাওয়াই ধার্য হইল। একজন দরজিকে ডাকাইয়া কোট ফতুই প্রভৃতি তাঁহার মনের মত পোষাক প্রস্তুত করিয়া সং সাজিয়া গিয়া উপস্থিত। আমি তাঁহাকে ইংরাজদের পরিহিত পরিচ্ছেদের সঙ্গে তাঁহার কাপড়ের তুলনা করিয়া দেখাইয়া দিলাম যে, তাহার সঙ্গে ইহার অনেক অমিল— ইহা দেখিয়া তিনি কিছু অপ্রতিভ হইলেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহার নিজের মহারাষ্ট্র-বেশে তাঁহাকে শতগুণ মানাইত ও এরূপ মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হইত না। বিদেশীর রীতির অনুকরণ করিতে গিয়া আমাদের অনেক স্থলে এই বিপদে পড়িতে হয়। ভারতকুলবালা যদি গৌণ ও পেটিকোট ব্যবহার করেন, তবে তাঁহাদের পদে পদে অপদস্থ হইতে হয় সন্দেহ নাই। বিবির সাজ সাজিতে হইলে কাল-সহকারে যে ফ্যাসানের পরিবর্তন হয়, তাহার উপর বিশেষ লক্ষ না রাখিলে সভ্য-সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, এটি যেন তাঁহাদের মনে থাকে।

প্যারিসে কখন কোন নূতন 'ফ্যাসনের' সৃষ্টি হইল— কোন পুরাতন 'ফ্যাসন' উঠিয়া গেল— আজিকার ধরন 'ক্রিণশীল' কি মার্জ্জনী গৌণ, হে বিবিয়ানা-পরোয়না ভারত-কুল-ললনা, এ সকল নিগূঢ় তত্ত্বের প্রতি উদাসীন থাকিও না। ফ্যাসনের ব্যাকরণ যেন তোমার কণ্ঠস্থ থাকে— ফ্যাসনের স্রোতের সঙ্গে তোমায় সাঁতার দিতে হইবে— নতুবা বিলাত-সমাজে উপহাসাস্পদ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু সৎপরামর্শ গ্রহণ করত ও পথে যাইও না।'

ইংরাজ ও দেশীয়দের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নভাব, তাহা প্রকৃতিতে এরূপ বদ্ধ মূল যে বোধ হয় না তাহা কোন কালে অপনীত হইবে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে অনেকগুলি কারণ উপলব্ধি হয়।

প্রথমতঃ, ইংরাজদের সহিত আমাদের জেতৃজিত সম্বন্ধ। তাঁহারা রাজার জাতি— আমরা পরাজিত প্রজার জাতি। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে যে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব, তাহা পৃথিবীর সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়। যুদ্ধেই হউক— বসতির জন্যই হউক— বাণিজ্য-ব্যবসার উদ্দেশ্যেই হউক— যে কোন কারণে এই দুই জাতি একত্রিত হয়— শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আপনার শ্রেষ্ঠতর পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন না। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ ভ্রাতার সহিত আপনার সামাজিক সম্মিলনের পথ আটেঘাটে বদ্ধ করিয়া রাখেন। বৈদিক কালে আর্য ও দস্যুদের মধ্যে এই কারণেই বিশেষ

বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়। এই বর্ণভেদের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে ভাষা ধর্ম, আচারব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা। এই জাতিগত বৈষম্য হইতে বিদ্বেষ ভাব উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। এ ভাব যে কোন কালে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবে তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজেরা এদেশে চারি দিনের যাত্রী, কতকদিন বাস করিয়া টাকা করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। ইউরোপ ও এদেশের মধ্যে যাতায়াতের এক্ষণে যেরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের উপর ইংরাজদের টান থাকিবার অল্পই সম্ভাবনা। পূর্বে এক এক জন ইংরাজের দেশীয়দের উপর সময়ে সময়ে বিলক্ষণ মমতা দেখা যাইত— তাহার কারণ এই, তাঁহারা ভারতবর্ষে অধিক কাল বাস করিয়া এদেশকে স্বদেশতুল্য জ্ঞান করিতেন কিন্তু এক্ষণে আর সে ভাব নাই। ইংরাজেরা এখানে প্রবাসীর মত থাকিয়া চলিয়া যান। দেশ ভ্রমণে দুই চারি দিনের জন্য যাহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ হয় তাহার সহিত বিশেষ সখ্যতা সচরাচর ঘটে না। "নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহার সুখে, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।" বিশেষতঃ ইংরাজদের যেরূপ স্বভাব তাহাতে তাঁহারা বিদেশীয়দের প্রিয়পাত্র কখনই হইতে পারেন না। ইংরাজেরা যখন বিদেশে ভ্রমণ করেন তখন তাঁহাদের 'জনবুল' ভাব সকলেরই অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। স্বকীয় রীতিনীতি হইতে যাহা ভিন্ন তাহা ইংরাজের চক্ষে নিতান্ত ঘৃণাস্পদ। তাঁহার সেই, 'রোস্টবীফ' ও বিবরমদ্য ভিন্ন প্যারিসের উৎকৃষ্ট হোটেলেও তৃপ্তি হয় না। ইংরাজেরা পৃথিবী জুড়িয়া আপনাদের রাজত্ব বিস্তার করিতেছেন, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ দ্বীপোচিত ক্ষুদ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির সঙ্গে মিশিতে পারেন না, তাঁহাদের স্বভাবই এরূপ নয়। ইংরাজ ও ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির মধ্যে যখন এমন অমিল তখন এদেশীয়দের ত কথাই নাই। ইউরোপে ভাষা রীতিনীতি আচার ব্যবহারে অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আগাগোড়া সকল বিষয়েই অমিল। আমাদের বর্ণ রীতিনীতি সকলই ভিন্ন। এমন সাধারণ ঐক্য-স্থল নাই যাহার উপর পরস্পরের প্রীতি সৌহার্দ্য স্থাপিত হইতে পারে। যে যাহাকে দেখিতে পারে না, তাহার চলন বাঁকা, ইংরাজ ও দেশীয় মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ। ইংরাজ এদেশকে কখনই আপনার বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। ইহার জলবায়ু তাহার সহ্য হয় না, ইচ্ছা করিলেও এদেশে অধিক কাল বাস করিতে অক্ষম। পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যাকে অল্প বয়সেই আপনাদের ভারত-গৃহ হইতে বিযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। মাতা ভারত হইতে ইংলণ্ডে, ইংলণ্ড হইতে ভারতে যাতায়াত করিয়া জীবন যাপন করেন। স্বামীকেও নিতান্ত একলাটি রাখিতে পারেন না— সন্তানগণেরও মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধান আবশ্যক। পিতাও হয়ত অনতিকাল বিলম্বে 'লিবর' রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রী-পুত্র পরিবারের সহিত গিয়া মিলিত হন। এদেশে তাঁহারা অর্থ উপার্জন করিতে আসেন, অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন।

এদেশ কর্মক্ষেত্র, স্বদেশ ভোগালয়— এদেশে আয়, সে দেশে ব্যয়— শরীর এখানে, মন ওখানে— সুতরাং দেশীয় ও ইংরাজ মধ্যে প্রণয়-বন্ধন কি রূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

আমি বলিয়াছি, ইংরাজেরা যেখানেই যাক, তাহাদের জাতীয় ক্ষুদ্র ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। এ দেশে তাহাদের আচারব্যবহারে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যৎকালে নিদাঘ-তাপের আতিশয্যে সমস্ত প্রাণী আকুল, মনুষ্যেরা ঘর্মাক্ত-কলেবর হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তখন ইংরাজেরা তাহাদের বনাতের কোট প্যান্টলুন পরিধান করিয়া গ্রীষ্মের কষ্ট দ্বিগুণিত করে। প্রখর রৌদ্রের সময় তাহারা মহা সাজসজ্জা করিয়া পরস্পরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে বাহির হয়। এদেশে সকল ঋতুতে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে বিশুদ্ধ সুশীতল বায়ু সেবনের সময় প্রাতঃকালে ৫টা হইতে ৭টা পর্যন্ত, কিন্তু রাতের খানাপিনা নৃত্য-গীত আমোদ-প্রমোদে রাত্রি জাগরণ করিয়া উষার সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান করা কিরূপে সম্ভবে? আবার এদেশে প্রচুর আমিষ ভক্ষণ ও সুরাপান শরীরের উপযোগী নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। ভারতবাসীদের অনেকেই নিরামিষাশী, উদ্ভিদ ভোজী, কোন কোন জাতির তণ্ডুলমাত্র জীবনে একমাত্র অবলম্বন, এইরূপ মিতাহার এদেশে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়, কিন্তু ইংরাজদের আহারের রীতি দেখিলে বোধ হয় না যে, তাহারা উষ্ণ দেশে বাস করিতেছেন। প্রাতঃকালে ৬টা ৭টার সময় চা, রুটি, মাখম, ডিমসিদ্ধ প্রভৃতি 'ছোট হাজারি'— ৯টা ১০টার সময় মদ্য মাংস সমেত 'বড়া হাজারি'— ২টার সময় ঠাণ্ডা গরম মাংস মিষ্টান্ন ফলারের টিফিন— ৪টা ৫টার সময় চা বিস্কিট ইত্যাদি— ৭/৮টার সময় মদ্য মাংসের ভূরি ভোজন, সময় বিশেষে মধ্য-রাত্রির সাপার— এই ত তাহাদের পানাহারের নিয়ম, পানীয় মধ্যে ব্রাণ্ডি আর সোডা সর্বাগ্রগণ্য। ইহার অর্থ জনৈক ফরাসি পরিব্রাজক Count Goblet D' Almeida এইরূপ করেন যে, আরম্ভে অল্প ব্রাণ্ডি অধিক সোডা ও শেষে অধিক ব্রাণ্ডি অল্প সোডা। ইহার আর এক নাম 'Peg' খুঁটি অর্থাৎ জীবনের অবলম্বন। এইরূপ অপর্যাপ্ত আহার-পানে যে তাহাদের স্বাভাবিক বলিষ্ঠ সুস্থ শরীর 'লিবর' ও অন্যান্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য স্বদেশে যাইতে বাধ্য করে, তাহাতে বিচিত্র কি? কেমন করিয়া এতদিন টিকিয়া থাকে এই আশ্চর্য।

তৃতীয়তঃ, জাতিতে জাতিতে সখ্য-বন্ধন হইবার পূর্বে আচারব্যবহারের কতকটা মিল চাই, কিন্তু তাহার কিছুই নাই। তাহারাও যেমন আমাদিগকে দূরে রাখিতে চায়, আমরাও তেমনি তাহাদের হইতে দূরে থাকিতে চাই, তাহারা আমাদিগকে পরাজিত জাতি বলিয়া অবজ্ঞা করে, আমরাও তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করি। অতএব আমাদের পরস্পর সদ্ভাবের সঞ্চার কোথা হইতে হইবে?

চতুর্থতঃ, ইংরাজের স্বভাবই কতকটা সামাজিকতার বিরোধী। শুদ্ধ আমাদের সম্বন্ধে কেন— তাহাদের আপনাদের মধ্যেও পরস্পরের ব্যবহারে এই পার্থক্য প্রকাশ পায়। ইংরাজেরা

আমাদের জাতিভেদ প্রথা অনিষ্টকর বলিয়া বর্ণন করে, কিন্তু ইংরাজ-সমাজে বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ইংরাজ সমাজে যে জাতিভেদ বিলক্ষণ প্রবল, পদে-পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাহাদের জাতিভেদ ধন ও পদমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের জাতিভেদ বংশ-মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। একজন নীচ বংশোদ্ভব কমিসনর হয়ত আপনা হইতে উচ্চকুল-জাত সহকারী কমিসনারের সহিত একত্রে ভোজন করিতে সম্মত হইবেন না। চিহ্নিত পদস্থ কর্মচারী ও অচিহ্নিত পদস্থ কর্মচারীদিগের মধ্যে যে সামাজিক স্বতন্ত্রতা তাহা ত জানাই আছে। অচিহ্নিত পদের লোকেরা রূপেগুণে কুলেশীলে যেমনই হউক না কেন, তাঁহাদের হেয় জ্ঞান করা চিহ্নিত পদারূঢ় কর্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম। কলেক্টর সহকারী কলেক্টরের সহিত সমকক্ষ হইয়া চলিবেন, কেন না তাঁহারা উভয়েই চিহ্নিত দলের লোক, কিন্তু অচিহ্নিত ডেপুটির সহিত তাঁহার স্বতন্ত্র ব্যবহার।

ইংরাজ ও আমাদের মধ্যে সহজভাবে দেখাসাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হইবার আর এক প্রতিবন্ধক এই যে, তাঁহাদের হাতে কর্মচারী নিয়োগের সমস্ত ভার অর্পিত। আমাদের মধ্যে অনেকে কেবল কর্ম-প্রার্থী হইয়া ইংরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। আমাদের সম্বন্ধে তাঁহারা এই দাতা ও প্রার্থীর ভাব ভুলিতে পারেন না। দেশীয় কোন ভদ্র লোক যে নিঃস্বার্থ ভাবে আলাপ করিবার মানসে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, ইহা সহজে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহার সাক্ষাৎকারে কোন না কোন স্বার্থ-লাভ অভিসন্ধি থাকিবে ইহা তাঁহারা আগে থাকিতে স্থির করিয়া লন। সুতরাং তাঁহারা আমাদের সকলেরই নিকট হইতে 'সেলাম' প্রত্যাশা করেন, স্বাধীনভাবে তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র, কেন না তাহার কোন প্রতিদান নাই।

তুমি একজন সাহেবের বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর, তিনি কি কখন তোমার বাটিতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন? এরূপ প্রত্যাশা বৃথা। ঘরোয়া রকমে সাহেবদের সহিত আলাপপরিচয় হয়, ইহা যদিও অনেক কারণে প্রার্থনীয়, কিন্তু সম্ভবপর নহে। আমরা গৃহে কিরূপে বাস করি, আমাদের আন্তরিক ভাব কি, আমাদের গার্হস্থ্য প্রণালী রীতিনীতি কিরূপ, সমস্ত জীবন ভারতবর্ষে কাটাইয়া কোন ইংরাজ তাহা জানিতে পারেন কিনা সন্দেহ। যখনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, তখনি আমরা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মনের শোকদুঃখ সম্বরণ করিয়া সহাস্য বদনে তাঁহাদিগকে দর্শন দিই। আমাদের প্রকৃত অবস্থা তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত, আমাদের গৃহদ্বার তাঁহাদের প্রতিরুদ্ধ। আমরা ভিক্ষুক হইয়া তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হই, তাঁহারা দাতা হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-উপহার প্রত্যাশা করেন।

যুবরাজ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন তিনি ইংরাজ ও এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে। বিদ্বেষভাব দর্শন করিয়া বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ ভাব যে কিসে বিদূরিত হইবে, তাহার উপায় আবিষ্কার করা সহজ নহে। দুই পক্ষেরই কিছু কিছু দোষ ইহা অবশ্য স্বীকার

করিতে হইবে। দুই পক্ষের লোকেরা কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার না করিলে সদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ইংরাজেরা রাজার জাতি, তাঁহারা অল্প প্রয়াসেই আমাদের সদ্ভাব আকর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জের সহিত এই ভারতবর্ষ জয় করিয়া সেই সকল প্রজাকে সুখী করা ও তাহাদের প্রীতি আকর্ষণ করা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য। প্রজারঞ্জন রাজার প্রধান ধর্ম। তাঁহারা যদি একপদ অগ্রসর হইয়া আসেন আমরা সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া তাহাদের নিকট যাইতে প্রস্তুত। আমাদের যদি কোন বিষয়ে দোষ থাকে ত তাঁহারা ক্ষমাদৃষ্টিতে দেখুন, কেন না "শক্তানাং ভূষণাং ক্ষমা"। তাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উচিত যে, আমাদের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যান। যদি কখন এমন সময় আসে যে, তাহাদিগেকে এ দেশ ছাড়িয়া যাইতে হয়, তখন তাঁহারা গৌরবের সহিত বলিতে পারিবেন যে, আমরা তোমাদিগকে শিক্ষিত ও স্বাধীন করিয়া দিয়াছি, এখন তোমরা আপনাদিগকে আপনারা রক্ষা কর। তখন তাঁহারা কোটি কোটি লোকের আশীর্বাদের পাত্র হইবেন। এমন সময় উপস্থিত হইলে আমরা সদ্ভাবের সহিত পরস্পর বিযুক্ত হইব ও তাঁহাদের রাজত্বকালে যে বহুবিধ উপকার লাভ করিয়াছি তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরকাল ঋণজালে বদ্ধ থাকিব। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যোগ ঈশ্বর মঙ্গলের জন্য বিধান করিয়াছেন, কিন্তু ইহা হইতে যাহাতে শুভ ফল প্রসূত হইতে পারে, তাহার জন্য উভয় জাতিরই যত্ন ও চেষ্টার আবশ্যক। ইংরাজেরা আমাদিগকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে, তাহারাও আমাদের নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারে, বিশেষতঃ ইংরাজ মহিলা আমাদের স্ত্রীগণ হইতে অনেক বিষয়ে শিক্ষা পাইতে পারেন। কিন্তু এদেশীয় ইংরাজ মহিলারা কোন বিষয়ে আমাদিগের স্ত্রীগণের আদর্শ হইতে পারেন না। এদেশের ইংরাজদের গার্হস্থ্যবিধানের আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। যদি এদেশীয়দিগের সহিত তাঁহাদের মমতা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের সময় কাটাইবার জন্য বৃথা আমোদ অন্বেষণ করিতে হইত না, কিন্তু এক্ষণে কি দেখা যায়? ইংরাজ রমণীগণ কিরূপে সময়ক্ষেপ করেন? স্বামী সমস্ত দিবস কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকিয়া সুখালাপে বঞ্চিত ও শ্রান্তক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করেন। স্ত্রী একাকিনী সময়ের ভার বহন করিতে থাকেন। সমস্ত দিনের মধ্যে ঘরের বাহির হইবার উপায় নাই। সন্তানগণ ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তিনি তাঁহার সন্তান হইতেও বিযুক্ত। বৎসরের মধ্যে কয়েকমাস হয়ত তিনি স্বামী হইতে দূরে কোন পর্বত প্রদেশে বাস করেন, স্বামী সত্ত্বেও তাঁহাদের বৈধব্য যন্ত্রণা* ভোগ করিতে হয়। কোন বিশেষ জনহিতকর কার্য হস্তে নাই যে, তাহাতে মনোনিবেশ করিয়া সুখী হইবেন। স্বামীর অগাধ ধন-কোষ তাঁহার হস্তে রহিয়াছে, এমন কোন ভোগের সামগ্রী নাই যাহা তাঁহার দুষ্প্রাপ্য, ইচ্ছামত আপনার সমুদয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন, অথচ তিনি সুখী নহেন। যে গরীব প্রজাপুঞ্জ দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত,

* এইরূপ বিধবাকে ইংরাজিতে Grass-Widow কহে।

তাহাদের অস্তিত্বের প্রতিও তিনি সন্দিহান। এই অবস্থায় তিনি যে আমাদের মহিলাগণের আর্দশ ও উপমাস্থল হইবেন এরূপ আশা করা বৃথা।

ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয়দের সম্বন্ধে পূর্বোল্লিখিত ফরাসিস্ পরিব্রাজক আপনার সদ্য-প্রণীত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত L' Inde et Himalaya গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম —

"আমার ভারতবর্ষে অবস্থিতি কালে অনেক ইংরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'কি দেখিয়া তোমার সকল অপেক্ষা আশ্চর্য বোধ হইল?' আমি ইহার উত্তরে বলিতে পারিতাম, 'এদেশে তোমাদেব দেখিয়া, বিশেষতঃ তোমরা এখানে এত দিন তিষ্টিয়া রহিয়াছ তাহা দেখিয়া।' বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথা সামান্য প্রশংসার কথা নয় কেন না ৬০ হাজারের অনধিক ইউরোপীয় সৈন্য দ্বারা বশীভূত ২৫ কোটি হিন্দুর উপর যে দুর্দ্ধর্ষ অটল রাজত্ব স্থাপন, ইহাতে শুদ্ধ প্রজাগণের অসাধারণ সহিষ্ণুতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, কিন্তু ইহা হইতে ইংরাজদিগের প্রভাবশালী অথচ বিচক্ষণ শাসনপ্রণালী উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ জয়লাভের উপযোগী যে সকল গুণ, এমন কি যে সকল দোষ থাকা আবশ্যক তাহা তাহাদের আছে। মূলনীতি রক্ষা করিতে গিয়া আসল-কাজ-ভুলিয়া না যাওয়া কার্যদক্ষতা, একাধিপত্যও থাকিবে অথচ তাহা যথেচ্ছাচারে পরিণত হইতে পারিবে না, এরূপ রাজনীতি-কুশলতা, শাসন সম্বন্ধে কঠোর ন্যায়রক্ষা ও সত্যপালন, বিজাতীয় ধর্মের প্রতি চিরাভ্যস্ত সমদর্শিতা, দ্রুতগতি না হউক স্থায়ী উন্নতির নিদানভূত আমূল সংস্কারের বশবর্তিতা, প্রজাগণের কল্যাণ-সাধনে মনের সহিত যত্ন করেন ততটুকু ধর্মজ্ঞান, প্রজাগণের অজস্র তোষামোদ ও আভ্যন্তরিক অসন্তোষ এ উভয়কেই উপেক্ষা করিতে পারেন এতটুকু অহঙ্কার,— এই সকল গুণে ভারতবর্ষের উপর অটল রাজ্য স্থাপন বিদেশীয় রাজার যতদূর সাধ্যায়ত্ত, ইংরাজেরা তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষের জলবায়ু ইউরোপীয় প্রকৃতির অনুপযুক্ত বলিয়া এদেশ তাঁহাদের স্থায়ী বসতির উপযুক্ত স্থান নহে, সুতরাং তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে নিত্য নূতন নূতন লোক আনাইয়া শাসনকার্য নির্বাহ করিতে হয়, ইহাতে রাজা-প্রজার পার্থক্য ভাব দূরীভূত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু পূর্বে পূর্বে যে সকল জাতি ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপনান্তর, দুর্গতিগ্রস্ত হইয়াছে তদনুরূপ দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইহা এক প্রধান কারণ বলিতে হইবে। এই কারণে রক্ষণশীলতা ও শাসনানুরাগরূপ স্বর্গীয় অগ্নি ইংরাজদের হৃদয়ে নিরন্তর প্রজ্বলিত দেখা যায়।"

"যে প্রভু তাহার আজ্ঞাধীন ভৃত্যকে তাহার নিজের ইচ্ছা বিরুদ্ধে সুখী করিতে চাহেন, সে প্রভু কখন ভৃত্যের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন না। যে জাতি চিরন্তন প্রথানুসারে সহজ ও অকৃত্রিম শাসনের অভ্যাসাধীন, তাহাদের মধ্যে কঠোর ও কৃত্রিম শাসন-প্রণালী প্রচলিত করিতে যে সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা ত ইংরাজদিগের জনসাধারণের নিকট অপ্রীতিভাজন

হইবার এক কারণ, কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাইবে যে, ইংরাজদের এমন কিছুই গুণ নাই যাহাতে তাহারা পরাজিত জাতির শ্রদ্ধা। আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। তাহারা তাহাদের উচ্চতর সভ্যতার গুণে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর বটে, কিন্তু তজ্জনিত অহঙ্কার প্রকাশেও তাহারা নিরস্ত নহে। ইংরাজেরা ন্যায়ী, কিন্তু ভদ্র নহে, ইহা সকলেরই মুখে শুনা যায়। কলিকাতা, বোম্বাই, সিংহল যেখানেই হউক যখন শিক্ষিত ও স্বাধীনতা-প্রিয় দেশীয় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিয়াছি, আর তাহারা আমাকে বিদেশী জানিয়া অসঙ্কোচে আমার নিকট তাহাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছে, তখনি ঐরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়াছি। উচ্চপদস্থ দেশীয়দের সহিত ইংরাজেরা যেরূপ ব্যবহার কবে, তাহা আমাদের দেশে একজন সামান্য ভৃত্য কি গাড়োয়ান ও সহ্য কবিয়া থাকিতে পারে না। কাজকর্মের সম্বন্ধে ইংরাজেরা দেশীয়দেব সহিত সাধু ও ভদ্র ব্যবহারে সচরাচর ত্রুটি করে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষবাসীদিগের সহিত ঘরোয়া ভাবে মিলিতে তাহারা কোন ক্রমেই সম্মত নহে। তাহারা আপনাদের সমাজ-দুর্গ-দেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে প্রাণপণে রক্ষা করে ও সাধ্যমতে দেশীয়দের সংস্রব হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে— এমন কি বাষ্পশকটে ভ্রমণকালীন, ইউরোপীয় ও দেশীয়দেব এক গাড়ীতে একত্রে উপবেশন, ইহাও দুর্লভ-দর্শন। বোধ হয যেন ইংরাজেরা দেশীয় সমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়া আপনাদের এক নূতন সম্প্রদায সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সম্প্রদায় পূর্বতন প্রথানুযায়ী ধর্ম-সংস্কারের উপর স্থাপিত নহে, কিন্তু বিভেদ ও জাত্যভিমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজয়ী ও পরাজিত জাতির ভদ্রকুলের মধ্যে আদানপ্রদানের পথ একেবারে অবরুদ্ধ — এরূপ উদাহরণের ইতিহাস আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। মিশ্র ফিরিঙ্গি জাতি— ইউরোপীয় ও দেশীয় রক্তের সম্মিশ্রণে যাহাদের উৎপত্তি,— তাহারা কোথায় এই উভয় জাতির সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের একতা সম্পাদন করিবে, না উভয় জাতিরই সমাজ হইতে তাহারা বহিষ্কৃত। যে দিকে নেত্রপাত করি, এ দুই জাতির মধ্যে সমতা বা সামাজিক ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় একতা দৃষ্টিগোচর হয় না। লক্ষের অনধিক ইউরোপীয় কর্তৃক পরিরক্ষিত এই দুইশত পঞ্চাশ কোটি আসিয়াবাসী যখন আপনাদের বল ও অধিকার বিষয়ে চেতনা লাভ করিবে, তখন যে কিরূপে ইংরাজ-রাজা রক্ষিত হইবে বলা যায় না। একমাত্র ভরসা এই যে, ইংরাজেরা যে গুরুতর শিক্ষাকার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ও যাহা তাঁহাদেরই দ্বারা সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারা যেন তাহাব পরিপক্বতা সাধন করিবার সময় পান, তাঁহাদের রাজ্য যেন অকালে বিনাশপ্রাপ্ত না হয়।"

ইংরাজেরা যেমন পুলিশ কোর্টে আমাদের রীতিনীতি স্বভাবচরিত্র শিক্ষা করেন আমরাও তেমনি হয়ত লালবাজারের গোরাকে ইংরাজ জাতির আদর্শ রূপে গ্রহণ করি। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, কর্মক্ষেত্রে তাহাদের সঙ্গে আমাদের যা কিছু আলাপপরিচয়, কিন্তু তাহারা আপনাদের মধ্যে কিরূপে জীবনযাপন করে, তাহাদের গার্হস্থ্য-প্রণালী সামাজিক রীতিনীতি কিরূপ তাহা এদেশে আমরা নভেল পড়িয়া যাহা কিছু জানিতে পারি, লৌকিক ব্যবহারে

অল্পই দেখিতে পাই। ইংরাজেরাও আমাদের ভিতরকার ভাব অল্পই দেখিতে পান। তাঁহারা আমাদিগকে যেরূপভাবে দেখেন তাহা আমরা মেকলে কৃত ওয়ারেন হেস্টিংস প্রস্তাবে বঙ্গবাসীদিগের চরিত্র পাঠে কতক অবগত হইতে পারি। দেশীয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত বিবেচনা করিতে গেলে তাঁহাদিগকে সামান্যতঃ দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দলের মত দেশীয়দিগের প্রতি সদ্ব্যবহার, ভারতবর্ষের শুভ উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ শাসন, উপযুক্ত হইলে তাহাদিগকে উচ্চপদ উচ্চ অধিকার প্রদান। অপর দলের ভাব স্বার্থপরতা— "হিন্দুস্থান তাঁহাদেরই ভোগের বস্তু, হিন্দুরা কখনই স্বাধীনতার উপযুক্ত নহে, চিরকালই তাহাদের সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। ইংরাজদের সঙ্গে সমকক্ষ হইয়া চলিতে যাওয়া তাহাদের স্পর্ধা মাত্র। এদেশ ইংরাজেরা তরবারি বলে জয় করিয়াছে, তরবারির বলে তাদের রক্ষা করিতে হইবে। প্রীতি সৌহার্দ্য ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা এ সকল কেবল মুখে বলিবার জিনিস, কাজের নহে। কৃষ্ণবর্ণ জাতি কখন শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার লাভের যোগ্য নহে, যদি হইত ত ইংরাজদের এদেশ অধিকারের ক্ষমতা থাকিত না। তাহাদিগকে সমান অধিকার দিলে ইংলণ্ডের মর্যাদার হানি হইবে। যাঁহারা আপনাদের শরীর পতন করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিজ সন্তানসন্ততিগণকে উপেক্ষা করিয়া দেশীয়দিগের মর্যাদা রক্ষা নিতান্ত অবিচারের কার্য। দেশীয়দিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়া, দেশীয়দিগকে স্বাধীনতা শিক্ষা দিয়া, আপনাদের পদচ্যুতির সোপান করিয়া দেওয়া নিতান্ত মূর্খতার কার্য। এরূপ নিঃস্বার্থ উপদেশ দেওয়া ভণ্ডামি মাত্র।" দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে ভারতবর্ষীয় ইংরাজদের মধ্যে এই শেষোক্ত দলের সংখ্যাই অধিক। ইংরাজি সংবাদপত্র সকলকে যদি এই দুই দলের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে এই দুই দলের আপেক্ষিক বল ও সংখ্যা সহজে অবধারিত হইতে পারে।

আর কতকগুলি ইংরাজ আছে (সংখ্যা তাহাদের অল্পই), এক কথায় যাহাদের মত এই যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের গলগ্রহ মাত্র, আর সে এমন গলগ্রহ যে তাহা হইতে নিষ্কৃতিরও উপায় নাই। এই সম্বন্ধে এক মাসিক সমালোচনী পত্রিকায় ("The Fortnightly Review" —"The foreign dominions of the Crown") পার্লামেন্ট সভার সভ্য সুবিখ্যাত লো সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার মর্ম পাঠকদিগের গোচরার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"প্রথমে যাহারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজ্য সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাদের স্বার্থ-সাধন ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ইংলণ্ডের গৌরব-বৃদ্ধি অথবা ভারতবর্ষবাসীদিগের কল্যাণ সাধন— এরূপ কোন ভাব তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। এক দল ব্যবসায়ীর কর্মকর্তা হইয়া তাহাদের ভারতবর্ষে প্রবেশ— তাহারা বিলক্ষণ অবগত ছিল যে যাহা কিছু করিয়া লইতে হইবে সে কেবল তরবারির বলে। কত কত দেশ উচ্ছন্ন গেল— কত রাজ্য ও

রাজা বিনষ্ট হইল— কত লুটপাট আরম্ভ হইল— ইংলণ্ডের সেনাগণ ক্রীত ডাকাতের কার্যে নিযুক্ত হইল। নিরপরাধী নিরীহ স্ত্রীগণ লুণ্ঠিত হইল— দেব মানব সকল প্রকার নিয়ম পদতলে দলিত হইল— এ সকলি অর্থোপার্জন উদ্দেশে। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার প্রত্যেক অভিযোগ সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ বর্তমান। উপায় যেমনই নিষ্ঠুর ও কলঙ্কিত হউক না কেন— জয়লাভ তেমনি সম্পূর্ণ হইয়াছিল। যদি ক্লাইব কিম্বা হেস্টিংসকে জিজ্ঞাসা করা যাইত— তোমাদের ভারতবর্ষে হুলুস্থুল বাধাইবার অভিসন্ধি কি? তাঁহারা অনায়াসে উত্তর দিতে পারিতেন— কোম্পানি বাহাদুরের আয় বৃদ্ধি। আর যদি অকপট ভাবে উত্তর করিতে ইচ্ছা করিতেন তবে ইহাও বলিতে পারিতেন— "আর আমাদের নিজেরও যৎকিঞ্চিৎ কাজ গোছান।" কিন্তু এ ভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই। তাহাদের কার্য-প্রণালী সময়োচিত হয় নাই। যদিও হেস্টিংস নির্দোষ সাব্যস্ত হইলেন, তাঁহার বিচারে যে সকল ব্যাপার প্রকাশিত হইল তাহাতে অবশেষে ইংলণ্ডের ধর্ম-বুদ্ধি জাগ্রত হইল। ক্রমে এই সকল অন্যায় অত্যাচার সংশোধিত হইল— বল ও যথেচ্ছাচারিতার পরিবর্তে ন্যায় ও সুবিচার সংস্থাপিত হইল। বিজয়ী কোম্পানীকে প্রথমে ব্রিটিশ রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতে হইল পরে তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত বিনাশপ্রাপ্ত হইল। যদি রোমিয়দের রাজ্য হইত ত তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বার্ষিক ২০ কোটি টাকা আদায় করিয়া লইতেন— ব্রিটিশ রাজ্য নিজের জন্য এক পয়সাও গ্রহণ করেন না। প্রত্যত ইংল্যণ্ডের নাবিকগণ ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য বিনা বেতনে যে কর্ম করে তাহা ধরিতে গেলে তজ্জন্য অন্যান্য বিষয়ে ভারতবর্ষের উপর আমরা ন্যায়ত অনেক টাকার দাবী করিতে পারি সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষকে করদ রাজ্য রূপে গণ্য করা দূরে থাকুক আমরা উল্টা তাহাকে সাহায্য দানে সমুৎসুক। যদিও তাহার রাজস্বের সংখ্যা ৫০ কোটি পৌণ্ড্র, আর ধনীরা তাহাতে প্রায় কিছুই দেন না, তথাপি ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের সাধ্যায় নিজ কর্তব্যসাধনে (দুর্ভিক্ষ মোচন) সাহায্য দিবার জন্য আমরা চাঁদা করিয়া টাকা উঠাইতে প্রস্তুত, আরো শুনা যাইতেছে শতকরা দুই এক টাকা সুদ বাঁচাইবার জন্য আমরা তাহার দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্যে টাকা ধার করিয়া উঠাইতে প্রস্তুত— আর ইংলণ্ডীয় করদাতা প্রজাগণ, যাহাদের উপর তাহাদের নিজের দরিদ্র-ভরণের ভার সমর্পিত, তাহাদের হইয়া ভারতবর্ষকে সমুদায়ে ৫০ কোটি টাকা উপঢৌকন দেওয়া হয় এরূপ প্রস্তাবও শ্রবণ করা যায়।

"ভারতবর্ষ হইতে লুটপাট মারপিট অন্যায় অত্যাচার সকল উঠিয়া গিয়াছে শুধু তাহা নয়, ভয় হইতেছে পাছে তাহার জন্য আমাদের অর্থ লুণ্ঠন আরম্ভ হয়। ভারতভূমি আমাদের কতই আদরের ধন— সোহাগের বস্তু— নাই পাইয়া নষ্ট শিশু তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ যে চিরকালই আমাদের উপর তাহার নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে— কেবল তাহা নহে, সে আমাদের নিকট হইতে কত আদর কত যত্ন পায়, আর যে সকল উপনিবেশ আমাদের নিজের সৃষ্টি তাহাদের গতি কি হয়, তাহার প্রতি আমাদের ভ্রূক্ষেপও নাই।

"ভারতের উপর আমাদের ও এইরূপ স্নেহ-দৃষ্টি। ইহার উপর আমাদের যতটা অনুরাগ ও মমতা, ইহা হইতে তদপযোগী লাভ উৎপন্ন হয় কিনা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। এক এই বলা যাইতে পারে যে ভারতের সহিত আমাদের যেরূপ ব্যবহার তাহাতে পৃথিবী-শুদ্ধ লোকে আমাদের পরোপকারব্রত ও নিঃস্বার্থ ভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতেছে। আমরা এইক্ষণে ভারতের সঙ্গে যে ভদ্র ব্যবহার করিতেছি তাহাতে আমাদের পূর্বপুরুষ সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত যতদূর সাধ্য তাহা হইয়াছে। আমরা জগৎকে দেখাইতেছি যে অল্প সংখ্যক ইউরোপীয় কর্তৃক কিরূপে কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শান্তি সুনিয়ম সৌরাজ্য বিস্তার হইয়া তাহাদের অবস্থার সর্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে— যাহা তাহাদের আপনাদের যত্নে কখনই হইতে পারিত না ও আমাদের সাহায্য বিনা এক বৎসর কালও স্থায়ী হইত না। এই সুদৃশ্যটি আমরা পৃথিবীর সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া আপনাদিগকে যথার্থ গৌরবান্বিত মনে করিতে পারি। কিন্তু একথা থাক্— ভারতবর্ষ হইতে আমাদের পুণ্য লাভের কথা হইতেছে না— আসল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এই, তাহা হইতে আমাদের বৈষয়িক লাভ কতদূর হইতেছে?

"এক এই লাভ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের মধ্যে অনেক গুণবান ও কর্মিষ্ঠ লোক, যাহাদের কর্মক্ষেত্র আমাদের দেশে অতি সঙ্কীর্ণ, তাহাদের জন্য ভারতবর্ষে অনেকগুলি উচ্চ অর্থকর যশস্কর পদ উন্মুক্ত রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষাও অধিকতর লাভ এই যে ভারতবর্ষীয় সিবিলসার্বিস সাধারণের জন্য মুক্ত হওয়াতে বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ উত্তেজনা লাভের এবং গুণ ও পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদানের এক প্রকৃষ্ট উপায় যোজনা হইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষের প্রশস্ত কার্যালয়ে প্রবেশ করিয়া যে সকল নিয়মবন্ধন করিয়াছি তাহাতে আমাদের গুণবান্ বিদ্বান যুবকগণ যেমন তাহাদের উপযুক্ত কর্ম-ভূমি পাইতেছে সেই অনুসারে ভারতবর্ষীদেরও উপকার সংসাধিত হইতেছে।

"ভারতবর্ষীয় রাজস্বের সদ্ব্যয় ও শৃঙ্খলা-বন্ধন আমাদের সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। লবণের উপর অযথোচিত কর ও শুল্ক আদায় সম্বন্ধে আর যে কতকগুলি দোষ ও অন্ধতা দৃষ্ট হয়, কালে তাহা বিলুপ্ত হইবে। যাহা হউক, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, বার্তা শাস্ত্রের নিয়ম বহির্ভূত যে সকল শুল্ক ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজ্যের রাজস্ব প্রণালীর কলঙ্ক স্বরূপ তাহা হইতে আমরা ভারতবর্ষকে মুক্ত রাখিয়াছি। মানবজাতির এমন বিস্তৃত জন-সংখ্যার মধ্যে যে আমরা শান্তি ও মর্যাদা রক্ষা করিতেছি— যে সকল শক্তি পরস্পরের প্রতিঘাত ও বিনাশ সাধনে নিয়োজিত হইত তাহা যে পরিশ্রম ও বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছি ইহাও বিশেষ প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে। প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কি— প্রজাদের পরস্পর কিরূপ সদ্ভাবে চলা কর্তব্য তাহার উচ্চ আদর্শ আমরা আর আর জাতির সম্মুখে ধারণ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইতেছি। ভারতরাজ্য হইতে আমাদের যাহা কিছু উপকার লাভ হইতেছে তাহার তালিকা এ প্রকার প্রদর্শিত হইল। আর

অধিক কিছু ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এখন অন্য দিকটা দেখা যাউক— এই সকল উপকার সাধনের জন্য আমাদের কতটা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে।

"কোন কোন জ্ঞানবান বিচক্ষণ ব্যক্তির মত এই যে, ভারতবর্ষ অধিকারে আমাদের মহাকার্যদক্ষতা ও দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইতেছে। তাহার উত্তর এই— যদি ইহা হইয়া থাকে ত তাহা আমাদের ভাগ্যের গুণে বুদ্ধি বলে নহে, কেন না ভারত-বিজয় ইংলণ্ডের মতামত-সাপেক্ষ ছিল না। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট ও প্রজাগণ, ভারত-বিজয়ে যাহাদের প্রকৃত ইষ্টানিষ্ঠ, তাহাদের সে বিষয়ে কোন হস্ত ছিল না। পলাশীর যুদ্ধ হইতে একবাব আমাদের রাজত্ব স্থাপিত হইবার পর, বিগ্রহের পর সন্ধি, সন্ধির পর বিগ্রহে, দেশীয় রাজ্য সকল ক্রমে আমাদের পদতলে বিদলিত হইল। আমরা প্রথম হইতে একেবারে হস্তক্ষেপ না করিতাম সে এক, কিন্তু কতকদূর অগ্রসর হইয়া এখন 'থামা যাক্ আর কাজ নাই' এরূপ বলিবার আর আমাদের সামর্থ্য রহিল না। এখন ত আমাদের অবস্থা আরো ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর আমাদের পিছু হটিবার যো নাই। এই কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জ যে বাজ্যের অধীন ছিল তাহা আমরা স্বার্থ-সাধন উদ্দেশে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের উপর রাজত্ব স্থাপন করিবার ভার লইয়াছি। ইহা নিশ্চয় যে এখন আর আমাদের মত পরিবর্তনের উপায় নাই, আমবা স্বহস্তে দেশীয় রাজ্য উচ্ছিন্ন করিয়া এক্ষণে প্রজাদিগকে অরাজকতাব অন্ধ কূপে পুনরায় নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। বহু দূরস্থ ভবিষ্যকালেও কখন যে এমন সময় আসিবে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন ভাবে স্বরাজ্য পরিচালনে সক্ষম হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ভারতবর্ষের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ দুই কারণে হইতে পারে, হয় ভিতর হইতে বিদ্রোহোৎপত্তি— অথবা বাহির হইতে শত্রুর আক্রমণ। ভারতের সহিত আমাদের ভাগ্য এরূপ সন্নিষ্ট হইয়া গিয়াছে যে ইচ্ছা করিলে ও আমরা যে সম্বন্ধ ভগ্ন করিতে পারি না। ইহা আমাদের সামান্য বিপদ নহে। দূরদর্শী রাজা এমন কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করেন না যাহাতে স্বীয় রাজ্যের ভাবী ভাগ্যের উপর নিজের অধিকার একেবারে তিরোহিত হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমরা এইরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি সন্দেহ নাই।

"ভারতবর্ষের রাজত্ব সম্বন্ধেও আমাদের ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের কথার উপর নির্ভর করিয়া কোটি কোটি মুদ্রা ধার দেওয়া হইয়াছে— পার্লামেন্ট পর্যন্ত এই ঋণের সঙ্গে জড়িত। মনে কর, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট কোন কারণে এই ঋণের টাকা প্রদানে অসমর্থ হন। তখন যদিও উত্তমর্ণগণ ব্রিটিশ ধনকোষের উপর দাবী করিতে প্রবৃত্ত হয় ত তাহা খণ্ডন করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে না। বলা যাইতে পারিবে যে পার্লামেন্টের অধীনস্থ ব্রিটিশ রাজ্যের রাজ মন্ত্রীগণ স্বয়ং এই টাকা কর্জ করিয়াছেন ও ঐ টাকা পরিশোধের জন্য রাণী নিজে কথা দিয়া দায়ী হইয়াছেন।

"ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া—শুধু অধিকার করিয়া নয়, তথায় শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া আমাদের এক লাভ এই হইয়াছে যে, সে দেশে আমাদের বাণিজ্য ব্যবসা নির্বিঘ্নে চলিবার সুবিধা হইয়াছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য ব্যবসায় ঘটিত সম্বন্ধ— সেই সকল দেশে রাজ্যের সুব্যবস্থা শান্তি ও ধন সমৃদ্ধি স্থায়ী হইলে তাহাতে ইংলণ্ডের নিজের স্বার্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্বার্থের পূর্ণ ফল লাভের জন্য ইহা আবশ্যক যে অন্যান্য স্থানে তাহারা যে মূল্যে যে প্রকার সামগ্রী পাইতে পারে আমরা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সামগ্রী অল্প মূল্যে আনয়ন করি। কিন্তু ইহা সকল সময় হইয়া উঠে না। ভারতবর্ষে শ্রমের মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ, এই জন্য এবং অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষীয়গণ আমাদের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছে। অতএব বাণিজ্য সম্বন্ধীয় লাভ অপ্রতিহত ও স্থায়ী লাভ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

"এই সম্বন্ধে আর একটি গুরুতর বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। ভারতের উপর আমাদের যে অধিকার তা কিসের বলে? বাহির হইতে বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণের ভয় বিচারযোগ্য কিন্তু তাহা দূরে থাকুক, ইহা ত অপ্রকাশ নাই যে আমাদের রাজত্ব রক্ষাহেতু সেই উষ্ণদেশে প্রায় ৭০০০ ব্রিটিশ সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন হইতেছে। আমরা দেশীয়দের সদ্ভাব রক্ষা ও প্রীতি আকর্ষণ করিবার জন্য যতই চেষ্টা করি না কেন তথাপি ব্রিটিশ সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত আমাদের চলে না। আর কোন কালে যে তাহা ছাড়িয়া চলিবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। এই সকল সৈন্য রক্ষার জন্য যে ব্যয়ের আবশ্যক তাহা ভারতবর্ষীয় রাজস্ব হইতে নির্বাহিত হয় সত্য, তথাপি এই কারণে আমাদিগকে অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। আমাদের রাজ্য সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা এইরূপ যে, আমরা কোন প্রজাকে তাহার ইচ্ছা বিরুদ্ধে সৈন্যদলভুক্ত করিতে পারি না। আমরা যে কেবল লোকসংখ্যায় দরিদ্র তাহা নয়। কিন্তু অপরাপর স্থলে অধিক বেতনে কর্মলাভের যেরূপ সুবিধা তাহাতে সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস হইবার আর এক প্রধান কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষ তাঁহার নিজের সন্তানগণকে ভক্ষণ করেন না বটে কিন্তু ইউরোপীয় রাজপুরুষদের উপর তাঁহার এরূপ কটাক্ষ যে এদেশের জলবায়ুর গুণে ইউরোপীয়দের যে ধ্বংস, তাহা অনেক ঘোর রক্তস্রাবী যুদ্ধ-জনিত নিপাতের সমতুল্য। ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহের ফল কি হইয়াছিল বিবেচনা কর। আমরা তৎপূর্বে যে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলাম তাহাতে আমাদের সৈন্য-সংখ্যা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের ভারতবর্ষীয় সৈন্যদলও ও নানা কারণে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ও সে ক্ষতি পূরণ না হইতে হইতেই ভারতবর্ষে এক মহা বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল। কত কষ্টে কত সাহসী ও অনুরাগী ব্রিটিশ সৈন্যের অতুল বীর্য উদ্যম সাহস পরাক্রমে— কি ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের পর তবে আমাদের রাজ্য প্রলয়দশা হইতে উদ্ধার পাইল। ইহা যেন কেহ মনে না করেন এইরূপ সঙ্কট চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না। যদি ইংলণ্ড যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ত আমাদের সৈন্যাভাব তেমনই উপলব্ধি হইবে— তেমনি বিপদ উপস্থিত হইবে। মনে কর সিপাই বিদ্রোহ আর এক বৎসর

পূর্বে সংঘটিত হইত অথবা ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ আর এক বৎসর অধিক স্থায়ী হইত তাহা হইলে কি হইত? তাহা হইলে রুসিয়ার রণক্ষেত্রে আমাদের আরো অধিক সৈন্য পাঠাইবার আবশ্যক হইত। আবার এদিকে ভারতবর্ষে আমাদের অল্পসংখ্যক প্রপীড়িত সৈন্যদলের সাহায্যে লোক না পাইলে সিবিলিয়ন দলের ইংরাজগণ ও তাহাদের অসহায় স্ত্রী-পুত্রদের সমূহ বিপদ উপস্থিত— এরূপ স্থলে কি করা যাইত? উভয় পক্ষ রক্ষা করিতে কি আমরা কৃতকার্য হইতাম? তাহা না হইলে কোন পক্ষকে কাল-কবলে ছাড়িয়া দিতে প্রবৃত্ত হইতাম?

"যে সকল লেখক ও বক্তা ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের মহামূল্য মণি বলিয়া বর্ণনা করে তাহাদের বাক্যের সততা বিষয়ে এখন আমরা বিবেচনা করিতে পারি। তাহাদের মতে ভারতবর্ষ গেলে ইউরোপীয় রাজ্যমণ্ডলীতে ইংলণ্ডের প্রাধান্য বিনষ্ট হইবে। আমাদের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি কখন আমাদিগের বিপদে পড়িতে হয় ত সে কেবল ভারতবর্ষেরই জন্য। আমরা অতীত ঘটনা হইতে যে শিক্ষা ও বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছি তাহা ইউরোপীয় জাতিদের সহিত ব্যবহারে কার্যে আসিতে পারে। আমরা আমাদের পরস্পর ভাব বুঝিতে পারিয়াছি— আমাদের মতাভিমত উদ্দেশ্য অনেকটা সমান। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দের মনোগত অভিপ্রায় বোধে আমরা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি? এইরূপ শুনা যায় যে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে আমরা তুর্কির সুলতানের করদ আশ্রিত প্রজা। চর্বিযুক্ত কাট্রিজে যেমন সিপাহিবিদ্রোহের সূত্রপাত হয়— পাগড়ীর আকার পরিবর্তনে যেমন বেলোয়ে বিদ্রোহ সমুদ্ভূত হয়, কে বলিতে পার কখন এইরূপ কোন সামান্য কারণে আমাদের ভারতবর্ষীয় রাজ্যে মহা হুলুস্থুল বাধিয়া যাইবে?"

নির্ঘণ্ট

অ

আ

এ

ও

ঔ

ক

খ

গ

ট

ড

ত

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

র

ল

শ

স

হ